ত্রয়োদশ বর্ষ । শ্রাবণ ১৩৬৩- আষাঢ় ১৩৬৪

সম্পাদক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

ত্রয়োদশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৩৬৩ - আষাঢ় ১৩৬৪

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

কোনারকের
রামকিঙ্ক

বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩

চিঠিপত্র

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েচি। চিরদিনই আমার মনটা পথিক, এই পথিকবৃত্তিই হয়তো আমার স্বভাব। চলাতেই ধ্বনি। বাঁশির বাধার ভিতর দিয়ে বাতাস যখন চলে তখন ধ্বনি জাগে, তটের সীমার মধ্য দিয়ে জল যখন চলে তখন তার কলগান— চিরদিন বাধার মাঝখান দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছে, সেই চলাতেই আমার সুর। চল্‌তে গিয়ে ভুলও হয়, রাস্তা যায় বেঁকে, ঝড়ে আলো যায় নিবে, খরতাপে পথের পথ্য যায় শুকিয়ে। ধাক্কা যখন খাই, তাপ যখন অসহ্য হয় তখনি খুঁজতে বেরই অন্তরের মধ্যে, বারে বারে দেখা যায় সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে অন্ন আছে আরোগ্য আছে শান্তি আছে, সেই শান্তির মধ্যে নিবিষ্ট হতে হতে একসময় বাইরেকার কুৎসা পারুষ্য পঙ্কিলতা আর নাগাল পায় না। কিন্তু সেই না-এর কোঠায় গিয়েই বিশেষ লাভ নেই। নিজের ভিতরে যে অভিমান যে রাগদ্বেষের চাঞ্চল্য আছে সেটাকে অতিক্রম করে একটি সহজ আনন্দ আসে সেটা কেবল মুক্তির নয়, সেটা সত্য উপলব্ধির। সেটা বিশুদ্ধ প্রীতির। এইটেতে উত্তীর্ণ হয়ে এইখানেই স্থিতি পাওয়া দুঃসাধ্য। এইটেকেই যে চাইতে হবে পেতে হবে থেকে থেকে মন সেটা ভুলেই যায়। পূর্ব্বসংস্কার আচ্ছন্ন করে দেয় সাধনার সংকল্পকে। তাহলেও এটা নিশ্চিত জানতে পারাতেও শক্তি পাওয়া যায়— সেই জানাটা হচ্ছে এই যে, অন্তরের স্তব্ধতার সঙ্গে বাইরের চলাকে মেলালে তবে সার্থকতা,— যেমন স্তব্ধবীণার সঙ্গে গতিশীল গানের সম্বন্ধ। আমার কাছ থেকে শক্তি পাবে এমন আশা করচ, কিন্তু সেই রকম গুরুর অধিকার তো আমার নয়। আমি তোমার কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু কল্যাণ বিধান করব এমন ঐশ্বর্য্য কি আমার আছে? ইতি ৩ ডিসেম্বর ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

ইতিমধ্যে আমার কলকাতায় যাবার কথা ছিল মনে করেছিলুম তখন তোমার সঙ্গে দেখা হলে কিছু কথাবার্ত্তা ক'ব। সে আর ঘটে উঠ্‌ল না। বরোদায় শীঘ্রই যেতে হবে অথচ শরীর কিছু অসুস্থ আছে—

এ অবস্থায় পথযাত্রার পরিমাণ ও দুঃখ আর বাড়াতে সাহস হয় না। তোমার অল্প বয়স, সর্বদা নিজের মনটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা তোমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। চারিদিকের সঙ্গে বেশ সহজভাবে যোগরক্ষা করে নির্ম্মল প্রসন্নতা নিয়ে দিন কাটানোর মতো সাধনা আর কী আছে। অসামান্য কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করা দুর্ব্বলতা। নিজেকে অনায়াসে ও অবাধে দানের শক্তিকে প্রতিদিনের সহস্র সামান্য উপলক্ষ্য নিয়েই চর্চ্চা করতে হবে। বাইরের সাধারণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যখন স্নিগ্ধ এবং অক্ষুব্ধ হয় তখনই বুঝতে পারি ভিতরের দিকে আমরা সিদ্ধিলাভ করেছি। অহমিকা কাটিয়ে ওঠার মত এমন দুরূহ অধ্যবসায় আর কিছুই নেই— তাকেই ক্রমাগতই বাড়িয়ে তোলা আমাদের চিরাভ্যাস— সকল কিছুতেই নানা আকারে সে নিজের দাবী উপস্থিত করে, স্বনামে বিনামে, সবসময়ে তাকে চিনতে পারিনে। তার একটু আঘাত একটু নিন্দা একটু ক্ষতিতে চারিদিক আলোড়িত করে সে ধূলা উড়িয়ে দেয়, তখন তাকে ভর্ৎসনা করে তাকে থামিয়ে দেবার কথা মনেই থাকে না, কেননা চিরকাল তাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। এতেই যত অশান্তি যত দুর্য্যোগ ঘটে। যখন মনে করে বসে আছি এই দুর্দ্ধর্ষটাকে নিরস্ত পরাহত করেছি এমন সময়ে কোথা থেকে সামান্য একটু নাড়া পেয়েই সে উদ্যত হয়ে ওঠে, ভুলে যাই নিজের পরাভব। তবু হাল ছাড়লে চলবে না— এই চঞ্চলটাকে বাইরে সরিয়ে নিজের থেকে এ'কে পৃথক করে দেখতে হবে। কাজটা একেবারেই সহজ নয় অতএব ক্ষণে ক্ষণে পরাভব ঘটলে অবসাদগ্রস্ত হোয়ো না। একটি অভ্যাস নিত্যই করতে হবে, যারা তোমার চারিদিকে আছে তাদের প্রতি সহিষ্ণু হোয়ো, প্রসন্ন হোয়ো— একটি প্রফুল্লতার আলোক তোমার অন্তর থেকে বিকীর্ণ হ'তে যাতে বাধা না পায় এইটি কোরো। তুমি আছ বলেই সংসারে একটু মাধুর্য্য আছে, সংসারযাত্রার কর্কশতা একটু দূর হয়েছে। এর মতো সৌভাগ্য আর কিছু নেই। চারদিককে যতই তুমি আনন্দিত করবে ততই আনন্দস্বরূপের আবির্ভাব তোমার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হবে। নিরন্তর নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে নিজেকে ক্লান্ত কোরো না—হাসিমুখে সহজ আনন্দে দিনগুলিকে অনুকূল স্রোতের নৌকার মতো ভাসিয়ে দিয়ো। বার বার মনকে বলিয়ে নিয়ো—

আনন্দং পরমানন্দং পরমসুখং পরমাতৃপ্তিঃ

ইতি ৮ জানুয়ারি ১৯৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

আহমেদাবাদ

কল্যাণীয়াসু

ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েচি তাই দুর্ব্বল। আজ বরোদায় যাচ্চি।

পথে থামতে থামতে ফিরতে হবে। একটানা অতদূর যেতে পারব না। হয়ত ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পৌঁছব। তোমার জন্য উদ্বিগ্ন রইলুম। শরীরকে সুস্থ ও মনকে শান্ত রেখো।

সাহিত্যসম্মেলনের পূর্ব্বে ফেরা অসম্ভব। বক্তৃতাটা লেখা হয়েচে— পাঠিয়ে দেব। ২৪ জানুয়ারি ১৯৩০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

শরীর এখনো কাজের বার। কক্ষকোণের গবাক্ষে চক্ষু মেলে পর্য্যঙ্ক অঙ্কাশ্রিত হয়ে নিষ্কর্ম্মা বসে আছি। এ অবস্থায় শীঘ্র এখান থেকে নড়চড় হবার সম্ভাবনা দেখিনে। মার্চ্চ মাসে য়ুরোপ যাওয়ার একটা জনরব উঠেছে কিন্তু এখনো তার আয়োজন বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না।

গ্রহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন— আমেদাবাদে পড়লুম রোগশয্যায়— ডাক্তারের হাতে পড়ে সাহিত্যসম্মেলনের লগ্ন পার হয়ে গেল— প্রত্যক্ষে ওষুধ খাচ্চি পরোক্ষে গাল খাচ্চি এইভাবে আমার শুভ মাঘমাস ক্ষয় হয়ে এল। একেবারে নাড়ী না ছাড়লে দেশের লোক ক্ষমা করেন না, কিন্তু এমনি ভাগ্য, যমের দূত আসে তবু রথ আসে না— তাই স্মরণসভায় যাঁরা বিলাপ করতেন সাহিত্যসভায় তাঁরা কটূক্তি করবেন।

তুমি দিল্লী চলেছ কিসের প্রত্যাশায় বুঝতে পারলুম না। আমার আশীর্বাদ। ইতি ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যে অসৌজন্য অন্যায় অবিচার প্রশ্রয় পাচ্চে সাধারণভাবে তোমার কাব্যের ভূমিকায় তারি উল্লেখ করেছি। এ জন্যে তোমাকে যে কেউ ক্ষমা করবে এমন আশা করিনে— তবু বলা ভালো। বিশ্রাম সাধনায় ব্যস্ত আছি অতএব আর নয়। ইতি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

বুলা একেবারেই নেই এই কথাটা যখন তোমার মন কোনোমতেই স্বীকার করতে চাচ্চে না তখন তাকে স্বীকার করবার দরকার কি? থাকা ব্যাপারটার কত বৈচিত্র্যই আছে। কখনো ঘুমিয়ে থাকি কখনো জেগে থাকি কখনো কাছে থাকি কখনো দূরে থাকি— কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য— তার সঙ্গে আরো একটা কথা যোগ করে দিতে দোষ কি— অর্থাৎ কখনো এ লোক কখনো অন্য লোক— কখনো মর্ত্ত্য শরীরের অবস্থায় কখনো এ শরীরের অতীত অবস্থায়। তুমি বল্বে, নিশ্চিত জানিনে যে। সেই জন্যেই ইন্দ্রিয়ের প্রমাণকেই বলবান না করে আকাঙ্ক্ষার প্রমাণকেই তো মানা ভালো। পৃথিবীতে সব আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা ঘটে না একথা সত্য, তেমনি একথাও সত্য, যে সব সত্যের যুক্তি আমাদের হাতে নেই, তাই যাকে নিশ্চিত বলে জানি সেও ভ্রান্ত হতে পারে। মৃত্যুকে বিলয় বলে মনে করচি খুবই সম্ভব তার কারণ এই যে, সে যে বিলোপ নয় তার প্রমাণগুলো আমাদের হাতের কাছে নেই— হয়তো কেবল বৃথা বিলাপ করেই

মরচি। মা পাশের ঘরে গেলে শিশু যেমন মায়ের অবলুপ্তি· কল্পনা করে এও হয়তো তেমনি। আমি এই কথা বলি যখন দ্বন্দ্বের মধ্যেই আছি তখন না-য়ের চেয়ে হাঁ-কে মানাই ভালো। মৃত্যু যদি চরম সত্যই হয় তাহলে আক্ষেপ করা বৃথা, যদি সত্য না হয় তাহলে ততোধিক বৃথা— অতএব মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে দেখা যাক তার পরে হয় এপক্ষে নয় ওপক্ষে তর্কের সমাধান হবে— আমি নিজে শান্ত মনে তারি অপেক্ষা কর্‌চি এবং ততক্ষণ এই বিশ্বাস ধরে রেখেচি যে মৃত্যুর পর মুহূর্ত্তেই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ হাঁকার নেই। ইতি ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার এ বয়সে ভুল করলে লোকে বুঝে নেয় সেটা ভুল। তোমাদের বয়সে যদি ভুল করতুম লোকে ধরে নিত সেটা অক্ষমতা অতএব আমার অনুকরণ কোরো না। সাবধানে লাইন গুনে অক্ষর মিলিয়ে কবিতা লিখো। আর ১ বয়সে [বৈশাখে] রামানন্দবাবুর সঙ্গ ধরে যদি এখানে আসতে পারো তবে কল্পনা কোরো না সেটা অত্যন্ত দুঃসহ হবে। ইতি ২৮ চৈত্র ১৩৩৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

জন্মদিনের উৎসব সুসম্পন্ন হয়ে গেছে খবর বোধহয় শুনেচ। আর সমস্তই ভালো কিন্তু ব্যাপারটা আমার পক্ষে সহজ হয় নি। আজও তার উপসংহার ভাগে যথেষ্ট হাঙ্গামা জমে উঠেচে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছি।

তোমরা আসতে পারলে খুবই খুসি হতুম। তোমাদের প্রদত্ত উপহার ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এসে পৌচেছে। ভালো লাগল। আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠিতে যে বেদনা প্রকাশ পেয়েচে, তাতে আমি অত্যন্ত পীড়া বোধ করলুম। জীবনের সঙ্গে সংসারের যদি অসামঞ্জস্য ঘটে তবে সেটা সহজে সহ্য করে ধীরে ধীরে সুর বেঁধে তোলা তোমার বয়সে ও তোমার অভিজ্ঞতায় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তোমাকে কি পরামর্শ দেব ভেবে পাইনে। নিজের অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে— তীব্র দুঃখে যখন দিনগুলো কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল তখন কোনো মতে সেগুলো উত্তীর্ণ হয়ে যাবার রাস্তা পাইনি, মনে করেছিলুম অন্তহীন এই দুর্গমতা। কিন্তু জীবনের

পরিণতি একান্ত বিস্মৃতির ভিতর দিয়ে নয়, দিনে দিনে বেদনাকে বোধনার মধ্যে নিয়ে গিয়ে কঠোরকে ললিতে অম্লতাকে মাধুর্য্যে পরিপক্ক করে তোলাই হচ্ছে পরিণতি। তোমার যে তা ঘটবে না তা আমি মনে করিনে— কেননা তোমার কল্পনাশক্তি আছে, এই শক্তি সৃষ্টিশক্তি। অবস্থার হাতে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে তুমি থাকতে পারবে না— নিজেকে পূর্ণতর করে তুমি সৃষ্টি করতে পারবে। আমি জানি আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে উদার শক্তিতে আত্মবিকাশ সহজ নয়— বাইরের দিকে প্রসরতার ক্ষেত্র তাদের অবরুদ্ধ— অন্তরলোকে প্রবেশের যে সাধনা সে সম্বন্ধেও আনুকূল্য তাদের পক্ষে দুর্লভ। তবু তুমি হতাশ হোয়ো না— নিজের উপর শ্রদ্ধা রেখো— চারিদিক থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সেই গভীর নিভৃতে নিজেকে স্তব্ধ কর যেখানে তোমার মহিমা তোমার ভাগ্যকেও অতিক্রম করে। তোমার পীড়িত চিত্তকে যদি সান্ত্বনা দেবার শক্তি আমার থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম— কিন্তু একান্ত মনে তোমার শুভকামনা করা ছাড়া আমার আর কিছু করবার নেই। যদি বাইরের কোনো ক্ষুদ্রতা তোমাকে পীড়ন করে থাকে তবে তার কাছে পরাভব স্বীকার করতে লজ্জা বোধ কোরো। ইতি ১৪ শ্রাবণ ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে আমাকে খুব সম্ভবত কলকাতায় যেতেই হবে। বন্যাপীড়িতদের সাহায্যকল্পে কিছু করা চাই। এই বন্যায় আমরাও নিঃস্ব অতএব একটা কোনো অভিনয় আশ্রয় করে অর্থসঞ্চয়ের চেষ্টা করতে হবে— নতুবা বুভুক্ষু প্রজাদের আর কোনো উপায়ে বাঁচাতে পারব না। এখান থেকে কিছু কিছু অর্থ আমরা সংগ্রহ করেছি। তোমার বাবাকে এই সংবাদ দিয়ো। তিনি সেপ্টেম্বরের আরম্ভে অভিনয়ের দিনগুলো বাদ দিয়ে কোনো একদিন যদি আমাকে আমন্ত্রণ করেন তাহলে অসুবিধা হবে না।

এই কাজের ভার গ্রহণ করবার উপযুক্ত শরীর আমার নয় কিন্তু উপায় নেই। সম্প্রতি কোমরে ব্যথা হয়ে আমার দেহটাকে আরো অচলতর করেচে। আজ এখানে বর্ষামঙ্গল হবে, তার কোনো কোনো অংশে আমাকেও যোগ দিতে হবে।

তোমার দেহমন সুস্থ আছে এই আশা করি। ইতি ৬ ভাদ্র ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ঠিক কবে রাজধানীতে পদার্পণ করব নিশ্চিত বলতে ভরসা পাচ্চিনে। অল্প বয়সে মনের উপর নির্ভর করা দুঃসাধ্য ছিল এখন দেহটাকে বিশ্বাস করা চলে না। তার মন্ত্রণা না নিয়েই কর্ত্তব্য সাধনের চেষ্টা করি কিন্তু সময়ে সময়ে সে এমনতর কড়া রকমের "সত্যাগ্রহ" করে বসে যে তাকে লঙ্ঘন করতে পারিনে।

আপাতত ঠিক করেচি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কিম্বা তার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই এখান থেকে নড়ব। তোমার বাবাকে বোলো এই বেলা মাল্য চন্দন, "শার্দ্দূলবিক্রীড়িত" ছন্দ এবং অনুঃস্বর বিসর্গের আয়োজন করে রেখে দিন। ইতি ১০ ভাদ্র ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Glen Eden/Darjeeling

কল্যাণীয়াসু

কলকাতায় এসে দূরধ্বনিবহ যোগে তোমাদের সন্ধান করেছিলুম প্রত্যুত্তর না পেয়ে মনে করলুম আয়ুপরিবর্দ্ধনের প্রত্যাশায় বায়ুপরিবর্ত্তনে বেরিয়েছ। আমিও সেই সংকল্পে অনেক দ্বিধা সত্ত্বেও দার্জ্জিলিং এসেছি। স্পর্দ্ধিত পৃথিবীর অভ্রভেদী ঔদ্ধত্য আমি পছন্দ করি নে। তার চেয়ে অবারিত আকাশের তলে তার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত আমার মনকে মুগ্ধ করে। মনে করেছিলুম ছুটির মাসটায় শান্তিনিকেতনে শেফালিসুগন্ধি শুভ্র শরতের নির্ম্মল প্রসাদ নির্জ্জনে উপভোগ করব। কিন্তু শরীর এবার শ্রান্তিভারে অভিভূত তাই গিরিরাজের আতিথ্যে শুশ্রূষা কামনা করে এখানে এসেছি। স্বাস্থ্য সংগ্রহ করে যদি নিয়ে যেতে পারি তবে বন্ধুর পথে কর্ত্তব্যের বোঝা আরো কিছুদিন টেনে বেড়াতে পারব।

কলকাতা থেকে দূরে গেছ ভালই করেছ— দূরে যাওয়া অবগাহন স্নানের মত; নিকটের ধূলি ধুয়ে দেয় এবং সঞ্চিত তাপ দূর করে। যে অবকাশে মন আপনাকে প্রসারিত করতে পারে অভ্যস্ত সংসার তাকে নানাদিকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। সংসার কর্ত্তৃক সেই একান্ত অবরোধের মধ্যে সংসারের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ পীড়িত বিকৃত হয়। মুক্তির ক্ষেত্রে এসে তবেই সেই সম্বন্ধকে আমরা বিশুদ্ধ করে নিতে পারি।

এই সার্ব্বভৌম কবির কথা তোমার বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো এবং তোমরা সকলে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি বিজয়া দশমী ১৩৩৮

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমি তো আপাতত এইখানেই স্তব্ধ আছি যে পর্য্যন্ত না জয়ন্তীর দূতেরা আমাকে জবরদস্তি করে ধরে নিয়ে যায়। ছিলেম দার্জ্জিলিংএ— শরীরটা ভালোই ছিল। এখানে নেমে এসে নানারকম কাজের চক্রে পাক খেয়ে মরচি— মুহূর্ত্তকাল সময় পাচ্চিনে।

যে ছবিটা পাঠিয়েছ তার ভুতুড়ে গোছের চেহারা। কোথা কোন্ প্রেতলোক থেকে সংগ্রহ করেছ। সময় পেলে তলদেশে কিছু লিখে দেবার চেষ্টা করব— কিন্তু আকৃতিটা দেখে কবিত্বের প্রেরণা মনে আসছে না। ২৪ নভেম্বর ১৯৩১

স্নেহরত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কোনো কোনো চিঠির জন্মক্ষণে হঠাৎ দুর্গ্রহের দৃষ্টি পড়ে। তোমার বাবার চিঠি পেয়েই তার জবাব লিখ্‌তে বসেছিলুম। এক পাতা শেষ হতে না হতে বাধার উপর বাধা। কিছুদিন থেকে আমি নানাপ্রকার কাজে অকাজে এতবেশি বিজড়িত যে তাতে কাজও এগোয় না বিশ্রামও চাপা পড়ে। ছোট খাটো জরুরী বৈষয়িক কর্ম্ম— বৈষয়িক বলতে আমার সম্পত্তি রক্ষণের কথা কল্পনা কোরোনা— যে কাজ আমার ঘাড়ে চেপেছে তারি ঘাড়ে যত কিছু দায় চেপে বসেছে, থেকে থেকে এক একবার তারা আমাকে ব্যস্ত করে তোলে— বিশেষত যখন অন্নাভাব ঘটে। সেই দুঃসময় এসেছে। তার উপরে একটা অভিনয়ের উদ্যোগপর্ব— সেটা জয়ন্তী নামধারী একটা বিরাট পর্ব্বেরই আনুষঙ্গিক।

যাহোক অরুণসারথির মতো সেই অসমাপ্ত পত্র পদার্থটা চিরকাল অসম্পূর্ণ হয়েই থাকবে না। কোনো একটা অবকাশে সেটার উপর হস্তক্ষেপ করব।

কলকাতায় এখন যাওয়া ঘটবে না। জয়ন্তীর সময় আশা করি যাওয়া সম্ভব হবে।

তোমার বাবাকে আমার সবিনয় নমস্কার জানিয়ে পত্রোত্তরচ্যুতি জনিত অপরাধের ক্ষমা সংগ্রহ করে নিবো। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

স্নেহরত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

"Uttarayan," †
Santiniketan
Birbhum

কল্যাণীয়াসু

মৈত্রেয়ী, চিত্রশালায় বিচিত্র জীবের উপদ্রবে হঠাৎ শরীরটা ভেঙে পড়ল। তাই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারতে হল। টেবিলের উপর একরাশ অটোগ্রাফ বই জমেছিল। তাড়াতাড়ি নাম সই করেই রথে চড়ে বসলুম। কোন্‌টা কার তা বাছাই করা অসাধ্য— নাম প্রায়ই নেই। যা হোক চিত্রশালাধ্যক্ষের হাতে সেগুলো পড়ে আছে বলে আশা করি। তোমার সোদরা ছবিরও বইখানা সেইখানেই বিশ্রাম করচে। মুকুলকে লিখে দেব। আনিয়ে নিয়ো। আমার কাছে কোনো জিনিষ ফেলে রাখা নিরাপদ নয়। আমি অপক্ষপাত ভাবে নিজের জিনিষও হারিয়ে থাকি। হারাধন খুঁজে খুঁজে আমার দিনের অনেক অংশ কাটে। পারস্য যাত্রার আয়োজন চলচে। ইতি ৩০ ফাল্গুন ১৩৩৮

স্নেহরত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

† মুদ্রিত ঠিকানা

সাহিত্যের ভাষা

শ্রীসুবোধ ঘোষ

বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রধান হয়ে উঠলেও রস এখানে জীবিত আছে—অগ্নিপুরাণের এই উক্তি শুনে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য তবে কি রসের জীবিতত্ব ক্ষুণ্ণ করে? বোঝা যায় না, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য অর্থে কি বুঝেছেন অগ্নিপুরাণ। রসের সৃষ্টির সহায়ক হল না, এমন বাক্-কীর্তিকে বৈদগ্ধ্য বলে আখ্যাত না করাই উচিত। জলহারা মেঘের ঘটার মতো সে বাক্-কীর্তি শুধু একটা ঘটা, বাগ্‌বৈখরী মাত্র।

বাগ্‌বৈদগ্ধ্যকে বাদ দিয়ে যদি রসের সৃষ্টি সম্ভব হত, তবে না হয় অগ্নিপুরাণের অনুরূপ ধারণা স্বীকার করে নিয়ে উভয়ের মধ্যে গুণগৌরবের একটা প্রভেদ মেনে নেবার যুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু বাগ্‌বৈদগ্ধ্য নেই অথচ বক্তব্য রসাত্মক হয়েছে, এমন সাহিত্যের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। বাগ্‌বৈখরী আছে, এবং বাক্য রসাত্মক হয় নি, এমন অসাহিত্য খুঁজলেই পাওয়া যায়।

মম্মট ভট্ট মনে করেন, যে-অলংকার রসের পোষক নয়, সে-অলংকার অলংকারই নয়, উক্তি-বৈচিত্র্য মাত্র। কুন্তকও তাঁর 'বক্রোক্তি'র অনেক মহত্ব ঘোষণা করে শেষ পর্যন্ত তাঁর থিওরিকে নিজেই যেন একটু সতর্ক করে দিয়েছেন। বক্রোক্তি, অর্থাৎ উক্তির চারুতা ও চমৎকারিতাই রসসৃষ্টির হেতু, কুন্তক তাঁর এই ধারণাকেই আবার বিচার করে বলেছেন যে, যে-উক্তির চারুতা ও চমৎকারিতা রস সৃষ্টি করতে পারে, সেই উক্তিই হল প্রকৃত বক্রোক্তি। অগ্নিপুরাণের ধারণাকেও এইভাবে সংশোধন করে নিয়ে বলা যেতে পারে যে, রসসৃষ্টির হেতু হয়ে থাকে যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, তাই হল প্রকৃত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের কারণেই বক্তব্য রসাত্মক হয়।

বাগ্‌বৈদগ্ধ্য অর্থে নিশ্চয়ই নিছক শব্দসমারোহ অথবা অক্ষর-ডম্বর ভাষার ঘটা বোঝায় না। কবি রামপ্রসাদ যখন বলেন, 'আমার জাগা ঘরে হয় চুরি', তখন তিনি অত্যুচ্চ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যেরই পরিচয় প্রদান করেন, কারণ বাক্য এখানে শব্দের অভিধা অতিক্রম ক'রে ভিন্ন একটি ব্যঞ্জনাভিরাম গরিমা লাভ করেছে, অথচ বাক্যের উপাদান হল ছোট ছোট সাদা ফুলের মত অনাড়ম্বর কয়েকটি কথা। বাক্‌বৈদগ্ধ্য অর্থে ভাষার সেই রূপ ও প্রকৃতির নির্মাণ বোঝায়, যার জন্য ভাষা রসসৃষ্টির হেতু হয়ে থাকে। বলতে পারা যায়, ভাষারই একটি সাহিত্যোচিত অথবা সাহিত্যসম্মত রূপ আছে।

ভাষার 'দুই ব্যবহার' নিয়ে অনেকদিন থেকেই একটা আলোচনার এবং সেই সঙ্গে ক্ষুব্ধ বাদ-প্রতিবাদেরও আন্দোলন চলে আসছে। সম্প্রতি পাশ্চাত্যের সাহিত্যের আসর এই আলোচনার প্রকোপে নতুন করে এবং বেশ একটু উত্তেজনা নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। বাংলারও কোনো কোনো সাহিত্যপত্রিকাতে মাঝে মাঝে ভাষার ব্যবহার-রীতি নিয়ে সদুপদেশ এবং দুশ্চিন্তারও প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভাষা সৎপথে থাকুক, ভাষা উন্নতির পথে এগিয়ে চলুক, এই রকমই একটা সদিচ্ছার আন্দোলন; কিন্তু দাবির রকম দেখে সন্দেহ করতে হয় যে, এ যেন ভাষাকে শাসন করবার জন্য নানা যুক্তি আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আন্দোলন।

আধুনিক ফ্রান্সে ডাডাইস্ট ঐতিহ্যের বাহক বিশেষ একটি লেখক-গোষ্ঠী ভাষাকে বাস্তবায়িত করবার আগ্রহে এমন দাবিও করে থাকেন যে, সাহিত্যোচিত ভাষার আদর্শ হবে বাজারের ভাষা। যে-সব শব্দ 'ক্লাসিক সাহিত্যের আভিজাতিক ঐতিহ্যের' সৃষ্টি, সেগুলিকে পরিহার করতে পারলেই ভাষা বেশি জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে উঠবে ; এই রকমই একটি ধারণার ব্যাকুলতা এই অভিমতের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এঁদের ধারণার মধ্যে আসল ভুল এই যে, তাঁরা শব্দরূপের রহস্য এবং ভাষারূপের রহস্যকে একই ব্যাপার বলে মনে করেছেন। বাজারী ভাষা-রীতি অনুসরণ ক'রে কখনোই সাহিত্যসম্মত ভাষা রূপ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু বাজারী ভাষায় প্রচলিত শব্দ ইডিয়ম উপমা ও প্রবাদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। প্রয়োগ-রীতির গুণে যে-কোনো শব্দ, সে শব্দ যতই অকুলীন হোক-না কেন, সাহিত্যোচিত ভাষার গঠনে স্থান পেতে পারে।

ভাষার 'দুই ব্যবহার' নিয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গ নতুন ক'রে উত্থাপন করেছেন আর এক শ্রেণীর মনস্বী। বিজ্ঞান ইতিহাস ও জীবনচরিতের মধ্যে সাহিত্যোচিত ভাষার অনুপ্রবেশ কেন ? এই প্রশ্ন হল তাঁদেরই আক্ষেপের প্রশ্ন, যাঁরা ভয় করেন যে, সাহিত্যোচিত ভাষার ব্যবহারে বিজ্ঞান ইতিহাস ও জীবনচরিতের তাথ্যিক সত্যতা বিপন্ন না হয়ে পারে না।

বৈজ্ঞানিক যখন পদার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেন, ঐতিহাসিক যখন ঘটনার বিবরণ প্রদান করেন, তখন তাঁর ভাষা খুবই সাবধানে বিশেষ একটি নিষ্ঠার অধীনতা মেনে নিয়ে তাঁর বক্তব্য রূপায়িত করে। ভাষার এই রূপ নিতান্তই বাস্তবানুগ রূপ। ভাষার মধ্যে কোনো অবান্তর রহস্যের কুহক থাকে না। এই ভাষা তাথ্যিকের ভাষা ; নিরাভরণ বক্তব্য যেন একটা গাণিতিক শুচিতা ধারণ করে থাকে। তথ্যকে জ্ঞানগোচর করার জন্য এই সাদামাঠা সাত্ত্বিক রূপের ভাষা দিয়ে কাজ চালানো যায়। এই ভাষা কেজো কথা দিয়ে গড়া ভাষা। বিজ্ঞান ইতিহাস ও জীবনচরিতের তাথ্যিক সত্যটুকুই যেখানে চিন্তার অধিগত করা প্রয়োজন, সেখানে অবশ্যই এই কেজো ভাষা তথা বাস্তবানুগ রূপের ভাষা প্রয়োজন।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক কি অস্বীকার করতে পারেন যে, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের তাথ্যিক রূপ ছাড়া আর একটি রূপ আছে, যেটা হল ভাবরূপ ? ঠিকই, আকাশের মেঘে বিদ্যুতের চমক বিশেষ একটা বৈজ্ঞানিক নিয়মেই নিষ্পন্ন হয়। সেই নিয়মের তাথ্যিক সত্যটুকু জানা ছাড়া আর কোনো সত্য কি অনুভব করবার নেই ? ঐ বৈজ্ঞানিক নিয়মের মধ্যেই কি আনন্দ ভয় বিস্ময় ও বিহ্বলতার একটি ভাবময় সত্তা নেই ? ঘটনা তথ্য ও নিয়মের এই ভাবময় সত্তা কিংবা ভাবরূপের সত্যতা প্রকাশ করতে হলে বাস্তবানুগ কেজো ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার নয়, তার জন্য দরকার সাহিত্যোচিত ভাষা। বিজ্ঞান ইতিহাস ও জীবনচরিতের রচনায় সাহিত্যোচিত ভাষার অনুপ্রবেশ দেখে ক্ষুব্ধ হবার ও উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। বরং বুঝতে হবে যে, বিজ্ঞান ইতিহাস ও ব্যক্তিজীবনের তথ্যগত সত্যকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্য তার রসের রাজ্যকেই বিস্তারিত করছে। সাহিত্যের পরিধি প্রসারিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের ও ইতিহাসের ভাবরূপের স্পর্শে যদি অনুভব রসিত হয় তবে সেটা যে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের তাথ্যিক জ্ঞান-ধারণা লাভের অন্তরায় হবে, এমন আশঙ্কারও হেতু নেই। বরং এর ফলে উপলব্ধির পূর্ণতাই সম্ভব হয়। জুলিয়াস সীজর বলতেন, আমার সৈনিকেরা সুরভিসিক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করে বলেই ভালো যুদ্ধ করতে পারে।

যেমন অতীতে দেখা গিয়েছে তেমনি আধুনিক কালেও দেখতে পাওয়া যায় যে, সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে আর-এক ধরনের খবরদারী মতবাদ মাঝে মাঝে প্রবল হয়ে ওঠে, এবং এই মতবাদ বস্তুত সাহিত্যেরই সত্যকে

বিপন্ন করবার দাবি। সাহিত্যের ভাষার রূপ হবে ছিমছাম, কাটাছাঁটা ও সাদামাঠা ; বক্তব্যকে সোজা স্পষ্ট ক'রে বলে দিতে হবে ; এই হল দাবি। অতীতে এই রকমই একটা দাবি নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি করেছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সর, এবং আমাদের আধুনিক বাংলার সাহিত্যপত্রিকার নিবন্ধেও মাঝে মাঝে ভাষার রূপ সম্বন্ধে সেই পুরানো স্পেন্সরীয় উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া যায়।

কাব্য ও কাহিনীর ভাষারূপের উপর রাগ করেছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সর। কাব্যিকের ও কাহিনীকারের ভাষা হল সত্যের অপলাপ, এই ছিল তাঁর অভিযোগ। নায়েগ্রা সম্বন্ধে এক কবিতা পাঠ করে তিনি কবিকে লিখেছিলেন যে, ঐ কবিতায় নায়েগ্রার রূপের যথার্থ পরিচয় অভিব্যক্ত হয় নি। জলধারার মত্ত আবেগ, ফেনিল উচ্ছ্বাস, প্রবল কলহর্ষ আর নৃত্যময় তরল হিল্লোল, যত সব কল্পিত অসত্যের ঝংকার। নায়েগ্রার প্রকৃত রূপের পরিচয় তিনি নিজেই বর্ণনা করে কবিকে জানিয়েছিলেন যে, নায়েগ্রা হল এক শ ষাট ফুট উঁচু একটি জলপ্রপাত, যার জলপ্রবাহের ভেলোসিটি হল প্রতি সেকেণ্ডে একশত ফুট, জলাবর্তের কুঞ্চন বিশ ফুট পুরু, এবং প্রতি সেকেণ্ডে সাতাশ হাজার টন জল প্রবাহিত হয়ে যায়।

হার্বার্ট স্পেন্সরের নায়েগ্রা নিশ্চয়ই মিথ্যা নায়েগ্রা নয়। কিন্তু তথ্যাভিজ্ঞের এই বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার মধ্যে নায়েগ্রার রূপের সব সত্যতা অভিব্যক্ত হয়েছে বলে কেউ স্বীকার করবেন না। তিনি শুধু একটি তাথ্যিক রূপের সত্যকে পাঠকের জ্ঞানগোচর করেছেন, সেই ভাবরূপের সত্যকে নয়। কবির কাছ থেকে প্রত্যুত্তর পেয়েও স্পেন্সর তাঁর ধারণার সংশোধন করতে পারেন নি। কি লাভ হবে 'ভাবরূপের সত্য'কে প্রকাশ ক'রে, সেটা যে সত্যের একটা ইলিউশন মাত্র? কবি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, সত্যের ইলিউশন সৃষ্টি করাই যে সাহিত্যের সার্থকতা ; সত্যের একটা মায়িক রূপ প্রকাশ করতে পারে বলেই তো সাহিত্যোচিত ভাষার এত শক্তি।

সাহিত্যোচিত ভাষার বিরুদ্ধে ছলনার অভিযোগ এনেছিলেন হার্বার্ট স্পেন্সর। কিন্তু রসস্রষ্টা শিল্পী ও সাহিত্যিক জানেন যে, স্পেন্সর যাকে ছলনা বলেছেন সেটাই হল সত্যের নবরূপায়ণ, দ্বিতীয় সৃষ্টি। হার্ডি তাঁর জর্নালে লিখেছেন যে, গ্যালিলিও যদি তাঁর থিওরিকে তথ্যনিষ্ঠ সরল গদ্যে না লিখে কবিতায় লিখতেন, তবে বোধহয় তাঁকে ইনকুইজিশনের কবলে পড়তে হত না। হার্ডি বোধহয় বলতে চান, সাহিত্যোচিত ভাষার সেই রহস্যময় শক্তি আছে, যার জন্য তাথ্যিক সত্যেরই রূপ বিশেষ একটি মায়িক আবরণ গ্রহণ করে সুন্দর হয়ে ওঠে এবং সতর্ক বিরুদ্ধবাদীও তার অবাঞ্ছিত তথ্যকে হেরেসি বলে মনে করতে পারে না।

ওঅল্টার ডি লা মেয়ার তাঁর 'এসে অন প্রোজ' নামক ছোট গ্রন্থটিতে সাহিত্যের ভাষারূপ সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে গদ্যের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করেছেন। তিনি গদ্যের দুটি শ্রেণী বিভাগ করেছেন। একটি হল বৈজ্ঞানিকের ও ঐতিহাসিকের 'ম্যাটার অব ফ্যাক্ট' গদ্য। অপরটি হল কথারসিকের ব্যবহৃত 'ম্যাটার অব ট্রুথ' গদ্য। অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ গদ্য এবং সত্যনিষ্ঠ গদ্য। ডি লা মেয়ারের সিদ্ধান্ত, এই সত্যনিষ্ঠ গদ্যই হল সাহিত্যের গদ্য। তিনি সেই গদ্যকেই ম্যাটার অব ট্রুথ গদ্য বলেছেন, যে গদ্য রচয়িতার অনুভবের উপবন হতে চয়িত নানা ফুলের মালঞ্চের মত রঙীন শোভায় ও সৌরভে আমোদিত। সাহিত্যের বাক্য কতগুলি কেজো কথার পংক্তি নয়। সাহিত্যের শব্দ অভিধার বন্ধনে বন্দী প্রতীক মাত্র নয়। সাহিত্যের ভাষা যথাযথ বাস্তবের জ্ঞাপনাও নয়।

বস্তু ও বাস্তবের বৈজ্ঞানিক সত্যতা দু'রকমের হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তথ্যলেখকের ভাষা সামান্য অবাস্তরের ছোঁয়াচও বাঁচিয়ে চলতে চায়। এখানে দ্ব্যর্থকতাই হল ভাষার পক্ষে সবচেয়ে বড় ভয়। কিন্তু বস্তু ও বাস্তবের ভাবরূপের অন্ত নেই। কথাশিল্পী ও কাহিনীকার বস্তু ও বাস্তবের ভাবরূপ প্রতিচ্ছবিত করেন। এখানে অবাস্তরের, অত্যুক্তির ও বক্রোক্তির অজস্র আশ্রয় আছে। কথারসিকের ভাষায় শব্দের সত্তাও অভিধার বন্দিত্ব হতে নিজেকে মুক্ত ক'রে লক্ষণা ও ব্যঞ্জনায় নূতন সিদ্ধিলাভ করে। সামান্য একটি উপমার স্পর্শে বস্তু ও বাস্তবের রূপ এবং তাৎপর্যও নূতন রম্যতা পায়। অনুপ্রাস একটা শাব্দিক ঝংকার হয়েও ভাব এবং অর্থের নূতন জ্ঞাপনা রণিত করে। সামান্যকথন পঞ্জিকালেখকের গদ্যরীতি হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের গদ্যে অতিকথনই হল স্বাভাবিক রীতি। সাহিত্যের ভাষায় বাহুল্যের রীতিমত স্থান আছে। সাধারণত নিন্দার্থেই বলা হয় যে, সহজ কথাটা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা হয়েছে। 'ইনিয়ে-বিনিয়ে' কথাটাকে কটূক্তির পরিভাষা বলে যদি মনে না করা হয়, তবে এই সত্যই স্বীকার করতে হবে যে, বিশ্বের সব দেশের সাহিত্যোচিত ভাষাই হল ইনিয়ে-বিনিয়ে রীতির সৃষ্টি। নিসর্গের সব সুন্দরতার সহজ প্রকাশের মধ্যে ইনিয়ে-বিনিয়ে রীতিরই শাসন লক্ষ্য করা যায়। গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ ইনিয়ে-বিনিয়ে এগিয়ে গিয়েছে, তার গতির মধ্যে সোজা সংক্ষিপ্ত শরবৎ ঋজুতা নেই। প্রকৃতির রূপের ছবি ও গতির মধ্যে সরল রেখার প্রকোপ নেই। ঋজুতা জ্ঞানী গাণিতিকের আবিষ্কৃত একটা তাত্ত্বিক সত্য। ঐ বনের লতা আর জলের ঢেউ— প্রাকৃতিক শোভার সব ছাঁদই যে হিল্লোলিত আঁকাবাঁকা রেখার কীর্তি। কারিগরও তাঁর মেশিনের সৃষ্টি নানা সামগ্রীর রূপের মধ্যে স্ট্রীমলাইনের ভঙ্গিমা বলয়িত করতে ভালোবাসেন। অস্থায়ী ও অন্তরা, এবং সঞ্চারী ও আভোগ কি সুর ও স্বরের প্রাণ ক্লিষ্ট করার জন্য রচিত কতগুলি ইনানো-বিনানো জটিল আড়ম্বরের জাল, অথবা বৈচিত্র্যসম্ভাবী মধুরতার ইন্দ্রজাল ?

অতিশয়োক্তি অলংকারের প্রাণস্বরূপ, প্রাচীন মম্মট ভট্টের এই অভিমতকে আধুনিক কালের সাহিত্য-সমালোচক রিচার্ডস-এর অভিমতেও যখন প্রতিধ্বনিত হতে দেখি, তখন মনে হয় ভাষার রূপ সম্বন্ধে বৃথাই ঐ নতুন অদ্বৈতবাদ প্রবল হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। রিচার্ডস তাঁর 'প্রিন্সিপল্‌স্ অব লিটারারি ক্রিটিসিজ্‌ম' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "মহৎ আর্টের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে তার রূপণা ও বর্ণনায় অজস্র ও অতি প্রচুর আলংকারিক ঐশ্বর্য থাকবে। অত্যন্ত স্পষ্টার্থক সামান্যকথন ও কৃপণতাকুণ্ঠিত বর্ণনায় যে বিপদ আছে, অতিকথনের মধ্যে তার চেয়ে কম বিপদ আছে। আসল প্রশ্ন এই যে, অপ্রয়োজন ও অবাস্তরের বর্ণনা বক্তব্যের ব্যঞ্জনাসিদ্ধির অন্তরায় হয়ে উঠেছে কি না ? যদি না হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে অতিকথনের দ্বারা বরং সমগ্র রচনার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে ; সম্ভবত এই কারণে যে, সেই অতিকথনের ফলে বক্তব্যের রূপ অতিরিক্ত একটি বলিষ্ঠ সৌষ্ঠব লাভ করতে পেরেছে।"

রিচার্ডসও ভাষার দুই ব্যবহারিক রূপ স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিক ব্যবহার, যেখানে ভাষা বস্তু-পরিচয়ের বিশুদ্ধ রেফারেন্স মাত্র। এবং ইমোটিভ তথা ভাবদ্যোতক ব্যবহার, যার ফলে পাঠক অথবা শ্রোতার মনে বস্তু ও বাস্তবের রূপ সম্বন্ধে বিশেষ একটি আবেগপ্রবণ অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। এই ভাষাই সাহিত্যের ভাষা। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিকের 'ম্যাটার অব ফ্যাক্ট' ভাষা যে অভিলাষের সৃষ্টি, তার মধ্যে বৈচিত্র্য আহরণের বিশেষ কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। অপর পক্ষে সাহিত্যিকের 'ম্যাটার অব ট্রুথ' ভাষা অজস্রভাবে এবং নিত্য নূতন রূপ ও বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ বৈচিত্র্যের হেতু কি ?

হেতু হল সাহিত্যরচয়িতার ব্যক্তিক মন। সাহিত্যের ভাষা সৃষ্টি করে রচয়িতার অন্তরে নিহিত সৃষ্টিপ্রয়াসী ও স্বপ্নময় একটি অহং। কবির একটি উক্তিকে এই ধারণার পক্ষে দাঁড় করিয়ে বলা যায়, সাহিত্যের ভাষাও রচয়িতার 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' ভাববস্তুর একটি রূপান্বিত সৃষ্টি। বায়রনের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মেকলে প্রসঙ্গত লিখেছেন যে, বাস্তব জীবনের আচরণে ব্যক্তিক অহমিকা খুবই অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক অহমিকাই হল স্টাইল, বৈচিত্র্যের হেতু। আধুনিক নিউম্যানও বলেন, সাহিত্যের ভাষা হল 'পার্সোনাল এক্সারসাইজ', ব্যক্তিক অনুশীলন। এই ভাষা ঠিক বাইরে থেকে আহরণ করা যায় না। 'অন্তর হতে আহরি বচন আনন্দলোক করি বিরচন'— বাইরের বস্তু ও বাস্তবের অভিজ্ঞতা অন্তররসে জারিত হয়ে নূতন একটি অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। এই নূতন অভিজ্ঞতারই রূপ সাহিত্যের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং অস্বীকার করা যায় না যে, সাহিত্যের ভাষা রচয়িতার একটি সুন্দর ব্যক্তিক অহমিকার সৃষ্টি। 'ম্যাটার অব ট্রুথ' ভাষা তাই শুধু 'ম্যাটার অব ফ্যাক্ট' ভাষা থেকে রূপে গুণে ও প্রকৃতিতে পৃথক নয়, এই ভাষার নিজেরই প্রকাশ সহস্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিক অহমিকার রঙে রঙীন হয় বলেই রূপের সহস্র বৈচিত্র্য গ্রহণ করে।

ফ্লবেয়ার তাঁর শিষ্য মোপাসাঁকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে— 'বক্তব্যের কোনো বস্তুর রূপ প্রকাশ করবার উপযোগী মাত্র একটি কথাই আছে; সেই বস্তুর গতির রূপ প্রকাশ করবার উপযোগী মাত্র একটি ক্রিয়াপদই আছে; এবং তার গুণ বোঝাবার জন্য মাত্র একটি বিশেষণই আছে।' মাত্র একটি, দ্বিতীয়ের কোনো স্থান নেই। সাহিত্যের ভাষারূপ সম্বন্ধে ফ্লবেয়ারের এই উক্তিও এক ধরনের অদ্বৈতবাদ, যেটা সাহিত্যের ভাষার উপর মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণার মত একটি মতবাদ। বৈজ্ঞানিকের ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট ভাষায় এই নীতি খাটে, যেখানে বস্তু ও বাস্তবের নিছক একটি তথ্যগত রূপের পরিচয় ব্যক্ত করাই হল লক্ষ্য। কিন্তু সাহিত্য বস্তু ও বাস্তবের ভাবরূপ অভিব্যক্ত করে— এবং সেই ভাবরূপের অন্ত নেই। সেই ভাবরূপ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক্। সুতরাং একই বক্তব্যের সাহিত্যোচিত প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভাষণে ভিন্ন ভিন্ন শব্দবৈচিত্র্য গ্রহণ করবেই। ফ্লবেয়ারের ধারণা যদি নির্ভুল হয় তবে বলতে হবে যে, সাহিত্যও অঙ্কশাস্ত্রের মত একটি খাঁটি বিজ্ঞান।

সাহিত্যের ভাষা লেখকের 'পার্সোনাল এক্সারসাইজ' তথা ব্যক্তিক অনুশীলন বলেই এমন ধারণাকে প্রশ্রয় দেবার যুক্তি নেই যে, লেখকের ব্যবহৃত ভাষার রূপ হবে একটা সাংকেতিক শব্দ-সমবায়ের রূপের মত। পার্সোনাল বটে, কিন্তু প্রাইভেট নয়। ভাষাকে ব্যক্তিগত কোড ক'রে তুলবার অধিকার কোনো কবি বা কথাশিল্পীর থাকতে পারে না; কারণ কবিতা ও কথা গুপ্ত জপমন্ত্রের মত শুধু রচয়িতারই ব্যক্তিগত নিদিধ্যাসিতব্য বস্তু নয়। অপরের মনের ঘরে প্রবেশ করবার উপযোগী দ্রুতি দীপ্তি ও প্রসাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ভাষাকে সেই সংবেদনা লাভ করতে হয়, যাকে টলস্টয় বলেছেন ইনফেকশন, অপরের অনুভবে সঞ্চারিত হবার যোগ্যতা।

ভাষাবিজ্ঞানীদের শাস্ত্রে বাউ-আউ নামে একটা থিওরি আছে। এই থিওরি বলে, মানুষের প্রথম ভাষা হল প্রাকৃতিক শব্দগুলির ভঙ্গী অনুকরণ ক'রে কণ্ঠস্বরের নানা ধরনের অভিব্যক্তি। বাউ-আউ বস্তুনিষ্ঠ ভাষার আদিম উদাহরণ। এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত অনবাস্তর প্রাঞ্জল ও সরল ভাষা আর কি হতে পারে? ভাষার চারুতা, চমৎকারিতা, অলংকার, অনুপ্রাস ও অন্যান্য বাহুল্যের সাজ বর্জন করলে ভাষার সেই

আদিম বাউ-আউকে হয়তো ফিরে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাহিত্যকে আর পেতে হবে না। বহু কোটি বছর আগের গাছের রূপ বড় সরল ও সংক্ষিপ্ত ছিল। না ছিল ফুল, না ছিল ডালপালা আর সবুজ পাতা ও কিশলয়ের সমারোহ। তার তুলনায় আজকের বনস্পতি খুবই জটিল। কিন্তু সুন্দরতর নয় কি? ভাষাও বাউ-আউ নামক সেই সরল ও সংক্ষিপ্ত এবং রিক্ত ও নিরাভরণ প্রতীকদশার হীনতা অতিক্রম ক'রে নানা ভঙ্গীর, বিন্যাসের, অতিশয়োক্তির ও ফর্মের সমারোহ গ্রহণ ক'রে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠতে পেরেছে। অগডেনের বেসিক ইংরেজীর সাড়ে আট শতটি শব্দ দিয়ে বস্তুর বস্তুতার পরিচয় প্রকাশ করা যদিই বা সম্ভব হয়, সাহিত্যের সৃষ্টি নিতান্তই অসম্ভব। ভাষার উন্নতির ইতিহাস হল অজস্র শব্দ-বাহুল্য সৃষ্টির ইতিহাস। প্রাচীন স্পার্টার লাকোনিক আদর্শের মধ্যেও সেই ভুল ছিল না, যেটা আজকের সাহিত্যের এক ধরনের ভাষাগত আদর্শের দাবির মধ্যে মুখর হয়ে উঠতে দেখা যায়—কাটাছাঁটা, ছিমছাম সাদামাঠা ভাষার দাবি। খুব কম কথা বলাই ছিল লাকোনিকের জীবনের নীতি। যুক্তি ছিল যে, অল্পভাষিতা তথা সামান্যকথন মানুষকে বলিষ্ঠ পৌরুষ দান করে, যার ফলে সে রণদুর্মদ হয়ে ওঠে। অল্পভাষিতা শিল্পিজনসুলভ আচরণ এবং সেটা সাহিত্যেরই উন্নতির জন্য দরকার, এমন দাবি করে নি প্রাচীন লাকোনিক। মজবুত সৈনিক তৈরী করবার জন্য অল্পভাষিতার দরকার হয়েছিল, মজবুত সাহিত্য তৈরী করবার জন্য নয়।

সাহিত্যোচিত ভাষার গদ্যেও ছন্দ থাকে। বৈজ্ঞানিকের ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট গদ্যে এই গতিরূপের বালাই নেই, এবং না থাকলেও চলে। সেণ্টসবেরি ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে অজস্র উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত সাহিত্যোচিত গদ্য ছন্দোময় না হয়ে পারে না। আজও লক্ষ্য করা যায় যে, বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলি সাহিত্যোচিত ভাষার অঙ্গীভূত হতে পারে নি। কারণ নিশ্চয়ই এই যে, এইসব পারিভাষিক শব্দ জ্ঞানীদের তাত্ত্বিক আবিষ্কার, কৃত্রিম প্রতীক মাত্র। যেগুলি গদ্যের ছন্দের পক্ষে হানিকর। সাহিত্যের ভাষায় সেইসব শব্দ এবং সমার্থক প্রতিশব্দও ঠাঁই পায়, যেগুলি বস্তুত স্বয়ং এক-একটি মীথ, ভাবনাময় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি এবং গদ্যের সঙ্গে সহজে ছন্দোবদ্ধ হয়। জামেনহফের রচিত এস্পেরাণ্টো বিশ্বভাষা হয়ে উঠবার স্বপ্ন দেখেছিল, কিন্তু কি শোচনীয় তার পরিণাম! ঐ কৃত্রিম ভাষায় দশ হাজারেরও বেশি তথ্য-গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু সাহিত্য রচনার চেষ্টায় সে ভাষাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থতা স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে।

কাটাছাঁটা ছিমছাম সাদামাঠা ভাষা, এবং বক্তব্য সোজা সরল ক'রে বলে দেবার রীতি সাহিত্যের পক্ষে তার স্বভাবধর্মবিরোধী কৃত্রিম রীতি। জগন্নাথের রসগঙ্গাধরের মতে—রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকাঃ শব্দাঃ কাব্যম্। সাহিত্যোচিত ভাষাকে রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক হতেই হবে। সুতরাং সাহিত্য চিরকালই বস্তুনিষ্ঠ তাত্ত্বিক ভাষাকে পরিহার করে চলবে। সাহিত্য চিরকালই তার বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে, একটু বাড়িয়ে, কিছুটা রঙীন ক'রে এবং কোথাও বা ঝংকার দিয়ে বলবে। মাঝে মাঝে মায়াময় ইলিউশনও সৃষ্টি করবে সাহিত্যের ভাষা। বস্তু ও বাস্তবের খাঁটি তাত্ত্বিক সত্য বিবৃত করবে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং দায়রা আদালতের মামলার বিবরণী। সে বিবরণী অত্যন্ত বাস্তবানুগ হয়েও সাহিত্য হয় না। সে ভাষা সাহিত্যোচিত ভাষাও নয়। সাহিত্যের ভাষা বাস্তব সত্যের ভাবরূপ প্রকাশ করে, এবং সেই হেতু সাহিত্যের ভাষা বহু বৈচিত্র্যে রূপময় হয়ে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস

শ্রীভবতোষ দত্ত

বাংলা দেশের ইতিহাস যিনি রচনা করতে যাবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তিনি ভক্তিনম্রচিত্তে স্মরণ করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন নি বটে, কিন্তু বাংলার অতীত সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। এ-কৌতূহল বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ অনুসন্ধিৎসা থেকেই শুধু জাগে নি, এর মূলে ছিল দেশপ্রেমিকের নিবিড় অনুরাগ। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রাণচেতনা দেশের অতীতকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই চেতনাকে সাহিত্যিক কল্পনায় ভাষা দিলেন। তাঁর একখানি ছাড়া সবগুলি উপন্যাসই বাংলার অতীত অথবা সমসাময়িক সমাজের ভূমিকায় রচিত। বাংলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত তিনি বঙ্গদর্শন নাম দিয়ে মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন। তাকে ঘিরে সৃষ্টি হল বাংলার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি আলোচনার আবর্ত। বাংলা দেশকে জননী কল্পনা করে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করলেন আনন্দমঠে আর মাতৃস্নেহের অসহ্য উন্মাদনা বেদনাময় হয়ে উঠেছে কমলাকান্তের অস্থিরতায় আর তার স্বপ্নদর্শনে।

কবে কেমন করে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বঙ্গপ্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, সে ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো সুলিখিত সম্পূর্ণ জীবনী নেই। তাঁর শিক্ষাকালের সব কাহিনীও আমাদের জানা নেই। বাংলা দেশের ইতিহাস না হলেও সাধারণভাবে ঐতিহাসিক চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালেই নবপ্রবুদ্ধ বাঙালীর মনে দেখা দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। ইতিহাস-চেতনা জাগ্রত মনের পরিচয়। বাঙালী যে মানবসমাজ এবং মানবজাতি সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে, এটা আধুনিক মনের একটি পরম কল্যাণকর লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র যখন শিশু, তখন ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। এই সভার সভ্য ছিলেন হিন্দু কলেজের একদল তরুণ ছাত্র যাঁদের বলা হত 'ইয়ং বেঙ্গল' অথবা ইয়ং ক্যালকাটা। প্রাচীন সংস্কার মোচনের চেষ্টায় এঁরা প্রথম জীবনে কিছু উচ্ছৃঙ্খলতাই করে ফেলেছিলেন; কিন্তু এঁদের এই দিক্‌টাকেই একমাত্র না দেখে নবযুগ রচনায় এঁদের উচ্ছৃঙ্খলতার পরোক্ষ সুফলটুকুই আজ বিচার করা প্রয়োজন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভাতেই সর্বপ্রথম তাঁদের সংযত চিত্তপ্রকর্ষের বিকাশ হল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনস্বী যুবকেরা এই সভায় যেসব বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করতেন, বাংলার সমাজ এবং দৃষ্টি সেসবের দ্বারাই অনেকটা প্রস্তুত হয়েছিল। জ্ঞানোপার্জিকা সভার কিছু কিছু প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়ে সংকলিত হয়েছিল। জনৈক পাঠক এইরূপ একটি প্রবন্ধসংগ্রহের সমালোচনা-প্রসঙ্গে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রে[১] দুটি প্রবন্ধের বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন— কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত On the Nature and Importance of the Study of History, অপরটি প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত The State of Hindoostan under the Hindoos. এই গ্রন্থটি সম্পর্কে পত্রিকা-সম্পাদকের মন্তব্যও[২] প্রণিধানযোগ্য :

---

১ The Friend of India, November 5, 1840.

২ The Friend of India, December 3, 1840.

The greater number of these Essays are either historical or topographical. There is one besides on general knowledge, another on the cultivation of the vernacular language of Bengal, one on Poetry, one on the condition of Hindu women and the last of the volume is on civil and social Reform among the Educated Hindoos. The mere mention of these topics will show the practical character of the Society's discussions and not less their patriotic and human aspirations.

এর থেকে বুঝতে পারা যায় নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে ঐতিহাসিক চেতনা কী ভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠছিল। এদের ভিতর থেকেই জেগে উঠছে নতুন জীবনের আভাস। দেশ এবং জাতির সম্পর্কেও গঠনমূলক চিন্তা দেখা দিতে শুরু করেছে। বলা যেতে পারে নবাগত জর্জ টমসনও তরুণ বঙ্গকে দেশের বর্তমান এবং অতীত ইতিহাস পর্যালোচনায় অনুপ্রাণিত করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাসে[৩] লিখেছেন চারটি বিষয়ে টমসন তাঁদের অনুপ্রেরণা দেন। প্রথমতঃ সকলকেই একবাক্যে দেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হতে হবে; দ্বিতীয়তঃ স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থা উত্তমরূপে জানা প্রয়োজন; তৃতীয়তঃ গবর্নমেন্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ; চতুর্থতঃ ইংরেজের ন্যায়পরতায় বিশ্বাস রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে দেশের জাগ্রত বিচারবুদ্ধিকে বৈনাশিক কার্য থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে কল্যাণকর সংগঠনকর্মে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন টমসন। টমসনের শিক্ষার সুফল ফলেছিল। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত প্যারীচাঁদের 'The Zeminder and the Ryot' প্রবন্ধটি টমসনের অভিপ্রায়কে চরিতার্থ করেছিল। এতে ছিল দেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার তথ্যানুসন্ধান এবং দেশের মঙ্গলসাধনে স্বাধীন বিচারণা। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক এবং রমেশচন্দ্র দত্তের 'The Peasantry of Bengal পরবর্তী কালে এই আদর্শকেই অনুসরণ করেছিল।

দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এই ভাবেই ইতিহাসচর্চার উৎসাহ দেখা দিচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক। ১৮৫৩-র পূর্বে একমাত্র সংবাদপ্রভাকরের মাধ্যম ছাড়া কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল না। তবে জানা যায়, বাল্যকাল থেকেই ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। অপেক্ষাকৃত প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়ে তিনি সেকালের শিক্ষিত জনসমাজের ইতিহাসচর্চার পরিচয় পেয়েছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ করে বাংলা দেশের সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কোনো সূচনাই আমাদের জানা নেই। বরং লক্ষ্য করা যায় যে রামমোহন রায় বাঙালীর যে মনোভঙ্গি জাগাতে চেয়েছিলেন, তা ছিল ভারতমুখী। প্রাচীন শাস্ত্র ইত্যাদির অনুবাদ দ্বারা তিনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নবরূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও প্রধানত সেই নির্দেশকেই অনুসরণ করেছিল। ১৮৩৫ সালে এদেশে নবশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব থেকে বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্য হতে থাকে।[৪] দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতেও সর্বোচ্চ দুই শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল History of Bengal—সম্ভবত মার্শম্যানের। এই

৩ বাংলার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ (গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯০৩), দ্বিতীয় অধ্যায়

৪ প্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস-সাধনা (১৩৬০), পৃ ১৬১

শিক্ষানীতির জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে জুনিয়র সেকশনে বঙ্গেতিহাস পড়েছিলেন। বঙ্গেতিহাস বিশেষ কোনো বইয়ের নাম না-ও হতে পারে। সেকালে এডুকেশন কাউন্সিলের শিক্ষানীতিতে বাংলার ইতিহাস পাঠ নিম্নশ্রেণীতেই সমাপ্ত হত। সুতরাং সমগ্রভাবে ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ না করে শুধু বাংলা দেশের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র কেন আগ্রহী হয়ে উঠলেন তার বিশেষ কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রথম বাংলার উপন্যাস লিখলেন, তখনই দেখতে পাই বাংলার অতীত তরুণ বঙ্কিমকে আচ্ছন্ন করেছে। আশ্চর্যের বিষয়, তখনও পর্যন্ত বাংলার এমন ইতিহাস প্রকাশিত হয় নি যা বঙ্কিমের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকতে পারে। পরবর্তী কালে যখন তিনি বাংলার ইতিহাস নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করছিলেন, তখনও তিনি স্টুয়ার্ট এবং মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাসের প্রশংসা করতে পারেন নি। সুতরাং এই ইতিহাস দুটি থেকে তিনি বাংলা দেশের গৌরব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মনে হয় না। জুনিয়র সেকশনে তিনি যে বঙ্গেতিহাস পড়েছিলেন, সেটা কার রচনা জানা যায় না। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মার্শম্যানের বইয়ের তিনখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এদের মধ্যে ওয়েঙ্গার এবং গোবিন্দচন্দ্র সেনের বই মার্শম্যানকে সমগ্রভাবে অনুসরণ করেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, মার্শম্যানের বইয়ের শেষাংশের অনুবাদ। মনে রাখা দরকার স্টুয়ার্টের বইতে (১৮১৩) তুর্কি বিজয়ের পূর্বের বাংলা দেশের ইতিহাস দেওয়া হয় নি; মার্শম্যানের বইতেও (১৮৩৯) সেই ইতিহাস একটি মাত্র পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যদি বাংলার হিন্দু রাজাদের সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল জেগে থাকে, তবে তার সূচনা ঘটিয়েছিল, এমন কোনো বইয়ের সংবাদ আমাদের জানা নেই, একমাত্র গোবিন্দচন্দ্র সেনের অনুবাদে মার্শম্যানের বই ছাড়া। অথচ পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র মার্শম্যানের বই সম্বন্ধে অকরুণ মন্তব্য তো করেছিলেনই, গোবিন্দচন্দ্র সেনের বইয়ের নামও তিনি কোথাও করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশপ্রীতির মূলে নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থের অনুপ্রেরণা না থাকলেও তাঁর এ বিষয়ে অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠবার পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরের প্রভাব অনুমান করা অসংগত হবে না। লক্ষ্য করা যেতে পারে সেকালে সুপ্রচারিত সমাচারদর্পণ পত্রিকাকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কবিতাপ্রকাশের আশ্রয়রূপে গ্রহণ না করে সংবাদপ্রভাকরকেই বরণ করেছিলেন। সমাচারদর্পণ ছিল মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত। এই পত্রিকা দেশীয় রুচির বিরোধী বলে ঈশ্বর গুপ্ত একে বহুবার সমালোচনা করেছিলেন। সংবাদপ্রভাকর সে যুগে বাংলা দেশ ও সমাজ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট মনোভাব অবলম্বন করে দেশপ্রীতির আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলছিল; সে যুগে এটা ঠিক সুলভ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে কবির খাঁটি বাঙালী মানসিকতার যে বিশদ আলোচনা করেছিলেন, এ-প্রসঙ্গে তাও স্মরণীয়। এ কথা ঠিক ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত থাকলেও সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। সংবাদ-প্রভাকরের সংবাদগুলি পর্যালোচনা করলে এ কথা বুঝতে পারা যায়। 'জননী ভারতভূমি' নামে যে কবিতাটি তাঁর কাব্যগ্রন্থভুক্ত হয়েছে, সেটি আসলে স্বদেশসেবা বিষয়ক একটি বক্তৃতার উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছিল।[৫] এসব সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষ ভাবে বাংলা দেশ এবং সমাজের জন্যই তাঁর চিন্তা ও কল্পনাকে নিয়োজিত

৫ সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৫৫। গোবিন্দচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে "স্বকীয় স্বজন বান্ধব পাঠকবর্গকে এবং নগরীর সংবাদপত্র সম্পাদক সকলকে এবং সংস্কৃত কলেজের উপাধ্যায় এবং অন্যান্য অধ্যাপকগণ"-এর সভায় ঈশ্বরচন্দ্র এই বক্তৃতা দেন।
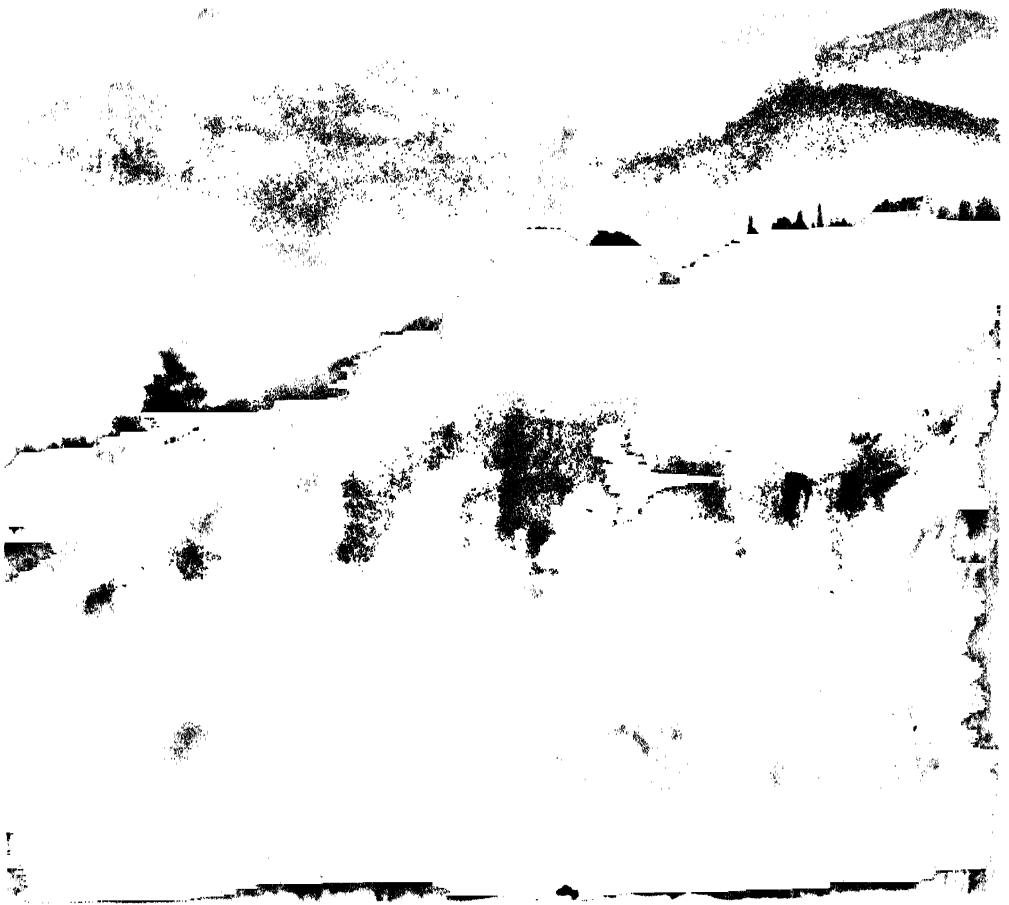
হিমালয়
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী উমাদেবীর সৌজন্যে

কাঞ্চনজঙ্ঘা

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
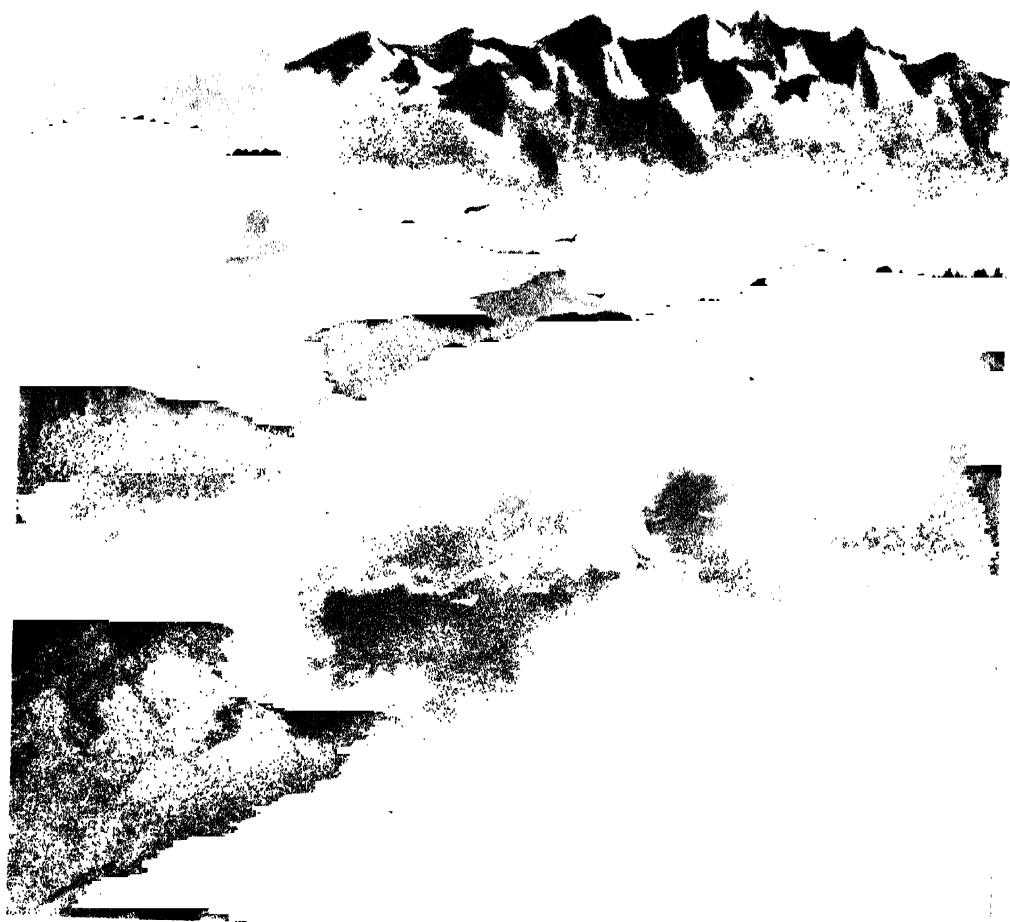
শ্রীমতী উমাদেবীর সৌজন্যে

করেছিলেন। বাংলার অতীত নিয়ে সংবাদপ্রভাকর সে রকম ঐতিহাসিক গবেষণা করে নি যদিও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করে এবং ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করে ঈশ্বর গুপ্ত ইতিহাস নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক আদর্শবাদিতার সঞ্চার না করলেও সংবাদপ্রভাকরের পৃষ্ঠায় বাঙালী জাতীয় জীবন এবং সমাজ সম্পর্কে যে মমত্ববোধ ফুটে উঠেছিল, তরুণ বঙ্গের কঠোর নিস্পৃহ যুক্তিবাদিতার পর সাধারণ পাঠককে স্বভাবতই তার আন্তরিকতাটুকু স্পর্শ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র এবং অন্যান্য যাঁরা সংবাদপ্রভাকরের লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই একটি সাধারণ বাঙালী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যদের তুলনায় এঁদের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যগোচর হওয়া স্বাভাবিক। ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক চিন্তাশীল মনীষী ছিলেন না বলেই বাংলা দেশ সম্পর্কে তাঁর মমত্বকে ঠিক ঐতিহাসিক যুক্তিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এই অপূর্ণতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্যসৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম।" বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি মিলিয়ে বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না, কিন্তু এরই ভিতর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানের বাংলাকে মোটামুটি বুঝতে পারা যায়। তিনি বাংলার যে অতীতকে দেখেছেন সে অতীত কীর্তিতে উজ্জ্বল, প্রাণের আবেগে স্পন্দিত। এ দেখা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকের তথ্যসংগ্রহে মাত্র পর্যবসিত করতে তিনি চান নি, যদিও তাকে তিনি ইতিহাস উদ্ধারে প্রাথমিক প্রয়োজন বলেই মনে করেছেন। তাঁর মতে "কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।"[৬] এই 'ধ্যান' কথাটি দিয়ে তিনি বাংলা দেশের একটি জীবন্ত সমগ্র মূর্তি-কল্পনাকেই বুঝতে চেয়েছিলেন। পূর্ণাঙ্গ কল্পনার অভাবে ইতিহাস অনেক সময়েই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় মাত্র পরিণত হয়— পূর্ণ রূপ নিয়ে চোখের সম্মুখে সজীব হয়ে ওঠে না। তবে এটাও ঠিক যে উপাদান সংগৃহীত না হলে মূর্তি-কল্পনা সম্ভব হয় না। বঙ্কিমের সময় পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ সম্পূর্ণ হয় নি এবং এক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম শিক্ষা বাংলার ইতিহাস (১৭৭৪) ছাড়া আর কোনো বই তাঁকে তৃপ্ত করে নি। তার কারণ আর কোনো লেখকই বাংলা দেশের মূর্তিকে ধ্যানে জাগ্রত করতে পারেন নি। স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান, লেথব্রীজ— কেউই বাঙালী ছিলেন না। গোবিন্দচন্দ্র সেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে ইতিহাস রচনা করেন নি। বঙ্গভূমির ইতিহাসকে যিনি অনুরাগের সঙ্গে সশ্রদ্ধচিত্তে বুঝতে চাইবেন, এমন ঐতিহাসিকের সাক্ষাৎ তিনি তখনও পান নি। এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থা ছিল। পুরাবৃত্ত আলোচনায় রাজেন্দ্রলালকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রামাণিক ধরেছেন; কিন্তু আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন, "বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে

৬ বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ

পারিতেন কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না।"[৭] রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলার ইতিহাস (১৮৯২) তখনও প্রকাশিত হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত বাংলার ইতিহাসে রাজনৈতিক কাঠামো পুরোপুরি রক্ষিত হলেও লোকবৃত্তও তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটিতে কৃষকসমাজের অতীত অবস্থা ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যালোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ বাংলা দেশের ইতিহাস রচনায় বঙ্কিম তিন দিক দিয়েই অনুসন্ধানের সূচনা করেছিলেন— নৃতত্ত্ব, রাজবৃত্ত এবং লোকবৃত্ত। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০, অগ্রহায়ণ ১২৮২) এবং বাঙ্গালীর উৎপত্তি (বঙ্গদর্শন পৌষ ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮); দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাঙ্গালার ইতিহাস (বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১), বাঙ্গালার কলঙ্ক (প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১), বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯); তৃতীয় শ্রেণীতে, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (বঙ্গদর্শন অগ্রহায়ণ ১২৮৭), বঙ্গদেশের কৃষক (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, ফাল্‌গুন ১২৭৯)। সর্বশেষে উল্লিখিত রচনাটিকে ঠিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলা না গেলেও এতে প্রখর ইতিহাসনিষ্ঠার পরিচয় আছে। এই রচনাটি আসলে সর্বপ্রথমে লিখিত হয়েছিল। এই কয়টি প্রবন্ধ ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রবন্ধ আছে, যেগুলি ঠিক ইতিহাস-বিষয়ক নয় বটে কিন্তু দেশপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রেরণায় সেগুলি অনুপ্রাণিত। বাঙ্গালির বাহুবল (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮১), বাহুবল ও বাক্যবল (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ১২৮৪) দুটির নাম করা যেতে পারে।

লোকবৃত্তকে জানবার জন্যই তিনি আধুনিক বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস সন্ধান করেছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ— এই প্রধান তিনটি সামাজিক বিভাগ ছাড়াও বাংলা দেশে বহু জাতি রয়েছে, বাঙালীর গোষ্ঠী-নির্ণয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের সকলকেই স্মরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান যথাযথ হয় নি। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রকাশিত কোলব্রুক সাহেবের Enumeration of Indian Classes প্রবন্ধটির পর মোটামুটি তাঁরই বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে অনুসৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ করে আশ্রয় করা হয়েছে পুরাণ তন্ত্র মনু প্রভৃতির সাক্ষ্য। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত Hindu Caste প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[৮] বাঙালীর সমাজ-বিন্যাস সম্পর্কে একটা ধারণা এতে জন্মালেও ইতিহাস-নির্ণয়ে এই পদ্ধতিকে নির্দোষ বলা চলে না। লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয় নামক গ্রন্থটিও এই কারণেই ইতিহাস হিসাবে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' এই গ্রন্থখানি অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল। আধুনিক গবেষণার ফলে এর অনেক সিদ্ধান্তই আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে আর্য-গৌরব-বোধ দেখা দিয়েছিল আজ দেখা যাচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষ্য তার অনুকূল নয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই জন্য যে তাঁর মধ্যে যেমন আর্য-গৌরব-বোধ ছিল, তেমনি আর একদিকে ছিল সমগ্রভাবে বাঙালী সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা। বঙ্কিমচন্দ্র দেখছেন, খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাংলা দেশে আর্য ছিল না। একাদশ শতাব্দীতেও আর্য ব্রাহ্মণ এদেশে ছিল বিরল। এতে আমাদের প্রাচীনত্বের কিছু হানি হলেও "আমরা সেই প্রাচীন আর্যজাতি সম্ভূতই রহিলাম— বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই গৌরবান্বিত আর্য। বরং গৌরবের বৃদ্ধিই হইল। আর্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ

৭ বাঙ্গালার ইতিহাস

৮ Calcutta Review, January-June, 1851.

কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই— আর্যকীর্তিভূমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী।

"আমাদের আর একটি কলঙ্কের লাঘব হইতেছে। বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গজয় করেন। তখন বঙ্গীয় আর্যগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহা অনুমেয়। তখনও তাঁহারা এ দেশে ঔপনিবেশিক মাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আর্যদিগের কিছু কমিতেছে বটে।"[৯] বাংলার ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাটুকু বঙ্কিমচন্দ্রের। এই ব্যাখ্যাতে ফুটে উঠেছে গভীর দেশাত্মবোধের আভাস। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার যে ইতিহাস চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে দেশপ্রেমের ব্যগ্র ব্যাকুলতাটুকু থাকবে এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে বাংলা দেশে যে আর্য-গর্ব-বোধ সুলভ হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যাটুকু তারই একটা প্রকাশ বলে ধরা যেতে পারে। যদিও এক দিকে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিচ্ছে তথাপি উত্তর-ভারতীয় আর্যকেই আমাদের পূর্বপুরুষ কল্পনা করে নূতন জাতিগঠনের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছিল। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার প্রবন্ধের উপসংহারে সেই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু সে যুগে বাংলার ইতিহাস কল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙালী জাতি বলতে তিনি শুধু উচ্চ বর্ণকেই ধরেন নি যদিও এ বিশ্বাস তাঁর ছিল যে উপরের স্তরে প্রায় কেবলই আর্য, নিম্নস্তরে রয়েছে বাঙালী অনার্য বা মিশ্রিত আর্য এবং বাঙালী মুসলমান। "এই জন্য দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালী জাতি অমিশ্রিত আর্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।"[১০] সুতরাং বাংলার ইতিহাস অর্থ যেমন শুধু রাজকাহিনী নয়, তেমনি শুধু উচ্চবর্ণের কীর্তির ইতিহাসও নয়। সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রেরণাতেই যেমন তিনি এক দিকে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বাঙ্গালীর উৎপত্তি এবং ইংরেজীতে Origin of Hindu Festival রচনা করেছিলেন, তেমনই বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধেও অর্থনৈতিক লোকবৃত্ত রচনা করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বাংলার ইতিহাস রচনায় রাজকাহিনীকে মাত্র একক প্রাধান্য দেওয়া যেমন ঠিক নয়, তেমনি রাজবৃত্তকে একেবারে বহিষ্কৃত করলেও ইতিহাস রচনায় বাধা ঘটতে পারে। আমাদের লোকজীবন রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে আপাতদৃষ্টিতে অচঞ্চল বলে মনে হতে পারে কিন্তু সংঘাত সেখানেও এসেছে; কোনোবার সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছে প্রধান, কোনোবার অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়েছে লক্ষণীয়। নূতন ধর্মের উদ্ভব, সাহিত্যের নূতন বিকাশ, সাধারণ জীবনযাত্রার ধারার পরিবর্তন— বাংলার ইতিহাস বিচার করলে এ সবই লক্ষ্য করা যাবে। পাল, সেন, পাঠান অথবা মোগল রাজত্বে সামাজিক জীবনের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিবর্তন স্পষ্টতই চোখে পড়ে। সুতরাং লোকবৃত্ত ইতিহাস রচনায় প্রধান হলেও রাজবৃত্তের কাঠামোটিকে অনুসরণ না করলে চলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অতীত আলোচনায় বাংলার ইতিহাসের এই দিকটির সম্পর্কেও ইঙ্গিত আছে। মনে হয়, তাঁর কল্পিত বাংলার ইতিহাসে চারটি স্তরভাগের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম, তুর্কী বিজয় পর্যন্ত; দ্বিতীয়, মোগল বিজয় পর্যন্ত; তৃতীয়, ইংরেজ বিজয় পর্যন্ত;

---

৯ বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার

১০ বাঙ্গালীর উৎপত্তি, সপ্তম পরিচ্ছেদ

চতুর্থ, ইংরেজ বিজয়ের পর। অবশ্য ইংরেজ বিজয়ের পর বাংলা দেশের ইতিহাস রচনা করবার সময় আসে নি। ইংরেজ রাজত্বে বাংলা এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস কি রকম দাঁড়াতে পারে, তার ইঙ্গিত অবশ্য তাঁর রচনায় আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, এক রাজসিংহ ছাড়া তাঁর সব উপন্যাসই বাংলা দেশের ভূমিকায় রচিত। এর মধ্যেও আবার কৌতূহলের বিষয়, ইতিহাসের প্রধান যুগসন্ধিগুলি তাঁর কয়েকটি উপন্যাসের কাল-পরিবেশ রচনা করেছে। তুর্কী বিজয় নিয়ে মৃণালিনী, মোগল বিজয় নিয়ে দুর্গেশনন্দিনী, ইংরেজ বিজয় নিয়ে আনন্দমঠ। মোগল-পতনের যুগান্তর কালের উপন্যাস সীতারাম। বলা বাহুল্য, উপন্যাস-রচনা ইতিহাসের ধারাবাহিক কালক্রম ধরে হয় নি। দুর্গেশনন্দিনীতে ইতিহাসকে শুধু কাহিনী হিসাবেই নেওয়া হয়েছে; তাতে লেখকের কোনো অভিপ্রায় এসে যুক্ত হয় নি। মৃণালিনীতে সচেতন ইতিহাস-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশপ্রেম। পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে বিশেষত সীতারাম এবং আনন্দমঠে ইতিহাস যেমন উজ্জ্বল, দেশপ্রেমও ততখানি গভীর ভাবেই আভাসিত।

মৃণালিনী (১৮৬৯) রচনাকালেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীন ইতিহাস-সন্ধানী মন জেগে উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় লক্ষ্মণাবতী বিজয় বর্ণনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি: "ষষ্টি বৎসর পরে যবন ইতিহাস-বেত্তা মিনহাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই।"[১১] ঠিক এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাই বহু পরের রচনায়: "নীতিকথায় বাল্যকালে পড়া আছে, এক মনুষ্য এক চিত্র লিখিয়াছিল। চিত্রে লেখা আছে মনুষ্য সিংহকে জুতা মারিতেছে। চিত্রকর মনুষ্য এক সিংহকে ডাকিয়া সেই চিত্র দেখাইল। সিংহ বলিল, সিংহেরা যদি চিত্র করিতে জানিত তাহা হইলে চিত্র ভিন্নপ্রকার হইত। বাঙ্গালীরা কখনও ইতিহাস লেখে নাই। তাই বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক চিত্রের এ দশা হইয়াছে।"[১২] মৃণালিনীতেই লক্ষ্মণাবতী বিজয়ের পর মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে যে কথা বলেছিলেন, সেটাও বঙ্কিমেরই কথা—"যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ তো গৌড় নহে।"[১৩] এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে "উত্তর বাঙ্গালা, দক্ষিণ বাঙ্গালা কোন অংশই বখতিয়ার খিলিজি জয় করিতে পারে নাই। লক্ষ্মণাবতী নগরী এবং তাহার পরিপার্শ্বস্থ প্রদেশ ভিন্ন বখতিয়ার খিলিজি সমস্ত সৈন্য লইয়াও কিছু জয় করিতে পারে নাই। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল, এ কথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে সে কুলাঙ্গার।"[১৪] বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি যে নেহাত দেশপ্রীতির অন্ধতা থেকেই উচ্চারিত হয়েছে তা বলা ঠিক নয়। কারণ পরবর্তী কালে ঐতিহাসিকেরাও মীনহাজউদ্দীনের উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[১৫]

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলা দেশ মোগলদের দ্বারা অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত বাংলার পাঠান রাজত্বকাল সম্পর্কে

১১ মৃণালিনী ৪ খণ্ড, ৪ পরিচ্ছেদ

১২ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

১৩ মৃণালিনী ৪ খণ্ড, ১২ পরিচ্ছেদ

১৪ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

১৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৩৫২) পৃ ৮৯-৯৩

বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ছিল সশ্রদ্ধ। পাঠান এবং মোগল রাজত্বের তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন পাঠানেরা স্বদেশ বলে এদেশেই স্থায়িভাবে বসবাস করেছিল এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু মোগলেরা এ দেশ জয় করেছিল বটে, কিন্তু বঙ্গভূমিকে স্বদেশ বলে কখনোই গ্রহণ করে নি। পাঠান ও মোগল রাজত্বের তুলনার এই ইঙ্গিত তিনি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বই থেকে পেয়েছিলেন মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাঙালীর মানসিক জ্যোতি পাঠান রাজত্বকালের মত আর কখনোই হয় নি। হুসেন শাহর পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ে বাংলা সাহিত্যের উজ্জীবন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চৈতন্যের আবির্ভাব হল এই সময়ে। তাঁরই প্রেরণায় বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী বিভিন্ন বৈষ্ণব নিবন্ধ রচনা করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে উচ্চ দার্শনিক ভিত্তিতে স্থাপন করে গেলেন, বৈষ্ণব পদকর্তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল পদাবলীর গান; ব্রজবুলির সৃষ্টি হল এক নূতন কাব্যভাষারূপে। রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবার ভাগবতের অনুবাদও ব্যাপকভাবে হতে লাগল। চৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় বুঝতে পারা যায়, নব্যন্যায় প্রভৃতি বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা দেশে প্রসার লাভ করেছে। রঘুনাথ শিরোমণি এলেন আর স্মার্ত রঘুনন্দন প্রাচীন হিন্দু সমাজকে নূতন ব্যবস্থায় বেঁধে দিলেন। এক কথায় বলতে গেলে সেই প্রাচীন উক্তি— কাব্যেপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে, তর্কেপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে— সার্থক হয়েছিল মোগল শাসন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার পূর্বেই। মোগল শাসনের পূর্ববর্তী এই উজ্জীবন সম্পর্কে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এতে অনুকরণের চেয়ে মৌলিকতাই ছিল বেশি। উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জীবনের সঙ্গে এর পার্থক্য এইখানেই। আধুনিক নবজাগরণে খানিকটা বিদেশীয় সংস্কৃতির অনুকরণ ছিল এবং এর সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্রকে 'অনুকরণ' নামে প্রবন্ধটি লিখতে হয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর উচ্ছ্বাস অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে জাতির অন্তর থেকেই এসেছিল।

এই প্রাণশিখা মোগল শাসনকালে অনুজ্জ্বল হয়ে এল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ইতিহাস প্রবন্ধে লিখেছেন, "যে আকবর বাদশাহের আমরা শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র। মোগলের অধিকারের পর হইতে ইংরেজ শাসন পর্যন্ত একখানি ভাল গ্রন্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সাম্রাজ্যে ভুক্ত হইয়া বাঙ্গালা দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল, সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন আর বাঙ্গালায় রহিল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়নির্বাহার্থ প্রেরিত হইতে লাগিল।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সারবত্তা আমরা বুঝতে পারি যখন ভেবে দেখি মোগল শাসনে সত্যই বাঙালীর মনের ক্ষেত্রে কোনো নবীন শস্য জন্মে নি; শুধু পূর্বে উদ্‌ভাবিত শস্যের থেকেই বীজ বপন করে যাওয়া হয়েছে মাত্র। পূর্ববর্তী কাব্যের আদর্শকে অনুসরণে বহিরঙ্গ-পারিপাট্যে মনোহরণ করে মঙ্গল কাব্য এবং বৈষ্ণব কাব্যের দুই ধারা চলে আসে। ধর্মের দিক্ দিয়েও বৈষ্ণব ধর্মের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়ে শাক্তধর্মের প্রান্তরে পথ হারায়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মোহান্তদের জীবনী এবং বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস রচনার সঙ্গে পদাবলী-সংকলনও হতে থাকে। এগুলি ঠিক মৌলিক নয়, মৌলিক সৃষ্টির সালতামামী। মোগল শাসনে একখানি 'ভাল গ্রন্থে'র অভাব বলতে বঙ্কিমচন্দ্র

বোধ হয় পূর্ববর্তী যুগের প্রতিভার স্বাভাবিক উৎসারকেই স্মরণ করেছিলেন। পাঠানকে যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার মিত্র বলে আখ্যাত করেছেন, তার কারণ পাঠানরা ভিন্নজাতীয় হলেও বাংলাকেই স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। পরন্তু মোগল রাজারা দিল্লী থেকে সুবাদারের সহায়তায় শাসন করতেন বলে বাংলাদেশ তাঁদের করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিযোগ আধুনিক ঐতিহাসিকও সমর্থন করবেন: "Mughal rule in Bengal preserved its character of a foreign conquest. The viceroys and officers came and went without taking any real interest in the life of the province. A considerable part of the resources of the land was drained away to Upper India in the form of presents or cash tributes."[১৬]

মোগল শাসনের এই বৈদেশিক প্রকৃতির মধ্যে সুফলও ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে সহৃদয়চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। পাঠান শাসনকালে বাংলা দেশ আপন গণ্ডীতে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। মোগল শাসনেই বাংলা বাইরের উত্তর-ভারতীয় জীবনধারার পথে এসে দাঁড়াল। শুধু তাই নয়, আকবরের শাসন-ব্যবস্থা এ দেশে অনেকটা শান্তি ও শৃঙ্খলা এনে দিল। আকবরের বঙ্গদেশ জয়ের পর নূতনতর শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং সেই সঙ্গে তোডরমল্লের রাজস্ব-বন্দোবস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা এনে দিল। মোগল রাজত্বের প্রয়োজনে জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব; কর সংগ্রহের জন্য এদের সৃষ্টি। রাজার রাজস্ব আদায় করে যার যত বেশি লাভ থাকত, সে ততই ধনী হয়ে উঠত। সুতরাং এদের বলা যেতে পারে করসংগ্রহের কনট্রাকটর। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে, মোগল রাজত্বের পূর্ব থেকেই বাংলা দেশে জমিদার-জাতীয় কয়েকটি রাজপরিবার ছিল, কিন্তু এটাও ঠিক যে, মোগল যুগে রাজস্বব্যবস্থার জন্য ছোটোবড়ো অসংখ্য জমিদার দেশে এক নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করে। 'করসংগ্রহের কনট্রাকটর' কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত ওয়েস্টল্যাণ্ডকে অনুসরণ করেই প্রয়োগ করেন। জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের প্রজাপীড়ন সম্পর্কে মোগল শাসনকে দোষারোপ করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁরই মত মনে করলে ভুল হবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধেও এই তথ্যটিই দেখানো হয়েছে—

"The word Zemindar, although an indefinite term, has no reference, like other Persian words of similar termination to ownership of land. This innovation in name was followed by another of a more radical nature. And it arose from a love of exaction. Several districts were incorporated into one great fiscal division and committed to the charge of individuals who were designated Talukdar or Zemindar-Talukdar. This Talukdari or farming system on an extensive scale— was vigorously carried on in Bengal by Jaffier Khan alias Murshidkuly Khan, in consequence of his having found the ancient Zemindars reluctant to submit to his extortions. The Zemindar-

---

১৬ তপনকুমার রায়চৌধুরী, Bengal under Akbar and Jahangir (Calcutta, 1953), পৃ ৪৩

Talukdars were neither the actual collectors, nor did they in any way bring themselves in contact with the people. They were averse to this trouble and they farmed the revenue to others between whom and the Government they stood as middlemen.[১৭]

ইংরেজরা এ দেশে এল মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায়। জমিদারেরা তখন প্রবল হয়ে দিল্লীর শাসন লঙ্ঘন করতে সাহসী হয়ে উঠেছে। এই সময়কে দৃশ্যপট করে বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। সীতারাম, দেবীচৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ— এই চারখানি উপন্যাস মোগল রাজত্বের পতন এবং ইংরেজ শাসনের অভ্যুদয়ের মাঝামাঝি সময়ের ইতিহাস আশ্রয় করে রচিত। কেন্দ্রের শাসন যখন শিথিল, তখন সেই বিশৃঙ্খলার যুগেই সীতারামের মতো রাজার উদ্‌ভব। তারপর দেশব্যাপী অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইংরেজ ভারতভূমিতে সাম্রাজ্য বিস্তার করল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের এই যুগসন্ধির কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। কেন ইংরেজ বাংলা দেশকেই সাম্রাজ্য স্থাপনের পাদপীঠরূপে ব্যবহার করতে পেরেছিল, সে প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিম-সাহিত্যে নেই।

ইংরেজরা দেশের শাসনভার গ্রহণের পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করবার পূর্বে মন্বন্তর ইত্যাদি যে বিপর্যয় ঘটেছিল, আনন্দমঠ তারই পটভূমিতে লেখা। অবশ্য আনন্দমঠে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ঐতিহাসিকতা তিনি রক্ষা করেন নি। উপন্যাস বলেই আমরা এর থেকে ইতিহাস-চিন্তা ঠিক প্রত্যাশা করি না। এই বিদ্রোহ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাকে মহোজ্জ্বল রাগে রঞ্জিত করেছে। আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে পদক্ষেপ করেছেন। ভবিষ্যৎ বাঙালীর অন্তর্বিষয়ক ও বহির্বিষয়ক জ্ঞানের সুসমঞ্জস সমৃদ্ধির তিনি স্বপ্ন দেখছেন। আনন্দমঠে ইতিহাসের অতীতচারণ মুখ্য নয়, ভবিষ্যতের প্রত্যাশাই মুখ্য। এই যুগটি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো প্রবন্ধ নেই, শুধু বঙ্গদেশের কৃষকে এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এই যুগটি সম্বন্ধে বলেছেন, "দেবীচৌধুরাণীতে বর্ণিত যুগে ইংরেজেরা জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতেন, নিলামে সর্বোচ্চ দরে এক এক বৎসরের জন্য (পরে একবার ৫ বৎসরের জন্য) জমিদারীগুলি ইজারা দেওয়া হইত। ইতিহাস-পাঠক সর্বদেশেই দেখিয়াছেন যে এই কুপ্রথার ফল ভীষণ প্রজাপীড়ন, চাষের হ্রাস, জমিদারের সর্বনাশ এবং রাজারও নিয়মিত বার্ষিক আয়ে দ্রুত অবনতি। দেশের এই দুর্দশার চিত্র বঙ্কিম ঠিক আঁকিয়াছেন, ইহার কোনো অংশ কল্পিত বা অতিরঞ্জিত নহে। কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) আর যাহাই করুক না কেন, অনেক বৎসর ধরিয়া মফঃস্বলে শান্তি, প্রজার সুখ এবং রাজস্বের নির্দিষ্টতা আনিয়া দেয়।"[১৮] বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করতে পারেন নি। তাঁর মতে এতে উৎপীড়ন ঠিকই চলল, শুধু জমিদারেরা উৎপীড়ন করার চিরস্থায়ী অধিকার পেল।[১৯] এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র ভিন্ন মত পোষণ করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা তাঁর চিন্তার অগ্রগামিতার পরিচয় দেয়।[২০]

---

১৭ Calcutta Review, 1846, No. XII, Vol. VI. The Zemindar and the Ryot.

১৮ দেবীচৌধুরাণী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ভূমিকা

১৯ বঙ্গদেশের কৃষক, চতুর্থ পরিচ্ছেদ

২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬০ সংখ্যায় অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত লিখিত 'রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভারতবর্ষের আর্থিক ইতিহাস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ইংরেজ রাজত্বের সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র কম করেন নি। পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও তিনি কঠিন ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজ শাসনকেই চেয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে ইংরেজরা যে অধ্যায় রচনা করতে এসেছিল, সেই অধ্যায়কে উনবিংশ শতাব্দীর কোনো মনীষীই লঘু করে দেখতে পারেন নি। সে যুগের মনীষীদের মধ্যে এক দিকে প্রখর দেশপ্রীতি আর একদিকে ইংরেজপ্রীতি অনেককেই বিভ্রান্ত করে। কিন্তু এটাই ছিল ইতিহাসের শিক্ষা। রামমোহনের জীবনীতেও কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন, "In his youth he was violently opposed to the English Government. But as he saw more of it, and learnt to compare it with the Mahommedan Government his strong aversion was converted into a warm admiration for its general character. He considered the conquest of this country by the English nation as a providential interposition calculated to answer important ends in the economy of the moral world. Though he was fully cognizant of the complex organization of the Government and of all wrongs and grievances inseparable from its operation, yet he cheerfully and gratefully admitted the manifold blessings it conferred on his country; and was strongly of opinion that the English were better fitted to govern it than the natives themselves."[২১] রামমোহন সম্পর্কে প্রযুক্ত এই কথাগুলি সেকালের প্রায় সকল মনস্বী ব্যক্তিরই কথা বলে ধরা যেতে পারে। তাঁরা বঙ্গভূমির ইতিহাসকে ধূসর অতীত থেকে সুদূর ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনায় প্রসারিত দেখতে পেয়েছিলেন। এক সময়ে তার গৌরব দীপ জ্বলে উঠেছে, এক সময়ে দুঃশাসনে বিপর্যয়ে সে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। একটি দুর্মদ বলিষ্ঠ সভ্যতার রূঢ় আঘাতে সেই মৃতপ্রায় দেহটিকে যদি সঞ্জীবিত করে তোলা যায় তবে বিদেশী বলেই তাকে পরিহাস করা অনুচিত। বাংলা দেশের আধুনিক ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র সেই আশাই পেয়েছিলেন।

কৃষ্ণনগর

২১ Calcutta Review (Selections Vol. IV); 'Rammohun Roy'। প্রবন্ধটি প্রথমে ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৪৫-এ প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ-সভা বছর বছর হয় কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা বলেন না, এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না ক'রে থাক্‌তে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখ্‌তে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করছেন।

এর থেকে একটি কথার প্রমাণ হয় যে, তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড় যুগে তাঁর জন্ম যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে; বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি অতীতের প্রথা ও বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন।— এমন দেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, যেখানে জীবন ও মনের যে প্রবাহ মানুষের সংসারকে নিয়ত অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের অভিমুখে নিয়ে যেতে চায় সেই প্রবাহকে লোকেরা বিশ্বাস করে নি, এবং তাকে বিপজ্জনক মনে করে তার পথে সহস্র বাঁধ বেঁধে সমাজকে নিরাপদ করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বে তিনি পুরাতনের বেড়ার মধ্যে জড়ভাবে আবদ্ধ থাক্‌তে পারেন নি। এতেই তাঁর চারিত্রের অসামান্যতা ব্যক্ত হয়েছে। দয়া প্রভৃতি গুণ অনেকের মধ্যে সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু চরিত্রবল আমাদের দেশে সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। যারা সবলচরিত্র, যাদের চারিত্রবল কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধিগত নয় কিন্তু মানসিক-বুদ্ধি-গত, সেই প্রবলেরা অতীতের বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন না। তাঁদের বুদ্ধির চারিত্রবল প্রথার বিচারহীন অনুশাসনকে শান্তশিষ্ট হয়ে মান্‌তে পারে না। মানসিক চারিত্র-বলের এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান। যাঁরা অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিষ্যতের পরম সার্থকতার দিকে বহন করে নিয়ে যাবার সারথি-স্বরূপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মহারথিগণের একজন অগ্রগণ্য ছিলেন, আমার মনে এই সত্যটিই সব-চেয়ে বড় হয়ে লেগেছে।

বর্তমানকাল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নিত্যচলনশীল সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে কে কোন্ দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য করবার জিনিস। যারা বর্তমান কালের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পিছন দিকেই ফিরে থাকে তারা কখনো অগ্রগামী হতে পারে না, তাদের পক্ষে মানবজীবনের পুরোবর্তী হবার পথ মিথ্যা হয়ে গেছে। তারা অতীতকেই নিয়ত দেখে ব'লে তার মধ্যেই সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে থাকাতেই তাদের একান্ত আস্থা। তারা পথে চলাকে মানে না। তারা বলে যে সত্য সুদূর অতীতের

মধ্যেই তার সমস্ত ফসল ফলিয়ে শেষ করে ফেলেছে; তারা বলে যে তাদের ধর্ম-কর্ম বিষয়-ব্যাপারের যা-কিছু তত্ত্ব তা ঋষিচিত্ত থেকে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভূত হয়ে চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে, তারা প্রাণের নিয়ম অনুসারে ক্রমশ বিকাশ লাভ করে নি, সুতরাং তাদের পক্ষে ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভবিষ্যৎকাল বলে জিনিসটাই তাদের নয়।

এইরূপে, সুসম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে, অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিত্তকে অবরুদ্ধ করে তার মধ্যে বিরাজ করা আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে সর্বত্র লক্ষ্যগোচর হয়, এমন-কি আমাদের দেশের যুবকদের মুখেও এর সমর্থন শোনা যায়। প্রত্যেক দেশের যুবকদের উপর ভার রয়েছে সংসারের সত্যকে নূতন করে যাচাই করে নেওয়া, সংসারকে নূতন পথে বহন করে নিয়ে যাওয়া, অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। প্রবীণ ও বিজ্ঞ যাঁরা তাঁরা সত্যের নিত্যনবীন বিকাশের অনুকূলতা করতে ভয় পান, কিন্তু যুবকদের প্রতি ভার আছে তারা সত্যকে পরখ করে নেবে।

সত্য যুগে যুগে নূতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন্যে যুবকদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেই-সকল নবযুগের বীরদের কাছে সত্যের-ছদ্মবেশ-ধারী পুরাতন মিথ্যা পরাস্ত হয়। সব-চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অস্বীকার করেছে। সকল-প্রকার প্রথাকেই চিরন্তন বলে কল্পনা করে কোনো রকমে শান্তিতে ও আরামে মনকে অলস করে রাখতে তাদের মনের মধ্যে পীড়া বোধ হয় না, দেশের পক্ষে এইটেই সকলের চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। সেইজন্যেই আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও এই দেশেরই একজন সেই নবীনের বিদ্রোহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি আপনার মধ্যে সত্যের তেজ, কর্তব্যের সাহস অনুভব ক'রে ধর্মবুদ্ধিকে জয়ী করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই তাঁর যথার্থ মহত্ত্ব। সেদিন সমস্ত সমাজ এই ব্রাহ্মণতনয়কে কিরূপে আঘাত ও অপমান করেছিল তার ইতিহাস আজকার দিনে ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু যাঁরা সেই সময়ের কথা জানেন তাঁরা জানেন যে তিনি কত বড় সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জয়ী হয়েছিলেন বলে গৌরব করতে পারি নে। কারণ, সত্যের জয়ে দুই প্রতিকূল পক্ষেরই যোগ্যতা থাকা দরকার। কিন্তু ধর্মযুদ্ধে যাঁরা বাহিরে পরাভব পান তাঁরাও অন্তরে জয়ী হন, এই কথাটি জেনে আজ আমরা তাঁর জয়কীর্তন করব।

বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতু-স্বরূপ হয়েছিলেন সেখানেও তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেন নি। তিনি জানতেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অথচ তিনিই বর্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন।

এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর বাইরের ব্যবহার বেশভূষা প্রাচীন, কিন্তু যাঁর অন্তর চিরনবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন এইটেই বড় রমণীয় হয়েছিল। তিনি অনেক বেশি বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেশলাভ করেন এবং তাঁর গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতবিদ্যারই চর্চা হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌববকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব-চেয়ে পূজনীয়, কারণ তিনি আমাদের দেশে চল্‌বার পথ প্রস্তুত করে গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্ছে এইভাবে বাধা অপসারিত করে ভাবী যুগে যাত্রা কর্‌বার পথকে মুক্ত করে দেওয়া। তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করে দেন। কিন্তু বাধাই যে দেশের দেবতা সে দেশ এই মহাপুরুষদের সম্মান করতে জানে না। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সব-চেয়ে বড় পরিচয় হয়ে থাক্‌বে। এই ব্রাহ্মণতনয় যদি তাঁর মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন কর্‌তেন, তা হলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বস্‌তেন এবং যে নৈরাশ্যের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে সহ্য করতে হত না। কিন্তু যাঁরা বড়, জনসাধারণের চাটুবৃত্তি কর্‌বার জন্যে সংসারে তাঁদের জন্ম নয়। এইজন্যে জনসাধারণও সকল সময়ে স্তুতিবাক্যের মজুরি দিয়ে তাঁদের বিদায় করে না।

এ কথা মান্‌তেই হবে যে, বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বেদনা বহন করে-ছিলেন। তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত pessimist ছিলেন বলে অখ্যাতি লাভ করেছেন, তার কারণ হচ্ছে যে যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পান নি। তিনি যদিও তাতে কর্তব্যভ্রষ্ট হন নি তবুও তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তাঁর বড় তপস্যার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পান নি, কিন্তু সকল মহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধনা করতে সংসারে পাঠান তাঁরা সেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরের সেই সম্মানের টিকাকেই উজ্জ্বল করে তোলে— অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।

এই উপলক্ষ্যে আর-এক জনের নাম আজ আমার মনে পড়্‌ছে, যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের, সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্য বিদ্যা শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাক্‌তে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন— নির্ভীক এই সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জান্‌বার জন্য মানুষ নূতন নূতন দেশে নিষ্ক্রমণ ক'রে অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনিই মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্রমহিমায় দুঃসহ কষ্টকে শিরোধার্য করে নিয়ে থাকেন। আমরা অনুভব করতে পারি না যে এঁরা এঁদের বিরাট স্বরূপ নিয়ে ক্ষুদ্র জনসংঘকে ছাড়িয়ে কত উর্ধ্বে বিরাজ করেন। যারা ছোট বড়র বড়ত্বকেই তারা সকলের চেয়ে বড় অপরাধ বলে গণ্য করে। এই কারণেই ছোটর আঘাতই বড়র পক্ষে পূজার অর্ঘ্য।

যে জাতি মনে করে বসে আছে যে অতীতের ভাণ্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন কর্‌বার জন্যে তার স্বকীয় উদ্ভাবনার কোনো অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মতো সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি

হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে কখনোই সে আরাম পেত না। কারণ বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে যা অজ্ঞাত, যা অলব্ধ, তার অভিমুখে নিয়ত চল্‌তে চায়; বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তার হাতের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎসাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, য়ুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচল-ধরা, তারা মানসিক আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অন্য দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেন দেশের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ এক সময়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্বগৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে, স্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদের উন্মেষ হয় নি। যারা এমনি ভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হাস্যকর দুঃখকর লজ্জাকর ব'লে মনে করে, তারা জীবন্মৃত জাতি। তাই ব'লে অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জান্‌তে হবে যে, অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবীকালের পথেই তাকে অগ্রসর কর্‌বার জন্যে। আমাদের চলার সময় যে পা পিছিয়ে থাকে সেও সাম্‌নের পা'কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সাম্‌নের পা'কে পিছনে টেনে রাখ্‌ত তা হলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত। তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণ করে দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন। আমি মনে করি যে, ভারতবর্ষে জাতির সঙ্গে জাতির, স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নয়, যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ। আমরা এইরূপে উভয় কালের মধ্যে একটি অতলস্পর্শ ব্যবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে বসেছি। এক দিকে আমরা ভাবীকালে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হতে পার্‌ছি না, অন্য দিকে আমরা কেবল অতীতকে আঁক্‌ড়ে থাক্‌তেও পার্‌ছি না। তাই আমরা এক দিকে মোটর-রেল-টেলিগ্রাফকে জীবনযাত্রার নিত্যসহচর করেছি; আবার অন্য দিকে বল্‌ছি, বিজ্ঞান যে আমাদের সর্বনাশ কর্‌ল, পাশ্চাত্য বিদ্যা আমাদের সইবে না। তাই আমরা, না আগে, না পিছে, কোনো দিকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পার্‌ছি না। আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্ছে যে, আমরা অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বিরোধ বাধিয়েছি, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেত্রকে আয়ত্তের অতীত করে রাখ্‌তে চাচ্ছি— তাই আমাদের দুর্গতির অন্ত নেই।

আজ আমরা বল্‌ব যে, যে-সকল বীরপুরুষ অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন, অতীত সম্পদকে কৃপণের ধনের মতো মাটিতে গচ্ছিত না রেখে বহমান কালের মধ্যে তার ব্যবহারের মুক্তিসাধন কর্‌তে উদ্যমশীল হয়েছেন, তাঁরাই চিরস্মরণীয়; কারণ তাঁরাই চিরকালের পথিক, চিরকালের পথপ্রদর্শক। তাঁদের সকলেই যে বাইরের সফলতা পেয়েছেন তা নয়; কারণ আমি বলেছি যে, তাঁদের কর্মক্ষেত্র-অনুসারে সার্থকতার তারতম্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব আশার কথা যে, আমাদের দেশেও এঁদের মতো লোকের জন্ম হয়।

আজকাল আমরা দেশে প্রাচ্য বিদ্যার যে সম্মান কর্‌ছি তা কতকটা দেশাভিমানবশতঃ। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা-বশতঃ প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্পদ কর্‌বার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন

আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জন্য অনেকবার তাঁর প্রাণশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। আজ আমরা তাঁর সাধনার ফল ভোগ করছি, কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করতে কুণ্ঠিত হই নি। তবু আজ আমরা তাঁকে নমস্কার করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেন নি— তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বল্‌বেন যে, তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ্য মাত্র ছিল; তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের বাহকরূপে দেখেন নি। তিনি কতকালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রের খণ্ডন করেন নি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে গেছেন।

আজ আমাদের মুখের কথায় তাঁদের কোনো পুরস্কার নেই। কিন্তু আশা আছে যে, এমন এক দিন আস্‌বে যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চল্‌তে গৌরব বোধ করব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্ত্রানুশাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে থাক্‌ব না, যেদিন 'যুদ্ধং দেহি' বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করে আন্‌বার জন্যে যাঁরা প্রত্যুষেই জাগ্রত হয়েছিলেন তাঁদের বল্‌ব, 'ধন্য তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয় নি, তোমরা একদিন সত্যের সংগ্রামে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্তি অক্ষয়রূপ ধারণ করছিল।'

সত্যপথের পথিকরূপে, সন্ধানীরূপে নবজীবনের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, ভাবীকালের তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে এক তালে পা ফেলে যেদিন আমরা এই কথা বল্‌তে পার্‌ব সেইদিনই এই-সকল মহাপুরুষদের স্মৃতি দেশের হৃদয়ের মধ্যে সত্য হয়ে উঠ্‌বে। আশা করি সেই শুভদিন অনতিদূরে।

১৭ শ্রাবণ ১৩২৯

বিদ্যাসাগর-স্মরণসভায় বক্তৃতার মর্ম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা।

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত।

প্রবাসী। নব্যভারত। ভাদ্র ১৩২৯

নবযুগের মানুষ বিদ্যাসাগর

শ্রীবিনয় ঘোষ

আমাদের এই মানুষের সমাজে, দেবতার চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ মানুষ। তপস্যা করে জীবনে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যিনি মানুষের মতন মানুষ। মানুষের পক্ষে এ সমাজে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়া যত সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয়। আজও আমাদের সমাজে, বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বিপ্রহরকালে, অতিমানুষ ও মানবদেবতাদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ যত স্বল্পায়াসে হয়, সামাজিক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ আদৌ সেভাবে হয় না। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, আমাদেরই এই সমাজে তাই যখন দেখতে পাই বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষ পর্বতের মতন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, কোনো অতিমানবিক অলৌকিক শক্তির জোরে নয়, সম্পূর্ণ নিজের মানবিক শক্তির জোরে— তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

অনেক মানুষের দৈহিক গড়ন-শ্রীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। তার সঙ্গে প্রতিভা ও কর্মগৌরব মিশে, তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণকে আরো বেশি দুর্দমনীয় করে তোলে। বিদ্যাসাগর এই স্বাভাবিক সম্পদটুকু থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। শীর্ণদেহের উপর উন্নতললাট প্রকাণ্ড একটি মাথা ছিল বলে, ছাত্রজীবনে তাঁর সহপাঠীরা তাঁকে 'যশুরে কৈ' বলে ঠাট্টা করতেন। অতিদরিদ্র পরিবারে, মোটাচালের ভাত খেয়ে মানুষ হয়েছেন যিনি, তাঁর দেহ থেকে লাবণ্য বা কান্তির দ্যুতি বিচ্ছুরিত হবার কথা নয়, হতও না। পরবর্তীকালে যখন বিদ্যাসাগর স্বনামধন্য পুরুষ হয়েছিলেন, তখনও তাঁর দর্শনপ্রার্থীরা প্রায় সকলেই তাঁকে চোখে দেখে হতাশ হতেন।

এ সম্বন্ধে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি। মনোমোহন গাঙ্গুলির স্মৃতিকথা থেকে সংগৃহীত। মনোমোহন গাঙ্গুলির পিতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বিদ্যাসাগরের ছাত্র ছিলেন। একদিন রবিবার সকালে বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ি গিয়ে দেখেন, তিনি বাগানে ঘাস নিড়চ্ছেন। নগেনবাবুকে দেখে বলেন, 'যা, উপরে গিয়ে বস্‌গে যা, যাচ্ছি।' এমন সময় মেদিনীপুর থেকে চারজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ঘাস নিড়তে দেখে তাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁকে বাগানের মালি মনে করে জিজ্ঞাসা করেন, "ওহে, বিদ্যাসাগর মশায় বাড়ি আছেন কি ?" নিড়ানি হাতে করেই তিনি উত্তর দেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন— আপনারা বসুন, তিনি একটু কাজে ব্যস্ত আছেন, একটু পরেই আসবেন।" কিছুক্ষণ বসবার পর তাঁরা বললেন, "ওহে, একটু তামাক খাওয়াতে পার ?" "আজ্ঞে হ্যাঁ পারি" বলে, বিদ্যাসাগর মশায় চারটি হুঁকোয় চারজনকে তামাক সেজে এনে দেন। ভদ্রলোকদের তামাক খাওয়া শেষ হবার পর, বিদ্যাসাগর ঘরে ঢুকে বলেন, "এবারে কি দরকার, অনুগ্রহ করে বলুন ?" তাঁরা একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দেন, "দরকারটা তোমাকে বলে কি হবে, তুমি একবার তাঁকে খবর দাও না !" তখন বিদ্যাসাগর নিরুপায় হয়ে বললেন, "আজ্ঞে আমিই বিদ্যাসাগর।" চারজনেই হুঁকো ফেলে লাফিয়ে উঠে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো হবে, বিদ্যাসাগরই বটে, তা না হলে কি এরকমটি হয় !"

কাহিনীটি লোকমুখে অতিরঞ্জিত হতে পারে। হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সত্যটুকুই যথেষ্ট। ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে আঁকড়ে ধরেই জনসমাজে এই ধরনের কাহিনী পল্লবিত হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁর মেট্রোপোলিটান ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন, এরকম দু-একজন অতিবৃদ্ধ যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাদের মুখে শুনেছি, একসময় গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে দক্ষিণ-কলকাতায় কালীঘাটের কালীদর্শন করে, উত্তর-কলকাতায় বিদ্যাসাগরকে দর্শন করতে যেতেন। বিদ্যাসাগর যদি সাধক হতেন, যোগী বা সিদ্ধপুরুষ হতেন, অথবা সমাজের ধর্মগুরুর কর্তব্য করতেন, তাহলে তাঁর এই আকর্ষণীশক্তিতে আশ্চর্য হবার মতন কিছু থাকত না। কিন্তু এসবের কোনোটাই তিনি ছিলেন না। তাঁর দৈহিক আকর্ষণ তো ছিলই না, অভিজাত বংশের বংশধর বলেও কোনো সামাজিক আকর্ষণ ছিল না। এমনকি তাঁর স্বভাবসুলভ জড়তার জন্য তিনি সভাসমিতিতে লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত হতেন না, বক্তৃতাও দিতেন না। সেকালের সংবাদপত্রে তখনকার সমাজ-নেতাদের আজকের মতন আত্মপ্রচারেরও সুযোগ ছিল না। তা সত্ত্বেও, কি কারণে বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই দুর্নিবার আকর্ষণীশক্তির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, ভেবে দেখা দরকার। যে-সমাজে মানুষের চেতনার আকাশ অতিপ্রাকৃতলোকের কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, সেই সমাজের মানসপটে বিদ্যাসাগরের মতন এক মানবসর্বস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হল কি করে? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায়, যুগের পরিবর্তন হয়েছিল বলে। তাঁর কালের আরো দুতিন শতাব্দী আগে জন্মালে বিদ্যাসাগর হয়তো নূতন ধর্মপ্রবর্তক হতেন, সাধারণ মানুষের কাছেও অবলীলাক্রমে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন, কিন্তু সমাজ-জীবনের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, কেবল মানুষকেই জপ-তপ-ধ্যান-জ্ঞান করে, তিনি বহুমানুষের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানুষ হতে পারতেন না। এই মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ও ধ্যানধারণাই নবযুগের অন্যতম ঐতিহাসিক লক্ষণ। এই চিন্তার জন্যই নবযুগ 'রিনেস্যান্সের যুগ', নবজাগরণের যুগ। বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশে এই ঐতিহাসিক লক্ষণ সব-চেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বিদ্যাসাগর-চরিত্রে।

মানবচিন্তার এই আদর্শকেই ইতিহাসে 'হিউম্যানিজ্‌ম্' বলা হয়। অপার্থিব থেকে পার্থিবের প্রতি, স্বর্গলোকের দেবতা থেকে মর্ত্যলোকের মানুষের প্রতি, অদৃশ্য অলৌকিক জগৎ থেকে দৃশ্যমান বহির্জগতের প্রতি মানুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করাই 'হিউম্যানিস্ট'-এর আদর্শ। এই আদর্শই বিদ্যাসাগরকে সারাজীবন তাঁর দুঃসাহসিক সমাজকল্যাণব্রতে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। নবযুগের বাংলার আদর্শ 'হিউম্যানিস্ট' বিদ্যাসাগর। 'হিউম্যানিজ্‌ম্' আর 'হিউম্যানিটেরিয়ানিজ্‌ম্'এর অর্থ এক নয়। শুধু মানবপ্রেমও হিউম্যানিজ্‌ম্ নয়। ঐশচিন্তায় মগ্ন ব্যক্তিও মানবপ্রেমিক হতে পারেন। হিউম্যানিজ্‌ম্ হল মানবতন্ময়তা। বিদ্যাসাগর এই অর্থে হিউম্যানিস্ট। অসহায় নিপীড়িতের সমাজে স্বভাবতঃই তিনি 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগর রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্য, বদান্যতা, মহানুভবতা, মাতৃভক্তি, সব কটি মানবচরিত্রের মহৎ গুণ হলেও, ব্যক্তিচরিত্রের উপাদান হিসেবে তার বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। 'ঐতিহাসিক মূল্য' কথাটির উপর জোর দিয়ে বলছি। যুগে যুগে বহু মানুষের মধ্যে এইসব মহৎ গুণের সমাবেশ হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সব সময় এইসব গুণের প্রকাশ হতে দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা না থাকায়, তাঁদের সেইসব গুণের সমাদর হয় না। কেবল এই গুণগুলির সমাবেশের জন্য বিদ্যাসাগরের মতন ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয় নি। তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ হল এই হিউম্যানিজ্‌ম্, এই

মানবতন্ময়তা, এই মানবাচ্ছন্ন চেতনা। মানুব-অতীত ও মানব-ব্যতীত সমস্ত চেতনার উপরে ছিল তাঁর মানবচেতনা। এই চেতনাই ঐতিহাসিক।

মানুষের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরে এই চেতনা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন যুগে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক যখন অনেক বেশি প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ ছিল, বৈষম্যের বিষ যখন সমাজের অন্তস্তল পর্যন্ত জর্জরিত করে তোলে নি, তখন মানুষের আচরিত ধর্মের সঙ্গে যাপিত জীবনের সংযোগও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নি। পরলোকের চিন্তা করেও মানুষ তখন ইহলোকের কথা ভুলে যেত না, দেবতা ও নিয়তির অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেও, মানুষ নিজের শক্তির উপর আস্থা একেবারে হারিয়ে ফেলে নি। তার পর, সুবিস্তীর্ণ মধ্যযুগের বিভিন্ন পর্বে মানুষ ক্রমে ক্রমে এমন স্থিতিশীল ও কূপমণ্ডূক হয়ে উঠল, ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুশাসন মানুষের মন ও বুদ্ধিকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে ফেলল যে, নিজের সত্তার চৈতন্য পর্যন্ত তার প্রায় লোপ পেয়ে গেল। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, সামাজিক সুষুপ্তির ঘোর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ভিতরের ও বাইরের নূতন-উন্মেষিত শক্তির আঘাতে সেই সুপ্তির ঘোর কেটে যায়, মানুষ ও সমাজ আবার এগিয়ে চলে। ইতিহাসের ধর্মই তাই। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে ইয়োরোপে যে নূতন সামাজিক শক্তির অভ্যুদয় হয়, তারই আঘাতে মানুষের এই সুপ্তির ঘোর কাটতে থাকে। বর্ধিষ্ণু ধনিক-বণিক-শ্রেণী নিজেদেরই অগ্রগতির স্বার্থে মানুষের মন ও বুদ্ধিকে সংস্কারমুক্ত করতে সচেষ্ট হন। তার জন্য তাঁদের একটি 'মডেল'এর প্রয়োজন হয়। পুনরনুসন্ধান করে এই 'মডেল' তাঁরা ইতিহাসের প্রাচীন যুগে আবিষ্কার করেন। মানববিদ্যা ও মানবজ্ঞানের মনন করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়। মানুষের চিন্তার রাজ্যে, নির্বাসিত মানুষ ও পৃথিবী প্রত্যাবর্তন করে। মানুষের এই নবচেতনাকেই ইতিহাসে বলা হয় নবজাগরণ বা রিনেস্যান্স। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী মার্টিন বলেছেন :

' . . . the typological importance of the Renaissance is that it marks the first cultural and social breach between the Middle ages and Modern times.

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের প্রথম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদকে বলা হয় 'রিনেস্যান্স'—আধুনিক যুগের শৈশবকাল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইটালিতে, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে, প্রথম এই যুগবিচ্ছেদের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই ফ্লোরেন্সকে বলা হয় আধুনিক ইয়োরোপের 'মডেল' বা 'প্রোটোটাইপ'। তুতিন শো বছর পরে, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে, ইয়োরোপের সংস্পর্শে এসে, বাংলার সমাজে রিনেস্যান্সের এই লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। কেবল হিউম্যানিজ্‌মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, antiquityকে model করে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের আন্দোলনে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রকেই তাঁরা সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। এও নবযুগেরই অন্যতম ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগের প্রধান জীবনকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র ছিল গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ। এই জীবনকেন্দ্র আধুনিক যুগে নগরে ও শহরে স্থানান্তরিত হতে থাকে। বাংলাদেশে নবযুগের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা শহর। ফ্লোরেন্স যদি আধুনিক নবযুগের ইয়োরোপের 'প্রোটোটাইপ' হয়, তা হলে বাংলাদেশের কলকাতা শহরকেও নিঃসন্দেহে নবযুগের ভারতের ফ্লোরেন্স বলা যেতে পারে। আট বছরের বালক বিদ্যাসাগর, ১৮২৮ সালে, যখন তাঁর পিতা ঠাকুরদাস ও পাঠশালার গুরুমশাই কালীকান্তের সঙ্গে বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে

পায়ে হেঁটে, মাইলস্টোন গুনতে গুনতে এসেছিলেন, তখন তিনি নবযুগের ফ্লোরেন্সেই এসেছিলেন, মধ্যযুগের তীর্থনগরে বা বন্দর-পত্তনে আসেন নি। মধ্যযুগের স্থিতিশীল জীবনকেন্দ্র থেকে আধুনিক যুগের গতিশীল ও পরিবর্তনশীল জীবনকেন্দ্রে এসেছিলেন তিনি— একটির পর একটি নিশ্চল শাস্ত্রীয় অনুশাসনের পাথুরে মাইলস্টোন অতিক্রম করে। শহরে এসে, দীর্ঘ বারো বছরের ছাত্রজীবনে তিনি নবযুগের ব্যক্তিসত্তার বিচিত্র প্রকাশ স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিশেষ করে, ডিরোজিওর শিষ্য, হিন্দু কলেজের ছাত্র, ইয়ং বেঙ্গল দলের মধ্যে এই আত্মচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের যে নির্বিচার প্রকাশ হয়েছিল, খুব কাছাকাছি থেকে তিনি তা দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন। এমনিতে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ দোষের নয়। নবযুগের রিনেস্যান্সের সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান বোধ হয় এই individuality, এই ব্যক্তিত্ববোধ। আগে মানুষের ব্যক্তি হিসেবে কোনো চেতনা ছিল না। বংশ, গোত্র-গোষ্ঠী, সংঘ-জন-জাতি ইত্যাদি সাধারণ categoryর সঙ্গে তার সত্তা অভিন্ন ছিল। চেতনার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই আত্মজ্ঞানহীন গোষ্ঠীচেতনা ও দলচেতনা নিম্নস্তরের চেতনা। মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে মানুষের মধ্যে যখন এই স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগল, তখন তার অবরুদ্ধ মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের পথ খুলে গেল চারি দিকে। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলাসাহিত্য, সর্বক্ষেত্রে মানুষের আত্মনির্ভর দুঃসাহসিক অভিযান শুরু হল। রিনেস্যান্সের ইতিহাস-রচয়িতা বার্থাট বলেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে ফ্লোরেন্স শহরে এই স্বাতন্ত্র্যচেতনার এমন চরম প্রকাশ হয়েছিল যে পোশাক-পরিচ্ছদের ফ্যাশান বলে শহরে তখন কিছু ছিল না। প্রত্যেক মানুষ তার স্বতন্ত্র পোশাকের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করতে চাইত। বাংলাদেশে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, ইয়ং বেঙ্গল দলও কতকটা এই অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁরা unique individual হতে চেয়েছিলেন, আচারে-ব্যবহারে তো বটেই, পোশাকের দিক থেকেও। ১৮৭২ সালেও, লালবিহারী দে'র Bengal Magazine লিখেছেন :

> Young Bengal, with his fantastic and ever-varying dress, might have furnished them [the leaders of fashion in London], in his own person, parts of the national costumes of all countries of the world.

ইয়ং বেঙ্গলের এই পোশাক-বৈচিত্র্য তাঁদের স্বাতন্ত্র্যবোধেরই প্রকাশ। কিন্তু, ইয়ং বেঙ্গলের এই আন্তর্জাতিক পোশাক-প্রদর্শনীর মধ্যে চৌবন্দি ফতুয়া ও সাদা চাদর গায়ে, তালতলার চটিজুতো পায়ে বিদ্যাসাগরের শুভ্রমূর্তিটি যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখনই বোঝা যায়, দুটি ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের বাহ্য প্রেরণা অভিন্ন হলেও, তাদের বনিয়াদ ভিন্ন।

যা কিছু চিরাচরিত, যা কিছু গতানুগতিক, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ইয়ং বেঙ্গল তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এমন-কি, নিজেদের জাতীয় ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেও তাঁদের মধ্যে অনেকে কুণ্ঠিত হন নি। স্বাতন্ত্র্যের উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ হলেও, ইতিহাসের উদারদৃষ্টিতে এ উচ্ছৃঙ্খলতা মার্জনীয় হত, যদি না তাঁরা বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ করতেন এবং স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্মের আশ্রয় নিতেন। অবশ্য সকলে তা করেন নি। ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যেও দুটি দল ও দুটি ধারা ছিল দেখা যায়। কিন্তু তা হলেও, নির্বিচার অনুচিকীর্ষা যতখানি তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল, ঠিক ততখানিই তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ব্যাহত হয়েছিল বলে মনে হয়। বিদেশীর অধীনতাও তার জন্য অনেকটা

দায়ী ছিল। কলকাতা শহর আর ফ্লোরেন্সের মধ্যে এই দিক থেকে পার্থক্য ছিল বিরাট। পরাধীন পরিবেশে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ যে কতখানি খর্ব হতে পারে, ইয়ং বেঙ্গলের ট্র্যাজিক বিকাশ ও পরিণাম তার করুণ দৃষ্টান্ত। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের মতন দু-একজন শক্তিমান্ পুরুষ, যাঁরা নিজেদের প্রতিভার জোরে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, কেবল এই খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁরাও বৃহত্তর জনসমাজে, তাঁদের ক্ষমতার অনুপাতে, ব্যাপক নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে একমাত্র বিদ্যাসাগরই ছিলেন এর বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। জীবনের প্রত্যেকটি কাজকর্মের মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষত্বই সব সময় ফুটে উঠত, সেই বিশেষত্ব হল individuality, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্যকে তিনি খণ্ডিত করেন নি। আধুনিক ইয়োরোপের বীজমন্ত্রটি তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলে, বাইরের পোশাক-পরিচ্ছদে বা আচার-ব্যবহারে তা তিনি কোনোদিন প্রকাশ করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। প্রকাশ করেছেন তাঁর চরিত্রে। ইংরেজি কেতাদুরস্ত ইয়ং বেঙ্গল দল ছিলেন অন্তরে বাঙালি, চরিত্রে বাঙালি, বাইরে ইয়োরোপীয়। ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাস ও আবেগসর্বস্বতাই ছিল তাঁদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগর ছিলেন মনেপ্রাণে আধুনিক ইয়োরোপীয় এবং তার জন্য বাইরের বাঙালিত্বটুকু তিনি বর্জন করেন নি। বাঙালি থেকেও তিনি পরিপূর্ণরূপে ইয়োরোপীয় ব্যক্তিসত্তাকে নিজের সত্তার মধ্যে বিলীন করে নিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে আর কেউ বোধ হয় আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাবধারাকে নিজের চরিত্রে এমনভাবে আত্মসাৎ করতে পারেন নি। এইখানেই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

কবি হেমচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছেন :

উৎসাহ গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি।

আতসবাজির মতন উৎসাহ অনেকের চরিত্রে দেখা যায়, বিশেষ করে বাঙালির চরিত্রে— যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি খপ্ করে নিবে যায়। কিন্তু গ্যাসের শিখার মতন উৎসাহ সমানভাবে অনির্বাণ থাকে ক'জনের চরিত্রে? বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর সমসাময়িক যে-কোনো আত্মসচেতন ব্যক্তির চেয়েও উগ্রতর ছিল। হেমচন্দ্রের ভাষায়, তিনি ছিলেন—

স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুলকাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।

কর্মজীবনে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরাই মর্মে মর্মে এই শেঁকুলকাঁটার দংশন অনুভব করেছেন। এই উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্যই তিনি বড় বড় সামাজিক আন্দোলনের নেতা হয়েও, কোনোদিন কোনো দল বা সমাজ-ভুক্ত হতে পারেন নি। ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংস্কার-আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকেও, তিনি কোনোদিন তাঁদের দলভুক্ত একজন হন নি। একমাত্র প্রত্যক্ষ কর্মের ক্ষেত্রেই তিনি সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজনবোধ করতেন। নির্দিষ্ট কোনো কাজের মাধ্যমেই বিভিন্ন দলের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হত। কাজ ছাড়া যেন বাইরের সমাজের সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। জনসভাতে তো নয়ই, সমসাময়িক বিদ্বৎ-সভার সঙ্গে পর্যন্ত তাঁর সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ। বেথুন সোসাইটির মতন বিদ্বৎ-সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হয়েও, তিনি তার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষভাবে যে অংশ গ্রহণ করতেন তা মনে হয় না। সর্বত্রই ঐ শেঁকুলকাঁটাই ছিল অন্তরায়।

বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে এই প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধের আভাস পাওয়া যেত। তাঁর পিতামহ তাঁকে

পরিহাস করে এঁড়ে বাছুর বলতেন। যত বয়স বাড়তে লাগল, দেখা গেল যে পিতামহের কথাই ঠিক। বর্ণপরিচয়ে গোপাল ও রাখাল নামে যে দুটি বালকচরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে গোপালের চেয়ে রাখালের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল বেশি। পিতা যা বলতেন, তিনি প্রায়ই ঠিক তার উল্টো করতেন। তার জন্য তিনি পিতার কাছে যথেষ্ট প্রহারও খেয়েছেন। শেষকালে উল্টো কথা বলে তাঁকে দিয়ে সোজা কাজটি করাতে হত। তাঁর বাল্যকালের এই একগুঁয়েমি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাশ করিয়া ভাল চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণলাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়।

ছেলেবেলা থেকে যাঁর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এত সজাগ ছিল, নিজের কাজকর্মের স্বাধীনতায় যিনি অন্যের সামান্য হস্তক্ষেপ পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না, তিনি যে যৌবনে ও পরিণত বয়সে স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুলকাঁটা হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ'এর এক জায়গায় বলেছেন যে সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলে, তিনি স্বদেশবাসীর কাছে অত খাতির পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন :

সাহেবদের নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, এ কথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে সাহেব সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও, কৃষ্ণকমলের মতন বুদ্ধিমান পণ্ডিতও তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি বুঝতে পারেন নি যে, সাহেব সমাজে বিদ্যাসাগরের যে প্রতিপত্তি ছিল তা বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিদের প্রতিপত্তি নয়, শিরোপাধারী রাজামহারাজাদেরও প্রতিপত্তি নয়। অর্থের বলে বা বিদ্যার বলে, সে প্রতিপত্তি তিনি লাভ করেন নি। এ সমাজে শাসকশ্রেণীর কাছে তাঁরাই খাতির পান যাঁরা বিত্তবান। বিদ্যাসাগর বিত্তবান ছিলেন না। বিদ্যা তাঁর ছিল, কিন্তু সে বিদ্যা আরো অনেকের ছিল, 'বিদ্যাসাগর' উপাধিও একাধিক পণ্ডিতের ছিল। সাহেবদের কাছে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল তাঁর চরিত্রের জন্য। নিজেদের চরিত্রের যা-কিছু মহৎ গুণ, তার সবগুলি তাঁরা একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চরিত্রে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই, সাহেবরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা থেকে অন্তত এইটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি ইংরেজ শাসকদের প্রসাদলোভী ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লাভ করেন। বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরেজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন। বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত তীব্র ছিল যে, কর্মক্ষেত্রে সাহেব রাজপুরুষ বা কর্মচারিদের সঙ্গে যখনই তাঁর সংঘাত হত তখনই তাঁদের প্রতিঘাত করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপ্যাল কার সাহেবের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করেছেন। সকলেই জানেন, কার সাহেব একদিন টেবিলের উপর জুতো-সুদ্ধ পা তুলে দিয়ে বসে, পাইপ খেতে খেতে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। প্রতিদানে বিদ্যাসাগরও একদিন তাঁর সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করেছিলেন। শিক্ষা কৌন্সিলের সেক্রেটারি কৈফিয়ত চাইলে তিনি উত্তরে যা জানান, তার মর্ম এই :

"আমি ভেবেছিলাম আমরা এদেশী নেটিব, অসভ্য— ভদ্রতা-ভব্যতা জানি না। সেদিন কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকেই এই আচরণ শিখেছি। একজন সুসভ্য ইয়োরোপীয়ের এই আচরণ যে অশিষ্ট হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। আমি ভাবলাম, এই বোধ হয় আপনাদের অভ্যর্থনার রীতি। তাই আমি এদেশী রীতিতে তাঁকে অভ্যর্থনা না করে, তাঁরই কাছ থেকে শেখা রীতি অনুযায়ী সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করেছি। যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তার জন্য আমি দোষী নই।"

জবাবের মধ্যে তীব্র শ্লেষের ঝাঁজ লক্ষণীয়— বিদ্যাসাগরী বাগ্‌ভঙ্গির একটা বিশিষ্ট রীতি। প্রতিঘাত করবার সময় তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যের শেঁকুলকাঁটাটি নির্মমভাবে প্রতিপক্ষের দেহে বিঁধিয়ে দিতেন। বিশেষ করে বিদেশীদের। বুঝিয়ে দিতেন যে পৃথিবীর যে-কোনো লম্বাচওড়া মানুষের তুলনায়, তিনি একজন শীর্ণকায় বাঙালি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েও, বড় ছাড়া ছোট নন।

কার সাহেবের গল্পটি অনেকেই জানেন। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৮৭৪ সালের ঘটনা। বিদ্যাসাগর একদিন কাশীর এক পণ্ডিতের সঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরি দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর পরনে ধুতিচাদর আর পায়ে চটিজুতো ছিল। সোসাইটির বিল্ডিংএ তখন মিউজিয়ামও ছিল। ভিতরে ঢোকার সময় দরোয়ান তাঁকে চটি খুলে রাখতে, অথবা হাতে করে নিয়ে যেতে বলে। বিদ্যাসাগর কোনো কথা না বলে বাড়ি ফিরে আসেন। মিউজিয়ামের ট্রাস্টি বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন তখন ব্লানফোর্ড। তাঁর কাছে তিনি চিঠি লেখেন এই মর্মে: "সেদিন সোসাইটির প্রাঙ্গণে ঢুকে দেখলাম, এদেশী লোক যাঁরা দেশী জুতো পরে গেছেন, তাঁদের জুতো খুলিয়ে হাতে করে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে— আর যাঁরা চোগাচাপকান আর বিলেতি জুতো পরে গেছেন, তাঁরা জুতো পায়ে দিয়েই ভিতরে ঢুকছেন। জুতোর ব্যাপারে এই অধিকারের পার্থক্য কেন, বুঝতে পারলাম না।" এসিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিলের কাছে তিনি চিঠি লেখেন। চটিজুতোর মর্যাদা নিয়ে সোসাইটির মতন বিদ্বৎ-সভাতেও আলোচনা হয়। *Englishman* পত্রিকা পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হন:

> If the leaving the shoes behind is a mark of respect, it matters little whether the shoes are of European or the native pattern. But if there is a mark of respect attached to the leather, it is immaterial as to what form the leather may take. We hope the Council of the Asiatic Society and the Trustees of the Museum will have the good sense not to make native gentlemen feel that to enter their room is to court insult.

হিন্দু প্যাট্রিয়ট মন্তব্য করেন:

> The great shoe question has turned up in quite an unexpected quarter—we mean in the rooms of the Asiatic Society.

"The Great Shoe Question" ই বটে, বিশেষ করে যখন বিদ্যাসাগরের দেশী জুতো!

বিদ্যাসাগর একদিন শিবনাথ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন: "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতোসুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।" শাস্ত্রী মশায় লিখেছেন:

> আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম, এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমনই ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতাশালী রাজারাও নগণ্যের মধ্যে।

রক্ষণশীলতা বা গতানুগতিকতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চটির কোনো সুদূর সম্পর্কও নেই। বিদ্যাসাগরের চটি তাঁর তীব্র individualityরই প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। যে ব্যক্তি তাঁর নিজের লাইব্রেরির জন্য শখ করে বিদেশ থেকে বই বাঁধিয়ে আনতেন, ডাই-প্রিন্টেড খাম ও নামের কার্ড ব্যবহার করতেন, তিনি যে কারও চেয়ে কম শৌখিন ছিলেন তা মনে হয় না এবং কেবল বাইরে সারল্যপ্রকাশের জন্য তিনি চটিজুতো ব্যবহার করতেন না। কোনো ঢিলেমি বা স্বভাবশৈথিল্যের প্রকাশও তাঁর পোশাকের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত না। কৃষ্ণকমল বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বরাবর চেয়ারে বসিতেন ; কখনও ফরাসে বিছানায় বসিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" যিনি চেয়ারে ছাড়া, ফরাসে বসে গল্পগুজব পর্যন্ত করতেন না, তিনি যে ঢিলেমি বা লোক-দেখানো সারল্যের জন্য গায়ে একটা ফতুয়া ও চাদর এবং পায়ে তালতলার চটি পরতেন, তা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

স্বাতন্ত্র্যের নামে সমাজের মধ্যে যে উৎকেন্দ্রতার জোয়ার এসেছিল, বিদ্যাসাগর তাঁর ফতুয়া চাদর ও চটিজুতো দিয়ে সেই জোয়ার প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চটিজুতোকে তিনি এমন প্রাধান্য দিয়েছিলেন যে একসময় কলকাতা শহরে তা রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। চটিজুতোর সমস্যা রাজনীতির রঙে পর্যন্ত রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। Renaissanceএর individualityর সত্যিকার প্রতীক ছিল বিদ্যাসাগরের তালতলার চটি। ইয়ং বেঙ্গলের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এই স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্য অনেক। একটি স্বাতন্ত্র্য পরগাছার ফুল, আর একটি স্বাতন্ত্র্য এ দেশেরই বনজ সম্পদ, নূতন পরিবেশের আলোবাতাসে পরিস্ফুট।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে, বিদ্যাসাগরের আগে, এই অখণ্ড স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব আর কারো মধ্যে তেমনভাবে প্রকাশ পায় নি, একমাত্র রামমোহন রায় ছাড়া। রামমোহন রায়ের বিদেশ-যাত্রা ও মৃত্যুর পর, ইয়ং বেঙ্গল দলই নবযুগের জীবনমন্ত্রের প্রধান মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। নূতন সামাজিক চেতনাকে জাগ্রত করে তোলার ঐতিহাসিক গুরুভার তাঁদের উপরেই পড়ে। তাঁদের মধ্যে প্রতিভাবান্ ও শক্তিমান্ পুরুষের অভাব ছিল না। অভাব ছিল এই অখণ্ড ব্যক্তিত্বের, যার বিকাশ একমাত্র দেশের মাটিতেই সম্ভবপর। উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যা, প্রধানতঃ ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায়, সর্বসাধারণের চিন্তার ও আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, উচ্চশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা ইত্যাদি এমন কোনো বিষয় ছিল না, যা নিয়ে তখন আলোচনা হয় নি। বিদ্যাসাগর নিজে তাঁর ব্যক্তিগত চেতনা বা উপলব্ধি থেকে কোনো সমস্যা আবিষ্কার করেন নি। হঠাৎ কোনো রহস্যময় উৎস থেকে তিনি এই সব সমস্যা সমাধানের প্রেরণাও পান নি। বহু সমাজসচেতন ব্যক্তির মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। বহুজনের সঙ্গে তিনিও এইসব বিতর্ক ও আলোচনার খোরাক জুগিয়েছিলেন। ইতিহাসে কোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা-বোধ কখনো কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। সমাজচেতনায় তা তরঙ্গায়িত হতে থাকে, তবেই সমাজচেতন কোনো ব্যক্তির পক্ষে সে সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং সেই চিন্তাকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব হয়। বিদ্যাসাগরও ঠিক তাই করেছিলেন। এই সমাজচেতনা যদি সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়, তা হলে সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, এই সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের সংযোগস্থলে "ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের" উদ্ভব হয়। উনিশ শতকের

মধ্যভাগে, বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনার সংযোগের ফলে, নবযুগের বাংলার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। তিনিই প্রথম সেই সমাজচেতনাকে, প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, social reality-তে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার জন্য বাইরের সামাজিক অবস্থাও তখন অনেকটা তৈরি হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের যুগ ছিল ডালহৌসির যুগ। ডালহৌসির যুগকে বলা হয়, conquest, consolidation ও development-এর যুগ। রেলপথ ও টেলিগ্রাফ নির্মাণ, দু পয়সার ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন, নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন, সবই কিন্তু নূতন গতিশক্তির উপকরণ। ১৮৫৩ সালে ডালহৌসি তাঁর বিখ্যাত 'রেলপথ প্রস্তাব' খসড়া করেন। ১৮৫৬ সালের মধ্যে হাজার হাজার মাইল রেলপথ নির্মাণ শুরু হয়ে যায় এবং কোটি কোটি পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন এ দেশে খাটতে থাকে। ১৮৪৭ সালেও যে পাব্লিক ওয়ার্ক্স্ খাতে মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড গবর্নমেন্ট ব্যয় করতেন, ১৮৫৬ সালের মধ্যে সেই পাব্লিক ওয়ার্ক্স্ খাতে ব্যয়বরাদ্দ হয় ২৫ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় দশগুণ। এই পাবলিক ইন্‌ভেস্ট্‌মেন্টের ফলে দেশের income ও employment অনেকগুণ বেড়ে যায় (বিদেশীর মুনাফা আত্মসাৎ সত্ত্বেও), এবং সমাজ-জীবনে তার প্রকাশ হয় চাকুরিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কলেবরস্ফীতিতে। ১৮৫৬-৫৭ সালের মধ্যেই প্রায় বিশ লক্ষ যাত্রী রেলপথে যাতায়াত করে। চলমান লোকের সংখ্যা যেমন বেড়ে যায়, তেমনি চলার গতিও বাড়ে। পায়ে হেঁটে চলা, গোযানে চলা, পাল্কিতে চলা, নৌকায় চলা, আর রেলপথে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রবল বেগে চলার মধ্যে যুগান্তকারী পার্থক্য আছে। বাংলার সমাজ-জীবনে যে সময় এই নূতন গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়, নূতন চলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রসার হয়, ঠিক সেই সময় বিদ্যাসাগর তাঁর প্রত্যক্ষ সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। আজ তার শতবর্ষ পূর্ণ হল। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এ দেশে প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ দেন বিদ্যাসাগর, কলকাতা শহরে। ১৮৫৬-৫৭ সালে তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্কুল স্থাপন করতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। সমাজ-জীবনের চারি দিকে যে নূতন গতিশীলতার বিচিত্র প্রকাশ হয়, বিদ্যাসাগর সেই গতিশীলতার প্রতিমূর্তি হয়ে কর্মজীবনে অগ্রসর হন। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের আর-এক বৈশিষ্ট্য হল এই dynamism, এই গতিশীলতা।

সামাজিক দিক ছাড়াও, আরও অন্যান্য দিক থেকে বিদ্যাসাগর-চরিত্র বিশ্লেষণ করা যায়। তার মধ্যে 'ধর্ম' হল একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তাঁর চরিত্রের আর কোনো দিক বোধ হয় এরকম দুর্ভেদ্য রহস্যজাল বিস্তার করতে পারে নি। এত পরস্পর-বিরোধী জল্পনা-কল্পনাও হয় নি তাঁর জীবনের আর কোনো দিক নিয়ে। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা ধর্ম ও ঈশ্বর-বিষয়ে তাঁর গম্ভীর স্তব্ধতায় বিমূঢ় হয়ে গেছেন, তার তল স্পর্শ করতে পারেন নি। তাই কেউ বলেছেন তাঁকে নাস্তিক, আবার কেউ বলেছেন সংশয়বাদী। কি যে তিনি তা শেষ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেন নি। বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কি না, করলেও কি দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতেন? ধর্মের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা ছিল কি না, থাকলেও সে ধর্মের স্বরূপ কি ছিল? বিদ্যাসাগরের জীবনের এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত জটিল এবং এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন হলেও,

সামাজিক জীবনে তার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী বলে, তার সামাজিক গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। আজ পর্যন্ত এসব প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর কেউ দেন নি।

বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমল বলেছেন :

> বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্যপরিহাস করিতেন! ললিত সে সময় যেন কতকটা যোগসাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন: 'হ্যাঁরে ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি?' ললিত উত্তর দিতেন: 'আছে বৈকি! আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকবে না তো, থাকবে কার?' বিদ্যাসাগর হাসিতেন।

বিদ্যাসাগর পরলোকে বিশ্বাস করতেন না বলে কৃষ্ণকমল কেন তাঁকে নাস্তিক বলেছেন জানি না। পরলোকে বিশ্বাস না করলেই যে নাস্তিক হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বিদ্যাসাগর অবশ্য ইহলোকেই বিশ্বাস করতেন, পরলোক মানতেন না। তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও কাহিনী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে একটি কাহিনীর উল্লেখ করছি। কাহিনীটি শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা থেকে সংকলিত। একবার বিশেষ কোনো কারণে বিদ্যাসাগরকে প্রত্যহ তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত করতে হয়। সেই বাড়ির বাইরের বারান্দায় একদিন তাঁর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। বন্ধুর কাজকর্ম সেরে তিনি বারান্দায় বসে, মুড়ি খেতে খেতে, তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন। বিদ্যাসাগর সভা-সমিতিতে যেতে পারতেন না বটে, কিন্তু মানুষ পেলে চমৎকার আসর জমিয়ে গল্প করতে পারতেন। বালকদের সঙ্গেও। তিনি বসে গল্প করছেন, এমন সময় এক বাঙালি খৃস্টান পাদ্রি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বালকদের লক্ষ্য করে salvation সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন এবং যীশু ভজ্‌লে কি ভাবে যে salvation সম্ভব, তাও বোঝাতে লাগেন। কিছুক্ষণ বক্তৃতা শুনবার পর, বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেন, "ওদের ছেড়ে দিন, আমার কাছে আসুন। ওরা নিতান্ত বালক, ওদের salvationএর কথা চিন্তা করার এখনও অনেক সময় আছে। আমি বুড়ো হয়েছি, আজ বাদে কাল মরব, আমাকে পরলোক ও salvationএর কথা বোঝান, কাজ হবে।" বৃদ্ধ হলেও, একজন ভাবী convert পাওয়া গেছে ভেবে, বাঙালি পাদ্রি সাহেব সোৎসাহে বিদ্যাসাগরের কাছে লেক্‌চার দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে তিনি অভিশাপ দিতে দিতে চলে যান।

স্বর্গলোক, পরলোক ইত্যাদি সম্বন্ধে এই ধরনের কঠোর ব্যঙ্গোক্তি বিদ্যাসাগর কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে করতেন। তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে তিনি ইহলোক ছাড়া আর কোনো 'লোকে' বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তাতেও তাঁর নাস্তিকতা প্রমাণ হয় না। সারাজীবন তিনি চিঠিপত্রের শিরোনামায় "শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং", "শ্রীশ্রী হরি শরণং" লিখেছেন। নিতান্ত লোকাচারের দাস হয়ে, তিনি তাঁর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে এ কথা লিখেছেন, তা মনে হয় না। সুতরাং তাঁকে নাস্তিক বলা যায় না। তা হলে তিনি কি?

ইটালীয় রিনেস্যান্সের নূতন মানুষের ধর্মভাব প্রসঙ্গে বার্থাট লিখেছেন :

> These modern men . . . were born with the same religious instincts as other Mediaeval Europeans. But their powerful individuality made them in religion, as in other matters, altogether subjective.

বিদ্যাসাগরের ধর্মভাব সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। তাঁর ধর্ম, তাঁর ঈশ্বর, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। বাইরের সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে, তিনি তাঁর ধর্ম ও ঈশ্বরচেতনাকে নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছিলেন। বাইরের সমাজে যখন ধর্মের নামে অধর্মের বন্যা বইছিল, তখন ধর্ম নিয়ে সামাজিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া তিনি নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করেছিলেন। ধর্মের বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ আন্দোলন করে মানুষকে যে ধর্মের মোহমুক্ত করা যায় না, এ সত্য বাংলার বিদ্যাসাগর এ যুগের অন্যতম বিপ্লবী দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের সমসাময়িককালে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই জীবনে একটিবারের জন্যও তিনি ধর্মবিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করেন নি! ঘরোয়া বৈঠকেও না। নবযুগের শক্তিমান্ মানুষের মতন তাঁর চিন্তাধারা ছিল ইহজগৎ-কেন্দ্রিক ও মানবকেন্দ্রিক। বালকদের বোধশক্তির বিকাশের জন্য যখন তিনি "বোধোদয়" লিখেছিলেন, তখন প্রথম কয়েক সংস্করণে তার মধ্যে 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই তিনি করেন নি। পরে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু সে ঈশ্বর "নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ"। বালকদের সাধ্য নেই এই সংজ্ঞা বোঝে। সেইজন্যই যে তিনি প্রথমে বোধোদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্বরূপ-ব্যাখ্যান করতে চান নি তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু যখন করলেন তখনও দেখা গেল, বোধোদয়ের প্রথমে "পদার্থ" বা "Matter", তার পরে "ঈশ্বর"। এই ইহজাগতিক মনোভাবের দিক থেকেও বিদ্যাসাগরকে রিনেস্যান্স-যুগের অদ্বিতীয় মানুষ বলা যায়।

মধ্যযুগের মানুষের কুলকৌলীন্য ও স্থাবর সম্পত্তির বদলে, নবযুগের মানুষের দুটি প্রধান অবলম্বন হল—"Money" ও "Intellect"— বিত্ত ও বিদ্যা। বিদ্যাসাগরের বিদ্যা ছিল, বিত্ত ছিল না। বিদ্যা যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সহায় হল এবং নবযুগের সমাজে যখন ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জোরে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাওয়াও সম্ভব হল (যা মধ্যযুগে সম্ভব ছিল না), তখন বিদ্যার বাণিজ্যিক বিনিময়েও সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে বিদ্যাসাগর কুণ্ঠিত হন নি। বিদ্যার বাণিজ্যিক বিনিময় বলতে তাঁর চাকরির কথা বলছি না, ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসায়ের কথা বলছি। তখন ব্যবসায়বুদ্ধি প্রায় প্রত্যেক কীর্তিমান্ পুরুষের মধ্যেই প্রবল ছিল। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, সকলে ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে বাণিজ্যবুদ্ধি ও বিদ্যাবুদ্ধির এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল। নবযুগের ঐতিহাসিক ধর্ম অনুযায়ীই ঘটেছিল, এবং এই দিক দিয়ে তাঁরা সত্যিকারের নবযুগের মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মধ্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য হল, তিনি বিদ্যা ছাড়া আর কোনো পণ্যের ব্যাবসা করেন নি। পণ্যপ্রাণ যুগে, প্রাণধারণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য, তিনি বিদ্যাকেই পণ্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন নবযুগের প্রকৃত "intellectual enterpreneur." সংস্কৃত প্রেস ও প্রেস-ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি, স্বাধীনভাবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর পরিচালনার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিবরণটি এই :

বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পারশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্বদাই উহার বাংলা পরিবর্তন করিতেন।...তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন— বুঝিতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন।— তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। বই লিখিয়া, ছাপাইয়া, লোকে ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে সমস্ত টাকা দিয়া

দিবেন। এই সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী তাঁহার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে ; ইহা এখনও বর্তমান আছে ;— কিন্তু উহার হিসাব রাখার নিয়ম খুব সুন্দর, যখনই যাও, আগের মাস পর্যন্ত যত বই বিক্রয় হইয়াছে তাহার হিসাব পাইবে এবং চাহিলেই তোমার যা পাওনা তাই দিয়া দিবে।

১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ যখন ত্যাগ করেন, তখন যে তিনি আদৌ বিচলিত হন নি তার কারণ, তখন তাঁর বই বিক্রির ব্যাবসা থেকে মাসিক আয় ছিল তিন-চার হাজার টাকা। তিনি জানতেন, অর্থসর্বস্ব এই সমাজে অর্থের জোর না থাকলে, স্বাতন্ত্র্য বা আত্মমর্যাদা রক্ষা করা কত কঠিন। তাই ১৮৪৭ সাল থেকেই তিনি স্বাধীনভাবে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যাবসা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর প্রখর বাস্তবচেতনা ও ব্যক্তিত্ববোধ থেকেই এই আধুনিক-যুগ-সুলভ জাগতিক বুদ্ধির বিকাশ হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের এই material স্তম্ভটিকে মজবুত রাখবার জন্যই কোনোদিন তিনি মধ্যযুগীয় বৈরাগ্য বা সাংসারিক উদাসীনতাকে প্রশ্রয় দেন নি। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর টিপিক্যাল 'নবযুগের মানুষ' ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের দয়াদাক্ষিণ্য, স্নেহ ভক্তি প্রীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো কথা আমি বলি নি, কারণ নবযুগের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচার-প্রসঙ্গে তা বলবার প্রয়োজন নেই। মাইকেল মধুসূদন একবার তাঁকে বিদেশ থেকে চিঠিতে লিখেছিলেন—"বাঙালি মায়ের মতন আপনার অন্তঃকরণ"। কিন্তু কেবল মায়ের মতন অন্তঃকরণ নিয়ে বিদ্যাসাগর "বিদ্যাসাগর" হতে পারতেন না, যদি-না মধুসূদন-কথিত আরো দুটি গুণ তাঁর থাকত—"the genius and wisdom of an ancient Sage" এবং "the energy of on Englishman." কেবল প্রাচীন ঋষিদের মতন জ্ঞান ও ইংরেজের মতন কর্মশক্তি নিয়েও বিদ্যাসাগর নবযুগের অদ্বিতীয় মানুষ হতে পারতেন না, যদি-না তাঁর চরিত্রে যুগসুলভ প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ, মানববোধ, সমাজ-চেতনা ও জাগতিক চেতনা প্রকাশ পেত। নবজাগরণের যুগের এই সমস্ত মহৎ গুণের সমাবেশ বিদ্যাসাগরচরিত্রে হয়েছিল বলেই, বিদ্যাসাগর বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষের আসন অধিকার করতে পেরেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবপ্রবর্তিত বিদ্যাসাগর-বক্তৃতামালার প্রারম্ভিক বক্তৃতা। ১৪ শ্রাবণ ১৩৬৩

জন্মশতবার্ষিকী

বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক

১৮৫৬ - ১৯২০

শ্রীঅমল হোম

লোকমান্য টিলকের জন্মের পর একশত বৎসর পূর্ণ হইল। তাঁহার মৃত্যুর পরও ছত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই দূরত্বের ব্যবধানে তাঁহাকে তাঁহার সমসাময়িক রাগবিরাগ হইতে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখা একান্ত সহজ না হইলেও নিতান্ত অসম্ভব নহে। অজস্র স্তুতি ও অযথা নিন্দা দুইই তাঁহার জীবনকালে ও পরে দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে আবিল করিয়াছে। আজ কিন্তু তাঁহার বিরাট মূর্তির পাদপীঠে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে তাকাইয়া দেখি, কালের কষ্টিপাথরে তাঁহার ধারণা-ভাবনা, তাঁহার কর্মকৃতি নানা মিশ্রণেও যে সোনার রেখা টানিয়াছে, শতাব্দীর প্রান্তেও তাহা দেদীপ্যমান এবং ভাবীকালেও তাহার দীপ্তি ম্লান হইবার সম্ভাবনা অল্পই। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার জীবনের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের সত্য মূল্যায়ন এখনও অপেক্ষা করিতেছে বটে, তবুও এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে।

টিলক সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার কিছুটাও করিতে গেলে সকলের আগে মনে না আসিয়া পারে না— তাঁহার সহিত তাঁহার জন্মস্থানের একাত্মতা। পৃথিবীতে এমন একাধিক বড়লোক জন্মিয়াছেন যাঁহাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে তাঁহাদের জন্মস্থানের ছাপ যাহা ছিল, তাহা তাঁহাদের কোনো-কিছুই ছাপাইয়া উঠে নাই— সব-কিছুর মধ্যে মিলিয়া-মিশিয়াই ছিল। তাঁহাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না যে, তাঁহারা আর কোথাও জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন না। কিন্তু টিলকের জন্ম মহারাষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভব ছিল না। না কাঠিবাড়ের শান্ত সমাবেশে, না বাংলার কোমল-কান্ত পরিবেশে টিলকের আবির্ভাব কল্পনীয়। সহ্যাদ্রির শিখরে গিরিবর্ত্মে, তার উপত্যকার জলহীন ফলহীন কঙ্করখচিত বিরলশস্যক্ষেত্রে, তার কঠোর-জীবন পল্লীপ্রান্তরে মহারাষ্ট্রের যে দৃঢ়িষ্ঠতা, আত্মনির্ভরতা, তেজস্বিতা ও অকুতোভয়তা ভারত-ইতিহাসে তাহাকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে— চরিত্রে, বাক্যে ও কর্মে টিলক ছিলেন তাহারই প্রতিমূর্তি। যে-দার্ঢ্য মারাঠীকে কর্মঠ করিয়াছে, যে-কর্মকুশলতা তাহাকে ভাবালুতা হইতে মুক্তি দিয়াছে, যে-চিন্তাশক্তি তাহার বুদ্ধিকে বহুল পরিমাণে মোহমুক্ত রাখিয়াছে, যে-নিষ্ঠা তাহার চরিত্রে বলিষ্ঠতা আনিয়াছে— সে-সমস্তেরই প্রতীক ছিলেন টিলক। টিলককে বুঝিতে হইলে মারাঠী চরিত্রের সবলতা দুর্বলতা দুইই জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। মহারাষ্ট্র-রাষ্ট্রনীতিতে তাহার সবিশেষ প্রকাশ। মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের ইতিহাসের আলোচনার স্থান এখানে নয়— কিন্তু সে-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্যেই যে নীতি ও পরিণতি দেখিতে পাই, তাহাতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে মারাঠী-চরিত্রের বিশিষ্টতা। সে-চরিত্রে বেগ আছে— আবেগ নাই; আদর্শের দৃঢ়তা আছে— ভাববাদী দুর্বলতা নাই; চাতুর্য আছে— 'চতুরালি' নাই; বিচার আছে— 'চুলচেরা' তর্ক নাই; সংগ্রাম আছে— উদ্দেশ্য ও উপায়ের দ্বন্দ্ব নাই। যেমন মহারাষ্ট্রের শৈল-কান্তারের কাঠিন্য, তেমনি চিৎপাবন ব্রাহ্মণের অনমনীয়তা, মারাঠী-চরিত্রের সমুদয় বিশেষত্বই ছিল টিলকের মধ্যে সুপরিস্ফুট। টিলকের দেহে-মনে, ভাবে-কর্মে, ভাষণে-ভঙ্গীতে ছিল তাহার অনবদ্য প্রকাশ। তাঁহার মধ্যে একাধারে ছিল নিন্দা-অপবাদে অটল আদর্শবাদ ও সর্বসংশয়মুক্ত

বলবন্তরাও গঙ্গাধর টিলক

চিত্র কলিকাতা মহারাষ্ট্র-নিবাসের সৌজন্যে

উপবিষ্ট, বাম হইতে দক্ষিণে : লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর টিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, নরসিংহ চিন্তামন কেলকর
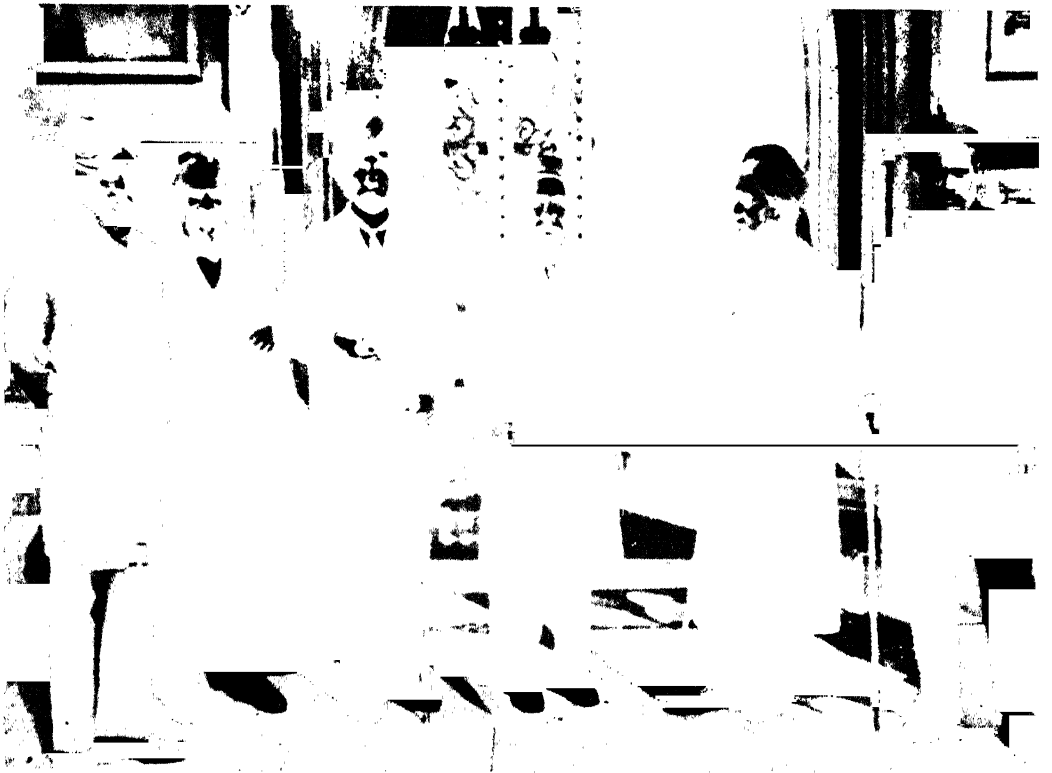
অচল কর্মসংকল্প। মারাঠার বীর্য তাঁহাকে দান করিয়াছিল বিপদে ধৈর্য, প্রত্যক্ষ নিষ্ফলতার মধ্যেও অসাধারণ কর্মোদ্যম, অনন্যসাধারণ চিত্তশক্তি ও সংযম। এই শক্তিই টিলককে আধুনিক ভারতের অদ্বিতীয় গণমানস-বোদ্ধা জননেতার আসনে অসামান্য প্রতিষ্ঠা দিয়াছিল। বলিতে গেলে, তিনিই দাক্ষিণাত্যে সর্বপ্রথম জনমনে পরাধীনতার অপমানগ্লানিবোধ জন্মাইয়া অনাস্বাদিত স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিলেন। ভারতের গণজাগরণে তিনি যে-শক্তির সৃষ্টি করেন, ভাবীকালে গান্ধিজী তাহারই উত্তরাধিকারে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় বলিয়া মনে করি না। ভারতের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে টিলক যে-বীজ বপন করিয়াছিলেন— তাহার ফসল-উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও সিদ্ধিতে গান্ধিজীর সহিত তাঁহার যে প্রভেদ-পার্থক্যই থাকুক-না কেন— সেই বপনক্ষেত্ররচনার প্রথম এবং প্রধান কৃতিত্ব টিলকেরই। তাঁহার সমগ্র জীবনের আরাধনা-সাধনা সেই প্রচেষ্টায় আরব্ধ ও সমাপ্ত।

ভারতের স্বাধীনতাস্পৃহাকে একটা ঐতিহাসিক বোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ ও মহারাষ্ট্রে টিলক সর্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যেমন দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া* কলিকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালী ছাত্রসমাজে আপন অলৌকিক বাক্‌বিভূতিসহায়তায় য়ুরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কাহিনী, ম্যাট্‌সিনীর মহৎ আদর্শবাদ ও গ্যারিবল্ডির অদ্ভুত কর্মপ্রচেষ্টা, 'ইয়ং ইটালী' ও 'নিউ আয়ারল্যাণ্ড'-এর স্বদেশ-উদ্ধারকল্পে আত্মোৎসর্গের কথার মাধ্যমে এক অভিনব ও উন্মাদিনী চেতনা জাগ্রত করিয়া, কংগ্রেসের জন্মের দশ বৎসর পূর্বেই, প্রথমে বাংলাদেশে ও পরে উত্তর-ভারতে দেশাত্মবোধ ও স্বদেশাভিমান সঞ্চারিত করেন— টিলকও তেমনি মহারাষ্ট্রে, কংগ্রেসের অভ্যুদয়ের দশ বৎসর পরে, নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে— নবীন য়ুরোপের ইতিহাসের দৃষ্টান্তে নয়, পুরাতন মারাঠা-ইতিহাসের অনুপ্রেরণায়— কেবল ধনী বা মধ্যবিত্ত সমাজে নয়, কৃষক শ্রমিক বণিক আপামরসাধারণের মধ্যে অপূর্ব প্রতিষ্ঠা ও নূতন অর্থ দান করেন।

ভারতবর্ষে শিবাজীর হিন্দুরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসের মূলে যে স্বাধীনতাস্পৃহা বিদ্যমান ছিল, মহারাষ্ট্র-ইতিহাসের সেই উদ্দীপনা টিলকের 'শিবাজী-উৎসব'প্রবর্তনে গত শতাব্দীর নবম-দশক-প্রান্তে ভারতের নব-উদ্বুদ্ধ স্বাদেশিকতাকে বহুল পরিমাণে প্রাণবন্ত করিয়াছিল। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, শিবাজীপ্রতিষ্ঠিত মারাঠাশক্তি জীর্ণদীর্ণ মোগলমহিমাকে ধূলিসাৎ করিয়া, দেশের শাসনভার প্রায় করতলন্যস্ত করিয়াই আনিয়াছিল এবং ইংরেজ এ দেশে না আসিলে দিল্লীর বাদশাহকে আপন ক্রীড়াপুত্তলিরূপে ব্যবহারব্যবস্থা একদা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভারতসাম্রাজ্যের তখত্‌-তাউষ আপনিই অধিকার করিয়া বসিত। কিন্তু হিন্দুপদপাদশাহীর সে-স্বপ্ন টিলকের মনে ছিল, এ কথা যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা তাঁহার ঐতিহাসিকবোধ ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি উভয় সম্বন্ধেই অনবগত— ইংরেজশাসকসম্প্রদায়প্ররোচিত ইতিবৃত্তকথার 'মিথ্যাময়ী' প্রচারে বিভ্রান্ত। ভ্যালেন্টাইন চিরল, ভার্নে লভেট— বিশেষভাবে চিরল— টিলকের যে-আলেখ্য তাঁহাদের কেতাবের পটে আঁকিয়াছেন, তাঁহার মতামত ও কর্মপদ্ধতির যে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বিদেশে, এমন কি এ দেশেও, টিলকের অপবাদীরা, বিশেষভাবে পতনপথযাত্রী পেশবা দরবারের ঐতিহ্যপন্থী পুণার ঈর্ষাপঙ্কিল ষড়যন্ত্রসংকুল রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ, তাঁহার সম্বন্ধে নানা সত্যমিথ্যার অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে

* ১৮৭৫-৭৬

টিলক বুঝি সত্যই শিবাজীসংকল্পিত হিন্দুসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তাঁহার কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। মহারাষ্ট্রে টিলকের 'শিবাজী-উৎসব'প্রবর্তনের মূলে সেরূপ কোনো মনোভাব বা মতবাদ কাজ করে নাই। প্রায় আটত্রিশ বৎসর পূর্বে পুণায় টিলকের বিশিষ্ট সহকর্মী পরলোকগত নরসিংহ চিন্তামন কেলকরের সহিত প্রবন্ধ-লেখকের এই প্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি বলেন যে, বহু বৎসর আগে, কংগ্রেসের আদিযুগে, সৈয়দ বদরুদ্দীন তৈয়বজী টিলককে প্রশ্ন করাতে টিলক স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে বলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও হিন্দুরাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা তাঁহার (টিলকের) নিকট আদৌ সমার্থবাচক নয়। ১৯১৬ সনে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনকালে মামুদাবাদের রাজাবাহাদুরের কৈসরবাগ প্রাসাদে এক ঘরোয়া বৈঠকে পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনীকুমার চন্দ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মহম্মদ আলি জিন্না, মোতিলাল নেহরু, আবদুল রসুল, সৈয়দ নবীউল্লা, মির্জা সামিউল্লা বেগের উপস্থিতিতে টিলককে যখন এই একই প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলেন যে, আজ যদি স্বয়ং বাজীরাও সে-উদ্দেশ্যে পুণায় আবির্ভূত হন, তবে তিনিই সর্বাগ্রে তাঁহাকে বাধা দিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"The Peshwa's role and rule are both ended and can never be revived. It will be mad and bad to think of it." সেখানে, বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের অনুচররূপে, টিলকের মুখে এই কথাগুলি শুনিবার সুযোগ লেখকের ঘটিয়াছিল।

'শিবাজী-উৎসব'প্রবর্তনে টিলকের মনে একটি বৃহৎ আশাই কাজ করিয়াছিল। সে-যাবৎকাল দেশে সর্বপ্রকারের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন—রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভারতবাসীর স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা-চেষ্টা—মুষ্টিমেয় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিতসম্প্রদায়ের উপরেই আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, দেশের আপামরসাধারণের চিত্ত কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধতা হইতে মুক্তি দিয়া সে-প্রয়াসকে গণমানসের বৃহত্তর ভূমিতে স্থাপিত করিতে না পারিলে যে ইংরেজের বজ্রমুষ্টি হইতে কোনো অধিকারই বিচ্যুত হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই, টিলক মর্মে মর্মে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই সেই demos বা গণদেবতার উদ্বোধন-অভিপ্রায়ে, জাতির রাষ্ট্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে, শিবাজী-মহারাজকে তিনি সিংহগড়ের ভগ্ন দুর্গকোণ হইতে পুণার মুক্ত প্রান্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচলিত 'গণপতি উৎসব'ও সেই একই ভাবনার ফল। কোনো একান্ত ধর্মানুগত সমাজে কোনো নূতন ভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্বদা তাহাকে ধর্মের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সে-ভাব সে-সমাজের মর্মকে স্পর্শ করিতে পারে না, এই কথাটি টিলক তাঁহার জনমানসজ্ঞাত অনুধাবনশক্তিতে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই গণপতি বা শিবাজী-পূজার মধ্য দিয়া তিনি স্বাদেশিক উদ্দীপনা জাগ্রত করিয়া গণচিত্তে এক নূতন ভাবের ও শক্তির সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হিন্দুত্ব বা হিন্দুরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য গুহাহিত ছিল এমন কথা বলা চলে না। তিনি পৌরাণিক গণপতি ও ঐতিহাসিক ছত্রপতি উভয়ের সংযোগে জাতীয় ভাবের নব প্রতীক রচনাপূর্বক গণমন্দিরে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশীয় সংগ্রামের নূতন ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই কথার উত্তরে শোনা যায়—মুসলমান যে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে যোগদান করে নাই তাহা এই কারণেই; হিন্দুর রূপক-প্রতীক পূজা-প্রকরণকে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্থান দিয়া একান্তভাবে হিন্দুধর্মের আশ্রয়েই যে-রাজনৈতিক কর্মধারার প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে মুসলমানকে আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বরাজ-সাধনায় পাই নাই। প্রত্যুত্তরে যদি বলা হয় যে, মুসলমানের একান্ত ধর্মীয় ব্যাপার তুর্কীর সুলতানের

'খালিফ'-শিরোপা বজায় রাখার আন্দোলনে হিন্দুর সর্বস্বপণ যোগদানে ধর্মের সহিত যখন রাজনীতির বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, তখন তাহার প্রতিবাদে কোনো মুসলমানের মুখে কোনোদিন একটি কথাও শোনা যায় নাই, তাহা হইলেই বিবাদ বাধে। কিন্তু সে তর্ক থাক্। টিলক-প্রসঙ্গে শুধু যেন এই কথাটি মনে রাখি যে, তাঁহার নিত্যসম্মুখগামী চিত্ত গণপতি বা শিবাজীকে অবলম্বন করিয়াই চলে নাই— সে-মেলা, সে-উৎসবকে আশ্রয় করিয়া তিনি 'হোম-রুল লীগ' আন্দোলনে (১৯১৪-১৫) বা লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯১৬) হিন্দুমুসলিম সোলেনামা সম্পাদন করেন নাই ; যুগধর্মের ও রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির সহিত তিনি তাঁহার কর্মপন্থার সমতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। টিলক-চরিত্রের এই বিশিষ্টতা বিশেষভাবেই অনুধাবনযোগ্য।

এই প্রসঙ্গেই টিলকের চরিত্রের ও তাঁহার ধারণা-ভাবনার আর-একটি দিকের আলোচনা আসিয়া পড়ে। রাজনৈতিক ব্যাপারে টিলক 'চরমপন্থী' হইয়া সামাজিক কার্যকলাপে রক্ষণশীলতা গ্রহণ করিলেন কেন ? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করি যে, টিলক রক্ষণশীল (conservative) হইলেও কোনো-দিনই সনাতনী (orthodox) ছিলেন না। তিনি মহারাষ্ট্রে 'অন্ত্যজ'-শ্রেণী সম্বন্ধে সামাজিক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু বার আপনার অভিমত স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান-গুলির সহিত চিরদিন ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিয়াছেন। গোঁড়ামি কোথাও টিলকের ধারপাশ দিয়া যায় নাই। হিন্দুয়ানির "লৌকিকাচারং মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ" উপদেশ তিনি জীবনে কোনোদিন পালন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। পুণায় তাঁহার 'গাইকবাড় ওয়াড়া' ভবনে লেখক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পাশে বসিয়া আহার করিয়াছেন ; তাঁহার পরিবারের মহিলারা আহার্য পরিবেশন করিয়াছেন ; তিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়াছেন ; ভিন্ন বর্ণের হস্তে প্রস্তুত আহার্য গ্রহণ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই ; অধিক কি, ইংরেজের গৃহে চা-পান করিয়া মহারাষ্ট্রের নামজাদা সমাজসংস্কারক, বাংলার ব্রাহ্মসমাজের দোসর বোম্বাইয়ের প্রার্থনা-সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে 'প্রায়শ্চিত্ত' করিয়া 'জাতে উঠিলে'ও, টিলক ইংরেজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া গোময়ভক্ষণে সম্মত হন নাই— জাতিচ্যুত হইবার আশঙ্কাতেও নয়। তাঁহার প্রথম-জীবনের একান্ত-আপন সহকর্মী বন্ধু আগরকার, তাঁহার গুরুতুল্য রাণাডে ও বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলঙ্কর প্রভৃতি মহারাষ্ট্রের সমাজসংস্কারকদের সহিত তাঁহার মতভেদের কারণ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি এ-বিষয়ে বাংলার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের ন্যায় জানিতেন ও মানিতেন যে, সমাজের অবস্থা-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রীতিনীতিও পরিবর্তনোপযোগী হইয়া পড়ে। কিন্তু যুগোপযোগী সামাজিক সংস্কার-সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াও বিদেশী-শাসিত রাষ্ট্রের আনুকূল্যে তাঁহারা কেহই তাহা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই টিলক সহবাসসম্মতি আইনে মত দিতে পারেন নাই, কিন্তু আপন পরিবারে গৌরীদান বা গ্রহণও করেন নাই। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেমন সম্ভবত বিধবা-বিবাহ-আইনের বিশেষ সমর্থক না হইয়াও আপন বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন, শুনিয়াছি টিলকও নাকি তাঁহার স্বজন-পরিবারের মধ্যেই ঐরূপ কোনো একটি বিবাহে আপত্তি করেন নাই। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় টিলকও মনে করিতেন, অনুকরণপ্রয়াসী সংস্কারচেষ্টা সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা পরধর্ম হইয়া উঠে। এই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নির্ধারণচেষ্টা না করিয়াও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের দেশের একাধিক সমাজসংস্কারক কেবলমাত্র বিদেশের সমাজের বহিরঙ্গ-প্রভাবেই স্বদেশের প্রাণস্রোতপ্রবাহিত রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন এবং

তাঁহাদের সে-সংস্কারচেষ্টার সহিত দেশের অন্তরের কোনো যোগ ছিল না বলিয়াই—তাহা শুধু আপামর-সাধারণের সহিত অকারণেই তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে।

ভারত-তত্ত্বে ও দর্শনে টিলকের গবেষণায় কি চিন্তাধারায় তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বিস্ময়কর। কোনো গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রচলিত মতবাদের আশ্রয় তিনি সে-ক্ষেত্রে কোথাও গ্রহণ করেন নাই। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আকাশপরিক্রমার অঙ্কপাতে তিনি বেদরচয়িতাদের যে আদিম বাসভূমি উত্তরমেরুতে নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক গৃহীত না হইলেও, সে-গবেষণার অভিনব মৌলিকত্ব সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছিল। ইংরেজ বেদজ্ঞ ম্যাক্সমূলার তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি অনুরাগেই, ১৮৯৮ সনে যখন রাজদ্রোহাপরাধে টিলকের প্রথম কারাদণ্ড হয়, তখন বিলাতে, তাঁহার বন্ধুদের সমর্থনে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদন জানাইয়া তাঁহার সত্বর মুক্তিলাভে সহায়তা করেন। গীতার 'অনাসক্তি'র ব্যাখ্যায় তিনি লোকশ্রেয়কেই একমাত্র নিষ্কাম কর্ম বলিয়া যে dynamic মানবধর্মকে শুদ্ধমাত্র আত্মমুমুক্ষুধর্মের উপরে আসন দিলেন, তাহা তাঁহার স্বাধীন চিন্তায় বলিষ্ঠ। তাঁহার তেজস্বী মনস্বিতা তাঁহার "গীতারহস্যে" দীপ্যমান। যখন মনে হয় যে, পঞ্চাশোর্ধ নিঃসঙ্গ এই মানুষটি স্বজন-পরিজন হইতে বহু দূরে, মান্দালয় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বসিয়া তাঁহার অপূর্ব গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন—তাঁহার ধারে কাছে না ছিল কোনো গ্রন্থাগার, না ছিল এমন একজনও কেহ যাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা বিষয়-বস্তুর উপর কোনো আলোকপাত করে—তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মনে হয়, গীতার যোগক্ষেম তাঁহারই মধ্যে মূর্ত হইয়াছিল।

এই স্থিতপ্রজ্ঞতাই টিলকের ঝঞ্ঝামথিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল অধ্যায়েই তাঁহার চরিত্রমহিমার সাক্ষ্য বারংবার বহন করিয়াছে। বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান কিছুই তাঁহাকে কোনোদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, কোনোদিন তাঁহার উন্নত ললাটে "ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।" ১৮৯৭ সনে রাজদ্রোহ-অভিযোগে যখন তিনি বিচারাধীন, তখন তিনি যদি তাঁহার 'অপরাধ' স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে মামলা তুলিয়া লওয়া হইবে, এ প্রস্তাব শুনিয়া টিলক বলিয়াছিলেন—"I am not prepared to do so. My position amongst the people depends upon my character; and if I am cowed down by the prosecution, I think, living in Maharastra is as good as living in the Andamans. We are all servants of the people. I shall be betraying them if I show a lamentable want of courage at a critical period."

এই অকুতোভয়তাই টিলককে জনগণের হৃদয়ে অসামান্য আসন দিয়াছিল। গান্ধিজীর বহুপূর্বেই তিনি ছিলেন "People's man"—দশের মানুষ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যথার্থই বলিয়াছিলেন—"Tilak rose out of the people, lived their life and was the embodiment of their genius. ...Essentially democratic, a divination of the mind and spirit of his people and their needs—these were the keynotes of Tilak's political genius." বহু বৎসরের নিঃস্বার্থ লোকসেবা টিলকের জন্য মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের হৃদয়মন্দিরে অক্ষয় স্বর্ণসিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্লেগের সময় যখন পুণার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় বহু বিখ্যাত ব্যক্তি রোগবিভীষিকায় শহর ছাড়িয়া পালাইলেন, তখন টিলক তাঁহার স্বেচ্ছাসেবকদল লইয়া গৃহে গৃহে

রোগার্তদের ঔষধ-পথ্য এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা দিনের পর দিন অসমসাহসে করিয়া চলিলেন— তাঁহার পত্নীর কাতর অনুনয়েও তিনি তাঁহার সন্তানসন্ততিদের পর্যন্ত পুণার বাহিরে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিকট টিলক কেবলমাত্র ভারতবিখ্যাত জননায়ক বলিয়াই পরিচিত ছিলেন না, তাঁহারা তাঁহাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্দিনের সহায় এবং দুঃখকষ্টে একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানিত। পুণায় তাঁহার বহির্বাটীর দৃশ্যটি মনে পড়ে। প্রাতে স্নানান্তে চন্দনচর্চিত-ললাট অনাবৃত-উত্তমাঙ্গ টিলক তাঁহার বিরলসজ্জ কক্ষটিতে একটি 'সাংখেরা' চারপায়ার উপর উপবিষ্ট— আর্ত-শরণাগতে, প্রার্থী-প্রত্যর্থীতে সেখানে তিলার্ধ স্থান নাই। শত রকমের শত আবেদন, পরামর্শ-প্রার্থনা; অসংগত অনুরোধেরও অভাব নাই। স্মিতহাস্য লোকমান্য অনুচ্চকণ্ঠে সকলের কথা শুনিতেছেন, সকলকেই যথাযোগ্য যুক্তি ও উপদেশ, আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিতেছেন— মাঝে মাঝে তাঁহার সেই দীপ্ত চক্ষু শিবের তৃতীয় নেত্রের মতো ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে—"two black diamonds pierced by flashes of gold; eyes to see through walls and hearts, to subdue animals—the eyes of a leader, a conqueror !"[১] জিতেন্দ্রিয় নিস্পৃহ নিরলস নিরভিমান কর্মযোগী টিলক, লোকহিতৈষী টিলক, দরিদ্রের সুহৃৎ টিলক, রাজদ্বারে ও শ্মশানে চিরবান্ধব টিলক সম্বন্ধে ভ্যালেণ্টাইন চিরল পর্যন্ত লিখিয়াছেন : "Tilak's indefatigable activity····· ·his philanthropy, his accessibility to high and low, his many acts of genuine kindness, the personal magnetism which···he exerted upon most of them who came in contact with him···combined to equip him more fully than any other Indian politician for the leadership of a revolutionary movement." —"Indian Unrest", London, 1910

চিরল শুধু একটি ভুল করিয়াছেন— অবশ্য সে ভুল ইচ্ছাকৃত। টিলক *revolutionary* ছিলেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—"He was by temperament incapable of a big jump. A spirit that would take what it gets and fight for the rest, cannot harbour that restlessness, that impatience which is at once the habit and instinct of a born revolutionary"—এবং ভারত-রঙ্গমঞ্চে যিনি সত্যই বিপ্লবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, টিলকের সেই সুহৃৎ ও সহকর্মী শ্রীঅরবিন্দ এই প্রসঙ্গে যে কথা লিখিয়াছেন— "Not revolutionary methods or revolutionary idealism, but the clear sight and the direct propaganda and action of the patriotic political leader, insisting on the one thing needful and the straightway to drive at it, had been the sense of Lokamanya Tilak's political career"— তাহা একান্ত প্রণিধানযোগ্য। Responsive Co-operation-এর মন্ত্রণাদাতা ও ব্যাখ্যাতার পক্ষে revolutionary হওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না।

টিলক-প্রসঙ্গে কোনো লেখা যত অসম্পূর্ণই হউক-না কেন— বাংলার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ-সম্পর্কের

---

১ ফরাসী কবি ও কথাসাহিত্যিক Theophile Gautier ফরাসী ঔপন্যাসিক Balzac-এর চক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়াছেন। —লেখক।

কথা কিছু না বলিলে তাহাতে বড় অসংগতি থাকিয়া যায়। প্রথমেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলি। সংবাদপত্রজগতে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে তিনি সত্যই গুরুর ন্যায় দেখিতেন এবং সর্ব ব্যাপারেই তাঁহার পরামর্শ-উপদেশ প্রার্থনা করিতেন। বহুবার তিনি বাংলাদেশে আসিয়াছেন কিন্তু একমাত্র শিশির-কুমারের গৃহ— 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-ভবন— ব্যতীত আর কোনো বাঙালীর গৃহে তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগের অন্ত ছিল না। তিনি চিরদিন তাঁহাকে আপন সহোদরের ন্যায় দেখিয়াছেন। বয়সে তিনি বিপিনচন্দ্রের অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন। ১৯১৮ সনে যখন টিলক হোম রুল লীগ ডেপুটেশনের নেতৃত্ব লইয়া বিলাতে যান, তখন বিপিনচন্দ্রকে তাহাতে যোগদান করিবার জন্য তিনি যে পত্র লেখেন, তাহার দু-তিনটি পংক্তি আমার মনে আছে…"and as regards outfit and out of pocket expenses *you* will, of course, need a little more than the rest of us. It will be arranged for." এই কয়টি কথার মধ্যে যে কৌতুকহাস্যোচ্ছল প্রীতি ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহা স্মরণযোগ্য। আত্মমতদৃঢ়প্রতিষ্ঠ বিপিনচন্দ্রের সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে টিলকের একাধিকবার মতান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু কোনোদিন মনান্তর হয় নাই। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহিত তাঁহার কতকগুলি বিষয় সমধর্মিতা থাকায় তাঁহাদের দুইজনের প্রগাঢ় সৌহার্দ ছিল। "সন্ধ্যা"র ও "কেশরী"র মুদী-মজদুর-বোধগম্য ঘরোয়া লিখনভঙ্গীতে, ধর্মীয় প্রতীক ও উৎসব-অনুষ্ঠানের সহায়তায় জাতীয় ভাব উদ্বোধনব্যাপারে টিলক ও ব্রহ্মবান্ধব সমভাবের ভাবুক ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সহিত টিলকের আত্মিক যোগের গভীরতা সমসাময়িক কালের ইতিহাসে প্রকাশিত নাই, ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে তাহা বহু চিন্তাধারা পুষ্ট করিয়াছে। কর্মক্ষেত্রে তাঁহারা সহচর হইয়াও একাধিক ব্যাপারে এক-পন্থী ছিলেন না— কিন্তু ভাবের জগতে বিপ্লবী অরবিন্দ ও বিদ্রোহী টিলকের যে একাত্মতা ছিল, গান্ধিজীর সহিত টিলকের বা শ্রীঅরবিন্দের তাহা কোনোদিনই ছিল না। টিলকের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের কী অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিবার মতো। ১৯২০ সনে টিলক যখন দেহরক্ষা করেন, লেখক তখন এলাহাবাদে মোতিলাল নেহরু-প্রতিষ্ঠিত ও তৎকালে বিপিনচন্দ্র পাল-সম্পাদিত "Independent" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। বিপিনবাবু অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় গিয়াছেন— এমন সময় টিলকের মৃত্যুসংবাদ আসিল। কাগজে টিলকের যথাযোগ্য তর্পণ করিবে কে? সহসা মনে হইল শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ করিলে কেমন হয়? তৎক্ষণাৎ পণ্ডিচেরীতে তাঁহাকে অনুরোধ জানানো হইল, যদি তিনি তারযোগে টিলক সম্বন্ধে দয়া করিয়া কিছু লিখিয়া পাঠান। ছয় ঘণ্টার মধ্যে একটি অনুপম রচনা "Independent"-আপিসে আসিয়া পৌঁছাইল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত টিলকের যোগাযোগ খুব বেশি না থাকিলেও, পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। ১৮৯৭-সনে টিলক যখন প্রথম রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত, বোম্বাই হাইকোর্টে তখন তাঁহার পক্ষ-সমর্থনের জন্য কৌঁসুলী পাওয়া দুর্লভ হইল— উকিল-মহলেও এমনি আতঙ্ক। টিলক কলিকাতায় শিশিরকুমার ঘোষ-মহাশয়ের নিকট অবস্থা জানাইলেন। কলিকাতা হইতে কৌঁসুলী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য "অমৃতবাজার পত্রিকা"-আপিসে পরামর্শসভা আহূত হইল। আমন্ত্রিতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। মতিলাল ঘোষ-মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, সভাকক্ষে শুভ্র-উত্তরীয় রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন— ললাটে তাঁহার রক্ততিলক! টিলকের জন্য কলিকাতার কৌঁসুলী-নিয়োগের ব্যয়নির্বাহার্থ চাঁদা তুলিবার

কাজে রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে যোগদান করিলেন। তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, চাঁদার জন্য তারকনাথ পালিত মহাশয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা না করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট গিয়া এক হাজার টাকা আদায় করেন। প্রায় সতেরো হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার দুই জন বিখ্যাত ইংরাজ ব্যারিস্টার— পিউ ও গার্থ সাহেবকে বোম্বাইয়ে পাঠানো হয়; তাঁহাদের 'জুনিয়র'-হিসাবে যান আশুতোষ চৌধুরীর ভ্রাতা ও সুরেন্দ্রনাথের জামাতা ব্যারিস্টার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। "কেশরী"র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দীর্ঘকাল চলিবার পর টিলকের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল (১৮৯৮)। এই ব্যাপারে সমস্ত দেশময় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইল, তাহা গভর্নমেণ্ট যাহা চাহিয়াছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত; দিকে দিকে প্রবল অসন্তোষ নানা ভাবে ছড়াইয়া পড়িল; সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে নূতন আইন রচিত হইল। এই আইন— Sedition Bill, 1898— পাশ হইবার পূর্বদিন কলিকাতার টাউন হলের প্রতিবাদ-সভায় রবীন্দ্রনাথ "কণ্ঠরোধ" নামে যে-প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা "রোষ-রক্ত গভর্নমেণ্ট···পুণা শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন," তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে।

মারাঠা ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ একাধিক কবিতা রচনা করিলেও শিবাজী সম্বন্ধে তিনি কিছু লেখেন নাই বলিয়া সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়[১] কবিকে অনুরোধ জানান যে, তিনি যেন কলিকাতায় শিবাজী-উৎসব উপলক্ষ্যে একটি ছত্রপতি-প্রশস্তি রচনা করেন।[২] ১৩১১ [১৯০৪] সনে রচিত 'শিবাজী-উৎসব' কবিতাটি, যতদূর মনে পড়ে, টাউন হলের সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন। কবির নিকট শুনিয়াছি যে, কবিতাটি দেউস্কর-মহাশয় মারাঠীতে তর্জমা করিয়া টিলককে পাঠাইলে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন যে তাঁহার কবিতাই "বঙ্গ-মারাঠারে এক করি দিবে বিনা রণে"।[৩] ১৩১৩ [১৯০৬] সনে শিবাজী-উৎসবে যোগদানের জন্য টিলক যখন কলিকাতায় আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার দেখা না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। সে-বৎসর উৎসব-মণ্ডপে, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের উদ্যোগে, ভবানীমূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা হয়।

---

১ এই মারাঠী ব্রাহ্মণ বাংলা ভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ "দেশের কথা" এককালে ইংরেজের শোষণনীতি উদ্ঘাটনে লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বাংলা মাসিক পত্রিকাতে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি কিছুকাল "হিতবাদী" পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন।—লেখক।

২ কবিতাটি প্রথমে দেউস্কর মহাশয়ের 'শিবাজীর দীক্ষা' (ভাদ্র ১৩১১) পুস্তিকার অন্তর্গত হইয়া প্রকাশিত হয়। অতঃপর মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত নবপর্যায় "বঙ্গদর্শন"-এর ১৩১১ আশ্বিন সংখ্যায়।—লেখক।

৩ 'শিবাজী-উৎসব' কবিতায় ছত্রপতির যে ভাবমূর্তি রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তী রচনায় তাহার রূপান্তর ঘটিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন (১৩১৬)—"শিবাজী যে হিন্দু সমাজকে মোগল-আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারগত বিভাগ-বিচ্ছেদ সেই সমাজেরই একেবারে মূলের জিনিস। সেই বিভাগমূলক ধর্মসমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা, ইহাই অসাধ্য সাধন। শিবাজী এমন কোনো ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই যাহা হিন্দুসমাজের মূলগত ছিদ্রগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে।···ভেদবুদ্ধিকেই মুখ্যত ধর্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া সেই শতদীর্ণ ধর্মসমাজের স্বারাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোনো মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নহে।"—"ইতিহাস", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪। টিলক রবীন্দ্রনাথের এই মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করিলেও অংশত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি মান্দালয় কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিয়াই (১৯১৪) ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানের একান্ত সহযোগিতা শুধু কামনাই করেন নাই, সেজন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এ কথা মনে করিবার কারণ আছে।—লেখক।

১৯১৭ সনে মিসেস বেসাণ্টের সভাপতিত্বে যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'-ভবনে "ডাকঘর" অভিনয় দেখিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতাকে নিমন্ত্রণ করেন। সে-অভিনয়ে টিলক, মিসেস বেসাণ্ট, গান্ধিজী ও মালবীয়াজী উপস্থিত ছিলেন।[১] অভিনয়ান্তে গান্ধিজী ও মালবীয়াজী চলিয়া গেলে পর, টিলক ও মিসেস বেসাণ্ট 'বিচিত্রা'র হল-ঘরের পাশের একটি প্রকোষ্ঠে বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। মনে আছে, বিদায়কালে টিলক রবীন্দ্রনাথের অভিবাদন-যুক্তকর তাঁহার হাত দুইখানির মধ্যে লইয়া কপালে ঠেকাইলেন।

হোম রুল লীগ ডেপুটেশন লইয়া টিলক যখন বিলাত-যাত্রার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, রবীন্দ্রনাথ যেন সে-সময়ে য়ুরোপে থাকেন। সে-সম্বন্ধে কবি তাঁহার "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"তে লিখিয়াছেন—

"...তখন লোকমান্য টিলক বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর কোনো এক দূতের যোগে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন আমাকে য়ুরোপে যেতে হবে। সে সময়ে নন্-কো-অপারেশন আরম্ভ হয় নি বটে, কিন্তু পোলিটিকাল আন্দোলনের তুফান বইছে। আমি বললুম, 'রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়ে আমি য়ুরোপে যেতে পারব না।' তিনি বলে পাঠালেন, আমি রাষ্ট্রিক চর্চায় থাকি, এ তাঁর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের যে-বাণী আমি প্রচার করতে পারি সেই বাণী বহন করাই আমার পক্ষে সত্য কাজ, এবং সেই সত্য কাজের দ্বারাই আমি ভারতের সত্য সেবা করতে পারি। আমি জানতুম, জনসাধারণ টিলককে পোলিটিকাল নেতারূপেই বরণ করেছিল এবং সেই কাজেই তাঁকে টাকা দিয়েছিল। এইজন্য আমি তাঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা গ্রহণ করতে পারি নি। তার পরে বোম্বাই শহরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে পুনশ্চ বললেন, 'রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ, সুতরাং দেশের কাজ করতে পারবেন— এর চেয়ে বড়ো আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশাই করি নি।' আমি বুঝতে পারলুম, টিলক যে গীতার ভাষ্য করেছিলেন সে কাজের অধিকার তাঁর ছিল— সেই অধিকার মহৎ অধিকার। ..হারুনা-মারু জাহাজ, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।"

বাংলার মনীষীদের সহিত টিলকের এই সব সংযোগ-সম্বন্ধের মূলে ছিল বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সহিত তাঁহার ভাব ও কর্ম-যোগ। সেই আন্দোলনে বঙ্গগোমুখীনিঃসৃত যে নব জাতীয়তার ধারা সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া সুষুপ্ত জাতিকে জাগ্রত করিয়াছিল, সেই সঞ্জীবনীপ্রবাহের সঙ্গে আপনার অপূর্ব সংগঠনীপ্রতিভায় টিলক যুক্ত করিয়াছিলেন— মহারাষ্ট্রের কর্মধারাকে। টিলকের সমর্থন-সহযোগিতা ভিন্ন বাংলার অরবিন্দ-রবীন্দ্র-বিপিনচন্দ্রের ভাবপুষ্ট নব জাতীয়তাবোধ কখনোই ভারতে প্রতিষ্ঠা পাইত না।

১ অভিনয়কালে লেখক রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে টিলক ও মালবীয়াজীর মাঝখানে বসিয়াছিলেন। তাঁহার উপর ভার ছিল যে অভিনয়প্রসঙ্গে তাঁহারা কিছু জানিতে চাহিলে যেন তাহার উত্তর দেওয়া হয়। পরলোকগত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের উপর ভার ছিল গান্ধিজী ও মিসেস বেসাণ্ট কিছু প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর দেওয়া। মালবীয়াজী, মনে পড়ে, শেষের দিকে ভাব-বিগলিত হইয়াছিলেন; তাঁহার চক্ষু সজল হইয়াছিল। টিলক নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মতো— দৃষ্টি অভিনয়মঞ্চের উপর স্থিরনিবদ্ধ। মিসেস বেসাণ্ট অতীব আগ্রহে অভিনয় দেখিয়াছিলেন। শেষ দৃশ্যে সুধা যখন ফুল লইয়া আসিয়া বলিল—'অমলকে বোলো সুধা তাকে ভোলে নি, তখন মিসেস বেসাণ্ট ডাক্তার মৈত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "What did she say?" দ্বিজেন্দ্রবাবু উত্তর দিলে মিসেস বেসাণ্ট বলিলেন, "You have exactly the same idea in Browning's 'Evelyn Hope". গান্ধিজী মনোযোগ-সহকারে অভিনয় দেখিয়াছিলেন— কোনো কথা বলেন নাই।—লেখক।

লোকনায়ক টিলক, বেদজ্ঞ গীতাব্যাখ্যাতা টিলক, আত্মত্যাগী নিষ্কাম কর্মযোগী টিলক, প্রীতিপরায়ণ বন্ধু টিলক, আদর্শ গৃহী টিলক— কিন্তু তাঁহার যে-মূর্তিটি লেখকের চক্ষুর সমক্ষে বারংবার উদ্ভাসিত হয়, তাহার বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন বিখ্যাত ইংরাজ সাংবাদিক হেন্‌রী নেভিনসন তাঁহার সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞ-বর্ণনায় (১৯০৭)—

"On the next day when Congress met and Tilak was refused permission to move his amendment, he rose from the platform and with folded arms faced the audience. On either side of him, young Moderates sprang to their feet; violently gesticulating vengeance, shaking their fists and yelling to the air, they clambered to hurl him down the steps of the platform. Behind him, Dr. Ghosh mounted the table and ringing an unheard bell harangued the storm in shrill, agitated, unintelligible denunciation. Restraining the rage of Moderates......Gokhale stood beside his old opponent, flinging out both arms to protect him from the threatened onset. But Tilak asked for no protection. He stood there with folded arms, defiant, calling on violence to do its worst, calling on violence to move him, for he would move for nothing else in hell or heaven. In front, the white clad audience roared like a tumultuous sea".
—"The New Spirit in India", London, 1908.

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

১৮৫৫ - ১৯১৮

শ্রীঅজিত দত্ত

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার সঙ্গে আধুনিক বাঙালি পাঠকের খুব বেশি পরিচয় ঘটে নি। অথচ তাঁকে উল্লেখযোগ্য কবিরূপে গণনা করা চলে। কতকগুলি বিষয়ে এঁর রচনা অনন্যসাধারণ। স্বভাবত কাব্যপ্রিয় বাঙালি পাঠকসমাজে এই কবির স্বল্প পরিচয় তাই বিস্ময় জন্মায়। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এরূপ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ঢাকা জেলার ভাওয়াল-গ্রাম-নিবাসী এই কবি বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে বহু দূরে থেকে যে কাব্যরচনা করেছিলেন, তা সহজে ও স্বাভাবিকভাবে কলকাতার রসজ্ঞ পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করবার অথবা রসিক পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোনো সুযোগ পায় নি। দ্বিতীয়ত, তাঁর কবিতা আঙ্গিকের দিক থেকে অত্যন্ত সেকেলে। ভাষার আধুনিকতা ছন্দ ও মিলের বৈচিত্র্য বা নূতনত্ব তাঁর কবিতায় দুষ্প্রাপ্য— একেবারে নেই বললেও চলে। বহিরঙ্গের দিক থেকে মধ্যযুগের বাংলা কবিতার সঙ্গেই তাঁর রচনার সাদৃশ্য দেখা যায়। মিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে গতানুগতিক, কর্ণতৃপ্তিদায়ক মোটেই নয়। এক-একটি দীর্ঘ কবিতায় একই মিল আগাগোড়া ব্যবহৃত হয়েছে, যা অননুসন্ধিৎসু পাঠককে প্রথমেই বিমুখ করে। ধৈর্যশীল সন্ধানী রসজ্ঞ পাঠক ভিন্ন অন্যের পক্ষে গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার রসাস্বাদন সহজ নয়।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার পাঠকগোষ্ঠী সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল সত্য, কিন্তু সেই গণ্ডির মধ্যে তাঁর অনুরাগী পাঠকসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। এঁর প্রায় সকল বইয়েরই একাধিক সংস্করণ হয়েছিল, কয়েকটি বইয়ের তিনটি করে সংস্করণও হয়েছিল। নিতান্ত বিশেষত্ব-বর্জিত হলে এ-রচনাবলীর এরূপ সমাদর হওয়া সম্ভব ছিল না। কবি এবং তাঁর অন্তরঙ্গ ও অনুরাগী পাঠকসমাজের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার কাব্যজগৎ থেকে গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী এখন আর পাওয়া যায় না। দু-একটি পাঠ্যপুস্তকে, প্রায়ই খণ্ডিত আকারে, দু-একটি কবিতা তাঁর রচনার সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় বজায় রেখেছে, কিন্তু এ-সব উদ্ধৃতি থেকে তাঁর কবিতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না।[১]

২

গোবিন্দচন্দ্র দাস রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং অগ্রজ। বাংলা কাব্যে আধুনিক ভাষা ভাব রুচি ও চিন্তার প্রবল অভ্যুদয়ের সেই যুগে গোবিন্দচন্দ্র দাস তৎকালীন আধুনিকতা থেকে দূরে ছিলেন। তাঁর ভাষা প্রায় মধ্যযুগীয়, আর রুচিও তাই— উভয়ক্ষেত্রেই ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব স্পষ্ট। গোবিন্দ দাস যে আধুনিকতা-আন্দোলনের কেন্দ্র থেকে দূরে ছিলেন, শুধু তাই এর একমাত্র কারণ নয়; আরো এক বড় কারণ এই যে তিনি 'উচ্চশিক্ষিত' ছিলেন না। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অধিকার ছিল না বললেই হয়, এবং সে

১ কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'গোবিন্দ-চয়নিকা' নামে একখানি সংকলনগ্রন্থ এই অভাব কিছু পরিমাণে দূর করেছে।

কারণে সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকের মত পাশ্চাত্ত্য ভাবভঙ্গি ও চালচলনের প্রতি একটা বিরাগই তাঁর ছিল। পাশ্চাত্ত্য আদর্শ ও ভাবধারা তিনি হৃদয়ংগম করেন নি বলে ইংরেজি প্রভাব বলতে তিনি সাহেবিয়ানা বুঝতেন। নানা কবিতায় ছড়ানো ইংরেজি বুকনির ছিটেফোঁটা দেখলেই এঁর স্বল্পবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত হালচাল বা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে নি, বরং বিজাতীয় রীতিনীতির প্রতি যে তাঁর বিরাগ ছিল, সাহেবিয়ানা ও মেমসাহেবিয়ানার প্রতি অজস্র বিদ্রূপোক্তিতে কবি নিজেই তা প্রকাশ করেছেন। 'কুঙ্কুম' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের প্রতি কবির মনোভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট।

কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম ?
আশা, চিন্তা, সুখ— সব, যত কিছু— অভিনব,
দেশময় নূতনের জবর-জুলুম !
যাহারা পুরানা দল, সকলেই বেদখল,
নাহি আর আগেকার সে ভারত-ভূম !
তোমারো সে দিন নাই, কপালে পড়েছে ছাই,
কামিনী কৌতুকে পরে 'ক্যানেঙ্গা' কুসুম !
লেভেণ্ডার ম্যাকেসার, হুইট্ ব্রায়ার ওয়াটার,
পাউডার এসেন্সের মহা মরসুম !
কে আর তোমারে খোঁজে ? প্রমত্ত অটো-ডি-রোজে,
পারফিউমের দেশে পড়িয়াছে ধুম্ !
সর্বথা বিলাতী গন্ধ, ভারত করেছে অন্ধ,
কে আর তোমারে ভালবাসিবে কুঙ্কুম ?

৩

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায় ইতস্তত ছড়ানো দু-চারটি ইংরেজি শব্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব তাঁর কাব্যে কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তো ছিলই না, এমন কি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, আদর্শ, ভাব ও ভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত সমসাময়িক কবিগোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল না। তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎস ছিল দুটি। প্রথমত, তার দুর্দমনীয় আবেগ— যে আবেগ শিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শে মার্জিত বা সংযত হবার সুযোগ পায় নি, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছোট-বড় সামাজিক, সাংসারিক ও পারিবারিক নানা ঘটনা, যা তাঁর মনকে সাময়িক-ভাবে আলোড়িত করেছিল। কবিতায় সমসাময়িক ঘটনাবর্ণনে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র দাসের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ-সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়।" গোবিন্দ দাস যে অনুরূপ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ও সামাজিক ঘটনা থেকেই অধিকাংশ কবিতার বিষয় সংগ্রহ করেছেন, তা তাঁর কবিতার নামগুলির থেকেই প্রতীয়মান

হবে। যেমন, বিবাহোপহার (একাধিক), নববর্ষ (একাধিক), কৃষ্ণদাস পাল, দেব-নিবাস (কোনো সম্ভ্রান্ত বান্ধবের বাস-ভবন অবলম্বনে), পরিমল দত্ত (নামকরণোপলক্ষে), মধুপুর, বঙ্কিমচন্দ্র, কার্ত্তিকপূজা, চীন-জাপান-যুদ্ধ, ভোলাবাবু ঘুম যায়, বিক্রমপুরে বসন্ত, ভাওয়াল-রাজদুহিতা প্রভৃতি। যে-সব কবিতায় নাম থেকে বিষয়বস্তু প্রকট নয়, তারও অধিকাংশই কোনো সাময়িক ঘটনা অবলম্বন করে লেখা। দৃষ্টান্ত হিসেবে, তাঁর বিখ্যাত কবিতা অতুল, সারদা ও প্রেমদা প্রভৃতি কবিতার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে সমসাময়িক ঘটনাকে 'রসময়ী রচনার বিষয়' করে নেওয়ার কথা ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বলেছেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস সম্বন্ধে অবশ্য সে কথা খাটে না। ঈশ্বরচন্দ্রকে পারিপার্শ্বিক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা জুগিয়েছে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের উপকরণ। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র দাসের মধ্যে সেই অসূয়াহীন তীক্ষ্ণ রঙ্গরসবোধ ছিল না, আবার শুধু হৃদয়াবেগকে আশ্রয় করে ক্ষণিকের অনুভূতিকে কাব্যের বিষয় করে তোলবার আধুনিক কৌশলও তাঁর জানা ছিল না। তাই পারিপার্শ্বিক ঘটনাকে আশ্রয় করেই তিনি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে, যেখানে এই-সব বিষয়ের সঙ্গে তাঁর স্বকীয় অনুভূতির প্রেরণা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেশে নি, সেখানে তাঁর কবিতা গতানুগতিক অলংকারময় বৈশিষ্ট্যহীন পদ্যে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন নামকরণ ও বিবাহোপলক্ষে লেখা বহু কবিতা তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে যা অত্যন্ত সাধারণ। তবু গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বভাবতই আবেগপ্রবণ কবি বলে তাঁর কাব্যে কবিত্বের পরিচয় পদে পদেই পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সঙ্গে বহিরঙ্গে তাঁর কবিতার মিল থাকলেও, এদিক থেকে বিচার করলে তিনি বৃহত্তর কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না।" এ মন্তব্য গোবিন্দচন্দ্র দাস সম্বন্ধে খাটে না। তাঁর স্বদেশী কবিতাগুলি এবং সমসাময়িক ঘটনার উপর লেখা বহু কবিতাতেই তাঁর তীব্র অনুভূতির পরিচয় মেলে। অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই যে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি তাঁরই লেখা।

> স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয় ;—
> এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হত যদি
> পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
>
> . . .
>
> স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এদেশ তোমার নয়,
> এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ি, এই যে পেলেস্— এই যে বাড়ি
> এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
> লাট বড়লাট তারাই সবে, জজ ম্যাজিষ্টর তারাই হবে,
> চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
> বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়!

৪

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর তীব্র প্রেমাবেগ বা passion। এরূপ প্রবল প্রেমাবেগ এ-যুগের কাব্যে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। গভীর আবেগে উৎসারিত তীব্র প্রেমানুভূতি সোজাসুজি প্রকাশিত হতে বাংলা কবিতায় খুব কমই দেখা গেছে। উনিশ শতাব্দীর কবিতায় সোজাসুজি

প্রেমের কবিতা— নিধুবাবুর গান বাদ দিলে— প্রায় নেই বললেই হয়। ভিক্টোরীয় যুগের কবিতা দ্বারা প্রভাবিত উনিশ শতাব্দীর কবিতায় প্রেমাবেগের তীব্র ও অসংকোচ প্রকাশ সম্ভব ছিল কি না তাই সন্দেহ। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র দাস ছিলেন এ-প্রভাব মুক্ত। মনের কথা অসংকোচে, এমন কি যথেচ্ছভাবে প্রকাশ করবার রীতি ঈশ্বর গুপ্তই প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু এ যথেচ্ছাচার প্রেমের কবিতায় তখনো সংক্রামিত হয় নি। তখনকার উচ্চশিক্ষিত, উন্নতরুচি, অতিমার্জিত সাহিত্যিকেরা প্রেমাবেগের নির্লজ্জ প্রকাশকে রুচিবিগর্হিত বলে মনে করতেন। গোবিন্দচন্দ্র দাসের শিক্ষাদীক্ষা, পরিবেশ বা সংস্কৃতি উচ্চস্তরের ছিল না। তাই আধুনিক যুগের রুচি ও শালীনতাবোধ তাঁর কাব্যে সংযম ও শৃঙ্খলা এনে দিতে পারে নি। আকারে বা আবেগে কোনোদিকেই তিনি তাঁর রচনাকে সংযত করতে জানতেন না। তাঁর অনেক কবিতাই দৈর্ঘ্যে অত্যন্ত বড়— সংযমই যে সাহিত্যের প্রাণ, এ সত্য তিনি শেখেননি। মনের সকল কথাই যে বলবার প্রয়োজন হয় না, কাব্যে অকথিত বাণী ইঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েই যে রসজ্ঞ পাঠকচিত্তকে বেশি আলোড়িত করে এ-ও তাঁর অজ্ঞাত ছিল। তাই আজকের বিচারে তাঁর অনেক কবিতাই রুচিবিগর্হিত, অমার্জিত ও অসংযত বলে মনে হতে পারে। তবু তাঁর স্বতঃ-উৎসারিত প্রেমের কবিতায় আবেগের আন্তরিকতা ও তীব্রতা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। আর এ কথাও মনে হয় যে, গভীর তীব্র তীক্ষ্ণ প্রেমানুভূতিকে এমন ঋজু ও বলিষ্ঠভাবে ও অসংকোচে প্রকাশ করতে খুব কম কবিই সমর্থ হয়েছেন। নীচের কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট হবে বলে আশা করি। গোবিন্দচন্দ্র যে ধরনের কবি তাতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ উদ্ধৃতি ছাড়া তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংসসহ,
অমৃত সকলি তার—মিলন বিরহ!
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেমকথা
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ!

. . .

আমি মহাকাম পতি,
সরলা সে মহারতি,
মরিলে মরণ নাই, নাহিক বিরহ!
অনঙ্গ অনঙ্গ রঙ্গে
সদা থাকে এক সঙ্গে,
সে আমার আমি তার মহা গলগ্রহ!

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংসসহ।
আজো তার ভস্ম ছাই
বুকে রেখে চুমা খাই,
আজো সে গায়ের গন্ধ বহে গন্ধবহ!

আজো তার প্রতিচ্ছায়া
ধরিয়া নূতন কায়া
স্বপনে আসিয়া করে সপত্নী কলহ !
—"আমার ভালবাসা", কস্তুরী

দিলে যদি সব দেও যা আছে তোমার
দেও রূপ রস গন্ধ, কি বিষাদ কি আনন্দ,
দেও তব হাসি অশ্রু শোক ভার ;
দেও কুল শীল মান, দেও আত্মা দেও প্রাণ,
দেও স্নেহ ভালবাসা ঘৃণা তিরস্কার,
যত নিন্দা যত গ্লানি দেও লো সমস্ত আনি,
দেও লো কলঙ্ক কীর্তি যা আছে তোমার !
দেও লো যৌবন জরা শত কথা ব্যথা ভরা,
দেও পাপ অনুতাপ পুণ্য পুরস্কার ;
দেও লো নরক স্বর্গ, জন্ম মৃত্যু চতুর্ব্বর্গ,
দেও ভূত ভবিষ্যৎ আলো অন্ধকার ;
নীলাম্বু সিন্ধুর বুকে, দেও ঢেলে শতমুখে,
মিশে যাই সুখে দুখে বুকে দু'জনার !

. . .

সরলা, তোমারে কহি, জহ্নু মুনি আমি নহি,
আমি যে করেছি পান নহে ফিরিবার !
আমি রাহু যারে গ্রাসি, আমি যারে ভালবাসি
জীবনে মরণে মুক্তি নাহিক তাহার !
—"নৃসিংহ," বৈজয়ন্তী

উপরে উদ্ধৃত দুটি কবিতা ছাড়া উলঙ্গ রমণী, সারদা ও প্রেমদা প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রেমের আন্তরিকতা পরিস্ফুট হয়েছে। কবির দুই বিবাহ ছিল। সারদার মৃত্যুর সাত বৎসর পর কবি প্রেমদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এই দুই প্রেমের আকর্ষণ কবি অতি মর্ম্মস্পর্শী আন্তরিকতায় ব্যক্ত করেছেন নিম্নোদ্ধৃত 'সারদা ও প্রেমদা' নামক কবিতায়।

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে
জীবন গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব সুন্দরী উষা, অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠেছে প্লাবিয়া !

সারদা যাইতে ডাকে, প্রেমদা ধরিয়া রাখে,
ঠেকেছি বিষম দায়—বিষম সংকটে,
কে হয় বেজার খুশি, কারে রুষি কারে তুষি,
এমন দারুণ দায় কারো নাকি ঘটে !

প্রেমদা পদ্মার কূলে কোমল শেফালি ফুলে
করিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই তীরে, আম কাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়।

নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয়-স্বামী, পানামা যোজক আমি,
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দু'জনার বাণে।

—"সারদা ও প্রেমদা", কস্তুরী

গোবিন্দচন্দ্র দাসের অন্য অনেক কবিতায় যেমন, এখানেও উপযুক্ত শিক্ষার অভাব দু-একটি অযোগ্য শব্দের প্রয়োগে পরিস্ফুট হয়েছে এবং কাব্যের রসকে খণ্ডিত করেছে। উপরের পংক্তিগুলির মধ্যে 'পানামা যোজক' উপমার প্রয়োগ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয়, তাঁর আবেগে যে আন্তরিকতা ছিল, তাঁর ভাষা যদি তদনুযায়ী সুশৃঙ্খল ও মার্জিত হত, তবে তিনি প্রকৃতই উচ্চস্তরের কবি বলে পরিগণিত হতে পারতেন।

৫

এ কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে তাঁর প্রায় সব কবিতারই বিষয় কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার গণ্ডির মধ্যবর্তী কোনো পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে সংগৃহীত। গোবিন্দচন্দ্র দাসের এমন কবিতা খুঁজে পাওয়া কঠিন যার প্রেরণা কবির কিংবা কবির বন্ধুবান্ধবের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে খুব স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান নয়। স্বভাবতই অনুমান হয়, কবির কল্পনাশক্তি খুব প্রখর ছিল না। এঁর কবিতার উপমাগুলি লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্ত আরো বলবৎ হয়।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের উপমা অনেক ক্ষেত্রেই আশ্চর্যরকম নতুন। যেখানেই কবি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত গতানুগতিক উপমা ব্যবহার না করেছেন, সেখানেই তিনি এমন নূতন ও আধুনিক উপমা ব্যবহার করেছেন যা তাঁর পরিচিত পরিবেশ থেকে সংগৃহীত। সর্বত্র অবশ্য এ নূতনত্ব সুখের হয় নি— যেমন উপরের 'পানামা যোজক'-এ দেখা গেছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব উপমা কেবল অভিনব নয়, অপূর্ব বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রেও কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতাই উপমার উপকরণ জুগিয়েছে এবং তাঁর কল্পনাশক্তির অভাব মিটিয়েছে তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। আশেপাশের খুঁটিনাটি জিনিস লক্ষ্য করে তাকে কবিতায় রূপান্তরিত করতে এ কবি প্রকৃতই দক্ষ ছিলেন। নীচের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে তাঁর ঘরোয়া এবং নিত্য চোখে দেখা জিনিসগুলিকে উপমায় ব্যবহার করবার অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে।

উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজালা
ভৈরবীর কাল কণ্ঠে মহাশঙ্খমালা।

—"শ্মশানে নিশান", প্রেম ও ফুল

একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে,
স্নেহময় সে চাহনি সে বন্ধন হায়,
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।

. . .

মায়ে পোয়ে হায় সেই শেষের বিদায়
গোধূলির কোল থেকে রবি অস্ত যায়!
চলে গেল রেলগাড়ী রেখে গেল ধূম
মলিন করিয়া মার জাগরণ ঘুম!

. . .

একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে
গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা সাগর ললাটে।

—"অতুল", কস্তুরী

কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচনায় মৌলিক উপমা কমই আছে— অধিকাংশই গতানুগতিক চিরাগত উপমা। তার মধ্যে বিশেষত্ব খুব বেশি নেই। গোবিন্দচন্দ্র দাসের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ তাঁর সহজ, অসংকোচ তীব্র ভাবাবেগ প্রকাশ ক্ষমতায়, ও অপূর্ব বর্ণনায়। অসাধারণ বর্ণনাশক্তির দৃষ্টান্ত হিসাবে 'অতুল' কবিতার ঘুমের বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য।

তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল।
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ।
নিরাশার নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে।
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল।
দিকবদ্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী।
অনন্ত শান্তির সুধা ভুঞ্জিছে সবাই,
একটি মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই,
চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুল্লি নিবিয়া নিবিয়া।

—"অতুল", কস্তুরী

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাঠক-সাধারণের অপরিচয়ের জন্যই এই উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োজন।

সব চেয়ে ভালবাসি শ্মশানে রমণী!
সে লাবণ্য অতিমুক্ত, পুণ্যযুক্ত জয়যুক্ত,

চৌদিক বেড়িয়া তার উঠে হরিধ্বনি !
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ, নাহি সুখ দুঃখে ক্লেশ,
নির্বাপিত প্রবৃত্তির প্রতিমা যেমনি।
অথবা তাহারি কাছে ব্রহ্মাণ্ড নিবিয়া আছে
জাগ্রত অনন্ত শক্তি আছে একাকিনী।
বুক ভরা অপরূপ যেন আলিঙ্গন স্তূপ
বিরাট বিশাল উচ্চ—স্পর্শে দিনমণি
যেন দিয়ে ক্ষুদ্র ধরা সে বুক গেল না ভরা
আরো চাহে কোটি বিশ্ব এমনি এমনি !

—"উলঙ্গ রমণী", কস্তুরী

শ্রাবণের শেষ দিন— মেঘে অন্ধকার,
দিনমান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ দেশ,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার
উলঙ্গ— এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল,
বিকট ভৈরব নাদে ছাড়িয়া হুংকার !
নিরখি সে ভীমছায়া, দিগন্ত বিস্তৃত কায়া,
ভয়ে যেন ব্রহ্মপুত্র গেছে মসী হয়ে,
আতঙ্কে কাঁপিছে বুক নাহি শান্তি একটুক,
তরঙ্গ তুফান তার ছুটিছে হৃদয়ে।
আজি তারা শশধর উঠেনি গগন-'পর,
অমর পেয়েছে ডর মরণের ভয়ে,
এমনি ভীষণ দৃশ্য, বুঝিবা ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব,
এখনি হইবে ধ্বংস মহান প্রলয়ে।

—"শ্মশানে নিশান", প্রেম ও ফুল

গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁর কাব্যের সরল ভাবাবেগে তাঁর নিকটবর্তী পাঠকসমাজকে তৃপ্তি দিতে পেরেছিলেন, এও কম কৃতিত্বের কথা নয়। এই পূর্ববঙ্গবাসী কবির রচনায় পূর্ববঙ্গের পল্লীপ্রকৃতি যেমন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, অন্য কোনো কবির রচনাতেই সেরূপ দেখা যায় না। পূর্ববঙ্গের ভাষাও ইনি প্রচুর ব্যবহার করেছেন, এবং এঁর রচনায় পূর্ববঙ্গেরও পল্লীসমাজেরও কিছু কিছু চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গোবিন্দচন্দ্র দাস বড় কবি বলে গণ্য হবেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে তিনি যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। এ-কবির রচনায় আবেগের তীব্রতা ছিল কিন্তু সংযম ছিল না; আন্তরিকতা ছিল কিন্তু শৃঙ্খলা ছিল না, বলিষ্ঠতা ছিল কিন্তু সৌষ্ঠব ছিল না। সেইজন্য কবিপ্রতিভার অধিকারী হয়েও তিনি উচ্চতর কৃতিত্ব, মহত্তর সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। তা হলেও, শিক্ষা সংস্কৃতি ও উন্নতরুচির অভাব সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় যে তিনি গতানুগতিক কবিতা থেকে অনেকটা ভিন্ন স্বাদ পরিবেশন করতে পেরেছিলেন—এও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

আলোচনা

" 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' শ্রীচৈতন্যলীলার ইঙ্গিত"

সন ১৩৬২ সালের (দ্বাদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা) শ্রাবণ-আশ্বিন বিশ্বভারতী পত্রিকায় ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার " 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' শ্রীচৈতন্যলীলার ইঙ্গিত " নাম দিয়া একটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন। নিবন্ধের মধ্যে কোনো যুক্তি নাই, এবং মনগড়া সিদ্ধান্ত আছে। অথচ পরলোকগত সম্পাদক মহাশয়ের নামে অপবাদ দিতে তিনি কোনো সংকোচ বোধ করেন নাই। লিখিয়াছেন—"এইরূপ স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিলে পুথির প্রাচীনত্বের দাবি টেকে না। তাই এই ব্যাখ্যাকে উড়াইয়া দিবার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে যথেষ্ট কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।"

তথাঁহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথী কূলে ॥

এই কবিতাটির বিমানবাবু স্বাভাবিক ব্যাখ্যা করিতেছেন—"শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সঙ্গে ভাগীরথীকূলের কোনো সম্বন্ধ নাই। সেইজন্য মনে হয় উদ্ধৃত অংশের রচয়িতা বলিতে চাহেন— 'নিতান্তই যদি ব্রজমণ্ডলের কোথাও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভাগীরথীকূলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানে খোঁজ কর। সেখানে না পাওয়া গেলে সাগরের কাছে সন্ধান করিও, কেননা শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীচৈতন্য সাগরে প্রায়ই যান। আর সেখানেও না পাইলে সকল লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিও, তাহা হইলে "সুধি পাইবে", সন্ধান বা তত্ত্ব পাইবে যেখানে জগন্নাথ বাস করেন। এই তোমাকে ভাগীরথীকূলের আদিলীলা ও জগন্নাথ ধামের অন্ত্যলীলা—'আদি অন্ত কথা সব কহিল তোমাতে' ॥"

এই ব্যাখ্যায় 'মনে হয়' কথাটি লক্ষণীয়। "সুধি পাইবে· ·যেখানে জগন্নাথ বাস করেন" ইহা নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা, প্রকৃত অর্থ— সেই জগন্নাথের (সেই জগন্নাথ যেখানে আছেন তাহার) সন্ধান পাইবে। এই কবিতায় নারদ মুনির সঙ্গে কানাইএর অবস্থিতির অনুমান করা হইয়াছে। নারদ মুনির সঙ্গে বৃন্দাবনলীলার সম্বন্ধ কি? "ভাগীরথীকূল" এখানে পবিত্র স্থান রূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের মানসগঙ্গাও হইতে পারে। "সাগরের ঘরে— সাগর গোয়ালের ঘরে" পরিষ্কার লেখা, তাহার অর্থ সমুদ্রতীর কি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা?

শ্রীরাধার আবির্ভাব-প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

"তে কারণে পদুমা উদরে। উপজিলা সাগরের ঘরে।" ২য় সং পৃ ৩
"আহ্মে কশ্যপ ঋষির কুঁয়র তোহ্মে সাগর কোঁয়রী।" ২য় সং পৃ ১৬৯

সুতরাং সাগর গোয়ালই কবির অভিপ্রেত। সমুদ্রের সঙ্গে ইহার কোনো সম্বন্ধ নাই।

জগন্নাথ ২, ১১, ৪২, ৪৬, ৬২, ৭৫ পৃষ্ঠায় আছে। জগন্নাথে ৬৮, ৯০, ৯১, ১০৩, ১০৮ পৃষ্ঠায় আছে। জগন্নাথের ১৬৩ পৃষ্ঠায় আছে। জগতের নাথ ৪৮, জগতনাথ ৭৩, জগতনাথে ১২৫ পৃষ্ঠায় আছে। এতগুলি পৃষ্ঠার কোনো স্থানে পুরীর জগন্নাথের এতটুকু ইঙ্গিত মাত্র নাই। সর্বত্রই জগন্নাথ— জগতের নাথ, জগদীশ্বর

এই অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। অকস্মাৎ নিজের গরজে রাধাবিরহ খণ্ডের জগন্নাথ—পুরীর জগন্নাথ হইবেন কেন? এইরূপে টানিয়া বুনিয়া অর্থ করা কি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা?

তোমার কারণে অবতীর্ণ হইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অথবা 'নিমেষেণ যুগায়িতং চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং' এই শ্লোকের ছায়া ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আধুনিক বলা নিতান্তই গায়ের জোরের কথা। প্রাচীনত্বের ছাপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সর্বাঙ্গে। উপাখ্যান, ভাষা, ছন্দ, রচনাশৈলী ইত্যাদি যে-কোনো একটি বিষয়ে তাহার আলোচনা করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। পুথির লিপিকাল তাহার শতাধিক বৎসর পরবর্তী। কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শ্রীচৈতন্যলীলার কোনো ইঙ্গিত নাই।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মূল প্রবন্ধলেখকের উত্তর

"ভাগীরথীকূল" (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ১ম সং, পৃ ৩৪০) শব্দটি শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সম্পাদক মহাশয় সেইজন্য প্রথম সংস্করণের টীকায় 'কূল'কে 'কুল' ধরিয়া লিখিয়াছিলেন "ভগীরথনামা (কোন) গোপগৃহে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে।" চতুর্থ সংস্করণের টীকায় ভাগীরথীকূলকে তিনি গোবর্ধনস্থ মানসগঙ্গার তীর ধরিয়াছিলেন। এখন শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণবাবু ভাগীরথীকূলকে কেবলমাত্র একটি পবিত্র স্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন। আলোচ্য পদটিতে রাধা বড়াইকে বাস্থলের ঘরে, যশোদার কোলে, যমুনার কূলে, যমুনার ঘাটে, বৃন্দাবনের তরুর উপরে, গোপগণের স্থানে ও সংকেতস্থলে শ্রীকৃষ্ণের খোঁজ করিতে বলিয়াছেন। এইগুলির প্রত্যেকটিই শ্রীকৃষ্ণলীলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; কোনটিই হরেকৃষ্ণবাবুর মতানুযায়ী ভাগীরথীকূলের মতন কেবলমাত্র সাধারণ অর্থে পবিত্র স্থান নহে। সেইজন্য পদটির ভাবের পৌর্বাপর্য রক্ষার জন্য বলিতে হয় যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে গঙ্গাতীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই কবি রাধার মুখ দিয়া তাঁহাকে ভাগীরথীকূলে সন্ধান করিবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথমেই (১ম সং পৃ ২) নারদের অবতারণা করা হইয়াছে; উহা অবশ্য হরিবংশের বিষ্ণুপর্বের প্রথম অধ্যায় ও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১।৬৪ শ্লোকের ভাব লইয়া। হরিবংশে যেখানে নারদকে "**তেজসা** জ্বলনাকারং বপুষা সূর্যবর্জসম্" বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি সেখানে "নাচ এ নারদ ভেকের গতী, বিকৃতবদন উমতমতী" বলিয়াছেন।

"জগন্নাথ" ও "সাগর" শব্দের অন্য অর্থ থাকিলেও, উহা প্রয়োগ করিয়া কবি শ্রীচৈতন্যলীলার ইশারা করিয়াছেন। মুখ্য অর্থ পরিহার করিয়া গৌণার্থে শব্দ প্রয়োগ কাব্যে ইঙ্গিতের বৈশিষ্ট্য।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

ওঅল্‌টার ডে লা মেয়ার

১৮৭৩ - ১৯৫৬

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

'আমি' ('Me') কবিতায় ডে লা মেয়ার একদা লিখেছিলেন :

যতদিন আয়ু আছে
আমি শুধু আমি হয়েই বাঁচব
আর কিছু নয়
কেবল আমি।
শেষে একদিন আসবে
যখন এই দেহ ছেড়ে যাব
তার সব ফুরিয়ে যাবে
আর তার অন্তরবাসী আত্মা
বিদায় নেবে।

Till the day come on
When I leave this body,
It's all then done,
And the spirit within it
Is gone.

সেদিন সত্যিই এল ১৯৫৬এর বাইশে জুন। তিরাশি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রতিদিনের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়তো তাঁর সামান্যই বিচ্ছেদবেদনা বেজেছে, কারণ প্রতিদিনের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগ খুব নিবিড় ছিল না। তাঁর নিত্যবিহার ছিল কল্পলোকের তীরে তীরে, ধরা-অধরার গোধূলি-আলোয়। যেখানে নিভৃত অরণ্যের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোয় পরীর দল কুয়াশার চাদর বিছিয়ে নামে, যেখানে লোকালয় থেকে বহুদূরে পোড়োবাড়ির মধ্যে বাদুড়েরা বাসা বাঁধে, যেখানে ম্লান চাঁদের আলোয় অশরীরী আত্মারা কারও প্রতীক্ষায় দিন গোনে, সেই সব নির্জন নিদমহলে রূপকথার এক জগতে ছিল তাঁর বাস। এই বাস্তব জগৎটাকে খুব বেশি সীমাবদ্ধ করে তিনি কখনো দেখেন নি। যদিই এর থেকে কিছু তাঁর ভালো লেগে থাকে—কোনো-একটি বুড়ো কৃষকের মন্থর মূর্তি, কোনো-একটি খোঁড়া কুকুর, কিংবা গ্রামের পথে হাস্যমুখর কোনো শিশুর দল—তাদের তিনি রূপকথার স্বপ্নময় রঙেই এঁকেছেন, বাস্তবের মোটা তুলিতে মোটা মোটা দাগে নয়। অতি বেশি বিজ্ঞের চোখ নিয়ে জীবনকে দেখবার মানুষ তিনি ছিলেন না। শিশুর মুগ্ধ সারল্যের মধ্যে যে পরম প্রবুদ্ধতা আছে, তাঁর ছিল সেই জ্ঞান।—

Now I know where the Rainbow ends
I know where there grows

ওঅল্টার ডে লা মেয়ার

১৮৭৩ - ১৯৫৬

A Tree that's called the Tree of Life
I know where there flows
The River of All-Forgottenness
And where the Lotus blows.

আজ আমি জানি কোথায় গিয়ে রামধনুটি শেষ হয়েছে,
কোথায় জন্মেছে সেই গাছ, যাকে বলে জীবনতরু,
কোথা দিয়ে বয়েছে বিস্মরণের নদী,
জানি কোথায় ফুটে ওঠে পদ্মফুলটি।

সেই সকল জানার পারে আজ তিনি পৌঁছেছেন হয়তো।

কবিবন্ধু উইলিয়ম হেন্‌রি ডেভিস বলতেন, ডে লা মেয়ারকে কোনো প্রশ্ন শুধিয়ে লাভ নেই, ও সর্বক্ষণ আপন জিজ্ঞাসাতেই মগ্ন। কবিদের সত্যিই জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। বিশেষ করে তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে। তাঁদের মনোভূমি তাঁদের বাইরের কাজের সঙ্গে সব সময় খাপ খায় না। তবু কোনো কোনো কবির জীবনী আলোচনা হয়তো সার্থক, তাতে তাঁদের কাব্যরসাস্বাদনে হয়তো সাহায্য হয়। শেলি বায়্‌রন বা উইলফ্রেড ওয়েন যেমন। কিন্তু ডে লা মেয়ারের জীবন বড়ই বাহুল্যবর্জিত, তাঁর চেতনার বর্ণলীলার কোনো স্পন্দন নেই সেখানে। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। শেক্‌স্পিয়রের বেলাও তো তাই।

তবে সংক্ষেপে হয়তো বলা দরকার যে ওঅল্‌টার জন ডে লা মেয়ার ইংলণ্ডের কেণ্ট্ প্রদেশের চার্লটন গ্রামে জন্মেছিলেন ১৮৭৩ খৃস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল। পূর্বপুরুষ ছিলেন ফরাসী প্রটেস্টাণ্ট বংশজাত, মা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের মেয়ে। সেণ্ট্ পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল স্কুলে পাঠ সাঙ্গ করে ষোলো বছর বয়সে চাকরির খোঁজে তাঁকে বেরোতে হয়। শেষে কেরানির কাজ পেলেন অ্যাংলো-অ্যামেরিকান তেলের কোম্পানিতে, তাদের লণ্ডন আপিসে। ছেলেবেলায় স্কুলে থাকতেই সাহিত্যচর্চার নেশা তাঁকে ধরেছিল, স্কুলের ছেলেদের নিয়ে এক মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। কেরানির কাজের মধ্যেও সে নেশা তাঁকে ছাড়ল না। অল্পস্বল্প গল্প কবিতা তিনি লিখে চললেন স্বনামে বেনামে। 'দি স্কেচ', 'পল্‌মল্ গেজেট' প্রভৃতি পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশ পেতে লাগল মধ্যে মধ্যে। ১৯০২ সালে বেরোল প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সঙ্স্ অভ্ চাইল্ড্‌হুড' (শৈশবের গান)। দু বছর পরে একটি বড় গল্প প্রকাশিত হল—'হেনরি ব্রকেন'। এ দুটি বইয়ে তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন 'ওঅল্‌টার রামাল'। এর পরে সে নাম আর তিনি ব্যবহার করেন নি।

১৯০৮ সালে ডে লা মেয়ার চাকরি ছেড়ে সাহিত্যসাধনায় একান্তভাবে মন দিলেন। সেই থেকে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে নানা সুন্দর সৃষ্টি তাঁর হাতে হয়েছে। সংখ্যায় তা হয়তো খুব বেশি নয়—বর্ষার ফুলের মতো ছোট ছোট কবিতা, তিনটি উপন্যাস, গুটি ষাটেক গল্প, কিছু সমালোচনা—কিন্তু মহৎ শিল্পীর প্রতিভা তাদের প্রত্যেকটি রচনাকেই দীপ্তি দিয়েছে। তাঁর শেষ গ্রন্থ 'প্রাইভেট ভিউ' সাহিত্যের সমালোচনা—১৯৫৩ সালে বেরোয়। কয়েকবার আমেরিকায় গিয়ে তাঁকে বক্তৃতাদি দিতে হয়েছে, তার

বেশি তিনি বাইরে বেরোন নি, ঘাসের শিসের ওপর শিশিরবিন্দু দেখেই তৃপ্তি পেয়েছেন। রচনাগুলিও তাঁর শিশিরবিন্দুরই মতো—ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল, ক্ষণিক হয়েও চিরন্তনের বার্তা জানায়।

সুদীর্ঘ তিরাশি বছরের এই সংক্ষিপ্ত আখ্যান নিশ্চয়ই অসার্থক। যে স্বপ্নাতুর চিরনিভৃতচারী মানুষটিকে তাঁর লেখার মধ্যে পাই, জীবনকাহিনীতে বৃথাই তাঁর সন্ধান করা।

তাঁর জীবন একান্ত তাঁরই, যদি তাঁর পাঠকেরা তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন সম্বন্ধে কৌতূহল বোধ করেন, একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে সে কৌতূহল চরিতার্থ করবার।—ফরেস্ট্ রীড

ডে লা মেয়ার কবিই। ছোটগল্প ও উপন্যাসগুলিতেও তাঁর কবিকল্পনাই প্রাধান্য পেয়েছে। অপূর্ব সুষমামণ্ডিত তাদের ভাষা, বোধ হয় একমাত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলার সঙ্গেই তার তুলনা চলে। কোথাও একটি অসতর্ক শব্দপ্রয়োগ নেই, নেই একটি বেসুর। ডে লা মেয়ার নিপুণ ভাষাশিল্পী।

কিন্তু তাই বলে অনাবিল কোনো সৌন্দর্যস্বর্গের মহিমা নেই গল্পগুলিতে। বরঞ্চ আছে দুঃখশোক-মৃত্যুর ছায়া। অতিপ্রাকৃতের ছোঁওয়া তাদের ঘিরে রয়েছে, কবরখানার হিম হাওয়া বয়ে গিয়েছে তাদের উপর দিয়ে।

তাতে ভয় বা আতঙ্ক জাগায় না। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'দি রিটার্ন্' বা 'প্রত্যাবর্তন'-এর কাহিনীই ধরা যাক। তার নায়ক আর্থার লফোর্ড্ ভাবুকগোছের মানুষ। একদিন বেড়াতে বেড়াতে সে এক গোরস্থানে এসে ঘুমিয়ে পড়ল এক সমাধির পাশে; সে সমাধি যার সে আত্মহত্যা করে মরেছিল। এই সুযোগে তার বুভুক্ষু আত্মা এসে ঘুমন্ত লফোর্ডের উপর ভর করল। কিন্তু সবটুকু অধিকার করতে সে পারল না। লফোর্ড্ জেগে উঠল, ঘরে ফিরে গেল। সেই থেকে তার মধ্যে দেখা দিল প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব—নিজের সঙ্গে অন্তরবাসী সেই প্রেতের। তার স্ত্রী ভাই বোন সবাই এক গভীর পরিবর্তন দেখতে পায় তার চোখে মুখে, কিন্তু কেউ জানে না তার বিক্ষুব্ধ অন্তরের কথা। অবশেষে প্রাণপণ চেষ্টায়, আর মেয়ে অ্যালিসের স্নেহের জোরেই লফোর্ড্ জয়ী হয়, মুক্ত হয় সেই প্রেতযোনির হাত থেকে। এ কাহিনী স্টীভেন্সনের 'ডক্টর জীকিল্ অ্যাণ্ড্ মিস্টার হাইড'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে হয়তো। কিন্তু দুটির সাদৃশ্য আপাত। 'দি রিটার্ন্'-এ অতিপ্রাকৃত অংশটুকু গৌণ। আসলে সকল মানুষের মধ্যেই এই চিরন্তন সংঘাত—'সু' এবং 'কু'-র টানা পোড়েন। কিন্তু ডে লা মেয়ার আরও দেখাতে চেয়েছেন যে, অতি সাধারণ দুর্বল মানুষও অমঙ্গলের প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায়, এবং জয়ীও হতে পারে।

অন্য একটি উপন্যাস 'মেময়র্স্ অভ এ মিজেট' বা একটি বামনের স্মৃতিকথা একরত্তি একটি মেয়ের আত্মজীবনীর আকারে রচিত। মেয়েটি এক বিঘত হয়েই রইল সারা জীবন, আর বাড়তে পারল না। সংসারে সকলের সঙ্গে তার সমান ঠাঁই হল না। লোকে তাকে কৌতূহলের চোখেই দেখে গেল। তারা তো বুঝল না যে তারাও ঠিক ওরই মতো কৌতূহলের বস্তু। সারা জীবনের শেষে মেয়েটি ভাবছে—

আমার কাজ আমাকে এও শিখিয়েছে—আগে যেমন নির্বোধের মতো আক্ষেপ করতাম আমার ছোট্ট, তুচ্ছ দেহের জন্যে, তা যেন না করি। ছোট মন, ছোট আত্মা তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ।

এ কাহিনীরও চার দিক ঘিরে রয়েছে অপরূপ ভাষার বুনন। অনুবাদে তার কিছুই তো মিলবে না। যেখানে মেয়েটি গল্প শোনে, কোথায় বরফে ছাওয়া পাহাড়ি দেশে তারই মতো ছোট্ট হালকা মানুষেরা বাসা

করে, আর তাদের জীবন চির-আনন্দময় বলে তাদের দেবতার কোনো নাম নেই; অথবা যেখানে ভোরের আলোয় পাখির গানের মধ্যে ব্ল্যাক্থর্ন্ গাছের নীচে ওঅল্টার পলক্-এর সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয়! কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই মোহময় পরিবেশের সঙ্গে মিশে আছে বিকলাঙ্গতা, আত্মহত্যা, কুশ্রীতার আভাস। পরীর সঙ্গে প্রেতের, জ্যোৎস্নার সঙ্গে মরণের মিলন ঘটেছে ডে লা মেয়ারের কল্পনায়। বিচিত্র তার রহস্য।

এই দিনরাত্রি-জন্মমৃত্যুর সংগম তাঁর ছোটগল্পগুলিরও পটভূমি। প্রধানত শিশুদের জন্যে এগুলি লেখা। শিশুরা তাঁকে বুঝতে পারে, ভালোবাসে। বোধ হয় তার কারণ তাদের চিত্তলোকও এই হিমকুহেলি দিয়ে ঘেরা, এবং জীবন-মরণের সীমানায় দাঁড়িয়ে তারা অবিচলিত, নির্ভয়। সেই 'দি রিড্ল্' (ধাঁধা) গল্পটিতে যেমন। সাতটি ছোট ছেলেমেয়ে তাদের দিদিমার সঙ্গে বাস করতে এল। দিদিমা তাদের অবাধ অধিকার দিলেন—যেখানে খুশি খেলা করো, বেড়াও। কেবল একটি জিনিস মানা—কোণের বড় শোবার ঘরটিতে, যেটায় ঐ ওক কাঠের মস্ত সিন্দুকটি রয়েছে, ওই ঘরে খেলা চলবে না। দিন যায়; ছেলেমেয়েগুলি মনের সুখে খেলা ক'রে বেড়িয়ে সময় কাটায়। কিন্তু তাদের কৌতূহল বাধা মানে না। নিষেধ অগ্রাহ্য করে তাদের এক-একজন কখনো কখনো সেই ঘরে যায়, সিন্দুকটার মধ্যে ঢোকে, আর চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়, আর ফিরে আসে না। এমনি ক'রে একে একে চলে যায় সাতটি শিশুই, আর তাদের বুড়ি দিদিমা বসে থাকেন—

> স্মৃতির কুণ্ডলী নিয়ে—কত হাসি, অশ্রু, কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, আজ যারা পুরোনো হ'য়ে গেছে, কত বন্ধুদের আগমন, কত সুদীর্ঘ বিদায়…।

এমনিধারা মায়ালোকের স্পর্শ তাঁর সব গল্পে—তিনটি বাঁদরের কাহিনী 'দি থ্রী মুলা-মুল্গার্স্', 'দি গ্রীন্ রুম' (সবুজ ঘর), 'ইন্ দি ফরেস্ট্' (অরণ্যে) অথবা 'দি আমণ্ড্ ট্রি' (বাদাম গাছ)। শৈশব, জরা, পাগল কোনো বুড়ো: কোন রঙ-চটা ছবি বা পোড়ো বাড়ি; বিগত দিনের আধো-ভুলে-আসা কোনো দুঃখ; এই-সব দিয়েই তিনি তাঁর আসর সাজিয়েছেন।

কবিতাগুলিতেও তাঁর এই একই সুর। উড়ো কল্পনা যেখানে সেখানে গিয়ে ভর করেছে ক্ষণিকের জন্যে, আবার ডানা মেলে দিয়েছে অনন্ত আকাশে। কোথায় শুকনো পাতার উপর তুষারের স্ফটিক জমে রয়েছে, কোথায় রবিন্ পাখির ছোট্ট চোখে অসীম বিস্ময়, কোথায় বুড়ো গাধা 'নিকলাস নাই' একমনে লেজ দুলিয়ে ঘাস খাচ্ছে, আর কোথায় ছোট্ট ছেলে ভাবছে—

> If I were king of Tartary
> Myself and me alone—
>
> হতাম যদি তাতার দেশের রাজা
> আমিই হতাম, নয়কো অপর কেউ।[১]

এ সব কিছুর মধ্যেই গভীর বিস্ময়ের সামগ্রী লুকিয়ে আছে, কারণ—

> No man knows
> Through what wild centuries
> Roves back the rose.

১ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী -কৃত অনুবাদ।

কেউ জানে না—
কত উদ্দাম শতাব্দী ধরে
ফিরে ফিরে আসছে গোলাপ ফুল।

আর তারই পাশাপাশি দেখতে পাই, জ্যোৎস্নারাত্রে বুড়ি মিসেস্ জিলের বাগানে পরীরা নেমে আসছে। বুড়ি সদ্য মারা গেছে, তাই নিয়ে তাদের ঠাট্টা—

Wont you look out of your window, Mrs. Gill?
Quoth the Fairy, nidding, nodding in the garden;
Cant you look out of your window, Mrs. Gill?
Quoth the Fairy, laughing softly in the garden;
But the air was still, the cherry boughs were still,
And the ivy-tod neath the empty sill
And never from her window looked out Mrs. Gill
On the Fairy, shrilly mocking in the garden.

জানালা খুলিয়া তাকাবে না কি গো মিসেস্ জিল্?
বাগান হইতে মাথা ঢুলাইয়া কহিল পরী;
জানালা খুলিয়া তাকাতে পার না মিসেস্ জিল্?
কহিল সে পরী স্নিগ্ধ হাসিতে বাগান ভরি;
বাতাস নিথর, চেরিশাখাগুলি কাঁপে না আর
জানালার নীচে লতাঝোপ, তাও থির নিসাড়
জানালা-বাহিরে তাকাল না আর মিসেস্ জিল্
বাগান ভরিয়া পরিহাস রাখি গেল সে পরী।

What have they done with you, you poor Mrs Gill?
Quoth the Fairy, brightly glancing in the garden;
Where have they hidden you, you poor Mrs Gill?
Quoth the Fairy, dancing lightly in the garden;
But night's faint veil now wrapped the hill,
Stark' neath the stars stood the dead-still Mill,
And out of her cold cottage never answered Mrs Gill
The Fairy mimbling, mambling in the garden.

কী করেছে ওরা, কী করেছে হায়, মিসেস্ জিল্?
ফুলবনে চাহি উজ্জ্বল চোখে কহিল পরী।
কোথায় তোমারে লুকায়ে রেখেছে মিসেস্ জিল্?
মেঘের মতন লঘুপায়ে নাচি কহিল পরী

রাতের চাদরে ঢেকে গেল ধীরে পাহাড়তল
কালো কারখানা, উপরে উজল তারার দল,
হিমেল কুটীরে সাড়া নাহি দিল মিসেস্‌ জিল্‌
বাগান ভরিয়া চপলচরণে নাচিল পরী।' [২]

চেনার থেকে অচেনার, কাছের থেকে দূরের, স্বপ্নের থেকে বাস্তবের মধ্যে আড়াল নেই কবির মনে। যাকে সত্যি বলে মনে করি, তাও তো রূপকথা, তাও তো সেই পথ বেয়ে চলে গেছে—

The long road bleak and bare that fades away in Time
দীর্ঘ বিজন রিক্ত যে পথ সময়ের দিগন্তে বিলীন
Beauty vanishes ; beauty passes ;
However rare—rare it be ;
And when I crumble, who will remember
This lady of the West Country ?

রূপ মিলিয়ে যায়, রূপ হারিয়ে যায়, যতই সে দুর্লভ হোক ; আর আমি যখন ধূলিতে মিশাব, কে মনে রাখবে এই পশ্চিম দেশের সুন্দরীকে ?

তবু শেষ পর্যন্ত সেই সৌন্দর্যই সান্ত্বনা, প্রাণের অবলম্বন।

Look thy last on all things lovely,
Every hour.

যা কিছু সুন্দর আছে, শেষ দেখা দেখে নাও তাদের দুচোখ ভ'রে। তোমার আগে কত যুগের কত মানুষের ভালোবাসার আভাতেই তো তারা সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মানুষের কাছে এই তাঁর পরম নির্দেশ।

---

২ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় -কৃত অনুবাদ।

রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ॥ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্রবিচিত্রা ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ॥ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় ॥ শ্রীক্ষুদিরাম দাস। পুথিঘর, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য ॥ শ্রীবুদ্ধদেব বসু। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ॥ শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা। মূল্য নয় সিকা।

কবিগুরুর রক্তকরবী ॥ শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধনা-মন্দির, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

সোনার তরী ॥ শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্রদর্শন ॥ শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যসংসদ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কিছুদিন থেকে, দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রমানস নিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। বোধ হয় তার একটা কারণ আছে। কথাটা বললে কেমন যেন শোনায়, কিন্তু বোধ হয় বলা যায় যে, একালে রবীন্দ্রমানস আলোচনার যেমন একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে তা বোধ হয় আগে ছিল না। এক হিসেবে বলা চলে যে, রবীন্দ্রমানস পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সম্পূর্ণ ক্ষেত্র হয়তো কোনোদিনই হবে না, কেননা তার বিরাট্ ব্যাপ্তি এবং গভীরতা সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে গেলে আর-একটি রবীন্দ্রমানস দরকার। রবীন্দ্রনাথ আলোকলতাও নন, হঠাৎ বিদ্যুৎচমকও নন— তিনি হলেন বিরাট্ বনস্পতির মত। ছোট থেকে তিনি আস্তে আস্তে বড় হয়েছেন, মাটির রসে তিনি পুষ্ট এবং আকাশের আলোয় তিনি সঞ্জীবিত। সেই মানসের মূল মাটির গভীরে— যে মাটিতে উপনিষদ্ আছে, কালিদাস ও বৈষ্ণব কাব্য আছে, সারা ভারতবর্ষের মন আছে। অথচ সেই মানসের ঊর্ধ্বমুখ পত্রপ্রবাল ছুঁয়েছে আকাশের আলোকে, যে আলো পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞান হতে বিকিরিত হচ্ছে, যেখানে বাধাবিহীন মুক্ত চিত্তের মেলা। তা ছাড়া, সেই বনস্পতির দিকে দিকে অজস্র শাখা, অজস্র পত্রসম্ভার, তার প্রত্যেক দিকে কত-না আশ্রয়, কত-না শান্তি, কত-না বিচিত্রতা। কাজেই এই বনস্পতির সম্পূর্ণ পরিক্রমা করাই দুরূহ, তার সম্পূর্ণ রূপ অনুধাবন ও আস্বাদন করা তো অনেক দুরূহতর ব্যাপার। কিন্তু সে অসুবিধা সব সময়েই আছে এবং থাকবে— কাজেই সে কথা ছেড়ে দিচ্ছি। এই কথা বাদ দিলে দেখা যাবে, সুরেশ সমাজপতির আমলে একদল লোক যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরোধিতা করতেন সম্পূর্ণ সাহিত্যবহির্ভূত কারণে, তেমনি তখন যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুগামী ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিচারের চেয়ে উচ্ছ্বাসটাই ছিল বেশি। পরের যুগে, যেমন কল্লোল-যুগে, যেসব নতুন সাহিত্যিক উঠলেন তাঁদের অনেকের মানসিক আবহাওয়ায় এমনই একটা ধাঁচা ছিল যে, তাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্যবিচার ঠিকমত করতে পারেন নি বলা অন্যায় হবে না। এক দিকে যুদ্ধোত্তর কিছু পশ্চিমী সাহিত্যের চটকদার বুদ্ধিদীপ্তি, অন্য দিকে "সম্মুখেতে পথ রুধি রয়েছেন রবীন্দ্র ঠাকুর"

-গোছের একটা মনোভঙ্গী—এই দুয়ের চাপে তাঁদের সুস্থ রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা ব্যাহত হয়েছিল। তার পরের দশক, অর্থাৎ চল্লিশের দশক, বাঙালী-চিত্তের বিকৃতি হতাশা এবং বিপর্যয়ের যুগ। অবশ্য প্রত্যেক যুগেই অগণিত বাঙালী রবীন্দ্র -কাব্য ও -সাহিত্য হতে সঞ্জীবনী সুধা আহরণ করেছে, কিন্তু সে পরিবেশ সমগ্রভাবে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার অনুকূলও ছিল না এ কথা সত্য। আজ আমরা এইসমস্ত চিত্তবিভ্রম অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছি। সেইজন্যই এখন সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা হওয়া স্বাভাবিক। আর হচ্ছেও তাই। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে শুধু যে অজস্র বই বার হচ্ছে তাই নয়, তার মধ্যে অনেকগুলি ভালো ভালো বই বার হচ্ছে —এইটেই সবচেয়ে আনন্দের এবং লক্ষ্যের কথা।

সম্প্রতি রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি বই হাতে এসে পড়ল। তার মধ্যে একটি মনোরম বই শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা'। সমালোচনার ক্ষেত্রে উপেনবাবু অপেক্ষাকৃত নবাগত, কিন্তু তাঁর প্রথম বই 'রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা' রবীন্দ্রসাহিত্যের গভীর আলোচনা এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। বর্তমান বইটিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি বৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে তিনি আটটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা, ১. গীতিনাট্য—বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলা ; ২. কাব্যনাট্য—চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারীর আবেদন ইত্যাদি ; ৩. রোমান্টিক ট্র্যাজেডি—রাজা ও রানী, বিসর্জন ইত্যাদি ; ৪. রূপক-সাংকেতিক নাটক—রাজা, অচলায়তন, ফাল্গুনী, ডাকঘর, মুক্তধারা, রক্তকরবী ইত্যাদি ; ৫. সামাজিক নাটক—নটীর পূজা, চণ্ডালিকা ইত্যাদি ; ৬. কৌতুকনাট্য —চিরকুমার-সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা ইত্যাদি ; ৭. ঋতুনাট্য—শেষবর্ষণ, বসন্ত ইত্যাদি ; এবং ৮. নৃত্যনাট্য। কিন্তু বিষয়বস্তু হিসেবে বিভাগ করা ছাড়াও লেখক বিষয়বস্তু নিয়ে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, আজকালকার নাটকে কেবল বস্তু বা আখ্যান নিয়েই নাড়াচাড়া করা হয় না, স্থূল জগতের প্রত্যক্ষ সত্য ছাড়াও যে বৃহত্তর সত্য অসীম লীলারহস্য তরঙ্গিত হচ্ছে সেই অতীন্দ্রিয় জগতের সূক্ষ্ম মায়াময় আবরণ নিয়েও নাটকের কারবার হচ্ছে, তার মধ্যে অসীমকে সীমায় বাঁধবার চেষ্টা পরিস্ফুট। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন একটা নিবিড় subjectivity বা মন্ময়তাই তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য প্রথমে তিনি পাশ্চাত্য রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে নাটক লিখলেও শেষকালে তিনি উপনীত হলেন ইন্দ্রজালময় কাব্যৈশ্বর্যের অপূর্ব নিদর্শন কাব্যনাট্যগুলিতে। তার মূল দ্বন্দ্বটি ভাবের দ্বন্দ্ব। রূপক-সাংকেতিক নাটকেও তাই। কবি ঠিক পাশ্চাত্য রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে নাটক লিখেছেন কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তর্ক উঠবে। কারণ সে নাট্যধারার বিপুল ঘটনাসংঘাত এবং আকার-প্রকারের একটি বিশিষ্ট ধারা আছে, যুগে যুগে তার চেহারা এবং উপকরণও এক নয়, কিন্তু এ সবই রবীন্দ্রপ্রতিভার সমানধর্মী নয়। কাজেই যাকে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ট্র্যাজেডি বলা হয় তা পাশ্চাত্য রোমান্টিক ট্র্যাজেডির সমধর্মী কি না সেবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবসর থাকলেও লেখক তাঁর পরবর্তী নাটকগুলি সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন তা সত্যই গভীর এবং নবীন ব্যঞ্জনাময়। রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য যুক্তিসিদ্ধ, ব্যাখ্যা নিপুণ, আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ—আর সবচেয়ে যেটি ভালো লাগে সেটি হল এই যে, তিনি নিজের মনের কথা রবীন্দ্রনাথের উপর আরোপ করতে যান নি, রবীন্দ্রনাথেরই সমসাময়িক নানা রচনার সাহায্যে রবীন্দ্রমানসের ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রমানস-ব্যাখ্যানের ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বই 'রবীন্দ্রবিচিত্রা' তাঁর অন্য বইগুলি হতে একটু বিশিষ্ট। রবীন্দ্রসাহিত্যের কতকগুলি স্বল্প-আলোচিত দিক নিয়ে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি হল "রবীন্দ্রকাব্যের পাঠান্তর"। বিষয়টি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই, কারণ এই আলোচনা হতে রবীন্দ্রমানসের পরিমণ্ডলই যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাই নয়, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। বিশী মহাশয় এই কাজ খুব দক্ষতার সঙ্গে করেছেন, কিন্তু আলোচনা বোধ হয় স্থানে স্থানে আরও গভীর হতে পারত। যেমন 'উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে' এই লাইনটিতে 'কলাপী'র বদলে, 'ময়ূর' শব্দটি যে অচল সে কথা বোঝাবার জন্য তিনি বলেছেন "মেঘসন্দর্শনে হৃষ্ট ময়ূরের বিস্ফারিত পুচ্ছের প্রতিই এখানে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ, কাজেই অভিধান যাহাই বলুক, এখানে কবির ভাবপ্রকাশের একটি মাত্র শব্দ বর্তমান, সেটি 'কলাপী'।" এ কথা তো সত্য, কিন্তু আমার মনে হয় এ কথাটাই সবটা নয়। মহাকবি শুধু চিত্ররূপের মারফত কাজ আদায় করেন নি, তার উপর শব্দ ধ্বনি এবং অনুপ্রাসের কাছ থেকেও কাজ আদায় করেছেন। 'উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে'—এই পদাংশে অনুপ্রাসের এমন একটা দ্রুত সঞ্চরণ আছে যে, উল্লসিত কলাপীর নৃত্যের দ্রুতবেগ যেন তার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে ওঠে। কাজেই শব্দরূপ চিত্ররূপ ধ্বনিরূপ—বহু দিক দিয়ে কাজ নিয়েছেন কবি, এই অদ্ভুত ক্ষমতা মহাকবির পরিচায়ক। যাই হোক, এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলকর দিকটির সম্বন্ধ আলোচনায় এই প্রবন্ধটি বিশিষ্ট। তেমনি আরও কতকগুলি প্রবন্ধ, যথা, "রবীন্দ্রনাথের খণ্ডোপন্যাস", "রবীন্দ্রকাব্যে একটি প্রতীক", "জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা" ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি পড়ে পাঠকেরা খুশী হবেন। কিন্তু "রবীন্দ্রসাহিত্যে গান্ধীচরিত্রের পূর্বাভাস" প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই সর্বজনসমাদৃত হবে না, কারণ এটিতে তিনি এমন একটি ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যাতে বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী। প্রমথবাবু লিখেছেন, "গান্ধীজীকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিবার পরে এই শ্রেণীর আভাস রবীন্দ্রসাহিত্যে আর পাওয়া যায় না, কেননা বোঝা কঠিন নয়, আভাস তখন স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, বাস্তবরূপে যে-মানুষ ভারতবর্ষে বিচরণ করিতেছে কবির লেখনী তখন তাহাকে দেখাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি লইয়াছে।" এই কথার বিরুদ্ধে সাক্ষী রবীন্দ্রনাথ নিজেই। কারণ প্রমথবাবুর কথা সত্য হলে রবীন্দ্রনাথের শেষ ভাষণ 'সভ্যতার সংকটে' পর্যন্ত 'ঐ মহামানব আসে' গানটি সংযুক্ত করার কোনো প্রয়োজন হত না। তা ছাড়া অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত 'কন্‌গ্রেস' শীর্ষক পত্র (ত্রিপুরীর পর লেখা) হতে কয়েক লাইনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কবি লিখেছেন, "সামনের যে ঘাট লক্ষ্য করে আজ কর্ণধার নৌকো চালিয়েছেন সেদিকে তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। দূরদৃষ্টিহীন ভক্তদের মতো বলব না, তার ঊর্ধ্বে আর ঘাট নেই। আরও আছে এবং তার জন্যে আরও মাঝির দরকার হবে।" এর পরও কি বলা চলে যে রবীন্দ্রনাথের মহামানব কেবল গান্ধীচরিত্রেরই পূর্বাভাস এবং গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ হবার পর রবীন্দ্রনাথের লেখনী সেই মহামানবকে "দেখাইবার দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছে"? আমার মনে হয় গান্ধীচরিত্রে মহামানবের প্রতিফলন তো থাকবেই, গান্ধীজীই তো এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানব, কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখক অনেক বেশি অর্থ খুঁজতে চেয়েছেন, যা ঠিক নয় বলে মনে হয়।

'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' নামক বইয়ে বিশী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ব্যাপক আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি মনোজ্ঞ। লেখক ঠিকই লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ক্ষেত্র নাগরিক

জীবন, প্রধান পাত্র-পাত্রী প্রায় সকলেই নাগরিক নরনারী। আর তাঁহার অধিকাংশ ছোটগল্পের ক্ষেত্র পল্লীজীবন, প্রধান অপ্রধান প্রায় সকলেই পল্লীবাসী।…পল্লীবঙ্গই তাঁহার ছোটগল্পের যথার্থ ক্ষেত্র।" বিশী মহাশয় সেই সঙ্গে একথাও ঠিক বলেছেন, "তাঁর ছোটগল্পে পাই প্রাকৃতিক স্পর্শ, আর কবিতায় পাই মানবিক স্পর্শ।" অবশ্য ছোটগল্পেও যে প্রকৃতি আর মানুষ জড়িয়ে একাকার হয়ে যায় নি তা নয়। তা ছাড়া লেখক রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভৌগোলিক পটভূমিকাও আলোচনা করে দেখিয়েছেন। অথচ প্রমাণ করেছেন যে আঞ্চলিক পটভূমি প্রচুর থাকা সত্ত্বেও তার রস সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। লেখক বলেছেন, "কেবল মানবিক সত্যের উপাদানে গল্পগুলি রচিত হইলে ইহাদের স্বাদ সরলতর হইত, হয়তো বা অধিকতর জনপ্রিয়ও হইত। কিন্তু কবি সে সহজ পথ গ্রহণ করেন নাই ; মানবিক সত্যের সহিত প্রাকৃতিক সত্যের মিশল দিয়া গল্পগুলিকে কবিত্বরসে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প যুগপৎ কবি ও কাহিনীকারের জোড়কলমে রচিত—ইহা এগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।" তা ছাড়া লেখক আরও একটা কথা ঠিকই মনে করিয়ে দিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁহার সাহিত্যে পাশাপাশি দুটি ধারা বর্তমান, একটি সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, আর একটি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকে উধাও হইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার সমকালীন কবিতা ও গল্প মিলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, কবিতায় ঐ নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর, আবার গল্পে সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর। এই মূল সূত্রটি মনে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।"

এই মূল সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প বিচার করা সম্ভব হলেও কতকগুলি গল্প এর ব্যতিক্রম। বিশেষতঃ তাঁর শেষজীবনের গল্পগুলি। যেমন 'সে'। এটির সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সে সময় ছবির রসে মগ্ন ছিলেন, এধারে লিখছিলেন বিশ্বপরিচয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথের ছবির মতই 'সে' কিম্ভূত-রসাশ্রিত শিল্প। রবীন্দ্রনাথের ছবির রস কিম্ভূতরস কি না সেবিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যে ব্যাখ্যা করা সব চেয়ে কঠিন বোধ হয় 'তিন সঙ্গী'র গল্পগুলি। কারণ আমরা এ পর্যন্ত রবীন্দ্র-গল্পসাহিত্যে তো বটেই, এমন-কি গোটা রবীন্দ্রসাহিত্যেও যে ধারা পেয়ে আসছিলাম এই গল্পগুলি তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। লেখক বলেছেন, "কি ভাষার সাবলীল নমনীয়তায় এবং যথেচ্ছ কার্যকারিতায়, কি ঘটনার সুনিপুণ সংবিন্যাসে, কি ভাবনার আকাশ-চংক্রমণকারী পদক্ষেপে, আর কি চরিত্রপরিকল্পনার জরাব্যাধিজয়ী দুঃসাহসিকতায় ল্যাবরেটরি গল্পের দোসর পাওয়া কঠিন। সমস্ত গল্পটি হইতে অস্তাচলাসীন সূর্যের শেষরশ্মিমদিরা বিচ্ছুরিত হইয়া পাঠককে যেন বিভ্রান্ত করিয়া দেয়।" তিনি আরও বলেছেন, "সোহিনীর· · রিয়ালিজম অত্যন্ত পাকা।" এ কথা সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথও নিজে বলেছেন। বিশী মহাশয়ের মতে রবীন্দ্র-সাহিত্যে "সোহিনী আকস্মিক নয়, তাহার দীর্ঘ পূর্বসূত্র আছে।…রবীন্দ্র-সাহিত্যে সোহিনীর অস্পষ্ট পূর্বরূপ চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানী। অর্জুনের বিদায়কালে চিত্রাঙ্গদা গৃহিণীতে ও প্রেয়সীতে মিলাইয়া রমণীর একটি আদর্শ চিত্র অঙ্কন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার প্রেয়সী-রূপটিই প্রেমে ও লাবণ্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার দেবযানীর অপমানিত প্রেম পদাহত সর্পিণীর মনোরম ভীষণতায় বিদ্যুল্লতাবৎ কচকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে।" কিন্তু এইখানেই প্রশ্ন জাগে। সোহিনীর রূপ কি প্রেয়সীর রূপ ? তার রিয়লিজমের চেহারা কী ? সে সর্ববন্ধনমুক্ত এ-কথা সত্য। কিন্তু তার মধ্যে একটা জ্বালা আছে, নিষ্ঠুরতা আছে, নির্মমতা আছে, এমন-কি নির্লজ্জতা আছে যা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, রবীন্দ্রসাহিত্যে যার

দেখা কোথাও পাওয়া যায় না। কুমুদিনীর সঙ্গে এর তুলনা চলে না। কেননা কুমুদিনী হৃদয়ের সংঘাতে আশ্রয় নিয়েছিল দেবতার মধ্যে— বাইরে সে পাথর। সে জ্বালায় ছটফট করে নি, সে নির্লজ্জভাবে স্ফুলিঙ্গ বিস্তার করে নি, তার টাইপই অন্য। লেখকের মতে এখানে একটি ব্যতিক্রম ঘটেছে, "বোধ করি রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান যে, সতীত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব পূর্ণতর আদর্শ।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সোহিনী-চরিত্র এঁকেছেন তা হতে তো তা মনে হয় না। কারণ সোহিনীকে তিনি মনুষ্যত্বের পূর্ণভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেন নি। বস্তুতঃ তার কোথাও দৃঢ়প্রতিষ্ঠা নেই, তাই এই চঞ্চলতা অস্থিরতা জ্বালা। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই অদ্ভুত ব্যতিক্রম কেন ঘটল তার উত্তর দেওয়া বোধ হয় সহজ নয়। বস্তুতঃ এই প্রশ্ন আরও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আমার অনেকবার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মানসমণ্ডলের একটা সুদূরপ্রসারী এবং ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিকায় এ কথা আলোচনা হওয়া দরকার। কয়েকটি ছোট ছোট লক্ষণের উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের ভাষা, পূর্বে, যেখানে অত্যন্ত ভাবাবেগসমৃদ্ধ, সেখানেও প্রসন্ন। কিন্তু শেষের দিকে, বিশেষতঃ চলতি ভাষা অবলম্বনের পর, তাঁর ভাষা অনেক বেশি পরিমাণে তির্যক্, এমন-কি তার মধ্যে বক্রোক্তিও অনেক বেশি। কেন এই বদল? এ তো চলতি ভাষার টেকনিকের তাগিদে নয়, এ হল মনের তাগিদ। একালের সমাজের ভাঙন রবীন্দ্রনাথের মনে যে উত্তাপের সঞ্চার করছিল, অথচ অন্যদিকে যে প্রসন্ন শান্তি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্ররচনায় বার বার জয়ী হয়েছে—এই দুই শক্তির অদৃশ্য সংঘর্ষই কি শেষকালে এক-একবার রবীন্দ্রনাথের কলমে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করেছে? কবিতায় তা করা রবীন্দ্রপ্রকৃতিবিরুদ্ধ, সেইজন্যই কি তিনি শেষকালে ছোটগল্পের মাধ্যমে সেই জ্বালাকে উৎসারিত করেছেন? বস্তুতঃ 'তিন সঙ্গী'র সব কটি গল্পেই এই বিশিষ্টতা।

৬

শ্রীযুত ক্ষুদিরাম দাসের বই 'রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়' পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই—এর মধ্যে তিনি নানা কথার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন (পৃ ২), "অতীত এবং বর্তমানের দ্বন্দ্বের মধ্যেই কবিমানসের স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা।" এ দ্বন্দ্ব কি সব সময়েই হয়? সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বও কি আরও একটা বিশিষ্ট শক্তি নয়? বস্তুতঃ এই বইটি পড়তে পড়তে পাঠক বারবার মতবাদে হোঁচট খায়। "রোমান্টিক কল্পনাবিহ্বলতা", "বিশিষ্ট-কল্পনাশ্রয়ী বিশ্বাত্মবোধের ভিত্তি" ইত্যাদি কথায় মতবাদের কথা যেমন প্রচারিত হয়েছে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রক্রিয়া তেমন প্রাধান্য পায় নি। 'উর্বশী' সম্বন্ধে লেখক বলেছেন এই কবিতায় "বিষামৃত মিশ্রিত বিকার-বিশেষেরই ইঙ্গিত" কবি দিয়েছেন এবং বলেছেন, "এই অনির্বাচ্য চেতনা কি বিস্ময়াশ্রিত অদ্ভুত রস? তাও হতে পারে না, কারণ মানসসুন্দরীর রূপ পরিগ্রহ করে তা বহুল পরিমাণে আদিরসাশ্রিত হয়ে পড়েছে।" এতে হয়তো পণ্ডিতজন চিন্তার উপাদান পাবেন, কিন্তু রসিকেরা প্রতিহতই হবেন। বিশুদ্ধ আলংকারিক বিচারেও লেখকের কতকগুলি মত তর্ক তুলবে। যেমন, "সুরদাসের প্রার্থনা" কবিতাটির সম্বন্ধে লেখক লিখেছেন, "আদিরসের আলম্বন থেকে সৌন্দর্যবোধকে বিচ্ছিন্ন না করেও কবি 'আদি'র বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান। সুতরাং বোঝা যায়, ঐ সৌন্দর্যবোধ যথার্থ রসরূপ প্রাপ্ত হয়েছে বলেই তা রতি বা বিস্ময় বা অন্য যে কোনো স্থায়ী ভাবের স্পর্শ থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছে। অর্থাৎ রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রাচীনেরা রসোপলব্ধির অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন নির্বিশেষ আনন্দ-চৈতন্যে মানসের স্থিতি, তা কবির এই সৌন্দর্যবোধ থেকে প্রমাণিত হয়।" কথাটা স্ববিরোধী। কারণ, প্রাচীনদের বলবার কথাই ছিল যে,

স্থায়ীভাব যখন আলম্বন বা উদ্দীপন বিভাবকে অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ সত্ত্বে অর্থাৎ রসে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে সমস্ত লৌকিক সংশ্রয় পরিত্যাগ করে অ-লৌকিকত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সর্বজনীনতায় প্রতিষ্ঠিত না হলে রস হবে কেন, তা সকল হৃদয়ে সমবাদী হবে কেন, রামসীতার ব্যক্তিগত প্রেম সর্বজনীন রস হয়ে উঠবে কেন? কাজেই আলম্বন ছাড়বেও না অথচ সে কাহিনী-নির্বিশেষ আনন্দ-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হবে—এ দুই প্রক্রিয়া একসঙ্গে চলে না। আর রবীন্দ্রনাথ যে আলম্বনকে ছাড়িয়ে বহু উর্ধ্বে উঠে একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠা করেছেন সে কথা কবিতাটি ভালো করে পড়লেই বোঝা যায়। সমস্ত বইটিই এই সুরে বাঁধা। যেমন "গোধূলি পর্যায়ের" আলোচনায় লেখক বলছেন, "আকাশপ্রদীপে' কবি এক দিকে যথাদৃষ্ট চিত্র অঙ্কনে নিপুণ, আর-এক দিকে 'রোম্যান্‌টিক কাব্যবিলাসী' এ কথা বলা যথেষ্ট হল না।" না হয় ঐ কথা মেনে নিলুম, কিন্তু ও দুটির কি কোনো মিশ্রণ হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি হল না, ঐ দ্বিধারাই রয়ে গেল? আর 'রোম্যান্টিক ভাববিলাসী' বলতে কি বুঝি? ঐ কথা দুটিতে তো শেলি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বহু কবিকেই চিহ্নিত করা যায়, কিন্তু তা বলে কি তাঁরা সবই এক? এইসব চলতি কথা দিয়ে কি বস্তুতঃ শেষ পর্যন্ত কোনো কবির বিশিষ্ট মানসটিকে ব্যাখ্যা করা যায়? তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাণীর তাগিদ আর রবীন্দ্রনাথের কবিতার তাগিদের সমীকরণ করে লেখক বলেছেন, "অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙালি-জীবনের তৎকালীন ঐহিকতার গ্লানির দ্বারা কলঙ্কিত, অথচ বহুকালাগত অধ্যাত্ম-সাধনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত"—এসব কথায় হোঁচট খেতে হয়। প্রস্তাবনায় লেখক অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সুফীধর্ম ইত্যাদি নানা ভাবধারার প্রভাবের কথার অবতারণা করেছেন, অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতার যে নাড়া নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্ফুরণের অন্যতম উপাদান সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা—বের্গসঁ ইত্যাদির উল্লেখ সত্ত্বেও— আছে বলে মনে হয় না। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ এই দুই ধারার ঘাতপ্রতিঘাতের বিস্ময়কর সৃষ্টি, তিনি কেবল উপনিষদ্‌ অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সুফীধর্মের উপর নিজস্ব পালিশ লাগিয়েছেন এবং কালিদাসের বৈদর্ভী রীতি, জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী এবং ভাষাসাহিত্যের সৃষ্টির ধারাকেই তিনি প্রসারিত করেছেন —এ কথা বলা চলে না।

শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসুর বই 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য' পূর্বের বইটির তুলনায় পাঠকের মনে ঠিক বিপরীত আস্বাদ এনে দেয়। ঝরঝরে ভাষায় লেখা উজ্জ্বল বই। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, শ্রীযুত বসু প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সর্বমুখীনতার দিকে। একই মাটিতে বিশ্বের সম্ভার —প্রকৃতির মতোই অমিতবিত্ত প্রাচুর্য। কেমন ক'রে সম্ভব হল? বস্তুতঃ এইটেই তো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রশ্ন। লেখক ঠিকই বলেছেন, যে-কোনো অংশের চাইতে তাঁর সমগ্র রচনাটি বড়ো। শ্রীযুত বসুও বলেছেন, "তাঁর কাব্য, কাব্যধর্মী নাট্য, এরা দাবি করে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকা, কিন্তু কথাসাহিত্যকে দেখতে হবে বাংলা সাহিত্যের, বাঙালি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। তার প্রথম কারণ এই যে, কথাসাহিত্যে দেশকালের প্রভাব খুব প্রবল; তা ভূগোলনির্ভর, ইতিহাসে বিন্যস্ত, সামাজিক অবস্থার বৈসাদৃশ্য তার আবেদনের অন্তরায় হতে পারে। দ্বিতীয় কারণ, মাতৃভূমিতে কাব্য আর গদ্যসাহিত্যের ঐতিহ্যগত ব্যবধান।" এইভাবে লেখক রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্যের বিশিষ্টতা, প্লটের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের অতি চমৎকার আলোচনা করেছেন। গল্পগুচ্ছ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা গভীর

সাহিত্যিক আলোচনা। গোরা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত সুচিন্তিত : "রবীন্দ্রনাথ· ·প্রচারকার্যে নামেন নি, একটি শিল্পকর্ম সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন, এবং সেই শিল্পকর্মের মধ্যেই বয়ন ক'রে দিয়েছেন বাংলাদেশের তৎকালীন ইতিহাস।" বইটি রবীন্দ্রসাহিত্যজিজ্ঞাসুদের অবশ্য পঠনীয়।

শ্রীযুত তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' রবীন্দ্রসাহিত্যের অংশবিশেষ নিয়ে আলোচনা। সোনার তরী হতে গীতালি পর্যন্ত এর পরিধি। বইখানি পড়ে সকলেই আনন্দ পাবেন। লেখক পূর্বে কতকগুলি বাঁধা তত্ত্বের অবতারণা করে তাই দিয়ে বিচার করতে চান নি। বরং তিনি প্রকৃত সাহিত্য-সম্মত পথে অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "জীবনের সত্য আস্বাদনের বিষয় হইয়া উঠে তত্ত্বরূপে নহে, কতকগুলি অস্ফুট আনন্দানুভূতি এবং অনাস্বাদিতপূর্ব বেদনাবোধের মধ্য দিয়া চেতনায় যাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তত্ত্বরূপে তাহাই নির্দিষ্ট হয়। 'সোনার তরী' কাব্যেও কতকগুলি আনন্দানুভূতি ও বেদনাবোধের মধ্য দিয়া যাহা উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহাকে আমরা তত্ত্বরূপে ততটা দেখি না, যতটা রসরূপে দেখিতে পাই। তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্র-মানসের পরিচয় গ্রহণ করিতে যাইলে কবির কাব্যের প্রাণবস্তু তত্ত্বালোচনায় ঢাকা পড়িয়া যাইবে।" এই ভিত্তিভূমি হতে অগ্রসর হয়ে তিনি 'সোনার তরী'তে বন্ধন আর অবন্ধনের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন তা হতে কবির বৃহত্তর মানসাভিসার, কবির গভীর প্রেমের সুর, বিশ্বের সঙ্গে কবির একাত্মীয়তা, এবং বিশ্বজীবনের ভূমিকায় জীবনের সত্য দর্শন। সেই বিপুল প্রেম ও জীবনসত্যে ক্রমে মৃত্যুর বাধাকে উত্তরণ। 'সোনার তরী' হল সেই বৃহতের চেতনা তথা বিশ্ববোধ। এপারের ছোট ক্ষেত হল খাঁচার জীবন, এই একাকিত্ব হল ব্যক্তির অহং-জীবনের একাকিত্ব। এই অভিনব ব্যাখ্যায় লেখক রবীন্দ্রকাব্যের এই অংশের উপর নূতন আলোকপাত করেছেন। তেমনি 'চিত্রা'র সম্বন্ধেও তিনি ঠিকই লিখেছেন, উপনিষদের সোঽহম্ তত্ত্বটিকে কবি একটি লৌকিক ভূমিকায় গ্রহণ করেছেন বলে তাঁর অন্তরের দেবতাকে এক নূতনভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁর মুক্তির বাণীও অভিনব অর্থ লাভ করেছে।

এই লেখকেরই আর-একটি বই 'কবিগুরুর রক্তকরবী'। প্রথমেই তিনি আলংকারিক বিচারকে নিরস্ত করে রসবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। রক্তকরবীতে মানবজীবনের দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ, যে দ্বন্দ্বের আঘাতে পুরুষ-চিত্তের বাসনা বিকশিত হয়— এই কথাটাই তাঁর প্রধান কথা। এ ছাড়া তিনি নাটকটির শিল্পভঙ্গী, কাহিনী, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের আলোচনা করেছেন। এ বইখানি লেখকের অপর বইটির তুলনায় রসোত্তীর্ণ না হলেও সার্থক এবং মনোরম।

অনেক সমালোচকই সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য বা নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'সোনার তরী' তার একটি চমৎকার ব্যতিক্রম। লেখক রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্য নিয়েই আলোচনা করেছেন। এই সুমিষ্ট ভাষায় অন্তরের দরদ দিয়ে লেখা বইটি বহু-সমালোচিত রবীন্দ্রকাব্যের উপরেও · নতুন আলোকপাত করেছে। লেখকের আলোচনার বস্তু সমগ্র রবীন্দ্রকাব্য নয়, কেবলমাত্র একটি রবীন্দ্রকাব্য— 'সোনার তরী'। কিন্তু সেই 'সোনার তরী'কে অবলম্বন করেই লেখক রবীন্দ্রমানসের একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন। লেখক বলেছেন, মানব-

জীবনের মূল তত্ত্বই 'সোনার তরী'র প্রতিপাদ্য বিষয়। "বিশেষ আমিটা মরবে, সে তো মরবেই, তার জন্যে তো দুঃখ নয়; দুঃখ হয় যদি বিশেষটির জন্যেই কেবল মরি, আমাদের অন্তরে অশেষের যে-মঙ্গলটি রয়েছে প্রেমভাবের বেদনায়, জীবনক্ষেত্রে তার ফসল কিছু না ফলাই। সর্বজনের জন্যে সোনার ফসল ফলানোর অধিকার আছে আমাদের জীবনে, মহাকাল উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছেন যথাযোগ্য সম্মানে সেগুলিকে সম্মানিত করার আকাঙ্ক্ষায়।··মহাকাল 'ক্ষুরধারা নদী' পার হয়ে তরী নিয়ে একদা আসবেন। সত্যকার যা ফসল, সোনার ফসল, নেবেন তুলে। ছোট-আমিটাকে, তার অহংবোধ ও দম্ভবিকারটাকে নেবেন না, কিন্তু নেবেন তুলে যা শ্রেয়, যা সুন্দর, মাঙ্গল্যরচনার মহিমায় যা মহৎ, বিশ্বজীবনের প্রেম ও আনন্দের প্রয়োজনে যা অপরিহার্য। মানবজীবনের তত্ত্বটাই এই। এবং—'সোনার তরী' কবিতারই শুধু নয়, সমগ্র কাব্যখানির-ই এই প্রতিপাদ্য।" এই হল লেখকের মূল কথা। এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথে কিভাবে বিকশিত হয়েছে তার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, কবির অশান্ত মন, সর্বদা এবং সর্বথা, মোহমুক্ত একটি জীবনধ্যানের আশ্রয়ে উপনীত হতে চাইছেন অবিশ্রাম গতিতে। 'কবি-কাহিনী' থেকে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত প্রাথমিক কাব্যাবলীতে অহং-বেদনার অমিতোচ্ছ্বাস আছে, জ্বালা আছে, যন্ত্রণা আছে, ব্যক্তিবিরহের সজ্জাহীন রূপমোহ এবং লজ্জাহীন হাহাকারও আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘাবৃত আকাশের আকস্মিক বিদ্যুৎচমকের মত দিশাহারা মুক্তিবেদনার অসহায় চেতনোচ্ছ্বাসও আছে। 'মানসী' কাব্যে উপনীত হয়ে জীবনপ্রত্যয়ের একটি সুস্পষ্ট ধর্ম কবি আবিষ্কার করেছেন। মানসী কাব্যেই কবি ক্রমশঃ বুঝতে পারলেন, 'আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের'। এর থেকে স্বভাবতঃই কবি এসে পৌঁছেছেন 'সোনার তরী'র মূল স্বরটিতে। "মানুষের মধ্যে যা 'সোনা'— যা শ্রেয়, যা সুন্দর, যা মানবিকতার মহিমায় অনুপম, কালের তরীতে তার ঠাঁই হয়, কবি জানলেন।" বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই কথা বলেছেন। "মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করচে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মতো—চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে।··যখন কাল ঘনিয়ে আসচে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠচে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না; কিন্তু যখন মানুষ বলে— ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও,··তখন সংসার বলে—তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কি?··প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না-কিছু দান করচে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করচে, রক্ষা করচে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্চে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্চে।" সেইজন্যই কবি রাজসভায় মনের ফসল শোনান, পুরস্কারের চেয়ে ফুলের মালা তাঁর কাছে বেশি দামী। সেই কারণেই ছোট-আমি'র পাল্লায় পড়ে বিম্ববতী কিছুতেই জয়ী হতে পারল না।

এইভাবে লেখক 'সোনার তরী'র বিভিন্ন কবিতার ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। ব্যাখ্যা অতি চমৎকার, ভাষাটি মিষ্ট—সব মিলিয়ে সত্যকারের ভালো সমালোচনা।

প্লেটোর আদর্শ রাজত্বে কবিদের স্থান নেই, কিন্তু রাজা-দার্শনিক বা দার্শনিক-রাজার স্থান আছে। প্লেটো এর কারণ যাই দিন- না কেন, সেকালের কি পরিবেশে তাঁর এই ধারণা জন্মেছিল তা আমরা জানি

নে। কিন্তু এ কথা সত্য, প্লেটো যদি শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যসুধা পান করতেন তাহলে হয়তো তাঁর মত বদল করতেন। কারণ মহত্তম কবিদের মধ্যে কাব্য শুধু অলংকার-ছন্দ-ঝংকারের সমাহার নয়, তার চেয়ে অনেক গভীর। তা শুধু মানবহৃদয়ের গহনেই প্রবেশ করে না, তার চেয়েও একটি বড় কাজ তার থাকে। এই মরকায়ার মধ্যেই নানা-আবরণ-পিহিত মন ক্রমশঃ বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে বৃহত্তর সত্যের দিকে যাত্রা করে— মহৎ কাব্যের এই হল চরম অনুষঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবিষয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সীমার সীমানা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে যাত্রা, বন্ধন উত্তরণ করে অবন্ধনের আস্বাদ, এই পৃথিবীতেই শাশ্বত আনন্দের আবির্ভাব—রবীন্দ্রকাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। মানবাত্মার এই মুক্তি, মানবমহিমার এই চরম অভ্যুদয়— যে অভ্যুদয়ে শুধু নরলোকেই ডঙ্কা বাজে না সুরলোকেও শঙ্খ বেজে ওঠে, মানব-অভ্যুদয়ের এই মন্ত্র মহাকাশে ধ্বনিত হতে থাকে— এক হিসেবে এই হল রবীন্দ্রমানসের চরম কথা। তাঁর অন্তিম ভাষণ 'সভ্যতার সংকটে'ও কবি এই কথাই বলে গিয়েছেন। তাঁর এই দর্শনের কাব্যগত বিচার হয়েছে। পশ্চিমী মানবতাবাদের দিক্ থেকেও এসব কথা আমরা আলোচনা করে থাকি। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী— বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী— হতে এর বিচার বেশি হয় নি। কিন্তু এরকম বিচারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রমানসের ঔপনিষদিক ভিত্তিভূমির কথা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। পশ্চিমী মানবতাবাদ দ্বারাও তাঁর বক্তব্যের পুরো বিচার সম্ভব নয়, কেননা কেবল মানুষ— এই যেমন মানুষটি আছে ঠিক তেমনই মানুষ— রবীন্দ্রনাথের আধার ছিল না। এই মানুষকে তিনি অনেক বড় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন— সেইখানেই তাঁর সাধনা, সেইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য, সেইখানেই তাঁর নিজস্ব দর্শন।

এই দিক্ থেকে রবীন্দ্রমানসের বিশ্লেষণ শ্রীযুত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রদর্শন' গ্রন্থে সুনিপুণতার সঙ্গে করেছেন। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হল। তাঁর আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী কাব্যের নয়, পুরোপুরি দর্শনের। সেই দিক্ থেকে তিনি দেখিয়েছেন কবি যদিচ কবিভঙ্গীকে পরিত্যাগ করে দার্শনিকভঙ্গী গ্রহণ করেন নি (সম্ভবতঃ হিবার্ট লেকচার ছাড়া), তাহলেও তাঁর রচনার মধ্যেই তাঁর দর্শনের মূল কথাগুলি খুব স্পষ্ট ভাবেই ছড়ানো আছে। পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য পাঠকবৃন্দ এই চমৎকার বইখানি পড়ে নেবেন। সংক্ষেপে শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য হল, রবীন্দ্রনাথ শুকনো জ্ঞানমার্গের পক্ষে সায় দেন নি। জানা তো যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে পাওয়া চাই যে। সে পাওয়া তো কেবল জানায় হতে পারে না। সেইজন্য চাই প্রেম। ঈশ্বরের সঙ্গে সান্নিধ্য। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারায় এই সান্নিধ্যের নানা রূপ ও নানা উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যদি এক হয় তাহলে আমাদের সান্নিধ্য হয় কি করে? এই জন্যই তো অদ্বৈত-বাদের প্রতি এত বিমুখতা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বচরাচরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, সে হিসেবে তিনিও সর্বেশ্বরবাদের সমর্থক। কিন্তু এইখানে তাঁর একটি নিজস্ব কথা আছে, যা শ্রীযুত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দার্শনিক চিন্তাধারায় একটি নিজস্ব এবং অভিনব সুর সংযোজন বলে মেনে নিতেই হয়। এইটিই হল তাঁর মতে রবীন্দ্রদর্শনের অভিনবত্ব। তাঁর কথায় "সর্বেশ্বরবাদে একটি অসুবিধা এসে পড়ে এই যে, এই পরিকল্পনায় ব্যক্তি বা ব্যষ্টি যেন নিমজ্জিত হয়ে যায় সমগ্রের ব্যাপক বিশালতার মধ্যে।· · এ ব্যাপক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে আরও একটি অসুবিধা এসে পড়ে। এমন অনেকে আছেন যাঁদের হৃদয়বৃত্তি বিশেষ পরিবর্ধিত। তাঁরা পরম সত্তাকে শ্রদ্ধা জানাতে, অর্ঘ্য দিতে, পূজা করতে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন। তা না

হলে তাঁদের তৃপ্তি হয় না। এ ক্ষেত্রে পরম সত্তাকে নিজ হতে বিশ্লিষ্ট করে, তাঁকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আরোপ করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যাকে আমরা একেশ্বরবাদ বলি তা এই ধরনের সেবা পূজার অনুকূল দার্শনিক মত স্থাপন করে।" এক নূতন ভঙ্গীতে সর্বেশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে পারাই রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক অভিনবত্ব, তাই তিনি 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে' বলা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে প্রেম পূজা নিবেদন করার বাধা হয় নি। লেখকের মতে তাঁর সমাধান হল, এই স্বতন্ত্র বা দ্বৈত-সত্তাকে মানুষের মধ্যেই আবিষ্কার করি—কাজেই তিনি সর্বত্র বিরাজমান হয়েও সীমার মধ্যে তখনই ধরা দেন যখন মানুষের মধ্যে সেই পরম সত্তার আবির্ভাবকে উপলব্ধি করি। সুতরাং যে মানবের মধ্যে সেই পরম সত্তার আবির্ভাব হয়েছে সেই মানবের সাধনাই শ্রেষ্ঠ দর্শন। মানুষের ধর্মের মধ্যে কবি তাই বলতে চেয়েছেন "সমগ্র মানবজাতির সেবার আত্মনিয়োগেই মানুষের উপযুক্ত ধর্ম।" শেষের দিকে, ব্র্যাডলি বের্গর্স প্রভৃতি পশ্চিমী দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী হতেও এই কথার বিচার লেখক করেছেন। বইটি মনোযোগ আকর্ষণ করে, কেননা সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধের যে ধরনের ব্যাখ্যা করা হয় এ বইটিতে সম্পূর্ণ অন্য দিক্ থেকে তার ব্যাখ্যা এবং সমর্থন আছে। ভাষা সুমিষ্ট ও প্রাঞ্জল, আলোচনাও স্পষ্ট।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

পরমরমণীয়॥ সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড। মূল্য চার টাকা।

কিছুকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার ব্যাপক চর্চা অনেকেরই কৌতূহল জাগিয়েছে। 'রম্যরচনা' নামটাও সম্পূর্ণ নতুন— একটি বিদেশী শব্দের অনুবাদ। আমাদের সাহিত্যে এই শ্রেণীর রচনার বিশেষ নাম কিছু ছিল না। হয়তো পূর্বের সাহিত্যিক বা পাঠক কেউই এ-বিষয়ে অবহিত হবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। প্রবন্ধ বলতে তথ্যমূলক রচনার সঙ্গে এই জাতীয় রচনাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হত। ইদানীং বাংলা সাহিত্যে এই রচনা এমন-এক বিশিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে চলেছে যে, এর আলাদা নামকরণের তো বটেই, আলাদা সংকলন-গ্রন্থেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। 'পরমরমণীয়'ই তার প্রমাণ।

কিছুকাল পূর্বেও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নামটি এই রচনাকেই বোঝাত। বলা বাহুল্য, এই নামটাও বিদেশী শব্দের অনুবাদ। আমাদের দেশে এই সাহিত্য-কর্মটি নতুন বলে বিদেশী শব্দের অনুবাদে কাজ চালাতে হচ্ছে, কিন্তু ও-দেশে এটা নতুন নয়। হ্যাজলিট তাঁর 'The Periodical Essayist' নামক প্রবন্ধে এই প্রবন্ধ-রীতিকে মন্‌টেন্ থেকে নির্ণয় করে কাউলি এবং উইলিয়ম টেম্পলের মাধ্যমে ট্যাটলার এবং স্পেক্টেটরে বিবর্তিত হয়ে আসতে দেখেছেন। কেউ কেউ অবশ্য আরো আগে এর সূচনা দেখেছেন। সিসেরোকে এর প্রথম প্রবর্তক বলে তাঁরা মনে করেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই হ্যাজলিটের মতো সমালোচক সশ্রদ্ধভাবে এই সাহিত্যিক রীতিকে ("This mode of familiar essay writing, free from the trammels of the schools and the airs of professed authorship") গ্রহণ করে নিয়েছেন দেখে মনে হয়, ইংরেজি সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের দীর্ঘ ঐতিহ্য এবং স্বাভাবিকত্ব সন্দেহাতীত। পরের ইতিহাসে ল্যামের স্থান কোথায়, সে কথা নতুন করে বলবার দরকার হয় না। বিংশ

শতাব্দীতে ম্যাক্‌স্‌ বীয়রবোম, চেস্‌টারটন, লিণ্ড প্রভৃতি প্রবন্ধকারেরা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মেজাজের দিক দিয়ে অভিনবত্ব আনলেন। এঁদের হাতে গদ্য যেমন গতিমান্‌ হয়েছে লেখক-মনোভাবও তেমনি হালকা এবং বৈচিত্র্যবিলাসী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রবন্ধ ব্যক্তিগত তো বটেই তবে ব্যক্তিমনের গভীরতাটাই এর একমাত্র লক্ষণ থাকল না। চেতনার স্থিরতাহীন, বাঁধনহীন পলাতক ছায়াছবিগুলো অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে এঁকে যেতে পারলেই প্রবন্ধের উৎকর্ষ লাভ করা গেল। তাই এর যথোপযুক্ত নতুন নামকরণের চেষ্টা হল, *belles-letters*। বাংলায় রম্যরচনা। বিষয়বস্তুর দিক্‌ দিয়ে এর সম্ভাবনার অন্ত নেই। লঘু বিষয় তো বটেই, গুরু বিষয়কেও অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে— শুধু চিন্তাটা যে গুরু, এটা যেন পাঠক বুঝতে না পারেন। পাঠকের গুরুত্ববোধকে হরণ করে নিয়ে রম্যরচনা তাকে দেয় সহাস্য স্নিগ্ধতা। আধুনিক রচনায় আর-একটি বৈশিষ্ট্য, প্রবন্ধে অসমাপ্তির একটা জাগ্রত কৌতূহল সৃষ্টি করে তোলা; যেন অনেক কথাই বলা হল অথচ কোনো সিদ্ধান্ত বা উপসংহার পাওয়া গেল না। এই অসমাপ্তি-বোধই একে একটা আর্টে পরিণত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্পর্কে সচেতনতা যেন বিশেষ করে বর্তমানেই দেখা যাচ্ছে। অবশ্য বর্তমান সংকলন-গ্রন্থটি থেকে এ রকম একটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়ার থেকেই এই প্রবন্ধরীতির প্রচলন ছিল। কিন্তু এটা ঠিক, বাংলা সাহিত্যের নবজন্মের সূচনায় যে বিভিন্ন প্রকাশ-পদ্ধতি দেখা দিল, ব্যক্তিগত প্রবন্ধর পদ্ধতিটি তাতে আলাদা স্বীকৃতি পায় নি। অর্থাৎ অনুভূতির যে বিশিষ্টতার ফলে বিশিষ্ট প্রকাশ-পদ্ধতি অবলম্বন করা অনিবার্য হয়ে পড়ে, উনবিংশ শতাব্দীতে সেই রকম বিশিষ্ট অনুভূতি দেখা দেয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তর রচনা করে সাহিত্যে এক নবীন পদ্ধতির সূচনা করলেন, তখন পাঠক এর আপাতকৌতুকের আড়ালে গুরুত্বটি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের স্বাভাবিক তথ্যনিষ্ঠ গভীরতার সঙ্গে এর যোগ সহজেই বোঝা গিয়েছিল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধও স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। কারণ এই প্রবন্ধের পূর্ণতা ও গভীরতাও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবিসংবাদিত পরিচয়। রম্যরচনা বলতে আজকাল যা বোঝায়, বোধ হয় তার সম্পর্কে সচেতনভাবে সমর্থনসূচক প্রবন্ধ প্রথম লিখলেন প্রমথ চৌধুরী। 'খেয়াল খাতা' নামক প্রবন্ধটিতে তিনি এর যে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করলেন, সেটাই আধুনিক রম্যরচনার ইঙ্গিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রমথ চৌধুরীর এই লেখাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত 'বাজে কথা' প্রবন্ধটির তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের প্রাচীনতর রূপ এবং আধুনিক রূপের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। নবোদ্ভূত রম্যরচনা নিয়ে সংশয় যেন সম্পূর্ণ ঘুচতে চায় না। বাঙালী চিন্তার যে-স্বভাবশৈথিল্য প্রায় প্রবচনে পরিণত হয়েছে, সেই ভূমিকায় রম্যরচনার আবির্ভাব স্বাভাবিক হলেও উৎসাহব্যঞ্জক কি না সে-বিষয়ে সকলে নিঃসন্দিগ্ধ নন। বিশেষত, বাঙালী সমাজে বেশ কিছুকাল থেকেই অনিশ্চয়তার পালা শুরু হয়েছে, বাঙালী লেখকদের চেতনায় তার ঢেউ এসে লাগবেই। রম্যরচনা এই সংবাদপ্রধান যুগেরই ফল। এই সংকলনে সাম্প্রতিক লেখকদের একটা গুণ সানন্দে স্বীকার করতে হবে। ভাষায় তারা যে ধাবৎ-শক্তি নিয়ে এসেছেন, তাতে ভাষা অনেক সপ্রতিভ হয়েছে। কিন্তু এ-আশঙ্কাও কিছুতেই দূর করতে পারি নে যে, এতে হয়তো গদ্যে সংযম এবং গাঢ়বদ্ধতার অভাব ঘটতে পারে।

'পরমরমণীয়'তে ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন বিদ্যাসাগরকে দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। তখনও এর

স্বকীয় রূপটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। বিদ্যাসাগর, সঞ্জীবচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনায় ব্যক্তিমনের স্বতন্ত্র উন্মেষ লক্ষ্য করি। কিন্তু বিষয়কে সম্পূর্ণ গৌণ করে ব্যক্তিচেতনাকে পাঠকের কাছে অনাবৃত তাঁরা করেন নি। আর্ট হিসাবে এর চর্চা তখনও হয় নি। সাহিত্যে ব্যক্তিচেতনার অনুপ্রবেশেই আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ। বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিচেতনার বৈঠকী রূপ যেখানে যতটুকু অসতর্কভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়েছে সেখানেই আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বিষয়-গাম্ভীর্যের অটলবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়ে খুশী হই। বিদ্যাসাগরের নামে পাঠকের মনে উৎকৃষ্ট ক্লাসিক গদ্যরীতির লেখকের যে-মূর্তিটি ভেসে ওঠে স্বভাবত ব্রজবিলাসে তার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত রূপটি পাঠককে আনন্দিত করবেই। সাধারণভাবে দেখছি, এ যুগের লেখকরা বিষয়নিষ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে রীতিনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন নি। এই প্রসঙ্গে মনে হল, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধটি (যেটা বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকৃতি সহকারে কমলাকান্তের দপ্তরে স্থান দিয়েছেন) সংকলনে দেওয়া চলত।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারাকে যদি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যায়, তবে প্রথম পর্যায়ে এই লেখকদের রচনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টির সূচনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যক্তিরূপটি সাহিত্যে আপন প্রভায় উজ্জ্বল। বিষয় হয়েছে গৌণ, কিন্তু তার পরিবর্তে এসেছে ভাবের অনন্যসাধারণ ঐশ্বর্য। সামান্যকে অবলম্বন করলেও ভাবটি অসামান্য ব্যঞ্জনায় গভীর। প্রবন্ধ-লেখক তখনও ভাবনিষ্ঠ, রসার্দ্র। প্রবন্ধে ব্যক্তির কল্পনা-ভঙ্গিই বড়ো এবং সেই হিসেবে এগুলি যে খাঁটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তাতে সন্দেহ নেই। লিরিকের ধর্মে এবং এই জাতীয় প্রবন্ধের ধর্মে মিল অমূলক নয়। পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় লিরিকের প্রসারের সঙ্গে এর প্রসারও তাই অর্থপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ— প্রধানত এই তিনজনকেই এই সময়ের প্রতিনিধি বলে ধরা চলে।

প্রমথ চৌধুরী থেকে তৃতীয় পর্যায়ের শুরু। পরবর্তী কালে যাঁরা রম্যরচনার প্রধান লেখক বলে গণ্য হয়েছেন, ভাষা এবং রীতির দিক দিয়ে তাঁদের অনেকেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের অনুবর্তী। আধুনিক অর্থে রম্যরচনার নির্দিষ্ট রূপটি এঁদের হাতেই গড়ে উঠেছে। সংকলনের দিকে তাকালেই দেখা যাবে— সংখ্যায় এঁরাই অধিক। স্বাভাবিক কারণেই এঁদের সংখ্যাধিক্য। প্রবন্ধগুলোর নামের বৈচিত্র্যেও বুঝতে পারা যায় লেখকসত্তা কত দিক্ দিয়ে আলোড়িত হচ্ছে। লেখকমন কত গতিশীল এবং সপ্রতিভ। জীবনের গভীরতর উপলব্ধির ধ্যানমগ্ন শান্তি যদি সে হারিয়ে থাকে, সংবাদমুখর জগতের কোলাহলের মাঝখানে জেগে উঠে সেই ক্ষতি সে পূরণ করেছে। রম্যরচনা এখন সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বিপজ্জনক সংকীর্ণ সীমারেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। সংকলক ভূমিকায় বলেছেন, 'জার্নালিসটিক লিটারেচর' ধরনের রচনাকে তিনি সাবধানে পরিহার করেছেন। রম্যরচনা যে কোন্ আশঙ্কা দ্বারা সর্বদাই তাড়িত হচ্ছে, সংকলকের এই সতর্কতাই তার ইঙ্গিত। সংকলন-কার্যে তাঁর এই সতর্কতার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কোনো প্রবন্ধই কৃত্রিম মনে হল না। বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্ন মেজাজের সান্নিধ্যে এসে পাঠকও চকিত কৌতূহলী এবং আনন্দিত বোধ করবেন। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, পরিমল রায়, ইন্দ্রজিৎ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মুজতবা আলী, সুশীল রায়, রূপদর্শী এবং অন্যান্য যাঁরা রম্যরচনার আদর্শ লেখক বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রচনারীতির বিভিন্নতা বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তার সৌরভ নিয়ে আসে। কেউ ভাষায় আলংকারিক রীতির পক্ষপাতী, কেউ নেহাত মজলিশি চালের মানুষ,

সালের। একশত দশ বৎসর পার হয়ে গেল; এখন দেখা যাবে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত করে বইয়ের জগৎ কি আশ্চর্য বিস্তার লাভ করেছে! অবশ্য রেডিও, সিনেমা, ইত্যাদির বহুল প্রচারের ফলে আমাদের জীবনে বইয়ের প্রভাব যে কিছুটা হ্রাস হতে পারে,—এমন আশঙ্কা অমূলক নয়।

বাংলায় বই সম্বন্ধে বই নেই। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় দু-একটি প্রবন্ধ দেখেছি। 'প্রিণ্টার্স গাইড' নামে বাংলায় যে বইটি আছে সেটি ছাপাখানার কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের সহায়ক, সাধারণ পাঠকের উপযোগী নয়। সুতরাং বইয়ের জগৎ সম্বন্ধে শ্রীবিনয় ঘোষ ও শ্রীঅশোক ঘোষের বই দুটি একই সঙ্গে পেয়ে আনন্দ লাভ করেছি। বাংলা সাহিত্যের একটি অভাব তাঁরা পূরণ করবার চেষ্টা করেছেন। এজন্য লেখক ও প্রকাশকদের আমরা অভিনন্দন জানাই।

শ্রীবিনয় ঘোষের 'জনসভার সাহিত্যে' '··সাহিত্যিকের ইতিহাস, তাঁর সমাজের ইতিহাস এবং তাঁর পেট্রন রাজা-রাজড়া, মুদ্রক প্রকাশক ও পাঠকদের ইতিহাস' আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর পরিধি বিস্তৃত; তাকে গ্রন্থের স্বল্লায়তনে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করবার কৃতিত্ব লেখক দাবি করতে পারেন। এই বই থেকে পাঠক বিদেশী সাহিত্য, বিদেশী লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানতে পারবেন যা পূর্বে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা হয় নি।

"জনসভার সাহিত্য" তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রাজসভার সাহিত্য বা পেট্রনের যুগ, দ্বিতীয় ভাগে রাজসভা থেকে জনসভায় যাত্রার কাহিনী, তৃতীয় ভাগে জনসভার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। "প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস হল পেট্রন ও লেখকের ইতিহাস" (পৃ ৪৩)। লেখকের মতে এ যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল এই: "পেট্রন যুগের কবিদের যেন অস্থি বিন্যাসই ছিল অন্য রকম। মেরুদণ্ড তাঁদের সবসময় বেঁকেই থাকত এবং ঘাড় থাকত হেঁট হয়ে। কাব্যচর্চার চেয়ে মোসাহেবি ও ভাঁড়ামির চর্চাতেই তাঁরা পটু ছিলেন বেশি" (পৃ ৩০)। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সম্বন্ধে এরূপ একটি সাধারণ মন্তব্য সমীচীন হয়নি। কারণ বেদ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্য এই মন্তব্যের আওতায় পড়ে। পেট্রন-যুগের সাহিত্যের প্রতি লেখক কঠোর অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। তাঁর যুক্তি সমর্থিত হতে পারে শুধু এরূপ কবি ও কাব্যের কথা উল্লেখ করায় সমগ্র সত্য আলোচিত হয় নি। কালিদাসও সভাকবি ছিলেন। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বলে কি তাঁর রচনাবলী উপেক্ষা করা যায়? পেট্রন থাকাটাই যদি সাহিত্যের অপকর্ষের কারণ বলে স্বীকার করতে হয় তাহলে সংস্কৃত সাহিত্য তো সম্পূর্ণরূপেই বাতিল হবার আশঙ্কা।

মধ্যযুগে রাজসভার বাহিরেও যে সাহিত্য রচিত হত বিনয়বাবু তারও কোনো উল্লেখ করেননি। বৈষ্ণবকবিতা, বাউল-সংগীত ও পূর্ববঙ্গগীতিকার মতো পল্লীগীতি রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্য দু রকম: ওষধিজাতীয় এবং বনস্পতিজাতীয়। রাজার স্তুতিগায়ক সভাকবির রচনা ওষধিজাতীয়। অথচ একমাত্র এই-জাতীয় সাহিত্য আলোচনা করে লেখক তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রাজা, সরকার অথবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা দল চিরকালই স্তুতি লাভ করে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে তা করা হয়। একালেও তা আছে। সভাকবি নেই বটে, কিন্তু প্রচার-দপ্তর আছে, সংবাদপত্র আছে। তারা সরকার বা দলবিশেষের গুণকীর্তন করে। মধ্যযুগে গদ্যরীতি প্রচলিত ছিল না, তাই প্রচার-দপ্তরের কাজ হত কাব্যে। শুধু এইজন্য একে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়ে প্রাধান্য দেবার কারণ নেই।

লেখকের আর একটি মন্তব্যের সঙ্গেও আমরা একমত হতে পারি না। তিনি লিখেছেন, মধ্যযুগে "কোন মমতাবোধ ছিল না মানুষের প্রতি বা জীবনের প্রতি।" য়ুরোপের সাহিত্য সম্বন্ধে এ কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু বাংলা কিংবা ভারতের সাহিত্য সম্পর্কে এই উক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করা যায় না। মধ্যযুগের বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের মতো এমন দৃপ্ত ঘোষণা আর কে করেছেন যে, মানুষই পৃথিবীতে সব-কিছুর উপরে একমাত্র সত্য? আমাদের পল্লীগীতি ও মঙ্গলকাব্যে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা যেরূপ মর্মস্পর্শী ভাষায় বলা হয়েছে তা থেকে কবিদের মানবতাবোধ ও সহানুভূতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহিত্যের কথা না হয় বাদই দিলাম। শ্রীচৈতন্য, দাদু, কবীর প্রভৃতি মানবপ্রেমী মহাপুরুষরা মধ্যযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ দেশে মধ্যযুগে মানবপ্রীতির এক জোয়ার এসেছিল।

সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা একটি ধাপ মাত্র। সেটা অত্যাবশ্যক ধাপ। যখন বই ছাপিয়ে বিক্রি করবার উপায় ছিল না তখন রাজা-রাজড়ার পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া লেখকের বাঁচবার পথ কোথায়? এখন কেউ একখানি ভালো বই লিখলে অর্থপ্রাপ্তির আশা করতে পারে। পূর্বে মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব ছিল না বলেই ব্যক্তিবিশেষের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করতে হত।

এখন লেখকদের পৃষ্ঠপোষক কে? নিশ্চয়ই পাঠক। একদল লেখক পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ বিসর্জন তো এখনো দিয়ে থাকে। সুতরাং কিছু-সংখ্যক লেখক চিরকালই পৃষ্ঠপোষকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। তবে আশার কথা, এদের রচনা সাহিত্যরসিকের নিকট সমাদৃত হয় না।

বিনয়বাবু ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত য়ুরোপের মুদ্রণ ও প্রকাশনের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এদেশের পাঠক শিক্ষণীয় অনেক নতুন কথা পাবেন। ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন: "লেখকদের লুণ্ঠন করাই প্রথম যুগের প্রকাশকদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য প্রকাশকদের প্রথম যুগটাকে অনেকে literary piracyর যুগ বলেছেন। কমার্সিয়াল পাইরেসির মতন লিটারারি পাইরেসি ছিল প্রকাশকদের নীতি। যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে প্রকাশকরা লেখকদের পাণ্ডুলিপির সর্বস্বত্ব কিনে নিতেন, লভ্যাংশ বা রয়ালটি দিয়ে নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে যেসব সাহিত্যিক এই ভাবে প্রকাশকদের লুণ্ঠন-নীতির দৌরাত্ম্য সহ্য করেন, তাঁদের মধ্যে সেক্সপীঅরও ছিলেন। অনেক নাটক সেক্সপীঅর এইভাবে প্রকাশকদের হাতে সমর্পণ ক'রে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

লিটারারি পাইরেসির এই ব্যাখ্যা যথার্থ বলে মনে হয় না। লেখককে পারিশ্রমিক (যত কমই হোক) দিয়ে এবং তাকে জানিয়ে বই প্রকাশ করলে 'পাইরেসি' বলার প্রচলন নেই। কার্টার লিটারারি পাইরেসির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল এই: "A term commonly applied (sometimes with, sometimes without, legal accuracy) to an edition produced and marketed without the authority of, or payment to, the author."

"বাংলা বইয়ের ইতিবৃত্ত" অধ্যায়টি আরো বিস্তৃত হলে আমরা আনন্দ লাভ করতাম। এই বিষয় নিয়ে একটি পৃথক বই লিখতে বিনয়বাবুকে অনুরোধ করছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাংলা বইয়ের কাটতি সম্বন্ধে বিনয়বাবু যা বলেছেন সে বিষয়ে আমরা একমত। য়ুরোপের সুইডেন প্রভৃতি দেশের মোট লোকসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষর লোকসংখ্যার প্রায় সমান। পূর্ব-পাকিস্থান ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বাঙালীদের বাদ দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ৬১ লক্ষেরও বেশি। সুতরাং য়ুরোপের ছোট ছোট দেশের সাহিত্য যদি আত্মনির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি না হবার কারণ নেই। একটি ভালো বই দশ-বিশ হাজার কপি বিক্রি হবার আশা করাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ না করবার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ব্যাহত হয়ে আছে। বাঙলার শেষ স্বাধীন নৃপতির সভাকবি সংস্কৃতে কাব্য রচনা করেছেন। তারপরে যথাক্রমে মুসলমান আমলে ফারসী এবং ইংরেজ আমলে ইংরেজী হয়েছে আমাদের সরকারী ভাষা। স্বাধীনতার পরে বাংলা ভাষার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সুযোগ এসেছিল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করবার। কিন্তু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয়নি। বাংলা এখনো প্রধানত চিত্তবিনোদনের ভাষা হয়ে আছে। যেদিন বাংলা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ভাষা বলে স্বীকৃত হবে সেদিন থেকে আমাদের সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির পথটা মুক্ত হয়ে যাবে।

শ্রীঅশোক ঘোষের 'মুদ্রণ বিশারদে' ছাপাখানার কাজ সম্বন্ধে সুন্দর বিবরণ পাওয়া যাবে। লেখকের ভাষা সহজ ও সাবলীল। বইটি কিশোরদের জন্য রচিত হলেও বড়রাও উপকৃত হবেন। টাইপ, কম্পোজিং, ছাপা, কাগজ, ব্লক, রঙিন ছবি ছাপবার কৌশল, প্রুফ দেখা, বই বাঁধাই, ইত্যাদি বিষয়গুলি সরল করে লেখক বুঝিয়ে বলেছেন। বন্ধনী ব্যবহার করায় পড়তে গিয়ে বাধা পেতে হয়। এগুলো না থাকলেই ভালো হত এবং কথাবার্তার আঙ্গিক ব্যবহার করবার প্রয়োজন ছিল না। যে-সব শব্দের বাংলা নেই তাদের ইংরেজী রূপ পাশে দিয়ে দিলে পাঠকদের সুবিধা হত। 'ফরমা' শব্দটির আসল রূপ যে 'forme' তা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব না-ও হতে পারে।

বাংলা মুদ্রণের ক্ষেত্রে যাঁরা পথিকৃৎ লেখক তাঁদের প্রথমেই স্মরণ করেছেন। কেরির আগে হবে পঞ্চানন কর্মকারের নাম। এবং তারও আগে থাকা উচিত ছিল উইলকিন্সের নাম,— যে নাম অশোক-বাবু উল্লেখ করেন নি।

লেখক এবং প্রকাশক কি সত্যি বিশ্বাস করেন এ বই পড়ে কেউ 'মুদ্রণ বিশারদ' হতে পারে ? 'বিশারদ' কথাটি গুরুগম্ভীর এবং একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং লঘু অর্থে এর ব্যবহার না হলেই ভালো হত। সাধারণ পাঠকের জন্য মুদ্রণশিল্প সম্বন্ধে ভূমিকার কাজ করলেই কি বইটির উদ্দেশ্য সার্থক হল বলা যায় না ?

'মুদ্রণ বিশারদে' নির্ভুল ছাপা এবং প্রথম শ্রেণীর মুদ্রণপারিপাট্য আশা করেছিলাম। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করবার জন্য কতকগুলি ছবি ব্যবহার করায় ফল ভালোই হয়েছে। তবে মেশিনের ছবিগুলি এত ছোট এবং অস্পষ্ট যে পাঠকদের কোনো উপকার হবে না।

'জনসভার সাহিত্য'ও মুদ্রণের ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। মুদ্রণ ও প্রকাশন সম্বন্ধে বই বলে প্রকাশকদের নির্ভুল ও সুন্দর ছাপার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

বাংলা কবিতার বইয়ে প্রথম অলংকৃত প্রচ্ছদের ব্যবহার আরম্ভ হয়। তারপরে গল্প ও উপন্যাসের প্রচ্ছদেও এর রেওয়াজ আসে। আলোচ্য বই দুটি প্রবন্ধের বই ; তবু এদের প্রচ্ছদের অলংকরণও লক্ষণীয়।

"জনসভার সাহিত্যে"র প্রচ্ছদের জন্য প্রকাশক বেশ অর্থ ব্যয় করেছেন, দেখতেও ভালো হয়েছে। আমাদের প্রকাশকেরা এই ধরনের প্রচ্ছদ ব্যবহারের রীতি যেরূপ দ্রুত গ্রহণ করছেন তার ফল কি হবে তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। প্রকাশকেরা প্রচ্ছদের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় করেন শেষ পর্যন্ত তা ক্রেতাকেই দিতে হয়। বাংলা বইয়ের ক্রেতা কম; অত্যাবশ্যক ব্যয় বরাদ্দ মিটিয়ে বই কেনার সামর্থ্য খুব বেশি লোকের থাকে না। প্রচ্ছদের জন্য বইয়ের দাম যদি বাড়ানো হয় তাহলে ক্রেতারা ক্রমশঃ বিরূপ হবে। প্রচ্ছদের বাহার না থাকলে বই বিক্রি হয় না, এ যুক্তি অচল।

বেশি দাম দিয়ে বই বাড়ি আনবার পর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রচ্ছদ খুলে যায়। কারণ এ ধরনের বই বাঁধাই করা হয় না, যা করা হয় তাকে ইংরেজীতে বলে 'কেসিং'। যদি বইটি রাখতে চান তাহলে দপ্তরীর বাড়ি পাঠিয়ে বাঁধিয়ে আনতে হবে। এই দোকর অতিরিক্ত ব্যয় করতে না হলে পাঠক এই পয়সা দিয়ে আর একটি বই কিনতে পারত। সুতরাং আপাতসুন্দর খেলো প্রচ্ছদ পরিণামে বাংলা বইয়ের ক্ষতি করবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা গণেশের আমল ॥ শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়। শৈলশ্রী, কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার ইতিহাসে খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেবল যে রাজনৈতিক দিক দিয়াই এ কথা সত্য, তাহা নহে— এই শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, তেমনই বাংলার সামাজিক ইতিহাসে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং সাহিত্যের ইতিহাসে কৃত্তিবাস ও বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব তেমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান শাসনের মধ্য হইতে রাজা গণেশের মাধ্যমে আকস্মিক একটি হিন্দু রাজশক্তির অভ্যুদয়ের প্রভাব খুব সুদূরপ্রসারী না হইলেও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে কৃত্তিবাস-চণ্ডীদাস-চৈতন্যের আবির্ভাব সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে মধ্যযুগের বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক জীবন ইহাদের দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। অতএব এই এক শতাব্দী কালের উপর ভিত্তি করিয়া যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভব, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব যাহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই শতাব্দীর গুরুত্বটি উপলব্ধি করা সত্ত্বেও ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক পরিচয় এ পর্যন্ত কেহই প্রকাশ করেন নাই। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, বর্তমান গ্রন্থকার এই শতাব্দীর গুরুত্বটি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া এই বিষয়ে সকল শ্রেণীর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিষয়টির গুরুত্ব যাহাই থাকুক-না কেন, এই বিষয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর কোনো গ্রন্থ রচনা করা যে সহজসাধ্য নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিও যে এই বিষয়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রচনা তাহাও বলিতে পারা যায় না, তবে ইহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্যানুসন্ধান করিয়া রাজা গণেশের কাল নিরূপণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এ সম্পর্কে যে-সকল জনশ্রুতি সহজ ইতিহাস-রচনার অবলম্বন হইয়াছে, তাহাদিগকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মূল্য বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে প্রচলিত এই

বিষয়ক বিভিন্ন মতগুলিও তিনি পরিবেশন করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থখানি কেবল তাঁহার নিজস্ব মতবাদের বাহন না হইয়া এই বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদের পরীক্ষা-ক্ষেত্র হইয়াছে।

গ্রন্থটিকে আপাতদৃষ্টিতে লেখকের রচিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের সমষ্টি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্য দিয়া একটি যোগসূত্রের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। 'রাজা গণেশ ও তাঁর বংশ' শীর্ষক সর্বপ্রথম প্রবন্ধটির ভিতর দিয়া রাজা গণেশ সম্পর্কিত বিস্তৃত ঐতিহাসিক পরিচয় দিবার পর তিনি তাঁহার পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে চীন ও বাংলার রাজনৈতিক সংযোগ' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটির ভিতর দিয়া দুষ্প্রাপ্য চৈনিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া এ যাবৎ অজ্ঞাত কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। রাজা গণেশের সম্পর্কিত কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য তথ্য চৈনিক উপকরণ হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার বাংলার ইতিহাসের উপর একটি নূতন আলোক-সম্পাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহার পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধে যথাক্রমে 'রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র' 'কবি চণ্ডীদাস' এবং 'চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি'র বিষয় অবলম্বন করিয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় দিক হইতে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কবি-কৃত্তিবাস রাজা গণেশের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন বলিয়া লেখক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, রাজা গণেশই কবি কৃত্তিবাসকে রামায়ণ অনুবাদ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে এখন পর্যন্তও এদেশে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকেন। বর্তমান গ্রন্থকারেরও মতবাদ সকল দিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যোগ্য।

রাজা গণেশের রাজসভার সঙ্গে রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই লেখক অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'তিনি শুধু মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন না, বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের কুটিল ঘটনাপ্রবাহ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তাই তিনি সবদিক দিয়েই অনন্যসাধারণ' (পৃ ৮৭)। এই সূত্রেই তাঁহার বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার সর্বশেষ প্রবন্ধে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক কিনা এবং তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহা কতদূর সত্য এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বড়ু চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের বাংলার একটি গৌরব-রত্ন। রাজা গণেশের সঙ্গে তাঁহার কোনো সম্পর্ক ছিল এমন দাবি এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই। অতএব তাঁহার বিষয়ক আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে স্থান লাভ করিবার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন হইতে পারে। তবে গ্রন্থকার বিভিন্ন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহারে দাবি করিয়াছেন যে, 'কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস একই সময়ে বর্তমান ছিলেন (পৃ ১৪০)।' বিষয়টি বিস্তৃততর তথ্যের উপর আরও নানা দিক হইতে আলোচনার যোগ্য।

গ্রন্থকার বাংলার ইতিহাসের কতকগুলি বিতর্কমূলক বিষয় অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি সকল দুরূহ বিষয়ের সুচারু মীমাংসা করিতে পারিয়াছেন, এমন দাবী তিনি নিজেও নিশ্চয়ই করিবেন না। তবে তাঁহার গ্রন্থখানিতে যে অধ্যবসায় ও তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রশংসনীয়।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

স্বরলিপি

ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ॥
তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তোমার তাই ব'লেই কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ।
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো সবায় আপন ক'রে ফেলেছ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

[মা -ণা ণা]
সা সা সা II সা -ধা ধা । {ধা ধা -ণা I ধা ধা -ণা । ধা পা -া[র] I
জো না কি কী ০ সু খে ও ই ডা না ০ দু টি ০

I রা রা -গা । মা -পা -া I (মা -পা মা । গা রসা -া I
মে লে ০ ছ ০ ০ ও ০ জো না কি০ ০

I সা -ধা ধা)} । সা সা -মা । মা মা -া I -া -া -া । -া -া -গা I
কী ০ সু আঁ ধা র্‌ সাঁ ঝে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I রা রা -পা । পক্ষা পা -া I -া -া -া । -া -া -া I
ব নে র্‌ মা০ ঝে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধা -া না । র্সা র্সনা -র্রা I র্সা নর্সা -ধা । পা -া -া[র] I
উ ল্‌ লা সে প্রা০ ণ্‌ ঢে লে০ ০ ছ ০ ০

I রা -ণা ণা । ধা পা -া I[ ]I
ও ০ জো না কি ০

II -া -া -া । -া পা পা I পা -া পা । ধা -া না I
০ ০ ০ ০ তু মি ন ও তো সূ র্‌ য

I র্সা -া র্রা । র্রগা -র্রা -র্সনা I র্সা -া -া । র্সা না -র্সা I
ন ও তো চ০ ০ ০ন্‌ দ্র ০ ০ তো মা র্‌

I ধনা -ধা না । র্সা -া র্রা I র্সা -া র্সনা । র্সা -া -না I
তা০ ই ব লে ই কি ক ম্‌ আ০ ন ০ ন্‌

I র্সা -া -নর্সা । ধা পা -া I ধা না -া । র্সা র্সা -নর্রা I
দ ০ ০০ তু মি ০ আ প ন্ জী ব ০ন্

I র্সা -া না । ধা পা -া I ধা ধা -ণা । ধা পা -া[র] I
পূ র্ ণ ক রে ০ আ প ন্ আ লো ০

I রা রা -গা । মা -পা -া I মা -পা মা । গা রসা -া II
জ্বে লে ০ ছ ০ ০ ও ০ জো না কিং ০

II {-া -া -া । -া সা সা I সা -মা মা । মা মগা -পা I
০ ০ ০ ০ তো মার্ যা ০ আ ছে তাং ০

I পা পা -া । পা পা -া I -া -া -া । -া পা পা I
তো মা র্ আ ছে ০ ০ ০ ০ ০ তু মি

I ধা -া না । র্সা র্রা -া I র্সা না -র্সনা । ধা পা -া I
ন ও গো ঋ ণী ০ কা রো ০০ কা ছে ০

I -া -া -া । -া পা পা I ধা -া না । র্সা র্রা -া I
০ ০ ০ ০ তো মার্ অ ন্ ত রে যে ০

I র্সা -া না । ধা পা -া I ধা ধা -ণা । ধা পা -া[র] I
শ ক্ তি আ ছে ০ তা রি ০ আ দে শ্

I রা রা -গা । মা -পা -া} I -া -া -া । {-া পা পা I
পে লে ০ ছ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তু মি

I পা পা -া । ধা ধা -না I র্সা র্রা র্রা । র্রগা -র্রা -র্সনা I
আঁ ধা র্ বাঁ ধ ন্ ছা ড়ি য়ে ও০ ০ ০০

I র্সা -া -া । র্সা না -র্সা I ধা না -া । র্সা র্সা -র্রা I
ঠ ০ ০ তু মি ০ ছো টো ০ হ য়ে ০

I র্সা -া না । র্সা -া -না I র্সা -নর্সা (-া)} । ধা । পা পা -া I
ন ও গো ছো ০ ০ টো ০০ ০ জ গ তে ০

I ধা না -া । র্সা র্রা -া I র্সা না -র্সনা । ধা পা -া I
যে থা য়্ য ত ০ আ লো ০০ স বা য়্

I ধা ধা -ণা । ধা পা -া[র] I রা রা -গা । মা -পা -া I
আ প ন্ ক রে ০ ফে লে ০ ছ ০ ০

I মা -পা মা । সা রসা -া II II
ও ০ জো না কিং ০

গোষ্ঠলীলা । বাংলা পট

অজিত ঘোষের সৌজন্যে

বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৬৩

চিঠিপত্র

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন

আমাকে যখন কেহ পথের কথা জিজ্ঞাসা করে তখন মনে মনে হাসি এবং মনে মনে বলি— হায় রে আমার কপাল! স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পাইলে নিজে বাঁচিয়া যাই অন্যকে পথ দেখাইব কিসের!

কিন্তু শিশুকাল হইতে সকল রকমে ইহাই দেখিলাম পথটাকে অস্পষ্ট করিয়া দিয়াই তিনি মজা করিতেছেন। জীবনটা শুধু কেবল পথে চলা নহে, খুঁজিয়া রাস্তা বাহির করা।

শতসহস্র পথের মধ্যে কেবল একটা পথ আছে যাহা আমার— নানাপ্রকার পরখ করিতে করিতে সেইটে বাহির করাই আমার সমস্ত শক্তির পরিণাম। আজ পর্য্যন্ত কেবল এই কাজই করিয়া আসিয়াছি— তাহাতে দুঃখও পাইয়াছি আনন্দও পাইয়াছি— এখনও নিঃসংশয় হই নাই। কিন্তু ভয় কাটিয়া গিয়াছে; একথা আর মনে হয় না যে একেবারে পথ হারাইয়া ধাঁদার মধ্যে পড়িয়া মারা যাইব। ইহা বেশ বুঝিয়াছি এই পথ খোঁজার মধ্যেই জীবনের সকলের চেয়ে বড় শিক্ষাটা আছে— যদি খুঁজিতে না হইত তবে আর যাহা পাই নিজেকে পাইতাম না। গুরুকে পাইয়াই বা লাভ কি, শাস্ত্রকে পাইয়াই বা লাভ কি— নিজেকে না পাইলে নয়— তাই নিজেকে এত করিয়া ঘুরাইতে হয়। কর্ম্মের পথও যেমন সত্য কর্ম্মত্যাগের পথও তেমনি সত্য— প্রত্যেকের পক্ষে ইহার সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যটি ঠিক যে কোন্‌খানে তাহা বাহির হইতে কোনোমতেই শেখা যায় না— তাহা বিচিত্র পরীক্ষা হইতে উৎপন্ন এমন একটি নৈপুণ্য যাহা কাহাকেও হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না। পোদ্দার যেমন ক্রমাগত টাকা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে স্পর্শমাত্রে মেকি টাকা অনুভব করিতে পারে কিন্তু সেই অনুভূতি শেখাইতে পারে না এও সেইরূপ। না শিখাইতে পারার একটা প্রধান কারণ প্রত্যেকের বোধশক্তির একটি বিশেষত্ব আছে— আমি ঠিক যেখানে পৌঁছিলে বুঝি আর একজন ঠিক সেখানটি পৌঁছিলে বোঝে না— মাত্রার তারতম্য আছে সুতরাং প্রত্যেক্যের focus ঠিক একটি বিন্দুতে নয়। এই বিন্দুটিকে ধ্রুব করিয়া ধরিবার চেষ্টায় আছি— তাই কখনো কাজ করিতেছি কখনো কাজ ছাড়িতেছি কখনো একটুখানি

এগোইতেছি কখনো একটুখানি পিছাইতেছি— এমনি করিতে করিতে ঠিক জায়গাটিতে গিয়া পৌঁছিব। পৌঁছিবার পূর্বে যে একেবারে নিছক দুঃখ তাও ত আমার মনে হয় না। হঠাৎ এক একবার একটা দিক হইতে দৃষ্টি যে একটু খোলসা হইয়া যায় তাহাতে যেটুকু পাওয়া যায় তাহার চেয়ে আভাস পাওয়া যায় অনেক বেশি— তখন বোঝা যায় এ একটা খেলা হইতেছে, লুকাচুরি খেলা, ইহা ধরা না ধরার মিশ্রিত খেলা— ইহাতে অত্যন্ত বেশি হতাশ হইবার দরকার নাই— কেননা এটুকু জানা গেছে যে যিনি খেলাইতেছেন তিনি কাছেই আছেন— তাঁহাকে না ধরিয়া খেলা শেষ হইবে না। তিনি আছেন, তিনি আছেন, বাস্ আর ভয় নাই— তিনি যেমনি ভান করুন, তিনি আছেন এইটেই আমার পক্ষে প্রচুর— আমার সমস্ত ভয় ভাবনা ইহার মধ্যে ছায়ার মত বিলুপ্ত হইতেছে। যাহা হয় তাহাই হউক্ এইটে খুব জোর করিয়া বলিয়া তারপরে কোমর বাঁধিয়া খেলিতে লাগা যাক্। সে খেলার মধ্যে সবই আছে— ভাবও আছে রূপও আছে, আনন্দও আছে তপস্যাও আছে, এড়ানোও আছে, ধরা দেওয়াও আছে।

আমার বোট কুষ্টিয়ায় আসিয়া পৌঁছিল— এবার কলিকাতার মুখে ছুটিয়াছি। আবার এখানে ফিরিব এমন আশা আছে। ইতি ২৬শে কার্তিক ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

আমি এখন উড়িবার মুখে।[১] কিছুদিন হইতে মনটা পালাই পালাই করিতেছিল— কিন্তু খাঁচার দ্বার খুলিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। অবশেষে নিজেই রুদ্ধ দরজা ভাঙিয়াছি। কাজকর্ম্ম লাভ লোকসান উচিত অনুচিত কোন কিছুর দোহাই মানিব না— এবার বাহির হইব এই পণ করিয়াছি। আমার পক্ষে কর্ম্মের যে প্রয়োজন ছিল সে বোধ করি শেষ হইয়াছে। এখন আর মন পিছনে তাকাইতে বা কোনো কাজের কথায় কান দিতে পারিতেছে না। এমন সময়ে আপনারা আমাকে আর পিছু ডাকিবেন না। নিমন্ত্রণ যদি করেন তবে পত্র পাঠাইবেন কোন্ ঠিকানায়— আমি যে বড় রাস্তায়। নদী যেমন চলিতে চলিতে নিজের বেগে আপনার পথ কাটিয়া লয়— কোনো খাল কাটা এঞ্জিনিয়রকে শিকি পয়সা বেতন দেয় না— আপনারও শক্তি তেমনি নিজের গতিপথ নিজের দ্বারাই জয় করিয়া লইবে। আপনার বলিবার কথাই আপনার বাহনকে দুরন্ত করিয়া লইবে— শুধু তাই নয়, শ্রোতাকেও কানে ধরিয়া টানিয়া আনিবে।

আমার এখন বিদায়ের সময় আসিয়াছে— আপনার অভ্যুদয় কামনা করি। "স তপোঽপ্যত" এই

১ এই সময় রবীন্দ্রনাথের বিলাত-যাত্রার আয়োজন চলিতেছে।

বাক্যকে স্মরণ করিয়া তপস্যাকে আশ্রয় করিবেন— রূপ পরিগ্রহের সাধনা ও বেদনার দ্বারা আপনার ভাবের সম্পদকে সার্থক করিয়া তুলিবেন। ঈশ্বর যাহা আপনাকে দিয়াছেন তপস্যার দ্বারা তাহাকে আপনার করিয়া লইতে না পারিলে দান করিবার অধিকার লাভ করিবেন না। নিজের ধনই আমরা দিতে পারি ঈশ্বরের ধন দিতে গেলে কেহ তাহা লইতে পারে না। ইতি ২৯শে আশ্বিন ১৩১৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

কোনোদিন উপাধির[২] অপদেবতা আমার স্কন্ধে ভর করিবে এমন আশঙ্কা স্বপ্নেও আমার মনে আসে নাই। অবশেষে বনগমনের বয়সে সেটাও ঘটিল। আমার নামটার সঙ্গে একটা আওয়াজের যন্ত্র বাঁধিয়া দিয়া বিধাতা এ কি কৌতুক করিলেন? ঝুমঝুমি সাপের পুচ্ছদেশে ভর করিয়া তাহার নকীব তাহার আগমন ঘোষণা করিতে থাকে— আমার মত নিরীহ জীবের পক্ষে ত সেরূপ বিধান অনাবশ্যক। আমার কাব্যলক্ষ্মীর মাথায় এতদিন যে ঘোমটা ছিল সে ভালই ছিল— বিশ্ববিদ্যালয়[২] সেটাকে সভাস্থলে উন্মোচন করিয়া যখন তাঁহার মাথায় পাগড়ি পরাইয়া দিবে তখন সেটা কিছুতেই মানাইবে না।

আপনার দার্শনিক প্রবন্ধটি যখন আমাকে আদরপূর্ব্বক পাঠাইতেছেন তখন সেটা আমি পড়িব কিন্তু এ সকল বিষয়ে আপনি আমাকে অধিকারী ঠিক করিলেন কোন হিসাবে? আমি যে কত আনাড়ি তাহার পরীক্ষা কি এমনি করিয়াই করিতে হয়? চিরকাল আমি ত সাহিত্যের খেলাঘরেই দিন কাটাইয়াছি পাঠশালা ঘরে ত পদার্পণ করি নাই— অতএব শাস্ত্রালোচনার ক্ষেত্রে আমার মত লোকের মান ততদিন বাঁচিবে যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে। মৌমাছির বটানি-শাস্ত্রে যতখানি ব্যুৎপত্তি দর্শনশাস্ত্রেও আমার ততখানি দৌড়। যে সব বিষয়ে আপনাদের কাছে আমি শিক্ষা করিতে পারি সেসব বিষয়ে আপনারা শিষ্যের মত আমার কাছে উপস্থিত হইলে আমি অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। ইতি ১৬ কার্তিক ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

২ এই পত্র লিখিবার কয়েকদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে Honorary Degree of Doctor of Literature দিবার সিদ্ধান্ত করেন (২৮ অক্টোবর ১৯১৩)। বিস্তারিত বিবরণ দেশ ১৩৬৩ সাহিত্য-সংখ্যায় মুদ্রিত শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

আমার সম্মানলাভে[৩] যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ইতি ১লা অগ্রহায়ণ ১৩২০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বকনিবেদন—

আপনাদের আনন্দই আমার পুরস্কার। আমার গৌরবে আপনারা গৌরব অনুভব করিতেছেন ভগবান আমাকে এই যে অধিকার দিয়াছেন ইহাই আমার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অধিকার। নোবেল প্রাইজের একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য আছে কিন্তু প্রীতির ত মূল্য নাই। আপনাদের নিকট হইতে সেই অমূল্য উপহার পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আজ ইহার বেশি বলিবার আমার সময় নাই। ইতি ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

কলিকাতা

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—

মৃত্যুর আঘাত পাইয়াছেন। এই গভীর বেদনা হইতে পবিত্র সান্ত্বনাধারা উৎসারিত হইয়া আপনার জীবনকে অভিষিক্ত করুক এই কামনা করি।

দুর্ভিক্ষকাতর দেশকে ফেলিয়া[৪] জাপানে যাওয়া আমার ঘটিয়া উঠিল না। দুঃখের ভাগ লইতে হইবে।

আপনি তত্ত্বজ্ঞানের নেশায় ভোর আছেন। এ নেশা ভাঙাইতে চাই না। কারণ নেশা জিনিষটা রক্তের ভিতরে গিয়া কাজ করে— সুতরাং ইহার ক্রিয়াটা কেবলমাত্র বুদ্ধি হইতে নহে— জীবন হইতে। অতএব আপনি যতই মাতিবেন আপনার তত্ত্বজ্ঞান ততই প্রাণের সামগ্রী হইয়া উঠিবে। বোধ করি এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞানী শিব নেশায় ভোর হইয়া তবে তত্ত্বজ্ঞানকে হজম করিতে পারেন— নহিলে তাঁহার কৈলাসপুরীটুকুও

৩ রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তি সংবাদে যাঁহারা আনন্দজ্ঞাপন করিয়া পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট প্রেরিত কবির স্বহস্তলিখিত উত্তরের সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত প্রতিলিপি।

৪ দুর্ভিক্ষনিবারণকল্পে এই বৎসর মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফাল্গুনী অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন।

টিঁকিত না— শ্মশান হইয়া যাইত। অন্নপূর্ণা বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজের হাতে তাঁহাকে সিদ্ধি ঘুঁটিয়া দিয়া থাকেন। দিনে দিনে আপনার নেশা বাড়িতে থাকুক্ এবং ক্রমে অচল যোগাসন ছাড়িয়া আপনি নৃত্যে মাতিয়া উঠুন— জটার জটিলতা হইতে রসমন্দাকিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া মাটি ভাসাইয়া দিক্। ইতি ২০ শ্রাবণ ১৩২২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭

ওঁ

শান্তিনিকেতন

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণমেতৎ—

আপনি যে আনন্দ এবং তপস্যা এই দুইকে সার ধরিয়াছেন ভালই করিয়াছেন— কারণ এই দুইয়ের যোগেই সৃষ্টি। বস্তুত এই দুইয়ের মধ্যে আসলে বিরোধ নাই। তপস্যায় আনন্দের আত্মোপলব্ধি— এই দুঃখের যোগ ব্যতীত শুধু আনন্দ ফাঁকা।

পৃথিবীতে অনেকস্থলে দেখা যায় শক্তির সীমা বশত আনন্দ ও তপস্যার বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যই একদল লোক সোপান গড়িতেছে গম্যস্থানের কোনো খোঁজ রাখিতেছে না, আর একদল আকাশে পাখা মেলিয়া উড়িতেছে তাহারা হাঁটা পথের কোনো ধার ধারে না। এই জন্য বিজ্ঞান পদার্থ টা একটা abstraction হইয়া উঠিয়াছে; তাহা প্রমাণ করে, নির্ম্মাণ করে না। তাহা বুদ্ধির ক্ষেত্রে খণ্ডিত হইয়া থাকে, প্রাণের ক্ষেত্রে রসের ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইতে পায় না। বিজ্ঞান বা দর্শন যতক্ষণ technical থাকে ততক্ষণ তাহা, রেশমের গুটির ভিতরকার কীটের মত পরিভাষার সূত্রজালে কারাবদ্ধ, তাহার মধ্যে প্রবেশ কঠিন। এই সূত্রজাল কারখানা ঘরে কাজে লাগিতে পারে কিন্তু ইহা প্রাণের বাহিরে পড়িয়া থাকে। গুটি যখন পরিভাষার জাল কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহিরে আসে তখনি দর্শন বিজ্ঞান রসে রঙে বিচিত্র হইয়া সচল ও প্রাণবান সাহিত্য হইয়া উঠে। যাহারা এই সূত্রজালবদ্ধ গুটির অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রজাপতির অবস্থা পর্যন্ত বরাবর নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া যান তাঁহারাই সত্যের সমগ্রতালাভ করিয়া ধন্য হন।

অতএব আজ আপনি যদি দার্শনিক তর্কসূত্রজালের মধ্যে মনকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া তপস্যা করেন এবং কাল যদি মুক্তির আনন্দলোকে বর্ণচ্ছটাবিচিত্র পক্ষবিস্তার করিয়া বিবরণ করেন তবে আপনার তপস্যা সার্থক হইল। স তপোঽতপ্যত— কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়— স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ— সৃজনেই শেষ যে আনন্দ তপস্যাকে প্রবর্ত্তিত করে সেই আনন্দই সৃজনের মধ্যে রূপধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। অব্যক্ত আনন্দ তপস্যার কঠোরতার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্যক্তরূপে প্রকাশ পায়।

অতএব আপনি এমন মনে করিবেন না, সম্মোহনের দ্বারা তপস্বীর তপোভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্রদেবের বিশেষ পরোয়ানা লইয়া আমি মর্ত্ত্যে আসিয়াছি কিন্তু যাহারা তপস্যাকেই লক্ষ্য বলিয়া প্রচার করে তাহাদের প্রতি আমার দয়ামায়া নাই জানিবেন। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩২২

ভবদীয়

৮

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

প্রীতিনমস্কার সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার লেখাটি সম্পাদকের হাতে দিয়েচি। কিন্তু যেহেতু আমাকে এই প্রবন্ধটির বিষয় করেচেন সেই জন্যে মুদ্রাযন্ত্রে এই রচনার ভবযন্ত্রণা আমি কামনা করি নে— আমি আশীর্ব্বাদ করি এর কৈবল্য লাভ হোক্। যাই হোক্ সে যখন বিধাতাপুরুষের হাতে গেছে তখন তিনি তার ললাটলিপি ঠিক করে দেবেন আমি কোনো কথা ক'ব না।

"শিক্ষার বাহন" লেখাটি পৌষের সবুজপত্রে দেখ্‌তে পাবেন।

৭ই পৌষের উৎসব আসন্ন— সেই নিয়ে কিছু ব্যস্ত এবং ক্লান্ত হয়ে আছি— সমাধা হয়ে গেলে একবার নদীতে বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছা আছে।

✓ চাটগাঁ অঞ্চলে মেয়েলি শিল্প যা-কিছু প্রচলিত আছে সংগ্রহ করে দিতে পারবেন? ওরা লক্ষ্মীপুজা বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে যে সমস্ত আল্‌পনা এঁকে থাকে সেইগুলি কোনো শিল্পপটু মেয়েকে দিয়ে কাগজের উপর আলতার রঙে আঁকিয়ে পাঠাতে পারেন? খাঁটি সেকেলে জিনিষ হওয়া চাই। শিকে, কাঁথা প্রভৃতি গৃহস্থালির শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করতে চাই। আর একটি জিনিষ চাই— চাটগাঁ অঞ্চলে যত বিভিন্ন রীতির কুঁড়ে ঘর আছে তার ফোটো বা অন্য কোনোরকমের প্রতিকৃতি। আপনার ছাত্রদের লাগিয়ে দিলে এটা দুঃসাধ্য হবেনা। ওখানে জনসাধারণের মধ্যে মাটির, কড়ির, বাঁশের বা বেতের শিল্পকাজ কি রকম চলিত আছে ভাল করে খোঁজ নেবেন। আমরা বাংলার প্রত্যেক জেলা থেকে এই সমস্ত গণশিল্প সংগ্রহ করতে ব্রতী। আপনার নিজের জেলার প্রতিও দৃষ্টি রাখবেন।

আপনার স্ত্রীকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাবেন— তিনি এই সংগ্রহকার্য্যে যেন আমার আনুকূল্য করেন।

ইতি ১লা পৌষ ১৩২২

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দার্শনিকপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৫২) মহাশয়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি ১৩৬৩ সাহিত্য-সংখ্যা দেশ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। যৌবনকাল হইতেই সুরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রানুরাগীমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, রবীন্দ্র-রচনার বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—'রবি-দীপিতা' ও RABINDRANATH TAGORE: THE POET AND THE PHILOSOPHER। এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম পত্রখানি পূর্বে অধুনালুপ্ত 'সুহৃৎ' (১৩২০) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য পুনর্মুদ্রিত হইল। চিঠিগুলি শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বঙ্গসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

বঙ্গসংস্কৃতির সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে। তার কারণ, গত দেড় শ বছর ধরে যে পথে যে ভঙ্গীতে এবং যে সামাজিক কাঠামোর চতুষ্কোণে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে আসছিল এখন সব দিকেই তার মৌলিক বদল ঘটতে শুরু হয়েছে। হয়তো নতুন রূপের সন্ধান কোথাও কোথাও কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ভাঙনের ধারাটাই খুব প্রবল হয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে, সমাজবিন্যাস ভেঙে পড়ছে, গ্রামাঞ্চল বিপর্যস্ত। এ পর্যন্ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ। সে সমাজ দ্রুত ভাঙনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুকালের মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজ হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে— অন্ততঃ বর্তমান চেহারায় থাকবে না— এ কথা অমূলক নয়।

সমাজ কখনও স্থাণু নয়, তার ভিতরের তাগিদে এবং নানা শক্তির দ্বন্দ্বে সে অবিরত চলছেই। যখন সেই বিবদমান শক্তির ভারসাম্য হয় তখন আপাততঃ মনে হয় সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। বরং এইরকম ভারসাম্যের সময়ই প্রায়শঃ দেখা যায়, সমাজ তার সৃষ্টির মহোচ্চ শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর যখন সেই বিবদমান শক্তির সংঘাত ভয়ংকর হয়ে ওঠে তখন দেখা যায় সমাজ সৃষ্টির বা অগ্রগতির ক্ষমতা হারায়, অবিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে, মহৎ ও গভীর সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে পড়ে। সকল মহৎ সৃষ্টিই গভীর জীবনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন মানুষ জীবনে বিশ্বাস হারায় তখন মহৎ সৃষ্টি স্বভাবতঃই অসম্ভব হয়ে ওঠে।

কিন্তু ভাঙনেরও দুটি চেহারা আছে। গত শতাব্দীতে যখন পশ্চিমী সভ্যতার প্রবল সংঘাতে এ দেশের প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজ ভেঙে পড়ছিল, নতুন ভাবের উন্মত্ততায় ইয়ং বেঙ্গল দল টলমল করছিলেন, গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যেরা স্বভাবতঃই আত্মগোপন করতে বাধ্য হচ্ছিলেন, দেশের লোকেই সংস্কৃত (বা ফারসী) তাড়িয়ে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রচলন করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন, তার জন্য গণ্যমান্য সকলেই নিজেদের চেষ্টায় ইস্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেছিলেন, সতীদাহ উঠে গেল, দাসত্বপ্রথা বন্ধ হল, দিকে দিকে সমাজসংস্কার শুরু হল, ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলন চলতে লাগল, এমন-কি শেষকালে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ভট্টাচার্যদের উদ্‌ব্যস্ত করে ছেড়ে দিলেন, আচারের নামে যেসব অনাচার চলছিল তা ভেঙে ভাসিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন উদার মানবিকতা। হিন্দুসমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে নতুন রূপ নিল। এও তো ভাঙন, কিন্তু এই প্রলয়ংকর বন্যা শুধু কূলই ভাসায় নি, নতুন ভূসংস্থান গড়তেও সাহায্য করেছে। নতুন আশা, নতুন বিশ্বাস, নতুন সঞ্জীবনী মন্ত্র, নতুন সমাজ গড়বার উদ্যম, নতুন নতুন বীরের আবির্ভাব, নতুন নতুন উজ্জ্বল চরিত্রের আত্মপ্রকাশ। এই আবহাওয়া ছিল বলেই তো মাইকেলের কল্লোলিত কাব্য সম্ভব হয়েছিল, যার নায়ক হলেন রামের পরিবর্তে রাবণ, যার ভাষা মিত্রাক্ষরের বন্ধন ছাড়িয়ে ধ্বনিত হতে লাগল সাগরগর্জনের মত আড়াঁবমা ভেঙে অমিত্রাক্ষরের পংক্তিতে পংক্তিতে, নির্ভীক স্বাচ্ছন্দ্যে দেখা দিল ব্যাকরণের নিয়মভাঙা গুরুচণ্ডালি গুণ। এও তো একরকম ভাঙন, যা জগতের ইতিহাসে বহুবার দেখা

যায়, যাকে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, সামনে লাফ মারবার জন্য সাময়িক পিছু হটা। আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং বৃহত্তর অর্থে ফরাসী বিপ্লব ও রুশবিপ্লবেরও এই কথা।

এই একরকমের ভাঙন আছে, যা নবজন্মের ব্যথায় কাতর, যা সৃষ্টির অগ্রদূত। কিন্তু এ ছাড়াও একরকম ভাঙন আছে যা সে জিনিস নয়, যা কেবলই ভাঙে কিন্তু নতুন কিছু গড়ে না। অন্ততঃ নিকট ভবিষ্যতে কিছু গড়ে না। সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, অথচ নতুন কোনো আশা বা নতুন কোনো বিশ্বাস উজ্জীবন-মন্ত্রের মত কাজ করতে থাকে না, দু-চারজন লোকও সর্বস্ব পণ করে ভবিষ্যৎ নতুন করে গড়বার জন্য দাঁড়ায় না, তেজ স্তিমিত হতে থাকে, শ্রেয় অপেক্ষা প্রেয় বড় হয়ে ওঠে, দেশের অপেক্ষা দল, দলের অপেক্ষা গোষ্ঠী, গোষ্ঠী অপেক্ষাও স্বকীয় স্বার্থ। এই পরিবেশেই জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায় ভবিষ্যতে চরম অনাস্থা, সকল বিষয়েই চরম অবিশ্বাস; আদর্শের কোনো ডাকই জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না, সকল বিষয়েই মনে হয় ও সব করে কি হবে।

সমাজে যখন শক্তির ভারসাম্য হয় তখন সুস্থ অবস্থার সৃষ্টি হয় নিশ্চয়ই, তার চেয়ে কাম্য আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু যখন তা থাকে না তখনও শঙ্কিত হবার কারণ ঘটে না যদি গঠনমূলক ভাঙন দেখা যায়। অর্থাৎ যে ভাঙন নতুন করে গড়বার জন্য ভাঙে। তাতে বহু বেদনা বহু বিপর্যয় আছে সত্য, কিন্তু তা ছাড়া নবজন্মও তো সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি তার বদলে আমরা অমন একটি ভাঙনের আবর্তে পড়ে যাই যা কেবলই ভাঙছে কিন্তু গড়ছে না, অন্ততঃ আপাততঃ গড়বার কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তা হলেই চিন্তার কারণ ঘটে।

ইয়ং বেঙ্গল যুগের বাংলার সঙ্গে তুলনা করলে একালের বাংলার এই পার্থক্যটিই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সেকালে ভাঙার অন্তরালে নতুন সৃষ্টির উদ্‌যোগ আয়োজন চলছিল, অথচ এখন যে ভাঙনের ধারা চলেছে তার মধ্যে সে লক্ষণ নেই। আজকের বৈহাসিকতা ও অবিশ্বাস যে বেড়ে চলেছে, নতুন কোনো সুস্থ অথচ প্রাণচঞ্চল জিনিস গড়ে উঠছে না, আমরা বহু সময়ই স্বকৃত ঘূর্ণাবর্তেই পাক খেয়ে চলেছি এ কথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই। সেইজন্যই এখনকার যে সংকট তা আমাদের চিন্তার কারণ হয়েছে, কারণ অগ্রগতির পথ আবিষ্কার না করতে পারলে আমাদের বহুদিন অন্ধকারে থাকতে হবে, বহু ক্ষয়-ক্ষতিও অনিবার্য।

২

সেই পথ খুঁজতে গেলে প্রথমেই ভালো করে বুঝতে হবে আমাদের বর্তমান অবস্থাটা কি। আমাদের সংস্কৃতির চেহারা কি, আমাদের সংস্কৃতির ধারক-বাহক কারা।

ইতিহাসের একেবারে একাল হতে শুরু করা যাক্‌। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি হতে জানা যায় পশ্চিমবাংলায় সাক্ষর হল মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৪·৫৪%, তার মধ্যে পুরুষেরা ৩৪·৬৮%, মেয়েরা মাত্র ১২·৭৩%। শহর ও গ্রামে সাক্ষরতার তফাত অনেক। কলকাতায় ৫৩·১২% সাক্ষর, সমস্ত শহরগুলিতে মোট জনসংখ্যার ৪৫·১৮% সাক্ষর। অথচ গ্রামের মোট জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১৭·৭৩% সাক্ষর। যদি সাক্ষরতা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উপকরণ হয় তা হলে মানতেই হবে গ্রামীণ মন সংস্কৃতির বিকাশের

সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[১] অথচ এ হতে একটা মস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়। আমাদের গ্রামপ্রধান সমাজ, যুগ যুগ ধরে সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে গ্রাম্য পরিবেশ ও গ্রামসমাজকে জড়িয়েই। এমন-কি এখন পর্যন্ত ঝাঁঝালো শহরে সংস্কৃতির ছাপ আমাদের সাহিত্যে খুব বেশি পড়ে নি। গল্প উপন্যাস বা কবিতাও গ্রামের ছাপই সব-চেয়ে বেশি মাত্রায় বহন করে আসছে। ইতিহাসের এই ধারাকে অস্বীকার করা যায় না। অথচ যদি দেখা যায় লোকসংস্কৃতির ধ্বংসের সঙ্গে সাক্ষরতা তো বটেই, বিদ্যালয়ের শিক্ষাই সংস্কৃতির অনিবার্য উপকরণ হয়ে দাঁড়াল তা হলে বলতেই হবে সে অবস্থায় আমাদের একটি সাংস্কৃতিক সংকট অবশ্যম্ভাবী। আমাদের জীবনের ধারা ও অভিজ্ঞতা চলছে একদিকে, কিন্তু সেদিকে কোনো সাংস্কৃতিক উপকরণ নেই—অথচ যেখানে তা আছে সেখানকার অভিজ্ঞতা এবং স্পন্দন আমাদের জীবনের সামান্য অংশই জুড়ে আছে—এ অবস্থায় সংকট অনিবার্য, সাহিত্যও জীবনমূল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আকাশকুসুম হয়ে পড়তে বাধ্য। তাতে চতুর সাহিত্য হলেও হতে পারে, মহৎ সাহিত্য কখনও নয়। তা ছাড়া এই ছিন্নমূল মানস কখনও নব হতে নবতর মহৎ হতে মহত্তর বিশাল হতে বিশালতর সৃষ্টির পথে যাত্রাও করতে পারে না, সে কেবল বর্তমানের পঙ্কিল আবর্তেই ঘুরপাক খেতে থাকে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশের ন্যূনতম উপকরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যুক্তি মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও আসে তার জন্য সাক্ষরতাই যথেষ্ট কি না। যে-সব গল্প উপন্যাস রচিত হবে তার উপভোগের জন্য সাক্ষরতাই যথেষ্ট? তাতেই কি লেখক ও পাঠকসমাজের চিত্ত স্ফুরিত হবে, পারস্পরিক অভিঘাতে নতুন নতুন স্ফুলিঙ্গ দেখা দেবে, নতুন দিগন্ত দেখা দেবে চোখের সামনে, নতুন নতুন যাত্রাপথ রচিত হতে থাকবে? তা যে হতে পারে না এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার জন্য বস্তুতঃ সাক্ষরতার চেয়েও আরও একটু বেশি উপকরণ প্রয়োজন। অথচ সংখ্যার হিসেবে দেখি, সাক্ষরতার বেলায় যেমন শহরগুলির প্রাধান্য, বেশি উপকরণের বেলাতে সে প্রাধান্য আরও অনেক বেশি। ১৯৫১ সালের সেন্‌সাসের হিসেবে পশ্চিমবাংলায় ম্যাট্রিক-পাশ লোকের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৫২ হাজার; তার মধ্যে কলকাতাতেই ১ লক্ষ ৩২ হাজারের বাস অর্থাৎ ৩৭·৬%। এম-এ বা এম-এস্‌সি পাশের মোট সংখ্যা ১৩,০৯৬; তার মধ্যে কলকাতাতেই ৭,৮২৭ অর্থাৎ ৫৯·৮%। বেশি হিসেব দেবার প্রয়োজন নেই, এ হতেই অবস্থাটা বোঝা যায়। সুতরাং একটি জায়গায় জ্ঞানের দীপটি জ্বালিয়ে বাকি সারা দেশটাকে অন্ধকারে রেখে দিলুম, তাতে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে না। তার উপর যদি দেখা যায় যেখানে জ্ঞানের দীপটি জ্বলল সেখানে প্রাণের কেন্দ্র নেই তা হলে বিকাশ তো দূরের কথা, সংকটতরণের উপায় খুঁজে পাওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

৩

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। লেখাপড়া না জানা থাকলে তা হলে কি সংস্কৃতি হয় না? বিদ্বান্ মাত্রেই সংস্কৃতিবান্ পুরুষ এমনতর অদ্ভুত কথা কখনই বলছি না, কিন্তু সংস্কৃতিবান্ হতে হলে কি লেখাপড়া জানতেই হবে? আমাদের দেশ তো যুগযুগান্তর নিরক্ষরতার অভিশাপ ভোগ করে আসছে। তা হলে আমাদের দেশে কোনো সংস্কৃতিই ছিল না? চীনও নিরক্ষর দেশ, সেখানেও কোনো সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে নি বলতে হবে?

১ এ বিষয়ে অনেক তর্ক ওঠে, তার কিছু আলোচনা পরে করেছি।

এ কথা যে সত্য নয় তা বলবার কোনো দরকার নেই। যুগযুগান্তর হতে এই-সব নিরক্ষর দেশেই সংস্কৃতির চরম বিকাশ দেখা গিয়েছে, বিশ্বসভ্যতায় এদের দান মহত্তম। সাহিত্যে চিত্রে বিবিধ-শিল্পকলায় গানে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে— কোন্ দিকে এই-সব দেশের দান এখনও বিশ্ববাসীর চরম বিস্ময় জাগাচ্ছে না? মুক্তেশ্বরের মন্দির যে স্থপতি গড়েছিলেন তিনি নিশ্চয়ই পাশ-করা ইন্‌জিনিয়র ছিলেন না, কোনারকের মূর্তি গড়েছিলেন যে ভাস্কর তাঁর নিশ্চয়ই আর্টসম্বন্ধীয় ডক্টরেট উপাধি ছিল না।

সুতরাং নিরক্ষরতা সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা এ কথা কখনও সত্য নয়। অথচ এক-এক সময়ে এই অসত্য কথাও সত্য হয়ে ওঠে। নিরক্ষরতা তখনই সংস্কৃতির বিকাশের পথে বাধা হয় না যখন লোকসংস্কৃতির ধারা খুব সজীব এবং প্রাণবন্ত থাকে। মুখে মুখে, কবিগানে, রামায়ণের পালায়, পুরুষানুক্রমিক চর্চায়, নানা আলাপ-আলোচনার ফলে এই সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিস্তার ঘটতে থাকে, নতুন নতুন রূপের সৃষ্টি হয়।

তা ছাড়া শুধু লোকমুখে চর্চার কথাই নয়। সে সময়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও মনে রাখা দরকার। সমাজে প্রাণের স্পন্দন চাই। তা না হলে মানুষের মন নতুন দিগন্তের অন্বেষণ করে না। প্রাণচঞ্চল সমাজ না হলে তার কোনো বিকাশই ঘটা সম্ভব নয়, সাংস্কৃতিক বিকাশও নয়।

যে-সব যুগে নিরক্ষরতার বাধা অতিক্রম করে এই-সমস্ত সমাজ বিস্ময়কর সৃষ্টি করে চলেছিল তখন তার পিছনে এই-সব নানা কারণ ছিল। তার প্রথম কথা হল, লোকসমাজ তখন এখনকার মত প্রাণহীন এবং একমুখীন ছিল না। সমাজে বৈচিত্র্য ছিল এবং সেইসঙ্গে প্রাণের সজীবতা ছিল প্রচুর। বস্তুতঃ এখনকার বাংলার সঙ্গে প্রাচীন বাংলার তুলনা করলে এই পার্থক্যটাই সব-চেয়ে চোখে পড়ে। এখনকার বাংলার সমাজে বৈচিত্র্য খুব কম। গ্রামাঞ্চলে চাষী, না হয় তো জমিনির্ভর মধ্যবিত্ত। সকলের জীবিকাই জমি, সকলের মনই সেই ছাঁচে গড়া। শহরে শহুরে মধ্যবিত্ত, খুব বেশি পরিমাণে চাকরি-নির্ভর। নানা জীবিকা, নানা ধরনের জীবনযাত্রা, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নানা নতুন স্পন্দন— এ-সবের ক্ষেত্র নিতান্তই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অথচ পূর্বে তা ছিল না। বাঙালীরা, কালিদাসের কথাতেও, নৌসাধনোদ্যত ছিল, দেশবিদেশে চলত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য। শ্রেষ্ঠীরা নৌকো সাজিয়ে পাড়ি দিতেন সমুদ্র পেরিয়ে। কিন্তু শুধু নৌকো সাজালেই তো বাণিজ্য হয় না, বাণিজ্যের উপকরণও তো চাই। সে উপকরণের অভাব বাংলাদেশে ছিল না। কার্পাসবস্ত্র, রেশম, নানাবিধ শিল্পদ্রব্য এবং অন্যান্য বাণিজ্যসম্ভার উৎপাদনে দেশের লোক ব্যস্ত থাকত। তা ছাড়া যাদের সঙ্গে বাণিজ্যের কোনো সম্পর্ক ছিল না তারাও যে এখনকার মত জমিনির্ভর ছিল তা নয়। যাঁরাই বাংলার প্রাচীন সমাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন তখন যুদ্ধবিগ্রহে কত সৈন্যসামন্ত দরকার হত এবং সে-সব সৈন্যসামন্ত আসত বাংলা হতেই। যখন ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকারি পুলিস সৈন্যদল ও শাসনতন্ত্র দেশের উপর চেপে বসল তখন জমিদারদের পাইক ঢালী সব বরখাস্ত করে দেওয়া হল। সে সময় শুধু বর্ধমানের মহারাজার জমিদারি হতেই উনিশ হাজার পাইক বরখাস্ত হয়েছিল। কিন্তু যতদিন তা হয় নি ততদিন এই-সব ভূস্বামীরা কেবল খাজনা আদায় করতেন না। যুদ্ধবিগ্রহ আক্রমণ আত্মরক্ষা বড় কম ছিল না। বারো ভুঁইয়াদের আমলের কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তার ঢের পরেও দেখা যায়— এমন-কি যখন ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে সে সময়েও— এ-সবের জের মেটে নি। লঙ্‌ সাহেবের Social Condition of Bengal-এ দেখা

যায় বর্ধমানের রাজা বা বিষ্ণুপুরের রাজা কোম্পানির উপর হুকুম চালাতে দ্বিধাবোধ করতেন না। বর্ধমান-মহারাজের সঙ্গে ইংরেজের কামান বন্দুক নিয়ে রীতিমত যুদ্ধও হয়েছে। ১৭৬০ সালে নবাব কাশিমআলি খাঁ ইংরেজদের জানাচ্ছেন বর্ধমানের রাজা যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ১৭৬১ সালে ক্যাপ্‌টেন হোয়াইট বর্ধমান-রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করছেন। ১৭৬১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এই যুদ্ধ ঘটে। কোম্পানির রিপোর্টেই দেখা যায়, বর্ধমানের রাজার পক্ষে অন্ততঃ দশ হাজার সৈন্য ছিল। কিন্তু এ শুধু একা বর্ধমানের মহারাজার কথা নয়। প্রায়ই এরকম ঘটনা ঘটত। বীরভূমের রাজা, নগরের যুদ্ধ, ইত্যাদি ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করবার দরকার নেই। তারও আগে শোভা সিংহের বর্ধমান-আক্রমণ (১৬৯৮ ?), বর্ধমানের মহারাজার বিষ্ণুপুর-আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনা প্রায়ই ঘটত। আসলে এগুলো ছিল সেকালের সমাজের সজীব সত্য। এরই প্রভাব সমাজ-জীবনে তরঙ্গিত হতে থাকত। সেইজন্য আজকের মত সেকালের সমাজ একমুখীন ছিল না, তার মধ্যে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা বহু বিচিত্র সংঘাত জীবনে নতুন নতুন আস্বাদ নিয়ে আসত। এমন-কি আমাদের জাতিগুলির ইতিহাস আলোচনা করলেও এই সত্যই প্রমাণিত হয়। রিজ্‌লে বলেছেন, আমাদের অনেক জাতিই বৃত্তিমূলক, অর্থাৎ functional caste। এককালে সব জাতিরই উদ্ভব ছিল হয়তো বৃত্তি থেকে, কিন্তু সেই সত্য বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রে প্রায় একাল পর্যন্ত অনেকখানি চলে এসেছে, এইটেই আশ্চর্যের কথা। ঢালীরা ঢাল ধরত, ভল্লারা ভল্ল ; পাইকেরা করত লড়াই। এমন-কি প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সাম্রাজ্যের কাছেও বাংলার এই-সব বীর জাতি সহসা মাথা নত করে নি। এদের নির্বীর্য করবার চেষ্টায় ইংরেজ প্রথমে এদের বৃত্তি থেকে চ্যুত করে, তার পর এদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু তার ফলে যে পাইক-বিদ্রোহ হয় তা ধলভূম হতে বাঁকুড়া মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে প্রকম্পিত করেছিল। তার জের সহজে মেটে নি।

বস্তুতঃ বাংলার সমাজজীবনের এই ইতিহাসের সাক্ষ্য তার সাহিত্যেও বহন করছে। মঙ্গলকাব্যগুলির কথাই ধরা যেতে পারে। এই কাব্যগুলি কি ইঙ্গিত বহন করছে ? একটি জিনিস তো খুব স্পষ্ট। এই-সব কাব্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছায়ায় রচিত হয় নি, ব্রাহ্মণ্যসমাজের ছবিও এতে প্রতিফলিত হয় নি। বরং উলটো। ব্রাহ্মণ্যদেবতারা তাঁদের নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন, লোকদেবতা ছিলেন না। জনসাধারণের, অর্থাৎ তথাকথিত নিচু জাতের, ব্যাধের শবরের, সাধারণ মানুষের দেবতা ছিলেন চণ্ডী মনসা ইত্যাদি বেদবহির্ভূত দেবতারা। তার উপর বয়ে গেল বৌদ্ধধর্মের প্লাবন। বৈদিক দেবতাদের ভিত তো আলগা হয়ে গেলই, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার মত সদাচারী পাঁচটি লোকও আনতে হল বিদেশ থেকে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, এ দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেও শংকরাচার্যের নেতৃত্বে সারা ভারতে যে নতুন কট্টর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই বহুজাতিমিশ্রিত বহুধর্মসংকর বাংলাদেশে সে রূপ দেখা গেল না। তার বদলে বার বার এখানে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আচারই ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে অঙ্গীকৃত হয়েছে, বেদবহির্ভূত দেবতারা ক্রমে ক্রমে তেত্রিশ কোটির মধ্যে আসন গ্রহণ করেছেন। লৌকিক শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাকে শুধু স্বীকার করতে বাধ্য হয় নি, তাকে মেনে নিয়ে মর্যাদা দিতেও বাধ্য হয়েছে। বাংলার আলাদা স্মৃতি আলাদা সম্পত্তিভাগের নিয়মের পিছনে এই স্থানীয় সামাজিক ও কৌম ব্যবস্থার প্রচণ্ড তাগিদ ছিল কি না কে জানে ? কিন্তু সে যাই হোক, সাহিত্যের সাক্ষ্য হতে এ কথা খুব স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, লৌকিক দেবতাদেরই আসন খুব দৃঢ়, বৈদিক দেবতাদের নয়। কাব্যের

বিষয়বস্তু ইন্দ্র অগ্নি বায়ু নন, বরং ধর্ম মনসা চণ্ডী। শেষকালে যখন আমাদের সমাজবৈচিত্র্য ভেঙে বীর জাতিগুলি ক্রমে কৃষিজীবী হয়ে পড়তে লাগল (শিবায়ন কাব্যে শিবের ত্রিশূল ভেঙে লাঙল গড়িয়ে চাষ করতে যাওয়ার ইঙ্গিত খুব গভীর) তখন প্রথমে এলেন শিব প্রভৃতি দেবতা, যাঁরা শবরের দেবতা হয়েও বহুপূর্বেই ব্রাহ্মণ্যদেবতাদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। আরও শেষের দিকে (যথা ভারতচন্দ্রে) মঙ্গল-কাব্যেও দেখা দিলেন দুর্গা প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ্যদেবতা। আশ্চর্য নয়, কেননা এতদিনে বাংলার লোকশক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে, অন্যদিকে নাটোর ও কৃষ্ণনগরের ভূস্বামীদের বিস্তৃত ব্রহ্মত্র দানে ব্রাহ্মণদের পুনরুজ্জীবন ঘটছে। সুতরাং একদিকে পাইক-বিদ্রোহের অবসান এবং অন্যদিকে মঙ্গলকাব্য থেকে ব্যাধ চণ্ডিকা মনসা ধর্মের পলায়ন— এ দুটি আকস্মিক এবং অসংযুক্ত ঘটনা নয় বলেই বিবেচনা করতে হবে। ও হল কাব্যে সমাজেরই প্রতিফলন। কিন্তু শেষ যে ভাবেই হোক, দীর্ঘ দিন ধরে (বলতে গেলে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত) বাংলার এই লোকশক্তি প্রচণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, অত্যন্ত সজীবতার সঙ্গে বেঁচেছে। এমন-কি শুধু সাহিত্য নয়, তার ধর্মকেও সে সেইভাবে গড়েছে। এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার তো ছিলই। কিন্তু পরের যুগেও, তান্ত্রিকতার প্রথম আমলে, সে জাতিভেদ মানে নি, চক্রে কোনো জাতিভেদ ছিল না, শক্তি সংগ্রহ হত সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতি হতেই। তার পর ক্রমে ক্রমে এই তন্ত্রধর্ম হিন্দুশাস্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে হতেই এসে পড়ল বৈষ্ণবপ্লাবন। তার ধর্মমত যাই হোক্, সে যে আর একবার জনসাধারণের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সারা সমাজ সেই প্লাবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বলেই তো সাহিত্যের চরম বিকাশ দেখা দিল। সজীব স্পন্দন না থাকলে অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য কখনও গড়ে ওঠা সম্ভব হত না।

তৃতীয়তঃ, এই সজীবতা যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ তখনকার অর্থনৈতিক বিন্যাস। তখনও বাংলার সমাজে এত বিভিন্ন রকমের শ্রেণীসংঘাত গড়ে ওঠে নি। অর্থাৎ শ্রেণী ছিল বিচিত্র, কিন্তু সংঘাত ছিল কম। সেই কারণে সংহতির অভাব হয় নি। বিশেষতঃ সামাজিক ও মানসিক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন শ্রেণীতে একালের মত অতখানি পৃথক হয়ে যায় নি। আজকের শহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত, যাঁরা কোনোদিন শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে বাস করেন নি, তাঁরা যেমন গ্রামজীবনের আশা-আনন্দ হৃদয়ে অনুভব না করুন অনেক সময় বুদ্ধিতেও করতে পারেন না, তখন তা ছিল না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই। আজ যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার হয়েছেন তাঁদের মনের যে উদার দিগন্তে দেশবিদেশের সাহিত্য ও চিন্তাধারা স্পন্দিত হচ্ছে সে দিগন্তের কোনো হদিশই অশিক্ষিত গ্রামের চাষী পায় না। সুতরাং অনুভূতির খণ্ডীভবন হয়ে গিয়েছে— যা পূর্বে ছিল না। সুতরাং স্বভাবতঃই পূর্বে যে সংহতি ও নিটোল সামাজিক অভিজ্ঞতা হতে সংস্কৃতি ও সাহিত্য রচিত হতে থাকত এখন আর তা একেবারেই নেই।

এই কথা থেকেই আর-একটি কথা উঠে পড়ে। সেটি হল এই যে, লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেকালে একটা লোকশিক্ষার ধারাও চলে আসছিল, যা ইংরেজ সাম্রাজ্য এবং মধ্যবিত্ত-অভ্যুদয়ের পর সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেল। পণ্ডিতেরা অবশ্য সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু তার পাশাপাশিই টোল ও মক্তবে, পাঠশালায় চণ্ডীমণ্ডপে, রামায়ণ-গান ও কথকতায় সর্বজনগ্রাহ্য একটি লোকশিক্ষার ধারা প্রবহমান ছিল। অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায়, গত শতাব্দীর প্রথম পাদেও বাংলাদেশে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল প্রচুর। বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ। তার তুলনায় এখন গ্রাম্য প্রাইমারি স্কুল কি খুব বেড়েছে?

কাজেই কিছু শাস্ত্রচর্চাবিলাসীদের কথা ছেড়ে দিলে বাকি সকলের পক্ষে মোটামুটি একটা শিক্ষাসামান্য ছিল যাতে সংস্কৃতির স্তর অনেক সময় বিভিন্ন শ্রেণীর ভেদরেখাকে অতিক্রম করেও পরিব্যাপ্ত হতে পারত। রামায়ণ-গান থেকে উপর স্তর এবং নীচের স্তর উভয়ই রস উপভোগ করত। আমাদের যত বিশেষীকরণ হয়েছে ততই অনুভূতি ও সংস্কৃতির মোটামুটি সার্বজনীনতা কেটে গিয়ে তা খণ্ডিত ও ভগ্নাংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাঁচালি, তারপর আখড়াই, ক্রমেই বিশেষ বিশেষ সমাজের উপভোগের বস্তু হয়ে উঠছিল, সকলের নয়। কিন্তু যেদিন ইংরেজ সভ্যতা এল, পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের দরজা খুলে গেল, সেদিন যারা তার আস্বাদলাভের দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হল তাদের সংস্কৃতির বিস্ময়কর হল বটে, কিন্তু যারা সে সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হল তাদের আর কিছুই রইল না। বস্তুতঃ যখন ইংরেজী স্কুল খুলবার হিড়িক পড়ে গেল তখন তা সকলের জন্য হল না, হল কেবল উদীয়মান মধ্যবিত্তদের জন্যই। বরং জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট হল 'ফিল্‌টার থিয়োরি': প্রথমে কেবল উপরস্তরচারীদেরই শিক্ষিত করে তোলা যাক, তার পর সেই ধারা একটু একটু করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচের দিকে যা গড়াবে তাই যথেষ্ট।

৪

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পূর্বে আমাদের যে ধারায় বিকাশ হচ্ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের অভিঘাতের পর তার মৌলিক বদল ঘটল। সম্ভবতঃ এরকম মৌলিক বদল আমাদের ইতিহাসে এর পূর্বে কখনও হয় নি। তার কারণ, পূর্বে পূর্বে যে-সব বদল ঘটেছে তাতে মূল কাঠামোর এতখানি বদল কখনও হয় নি, শ্রেণীর মধ্যে তফাত এত অলঙ্ঘ্য ও এত বিরাটও কখনও হয় নি। যা এখন হল।

এতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নেই। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায়, এইরকম বদল মোটামুটি সব দেশেই ঘটে থাকে। অনেক পণ্ডিত বলেছেন, মধ্যযুগীয় অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন যুগের অভ্যুদয় শুরু হলেই দেখা যায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অভিজাতদের আশ্রয় ত্যাগ করে মানব-অভ্যুদয়ের নীতি গ্রহণ করে। বস্তুতঃ এই মানব-অভ্যুদয়ের মহিমাই তার নবজীবন আনে। আর সমাজতত্ত্বের নিয়মে এই অভ্যুদয়ের মহিমা গান করবার ভার প্রথমে পড়ে মধ্যবিত্তদের উপরেই। এই কথাটাই কার্ল ম্যান্‌হাইম বলেছেন—

> If one calls to mind the essential methods of selecting èlites which up to the present have appeared on the historical scene, three principles can be distinguished: Selection on the basis of *blood, property* and *achievement*. Aristrocratic society, specially after it had entrenched itself, chose its èlite primarily on the blood principle. Bourgeois society gradually introduced, as a supplement, the principle of wealth, a principle which also obtained for the intellectual èlite, inasmuch as education was more or less available only to the offspring of the well-to-do. It is, of course, true that the principle of achievement was combined with the two other principles in earlier periods, but it is the important contribution of modern democracy (as long as it is vigorous), that the achievement principle increasingly tends to become the criterion of social success.

তা হলে প্রথম কথা দেখা গেল, এ সময় ক্রমে আভিজাত্যের বদলে দেখা দেয় মানব-অভ্যুদয়, এবং তার পুরোধা হন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। কিন্তু সেই সঙ্গে তার চেয়েও বড় কথা দেখা গেল, এ সময় হতে সংস্কৃতি ক্রমেই তার সার্বজনীন মূর্তি পরিহার করে গোষ্ঠী-আশ্রয়ী হয়ে ওঠে, èliteদের হাতে পড়ে। যত নতুন

নতুন গোষ্ঠী সজীব হয়ে উঠবে ততই এই সংস্কৃতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করবে, অগ্রগতির প্রেরণা পাবে। আর যদি একটি কি তুটি গোষ্ঠীমাত্র জীবিত থাকে, বাকি সব গোষ্ঠী সরে যায়, তা হলে সংস্কৃতির বিকাশ এবং অগ্রগতি আর হবে না, ক্রমেই সে নিজের ঘূর্ণাবর্তের পঙ্কিলতায় তলিয়ে যেতে থাকবে।

বাংলায় ইংরেজী সাম্রাজ্য ও পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাত এসে পড়বার পর এই ধরনের বিকাশ হয় নি তা নয়। কেবল তফাতের মধ্যে অন্যান্য দেশে এই নবযুগের প্রাণস্পন্দন যেমন নানা গোষ্ঠী নানা স্তরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এখানে তা কেবল একটিমাত্র গোষ্ঠীকেই উদ্বুদ্ধ ও বিকশিত করতে পেরেছিল, অন্যগুলিকে নয়। অন্যগুলির ঘটেছে মৃত্যু। তাদের প্রাচীন লোকসংস্কৃতি ও লোকশিক্ষার ধারা গেল অবলুপ্ত হয়ে, অথচ নতুন যুগের নতুন ধারার বিকাশও তাদের হল না। এইখানেই বঙ্গসংস্কৃতির মৌলিক তুর্বলতা নিহিত।

গত শতকের ইতিহাস আলোচনা করলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরেজী শাসনের প্রভাবে গ্রামের হল অপমৃত্যু, গ্রামীণ সমাজেরও তাই। পূর্বে গ্রামজীবনের যে নানা বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছি সেও অবলুপ্ত হয়ে দেখা দিল কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর সমাজ। অন্য দিকে দেখা দিতে লাগল নতুন শহর, যে শহর পূর্বের মত 'বিবর্ধিত গ্রাম' নয়, যারা চেহারায় চালে চলনে খাঁটি শহর। শহুরেআনা তার মধ্যে বিকিরিত। উদ্ভব হল কলকাতা কাল্‌চারের—'বাবু'-কালচারেরও। অর্থনৈতিক দিকে এর প্রেরণা জোগাচ্ছিল নবগঠিত শ্রেণীবিন্যাস। যাঁরা কর্নওয়ালিশী ব্যবস্থায় নতুন জমিদার-বড়লোক হয়ে উঠেছিলেন, যাঁরা মুৎসুদ্দি বেনিয়ান হৌস ব্যবসা করে যথেষ্ট সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁদেরই আশ্রয়ে নব সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভিযান আরম্ভ হয়। কিন্তু এ ধারা নিজের গতিবেগেই শীঘ্র খাত ছাপিয়ে উপ্‌চে পড়ল। তখন আর এই ধারা পৃষ্ঠপোষকদের কুক্ষিগত রইল না, মন্দ্রিত হতে লাগল নবোদিত মধ্যবিত্ত চিত্তে। সেই চিত্তে লাগল মানব-অভ্যুদয়ের অরুণাভা। পুরোনো সব সংস্কার ভেঙে ফেলল ইয়ং বেঙ্গল দল, কেউ কেউ উৎসাহের আতিশয্যে খৃস্টান হলেন, ছুটে চললেন ইউরোপে, দূর করে দিলেন সংস্কৃত শিক্ষা, আবাহন করে আনলেন ইংরেজী শিক্ষাকে। প্রথম যুগের আতিশয্য কেটে যাবার পরও এই নব মানবতার আহ্বান উদ্বেলিত হয়ে উঠল বিদ্যাসাগরের মত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরও চিত্তে। তিনি ইয়ং বেঙ্গল দলের মত শাস্ত্রকে অস্বীকার করলেন না— কিন্তু তার নবব্যাখ্যা করলেন, যাতে শাস্ত্রের মধ্য দিয়েই মানবমহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত লিখলেন—[২]

Let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new methods of interpretation, and adopt the old eternal and undying truths to the necessities of that new life.

অথচ এক দিকে যেমন এই বিস্ময়কর বিকাশ ঘটছে অন্য দিকে তখন সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটছে। এই অপঘাত ঘটত না যদি আমাদের দেশে একটি যুগের স্বাভাবিক অন্ত হয়ে আর-একটি যুগের স্বাভাবিক উদয় হত। কিন্তু এ দেশে তা ঘটবার সুযোগ ঘটে নি। ইংরেজী সাম্রাজ্যিক অভিযানে আমাদের নবযুগের সমাজবিবর্তন গোড়া হতেই বিকৃত ও বিকলাঙ্গ। এই অস্বাভাবিক বিকাশের কথা বহু সমাজ-তাত্ত্বিকই আলোচনা করেছেন, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যায়, এর ফলে ঘটল সমাজজীবনে (একটি স্তর ব্যতীত) বৈচিত্র্যের অভাব। মধ্যবিত্তশ্রেণী ছাড়া আর সকলেই চাষ

---

২ Bankimchandra: *Letters on Hinduism*, Letter II.

ও জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। বাংলার সমাজজীবনে যে বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছি তা অবলুপ্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয়তঃ, সেই গ্রামজীবনেও প্রসার ও বিকাশের পরিবর্তে দেখা দিল নিদারুণ সংকোচন ও ক্ষয়িষ্ণুতা। ফসল উঠবে প্রচুর, গ্রামে গ্রামে শ্যামসমারোহ, জীবনযাত্রা সুশৃঙ্খল ও সুষমাময়— এই পরিবেশেই তো গ্রামে গ্রামে ঋতু-উৎসব লেগে থাকতে পারে, হৃদয়ের অনাবিল আনন্দ ও সহজ দাক্ষিণ্য স্বচ্ছন্দ ধারায় অনর্গল প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে যদি দেখা যায়, করাল দুর্ভিক্ষে দেশ শ্মশান, (ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের চিত্র, আনন্দমঠে, মনে করুন), প্রজারা সকল জমি হতে বিতাড়িত ও তাদের সকল বৃত্তির জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে (Resumption Proceedings এ তাই করা হয়েছিল), তাদের কোনো স্বত্বই নেই, উপরন্তু জমিদার ইচ্ছা করলেই তাদের আটক বা কয়েদ করতে পারে (হফ্‌তম পঞ্চম রেগুলেশন), মুখে অন্ন নেই, তার উপর আছে কোম্পানির দাদন ও কুঠিয়ালের অত্যাচার (নীলের কথা কে না জানে?— তা ছাড়াও আরও দাদন ছিল)— তা হলে সেই পরিবেশে মন বিকশিত হতে পারে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তৃতীয়তঃ এই-সব কারণেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে গেল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আগে রামায়ণ-গান সকলেই উপভোগ করতেন। কিন্তু এখন নবশিক্ষিতদের মনে শেকৃস্‌পীয়র মিল্‌টন্‌ বার্ক কল্লোলিত হতে লাগল। অথচ সাধারণ লোকের পক্ষে পূর্বেকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিও বজায় রাখা আর সম্ভব হল না, নতুন কোনো সংস্কৃতি গড়ে তোলাও সম্ভব হল না। তার উপর চতুর্থতঃ, শহর ও গ্রামগুলিতে তফাত হয়ে গেল অনেক। সত্যিকারের শহর, শহুরেয়ানার শহর, গড়ে উঠল এই আমলে। এই কারণেই নবজাগৃতির কেন্দ্র হল স্বভাবতঃই এই শহরগুলি। সংস্কৃতির কেন্দ্র নবদ্বীপ ভাটপাড়া হতে সরে এসে স্থাপিত হল শোভাবাজারে। এই কারণেই শুরু হল 'বাবু'-কালচার। বাগানবাড়ি ও হাফ্‌-আখড়াইয়ের পালা, পক্ষীর দলের গান। যা গ্রামে ছিল না, কখনও বরদাস্তও হত না। অন্য দিকে নামে যা ছিল তা অবলুপ্ত হয়ে গেল। সংস্কৃতির আধার হল শহর, গ্রাম কুসংস্কারের।

৫

গত দেড় শ বছর ধরে এই ধারাই বিকশিত হয়ে আসছে। যতদিন নবজাগ্রত বিদ্বৎ-গোষ্ঠীর প্রসার ছিল ততদিন আমরা এই মৌলিক দুর্বলতার কথাটা ধরতে পারি নি। তখন বস্তুত গ্রাম অন্ধকারে নিমজ্জিত, একটি গোষ্ঠী ছাড়া অন্য কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে না। কিন্তু সে-সব কিছুই নজরে পড়ে নি, কেননা একটি গোষ্ঠী যে মহা-ঐশ্বর্যময় অদ্ভুত সৃষ্টি করে চলেছিলেন তারই বিস্ময়কর উজ্জ্বলতায় আমাদের চোখ ঝলসে ছিল। একালের ভারতবর্ষে মহিমার এমন উত্তুঙ্গ শিখর আর কোথাও রচিত হয় নি। তারই বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে আমরা ভাবতে পারি নি, যেদিন এই ধারা শেষ হয়ে আসবে সেদিনের অবস্থাটা কি হবে। মাইকেলের পর বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ— এর কোথাও শেষ আছে কি?

আমাদের চোখে আমাদের মৌলিক দুর্বলতা ধরা না পড়লেও তা আমাদের মহত্তম মনীষীদের চোখ এড়ায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন[৩]—

বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে

৩ 'বঙ্গদর্শনের সূচনা।'

অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে ?

একালে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে সমাজের বহু বিচিত্র স্তরই বিধৃত। বস্তুতঃ এত ব্যাপ্তি আর কোথাও নেই। শুধু মধ্যবিত্ত সমাজই তাঁর রচনার উপজীব্য নয়। এক দিকে যেমন সর্বপ্রথম যুগে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে রাজারাজড়ার কাহিনীকে তাঁর বিষয়বস্তু করেছেন,[৪] তেমনি কালে কালে তাঁর রচনায় বিনোদিনী-মহেন্দ্রের মধ্যবিত্ত জীবন, কেটি-সিসি-র শৌখিন অভিজাতপনা ইত্যাদির সঙ্গে পল্লীজীবনের বিচিত্র আনন্দবেদনাও গল্পগুচ্ছে বিধৃত হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এত স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং তা নিয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখে গিয়েছেন—

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে, হয় নাই সে সর্বত্রগামী

এটি তাঁর বিনয় নয়, বস্তুতঃ এটি আমাদের মৌলিক সংস্কৃতিসংকটের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ, আমাদের সমাজচেতনার একদেশদর্শিতার উপর তীব্র কষাঘাত। সে কষাঘাতের যে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তা এখনকার অবস্থা আলোচনা করলেই বোঝা যায়।

বস্তুতঃ আমরা এখন কি অবস্থায় এসে পৌঁচেছি? এক দিকে দেখি, ক্ষীয়মান মধ্যবিত্ততার যুগে যে বিদ্বৎ-গোষ্ঠী এতকাল আমাদের সংস্কৃতির একমাত্র বিকাশয়িতা ছিল তারা বিপর্যস্ত। অন্য দিকে দেখি, যে-সব শ্রেণী বহুকাল অন্ধকারে ডুবে ছিল সেই-সব শ্রেণী রাজনৈতিক আবর্তে উপরে ভেসে উঠছে বটে, কিন্তু তাদের নতুন সংস্কৃতি রচনা করবার ক্ষমতা হয় নি। তাদের ইচ্ছার সজোর ছাপ সমাজমনে পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও তার মধ্যে প্রতিবাদের স্বরই প্রবল, আনন্দের চেয়ে ক্রোধই দুর্জয়। বলা বাহুল্য, সৃষ্টির পরিবেশ এ নয়।

মধ্যবিত্ততার অবসানকালে এইরকমই ঘটে থাকে। জর্মান সমাজতাত্ত্বিক কার্ল্ ম্যান্‌হাইম এই অবস্থার একটি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। এই সময় যে যে লক্ষণ ঘটে তার আলোচনা করতে গিয়ে কার্ল্ ম্যান্‌হাইম বলেছেন, পূর্বে যে শক্তি বিকাশের সহায়ক থাকে এই যুগে সেই শক্তিই উলটো ফল ফলায়। তার কারণ, অর্থনৈতিক তাগিদে নতুন নতুন শ্রেণী সামাজিক চেতনার অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে, অথচ তারা সাংস্কৃতিক বিকাশের কোনো দরজাই খোলা পায় না। তার উপর, এই অবস্থায় "বিদ্বৎ-গোষ্ঠী" বাড়তেই থাকে, বিশেষ কোনো একটি বিদ্বৎ-গোষ্ঠীর আর প্রাধান্য থাকে না, পূর্বে যে অর্থ প্রতিপত্তি বা কৃতিত্বের ভিত্তিতে বিদ্বৎ-সমাজ গড়ে উঠত এখন তারও লাঘব হতে থাকে, বিদ্বৎ-সমাজের মধ্যে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনও ঘটে যথেষ্ট। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সচলতার অভাব ঘটতে থাকে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগ যায় কেটে, নিজের চার পাশে গণ্ডী রচনার চেষ্টা চলতে থাকে। ম্যান্‌হাইমের কয়েকটি কথা তাঁর নিজের ভাষাতেই উদ্ধৃত করি[৫] :

The crisis in culture in liberal-democratic society is due, in the first place, to the fact that the social processes, which previously favoured the development of the creative élites,

৪ অবশ্য বৌঠাকুরানীর হাট রাজারাজড়ার কাহিনী হলেও, বঙ্কিমভঙ্গীর সঙ্গে একেবারে মৌলিক পার্থক্য আছে।

৫ Mannheim: *Man and Society*, p. 85 *et seq.*

শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন

শ্রীরাধার মানভঞ্জন

শুক-শারিকা । কালীঘাট

শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে

now have the opposite effect, i.e. have become obstacles to the forming of èlites because wider sections of the population still under unfavourable social conditions take an active part in cultural activities. . . . . This is called "negative democratization." . . . . There are four processes which are of special significance today. They are (1) The growing number of èlite groups, and the consequent diminution in their power. (2) The destruction of the exclusiveness of the èlite groups. (3) The change in the principle of selection of these èlites. (4) The change in the internal composition of these èlites. . . . Today a growing number of social groups strive for a share in social and political control and demand that their own interests be represented. The fact that these social groups come from intellectually backward masses is a threat to those èlites which formerly sought to keep the masses at a low intellectual level. . . . . This [process of keeping down] may, of course, succeed for a time, but in the long run the industrial system puts new vigour in the masses, and as soon as they enter in one way or other in politics, their intellectual shortcomings and more specially their political shortcomings are of general concern and even threaten the èlites themselves.

এই নবজাগ্রত চেতনাকে সুস্থ রূপ দিয়ে নব নব সৃষ্টির পথে পরিচালনা না করতে পারলে দুটি ফল দেখা যায়। প্রথমতঃ এই চেতনা জোয়ারের মত আসে, কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্থায়ী ফল ফলাতে পারে না।[৬]

The new impulses, intuitions and fresh approaches to the world, if they have no time to mature in small groups, will be apprehended by the masses as mere stimuli. As a result they fade away with the many passing sensations which abound in the life of a modern metropolis. Instead of creative ability and achievement we find constantly increasing hunger after every new sensation.

বর্তমান কালে বাংলার সমাজজীবনে কি ঠিক এই লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না ?

এর দ্বিতীয় ফল হল, চিত্তের অশান্ততা। সুস্থ ফলবান্ সৃষ্টির পথে না গেলে সে কেবল সময় সময় অসুস্থ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে, নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে চায়, আর কিছুই করে না।

Since democracy has become effective, i.e. since all classes played an active part in it, it has been increasingly transformed into what Max Scheler called a "democracy of emotions". As such, it leads less to the expression of interests of the various social groups and more to sudden emotional eruptions among the masses.

আজ বাংলায় কি এই অবস্থাও দেখা দেয় নি ?

৭

তা হলে ভবিষ্যতের পথ কি ?

পূর্বের আলোচনা হতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই সংস্কৃতিসংকট উত্তীর্ণ হতে গেলে আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি প্রসারিত করতে হবে। বর্তমানকালের সংস্কৃতি গোষ্ঠী-আশ্রয়ী, তা কখনোই একদিনে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে না। তা ছাড়া যে যুগে সমাজে বিশেষীকরণ অনিবার্য সে যুগে জটিলতাবর্জিত

[৬] Mannheim: *Man and Society*, p. 87.

জীবিকৈকবৃত্তি কৃষিপ্রধান সমাজের মত অখণ্ডতা ও সার্বজনীনতা ফিরে আসা বোধ হয় কখনোই সম্ভব নয়। কাজেই এই অবস্থা অনিবার্য এ কথা স্বীকার করে নিলে তখন সমাধানের একটিমাত্র পথই খোলা থাকে। সে পথ হল, যে-সব বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক আবর্তে পড়ে জাগ্রত ও সচেতন হয়ে উঠেছে, যাদের ধাক্কা সমাজকে থেকে থেকে নড়িয়ে তুলছে, যাদের আমরা আর কোনোক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না, অথচ যারা উপকরণের ও চিত্তমার্জনার অভাবে সংস্কৃতিরচনায় অংশীদার হতে পারছে না, ফলে বর্তমান সংস্কৃতিকে ভাঙছে কিন্তু নতুন সংস্কৃতি গড়ছে না, সেই-সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীকে সুযোগ দিয়ে উপকরণ-সমৃদ্ধ করে সংস্কৃতিরচনার অংশভাক্‌ করে তোলা। এর মধ্যে যারা ক্ষয়িষ্ণু, যাদের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নেই, তারা স্বতঃই বাদ পড়ে যাবে। আর তারা সমাজ-জীবনে ধাক্কাও মারছে না। কিন্তু যাদের শক্তি ও সম্ভাবনা আছে অথচ বর্তমানে ঘটনা সন্নিবেশে প্রকাশ ও বিকাশের পথ খোলা না পেয়ে মিছে মাথা কুটে মরছে তাদের বেলা এ কথা প্রযোজ্য নয়।

বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতিরই দেশ, কাজেই এ কাজ বাংলাদেশে অন্ততঃ কঠিন হওয়া উচিত নয়। পূর্বেই বলেছি, আমাদের সমস্ত ইতিহাসের গতিই সেই দিকে। তাই ভারতবর্ষের চিরাচরিত আধ্যাত্মিকতার মধ্যেও তারই আড়ালে আড়ালে বাংলাদেশে যুগে যুগে কালে কালে এই মহৎ মানবস্বীকৃতি ও প্রশস্ত সাংস্কৃতিক ভিত্তি রচনা ঘটে এসেছে এবং সেই জন্যই বরাবর বাংলা সংস্কৃতির এত বিস্ময়কর বিকাশ, এত ঐশ্বর্য। "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই উক্তির মধ্যে হয়তো সহজিয়া সাধনার নিগূঢ় অর্থ খুঁজলেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে আধ্যাত্মিক কথা বাদ দিয়ে এর সহজ লৌকিক অর্থে এ একটি নবযুগের শঙ্খধ্বনি। সেই লোকশক্তিকে অঙ্গীকৃত করার ফলেই তো সে যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির মহত্তম বিকাশ। তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—

"আজ পেত্রার্ক, কাল লুথর, আজ গেলিলও, কাল বেকন ; ইউরোপের এইরূপ অকস্মাৎ সৌভাগ্যোচ্ছ্বাস হইল। আমাদিগেরও একবার সেই দিন হইয়াছিল। আকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয় ; তারপর রূপসনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। একদিকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িনী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া।"[৭]

কাজেই আমাদের যখন মানব-স্বীকৃতির কথা ভাবতে হয় তখন ইউরোপে-পরিস্রুত গ্রীক মানবিকতা, যা আমাদের দ্বারে আঘাত করেছে, কেবল তার কথা না ভেবে আমাদের ইতিহাসের কথাটাও ভাবতে হবে, কেননা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় জর্জরিত হয়েও তারই মধ্যে বার বার প্রবলবেগে মানব-অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি আচার ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তাকেই সমর্থন করার যুক্তি খুঁজে বেড়িয়েছে, বাংলার ইতিহাসের এইটিই শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। তার পরের যুগে আমরা যখন আধ্যাত্মিকতার বেড়াজাল কেটে বার হতে পেরেছিলাম তখন ক্রমে ক্রমে মানব-অভ্যুদয়ের শ্রেষ্ঠ মহিমা প্রচারিত হতে দেখেছি রবীন্দ্ররচনায়। এইখানেই বাংলার অন্তর্নিহিত শক্তি, এইখানেই যুগে যুগে তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের মূল রহস্য, এইখানেই তার সংকট-উত্তরণের মূল কৌশল। অবশ্য তার বাহ্য রূপ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন হতে বাধ্য। বৈষ্ণবযুগে সে যে আকার নিয়েছিল, উনিশ শতকে তার চেহারা অবশ্যই ভিন্ন হয়েছে,

৭ বঙ্কিমচন্দ্র : বাঙ্গালা ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

একালে আরও তফাত হবে। তা না হলে বুঝতে হবে আমাদের গতি নেই, দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে নয়; আমরা এগোতে চাই না, বরং পিছোতে চাই, আমরা নবযুগ রচনার বদলে obscurantism ও revivalism-এর চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও ভুললে চলবে না যে, মানব-অভ্যুদয়ের মহামন্ত্রই বাংলাকে যুগে যুগে রক্ষা করে এসেছে। এ যুগে যে-সব নতুন সমস্যা উঠেছে তারই উপযোগী করে মহত্তম অর্থে এবং ব্যাপকতম ও গভীরতম ভিত্তিতে যদি এই মহামন্ত্র পুনর্বার প্রযুক্ত না হয় তা হলে এই সংকট কাটবে না। তার জন্য প্রাচীন লোকসংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপে পুরোনো পুঁথি, ছেঁড়া কাঁথা ও কীটদষ্ট পট জোগাড় করলেই চলবে না। এমন-কি তার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কলমে অশিক্ষিতদের ক্ষোভহতাশার বর্ণনাও যথেষ্ট নয়। তার জন্য চাই, যারা আজ আন্দোলিত হচ্ছে, ক্ষুব্ধ হচ্ছে, অশান্ত হচ্ছে, অথচ সুস্থ পরিবেশ ও উপযুক্ত উপকরণের অভাবে বিকশিত হতে পারছে না, তাদের বিকশিত করে সংস্কৃতিকে মানব-অভ্যুদয়ের ব্যাপক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটানো, তাতে নতুন বেগসঞ্চার করা। আমাদের ভবিষ্যৎ সেই পথেই।

কীর্তন ও ধ্রুবপদ

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

নরোত্তম যখন পদাবলী কীর্তনের প্রযোজনা করলেন তখন ধ্রুবপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় ধ্রুবপদ তখন উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সম্ভ্রান্ত সংগীতশিল্পীগণ তাকে বরণ করে নিচ্ছেন। নরোত্তম স্বয়ং বিশিষ্ট সংগীতবিদ্ ছিলেন এবং উত্তরাঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে তিনি ধ্রুবপদ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তাঁর প্রবর্তিত পদাবলী কীর্তনে উক্ত বিধির প্রয়োগ করেন। এই অনুমানের মূল কারণ এই যে, ধ্রুবপদের সুগম্ভীর গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে প্রাচীন কীর্তনের একটা মিল আছে। এই সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে নরোত্তমপ্রবর্তিত কীর্তনের বর্ণনা থাকলেও তার সঙ্গে ধ্রুবপদের উল্লেখ নেই অথচ অপরাপর সংগীতের উল্লেখ রয়েছে। বস্তুত প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে ধ্রুবপদের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই চলে। পদের মাঝে মাঝে যেখানে 'ধ্রু' আছে তাকে ধ্রুবপদ আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয় কেননা ধ্রুবপদের রূপবন্ধের (technique) সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই 'ধ্রু'র অন্য ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু এটি অপর প্রসঙ্গ।

প্রাচীন কীর্তন এবং ধ্রুবপদের গায়নরীতির মধ্যে যদি ঐক্য খুঁজে পেতে হয় তাহলে দুইয়েরই মূল উৎসের সন্ধান করতে হয় এবং এই সন্ধান করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়বে যে, দুটিই প্রাচীন প্রবন্ধ-সংগীতের মূলরূপ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই কারণেই দুইয়ের মধ্যেই একটি ঐক্য ধরা পড়ে।

প্রবন্ধসংগীত কি? এর উত্তরে কোনো বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে সোজা কথায় বলা চলে যে, সাধারণ গানের সাংগীতিক নামই হচ্ছে প্রবন্ধ। নানারকমের গান আজ যেমন আছে সেকালেও তেমন ছিল এবং সেগুলির বিভিন্ন প্রবন্ধ হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বর্তমান যুগে গানের চারটি কলি— স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। পূর্বে এই সব কলিকে বলা হত ধাতু এবং প্রচলিত ধাতুগুলির নাম ছিল— উদ্গ্রাহ, মেলাপক ধ্রুব এবং আভোগ। ধ্রুব এবং আভোগের মধ্যে আবার একটি কলি ছিল, তার নাম অন্তরা। 'ধ্রুব'— এই অংশটি ছিল গানের নিত্য অংশ অর্থাৎ এই কলিটি থাকতেই হবে। কালক্রমে এই সব কলির অদলবদল ঘটেছে এবং এগুলি বর্তমান চারটি কলিতে রূপান্তরিত হয়েছে।[১]

মোগল আমলের শেষদিকেও আমরা ধ্রুবপদের যে পরিচয় পাই তাতেও ধ্রুবপদ যে প্রাচীন প্রবন্ধ-সংগীতেরই সংস্কৃতরূপ সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পণ্ডিত ভাবভট্ট লিপিবদ্ধ করেছেন—

শৃঙ্গাররসভাবাঢ্যং রাগালাপপদাত্মকম্
পদান্তানুপ্রাসযুক্তং পাদান্তযুগকং চ বা।
প্রতিপাদং যত্র বদ্ধমেবং পাদচতুষ্টয়ম্
উদ্গ্রাহধ্রুবকাভোগান্তরং ধ্রুবপদং স্মৃতং॥[২]

---

১ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল, "প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তা" (বিশ্বভারতী) পুস্তিকায় এবিষয়ে আলোচনা করেছেন।

২ অনুপসংগীত রত্নাকর, ভাবভট্ট

এ বর্ণনা থেকে ধ্রুবপদে যে প্রবন্ধের "ধাতু"গুলি প্রচলিত ছিল এইটি প্রমাণিত হচ্ছে। আর, এটিও বোঝা যাচ্ছে যে, ধাতুনিবদ্ধ প্রবন্ধের "ধ্রুব" অংশটি একদা ধ্রুবপদের প্রধান অঙ্গ ছিল যে-কারণে এই সংগীতের নামকরণ হয়েছে "ধ্রুবপদ"।

দীর্ঘকালপ্রচলিত প্রবন্ধসংগীতের বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক এবং বহুবিধ প্রবন্ধে নানা মিশ্রণ ঘটতে ঘটতে অবশেষে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, প্রবন্ধসংগীতের একটি সংস্কারসাধন না করলে হয়তো ভারতীয় সংগীতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বিলুপ্তই হয়ে যেত। ধ্রুবপদ হচ্ছে এই সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল। দুঃখের বিষয় এই সংস্কারপ্রচেষ্টার নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না এবং ধ্রুবপদের সংগঠন সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। আইন-ই-আকবরিতে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় সেটুকু অবলম্বন করে এবিষয়ে নানারকম অনুমান করা হয়েছে। এই বিবরণী হচ্ছে—

Songs are of two kinds. The first is called Marga or the lofty-style as chanted by the gods and great Rishis, which is in every country the same, and held in great veneration. The masters of this style are numerous in Dekhan, and the six modes[৩] above mentioned with numerous variations of which the following examples, are held by them to appertain to it.

(1) Surya-prakasa (2) Pancha-talesvara (3) Sarvato-bhadra (4) Chandra Prakasa (5) Raga Kadamba (6) Jhumara (7) Svara-vartani.[৪]

The second kind is called Desi or applicable to the special locality, like the singing of Dhrupad in Agra, Gwalior, Bari and adjacent country. When Man Singh (Tonwar) ruled as Raja of Gwalor, with the assistance of Nayak Bakshu, Machhu and Bhanu, who were the most distinguished musicians of the day, he introduced a popular type of melody which was approved even by the most refined taste. On his death Bakshu and Machhu passed into the service of Sultan Mahmud of Gujarat where his new style came into universal favour.[৫]

এ থেকে এইটুকুই মাত্র জানা যায় যে রাজা মানসিং (তনোয়ার) তিনজন সংগীতজ্ঞের সহায়তায় একটি জনপ্রিয় সংগীতের প্রবর্তন করলেন এবং এই সংগীত উন্নত রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও অনুমোদিত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরিতে এ বিষয়ে একটি সাধারণ বিবরণী দেওয়া হয়েছে মাত্র। গবেষকদের এর উপর বেশি নির্ভর করা চলে না। পরন্তু এই গ্রন্থের বিবৃতি অনেকস্থলে যথার্থ নয়। এই গ্রন্থে কীর্তনীয়াদের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা থেকেই বোঝা যাবে এই সব বিবরণ কত অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত। উদাহরণস্বরূপ অংশটি উদ্ধৃত করি—

---

৩ ষড়্-রাগ—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ।

৪ এই সব গীতগুলি মার্গসংগীতের অন্তর্ভুক্ত নয়। আইন-ই-আকবরি সংকলিত হবার বহুপূর্বেই এর অনেকগুলি দেশীপ্রবন্ধের অন্তর্গত বলে সংগীতশাস্ত্রে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে সংগীতরত্নাকরের প্রবন্ধ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই ধরনের বিবরণী থেকে প্রমাণিত হয় যে আইন-ই-আকবরির সংগীত অধ্যায়ের সংকলন যথেষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তায় প্রস্তুত হয় নি।

৫ Ain-i-Akbari, translated into English by H. S. Jarret, edited by Jadunath Sarkar. Chapter—Sangit.

The Kirtaniya are Brahmins whose instruments are such as were in use among the ancients. They dress up smooth-faced boys as women and make them perform singing praises of Krishna and reciting his acts.

যে ধরনের সংগীতানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে এই বিবরণী লেখা হয়েছে তা কীর্তনের পর্যায়ে পড়ে না। শ্রীচৈতন্য যে নগরকীর্তনের অনুষ্ঠান করে নিজে গেয়েছিলেন—"তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে। শারংগধর "তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে" বা পুরীতে রথযাত্রা উপলক্ষে স্বরূপ দামোদর গেয়েছিলেন— "সেই তো পরাননাথ পাইনু। যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু"— এইসব অনুষ্ঠান স্মরণ করলে আইন-ই-আকবরির বিবরণীর বিকৃতিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাক, মূল প্রসঙ্গেই ফিরি।

মধ্যভারত থেকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলে যখন ধ্রুবপদ প্রসারিত হচ্ছে তখন বাঙলায় কী ধরনের তুলনীয়সংগীত প্রচলিত ছিল সেইটি বিচার্য বিষয়। বাঙলাদেশেও ধাতু নিবদ্ধ বহু প্রকার প্রবন্ধ -সংগীতের অস্তিত্ব ছিল। ভক্তিরত্নাকরে এই ধরনের ধাতুনিবদ্ধ পদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

রাগ-পঠমঞ্জরী

উদ্‌গ্রাহ

উদিত পূরণ নিশিনিশাকর
কিরণ করুতম দূরি
ভানুনন্দিনী পুলিন পরিসর
শুভ্র শোভিত ভূরি।

মেলাপক

মন্দ মন্দ সুগন্ধশীতল চলত মলয় সমীর।
ভ্রমরগণ ঘন ঝঙ্করু কত কুহকে কোকিল কীর।

ধ্রুব

বিরহে বরজকিশোর
মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী
পেখি পরম বিভোর।

অন্তরা

দেব দুলহ সুরাসমণ্ডলে বিপুল কৌতুক আজ।
বংশীকর গহি অধর পরশত মোদ ভীরুহিয়া মাঝ।
রাধিকাগুণ চরিতময় বর বিরচিত বহুবিধ গীত।
গানরত রতিনাথ মদভর হরণ নিরুপম নীত।

আভোগ

কঞ্জলোচন ললিত অভিনয় বরিষে রসজনু সেহ।
ভনব ফিরে ঘনশ্যাম প্রকটত জগতে অতুলিত লেহ।

এইটি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতুনিবদ্ধ প্রবন্ধসংগীতের সাধারণ উদাহরণ। কিন্তু, শুধু এইটুকুই নয়, প্রবন্ধসংগীতের অপরাপর অঙ্গাদিও বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল। ধ্রুবপদ এর তুলনায় সরলতর এবং এই

সরল পদ্ধতি বাঙলায় তখনও ব্যবহৃত হয় নি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, মুসলমানশাসনকালে ভারতের অপর অংশের সঙ্গে বাঙলার সংস্কৃতিগত সংযোগ খুব প্রবল ছিল না। এই কারণে কতকগুলি প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারা বহুকাল ধরে বাঙলায় অপরিবর্তিতভাবে প্রচলিত ছিল। বাঙলার বাইরে যখন প্রবন্ধ-সংগীতের সুসংস্কৃতরূপের প্রতিষ্ঠা ব্যাপ্ত হয়েছে বাঙলায় তখনও সুবিস্তারিত ষড়ঙ্গ প্রবন্ধসংগীত সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজ আধিপত্যে বাঙলা যখন গুরুত্ব অর্জন করেছে তখন বাইরে থেকে নানা গুণীজন বাঙলায় যাওয়া আসা আরম্ভ করেন এবং বাঙলায় ধ্রুবপদের প্রতিষ্ঠা এই সময়েই সুদৃঢ় হয়েছে। এর পূর্বে বোধকরি ধ্রুবপদের প্রচলন আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র সেই সব স্থানে যেখানে মুসলমান শাসনকর্তাদের বিশেষ যাতায়াত ছিল। এঁদের কাছে বাইরে থেকে ওস্তাদরা আসা যাওয়া করতেন এবং তাঁদের মাধ্যমে ধ্রুবপদ সেই সব অঞ্চলে কিছু কিছু বিস্তার লাভ করেছিল।

এই ষড়ঙ্গ প্রবন্ধের সঙ্গে পদাবলীকীর্তনের বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। ভক্তিরত্নাকরে এই-জাতীয় সংগীতের চমৎকার পরিচয় দেওয়া আছে।

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ শাস্ত্রে এ নির্ধার।
ষড়ঙ্গা প্রবন্ধগীত সর্বত্র প্রচার॥
স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাঠ, তাল।
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল॥
স্বর সরিগমপধাদিক নিরূপয়।
গুণনামযুক্ত মতে বিরুদ কহয়॥
পদশব্দবাচক প্রকার বহু ইথে।
তেন তেনাদিক শব্দ মঙ্গল নিমিত্তে॥
পাঠ বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা ধিলঙ্গাদি।
তাল চচ্চৎপুট যত্যাদিক যথাবিধি॥
এ ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য নিরূপয়।
বাক্য, স্বর, তাল, তেনা চারি কেহ কয়॥

এই ছটি অঙ্গ হল— স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাঠ এবং তাল। স্বর হচ্ছে "সা, রে, গা মা"— এই সব স্বর। বিরুদ হচ্ছে গুণবাচক অংশ। পদ বলতে গানের বাক্যাংশকে বোঝায়। তেনক শব্দ মঙ্গলবাচক। আগে গানের প্রারম্ভে "ওঁ তৎসৎ" এই ধরনের মঙ্গলসূচক বাক্য গাওয়া হত। একেই বলা হত "তেন"। "পাঠ" হচ্ছে তালের বোল। গানের সঙ্গে মাঝে মাঝে সঙ্গতে ব্যবহৃত বোলগুলিরও উচ্চারণ করা হত। এই ছটি অঙ্গের সন্নিবেশ অনুসারে প্রবন্ধের পাঁচটি জাতির পরিকল্পনা হয়েছে— মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী ভাবনী এবং তারাবলী।

ষড়ঙ্গ মেদিনীর একটি উদাহরণ ভক্তিরত্নাকর থেকে উদ্ধৃত করি—

জয় জগত বন্দিনী বিদিত নৃপনন্দিনী রাধিকাচন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী।
শ্যামমনোরঞ্জিনী ধৈর্যাভয়ভঞ্জিনী কঞ্জখঞ্জনমীন গঞ্জি মৃগলোচনী॥
কান্তজিতদামিনী পরমঅভিরামিনী ভামিনী সিন্ধু কন্যাদিমদমর্দিনী।
মঞ্জুমৃদুহাসীনী ললিত কলভাষিণী ভুবনমোহিনী ললিতাদিমুদবর্ধিনী॥

সুভগশৃঙ্গারিণী নবনববিহারিণী, বৃন্দবিপিনবিনোদিনী গজগামিনী।
রাসরসঙরঙ্গিনী মধুরতরঙ্গিনী, সকলরমণীমণি নরহরিস্বামিনী॥
ঝান্তা ঝাং ঝান্তা তাথা বিতকতো থুন্না দৃমিকি ত্রিগও তা কতা তা থৈয়া।
সরি রিগম পমগমম্মগরি সাস্‌সাতি অই তেন্না তেন্নাতে নাংতি অই ঐ আ॥

এই উদাহরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে প্রাচীন ষড়ঙ্গযুক্ত প্রবন্ধের প্রভাবই পদাবলীকীর্তনের উপর বিশেষভাবে পড়েছিল এবং এই রীতি ছিল ধ্রুবপদের চেয়ে কঠিনতর এবং বিস্তৃততর। আমাদের সাহিত্যে পদাবলীকীর্তনগায়নের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে প্রথমে অনিবদ্ধ গীত আলাপন হবার পর নিবদ্ধ গীত আরম্ভ হয়েছিল। এটি আমাদের সংগীতের চিরাচরিত রীতি। ধ্রুবপদ সংগঠিত হবার বহু পূর্ব থেকে এটা চলে আসছে। অতএব এদিক দিয়ে বিচার করেও এই গায়নপদ্ধতিকে ধ্রুবপদের প্রভাব বলা সংগত নয়। কীর্তনগায়ন প্রসঙ্গে "শ্রুতিস্বর গ্রাম মূর্ছনাদি প্রকাশিলা" বা "তাল পাঠাক্ষর চারুছান্দে উচ্চারয়" এই ধরনের প্রয়োগের উল্লেখ আছে। এইসব ধ্রুবপদের পূর্বে ষড়ঙ্গ প্রবন্ধসংগীতেই অধিক প্রচলিত ছিল।

নরোত্তমের বহু পরে রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও বাঙলার সংগীতের যে বিশদ বিবরণী পাওয়া যায়[৬] তাতে ধ্রুবপদের উল্লেখ পূর্বপ্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধ সংগীতের মতো প্রাধান্যযুক্ত নয়। ধ্রুবপদের প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকর বলছেন—"ধ্রুবপদাদি লক্ষণ সর্বত্র বিদিত", কিন্তু প্রবন্ধসংগীত সম্পর্কে বলেছেন—"ষড়ঙ্গ প্রবন্ধগীত সর্বত্র প্রচার"। এইসব উক্তি থেকে এইটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ধ্রুবপদ বহু পরে বাংলায় ব্যাপকতা লাভ করেছে, এমন কি সপ্তদশ শতকের শেষের দিকেও বোধ হয় ধ্রুবপদ বাঙলায় ততটা গৌরব অর্জন করে নি। ভক্তি-রত্নাকর পরবর্তীকালের রচনা হলেও বহুগ্রন্থের সহায়তা এতে গ্রহণ করা হয়েছে যাদের প্রামাণিকতা অবশ্যস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ,— "সংগীতপারিজাত", "সংগীতসার", "সংগীতমুক্তাবলী", "সংগীত দামোদর", "নারদপঞ্চমসার-সংহিতা", "কোহল", "সংগীত শিরোমণি" "রত্নমালা" প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গ্রন্থটিতে নিতান্ত সমসাময়িক সংগীতের আলোচনাই হয় নি, বাঙলার সাংগীতিক ঐতিহ্যের পরিচয়ই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অতএব বাঙলার সংগীত ব্যাপারে এই গ্রন্থের প্রাধান্য অবশ্যস্বীকার্য।

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে "ক্ষুদ্রগীত" প্রসঙ্গে ধ্রুবপদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এসব গানের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উদ্‌গ্রহাদি ধাতুরও উল্লেখ করা হয়েছে।

তাল ধাতু যুক্ত মাত্র ক্ষুদ্রগীত।
ধাতু পূর্ব উক্ত উদ্‌গ্রাহাদি যথোচিত॥

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে ক্ষুদ্রগীত বলতে কেবলমাত্র তাল আর ধাতুর সন্নিবেশ বোঝায়। অর্থাৎ, অপর ছটি সঙ্গের বিস্তারিত প্রক্রিয়া ধ্রুবপদে ছিল না, অথবা থাকলেও কমই ছিল। এই কারণেই এ গান "ক্ষুদ্র" অথবা প্রবন্ধসংগীতের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। কিন্তু, কীর্তন এই ক্ষুদ্র বা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পদাবলীকীর্তনের আয়োজন সুবিপুল। এক গৌরচন্দ্রিকাই কত বড়ো ব্যাপার প্রবন্ধ সংগীতের সম্পূর্ণ রীতি বজায় রেখেও এতে নূতনত্ব সম্পাদিত হয়েছে— এটি বড়ো কম কৃতিত্বের কথা নয়। সারা ভারতে যখন প্রবন্ধসংগীতে বিকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন বাঙলাদেশে ষড়ঙ্গ মেদিনীজাতীয় প্রবন্ধের পূর্ণবিকাশ ছিল এটিও বাঙালির পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নয়। কিন্তু, সহজধারার সঙ্গে পরিচয়

---

৬ ভক্তিরত্নাকর, নরহরিচক্রবর্তী। মুর্শিদাবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণ ৪২৬ চৈতন্যাব্দ। পঞ্চমতরঙ্গ।

শিকারী বিড়াল । কালীঘাট-পট

রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

হলে লোকে আর কঠিন রীতির দিকে আকৃষ্ট হয় না। অতএব দরবারের অনুমোদিত এবং সম্মানিত ধ্রুবপদ যখন বাঙলায় প্রসারলাভ করল তখন এই ধ্রুবপদ্ধতির জনক প্রবীণ প্রবন্ধসংগীত নবীনকে তার স্থান ছেড়ে দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে অন্তর্হিত হল। তবে এটা ভাবলেও ভুল হবে যে কীর্তন সেই মূলপ্রবন্ধ-সংগীতের ধারা আজও বহন করছে। খেতরীর মহোৎসবের অল্পকাল পর থেকেই পদাবলীকীর্তনের মূল গায়নপদ্ধতিতে ভাঙন ধরে এবং ক্রমে কীর্তনও বাহুল্য বর্জন করতে করতে তার পূর্ব বৈশিষ্ট্যকে হারিয়ে ফেলেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

ভক্তিরত্নাকর অনুসারে ক্ষুদ্রগীত চার প্রকার— চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদ এবং পঞ্চালী। ধ্রুবপদ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে—

ধ্রুবপদাদি লক্ষণ সর্বত্র বিদিত।
ভাষা সংস্কৃতে গায় নানাবিধ গীত॥
গীত সংস্কৃত ভাষাদি প্রসিদ্ধ হয়।
দিব্যাদি প্রকার সংগীতজ্ঞ নিরূপয়॥

এই "দিব্যাদি প্রকার" সংগীত সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরের উদ্ধৃতি হচ্ছে—

দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈব গীতং স্যাদ্দিবামানুষং।
দিব্যং সংস্কৃতসম্পন্নং মানুষং প্রকৃতোত্থিতং॥
সংস্কৃত প্রাকৃতোত্থঞ্চ দিব্যমানুষমুচ্যতে।
কেচিদ্দেশবিশেষোত্থভাষয়া মানুষং বিদুঃ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদ্যা দেশ ভাষাদিহেতবঃ।
যেষু যেষু দেশেষু যা ভাষাশ্চৈকবল্লভাঃ॥
তাস্ত তত্তজ্জনালাপাদাহৃত্য প্রতিযোজয়েৎ॥

ধ্রুবপদ সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছু বলা হয় নি এবং কোনো উদাহরণও দেওয়া হয় নি। কীর্তনের তুলনায় ধ্রুবপদকে লঘু প্রতিপন্ন করবার জন্যই যে ভক্তিরত্নাকর ধ্রুবপদ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করেন নি এই অনুমান সংগত নয়, বোধকরি ধ্রুবপদের প্রাধান্য তখনও এতটা বিস্তৃত হয় নি বলেই এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা হয় নি। ভক্তিরত্নাকর বাঙলায় প্রাক্-ধ্রুবপদ প্রবন্ধসংগীতের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করে এইটিই প্রমাণ করেছেন যে মুসলমান শাসনে বাঙলা যে কেবল লোকগীতি বা মঙ্গলকাব্যাদি রচনা করেছে তাই নয়, ভারতীয় সংগীতের মূল ধারাটিকেও বহুকাল ধরে বহন করে এসেছে। এই মূলরূপ, যা ষড়ঙ্গ প্রবন্ধসংগীত নামে পরিচিত, সেটি ধ্রুবপদ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং ব্যাপক। ধ্রুবপদ হচ্ছে কেবলমাত্র প্রবন্ধসংগীতের আকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রচেষ্টার ফল। যেখানে প্রবন্ধসংগীতের বিশেষ বিকৃতি ঘটেছিল ধ্রুবপদের অভ্যুদয় সেখানেই। বলা বাহুল্য যে সেইসব স্থানে প্রবন্ধসংগীতের বহু বৈশিষ্ট্য এবং অলংকরণ ইতিপূর্বেই একেবারে লুপ্ত হয়েছিল বা বিকৃত হয়ে পড়েছিল। অতএব ধ্রুবপদে আমরা কেবলমাত্র প্রবন্ধসংগীতের কাঠামোটুকুরই পরিচয় পাচ্ছি। নরহরি চক্রবর্তীর নামে প্রচারিত "সংগীতসারসংগ্রহ" নামক যে একটি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় তাতেও ধ্রুবপদের যে সামান্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, ধ্রুবপদ মূল প্রবন্ধসংগীতের ধাতুনিবদ্ধ আকৃতিটুকুই মাত্র বহন করে। অতএব ধ্রুবপদ ষড়ঙ্গ প্রবন্ধসংগীত অপেক্ষা অনেক সরল, সহজ এবং সাধারণের পক্ষে সুবোধ্য হয়েছিল। এই

কারণেই ধ্রুবপদের প্রসার এত দ্রুতগতিতে ঘটেছে। নরোত্তম বাল্যকাল থেকে বাংলার প্রচলিত প্রাক্-ধ্রুপদীয় ষড়ঙ্গ প্রবন্ধের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, সুতরাং তাঁর কাছে ধ্রুবপদ কিছু নতুন বস্তু নয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই তিনি পদাবলীকীর্তনের ভিতর দিয়ে ধ্রুবপদের প্রচার করেন নি, যা করেছিলেন তা প্রবন্ধসংগীতেরই একটি নবরূপের আরোপ। ধ্রুবপদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংগীত যেখানে প্রচারিত ছিল সেখানে ধ্রুবপদের প্রভাবের কথা উঠতেই পারে না।

আসল ব্যাপার এই যে, ধ্রুবপদ প্রবন্ধসংগীতের আত্মজ হওয়াতে বাঙলায় প্রচলিত প্রবন্ধসংগীতের সঙ্গে তার আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত একটি মিল থাকবেই। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই এইসব সংগীতের প্রয়োগবিধিতে কতকগুলি ঐক্য আছে; নতুবা নরোত্তম-প্রবর্তিত পদাবলীকীর্তনের সঙ্গে ধ্রুবপদের আর কোনো সংযোগ নেই। এই দুটি গীতরূপের বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হয়েছে, এবং কীর্তনকে ধ্রুবপদের উপর নির্ভর করবার কোনো কারণ দেখা যায় না, কেননা পদাবলীকীর্তন ধ্রুবপদ অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং শ্রেষ্ঠতর ষড়ঙ্গ প্রবন্ধসংগীতের প্রভাবে সংগঠিত হয়েছে।

য়োরুবা দেশে

১ লেগস নগরী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাইজিরিয়া দেশ, ভারতবর্ষ হাত-ছাড়া হবার পরে ইংরেজদের অধীনে এখন সব-চেয়ে বড় দেশ (কানাডা দক্ষিণ-আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি তো স্বাধীন রাষ্ট্রেরই মত)। নাইজিরিয়ার আয়তন ৩ লাখ ৩৭ হাজার বর্গ-মাইলের অধিক (ভারতবর্ষ ১২২ লাখের উপর, আর গ্রেট-ব্রিটেন আর উত্তর-আয়র্লাণ্ড মাত্র ৯৪ হাজার বর্গ-মাইলের কিছু উপর), লোকসংখ্যা ৩ কোটি। নাইজিরিয়াকে Niger নাইজার নদী আর তার করদ নদী Benue বেনুয়ে, এই দুইয়ে মিলে তিনটি স্বাভাবিক খণ্ডে যেন বিভাগ ক'রে দিয়েছে— উত্তর-নাইজিরিয়া, পশ্চিম-নাইজিরিয়া আর পূর্ব-নাইজিরিয়া। দেশের লোকেরা প্রায় সকলেই কৃষ্ণকায় নিগ্রো বা আফ্রিকান জাতির মানুষ। এদের মধ্যে নানা উপজাতি, নানা ভাষা। কতকগুলি ভাষা একই গোষ্ঠীর, আবার অনেকগুলি নিজ নিজ পৃথক্ গোষ্ঠীর। এখন রাজার জাতি ইংরেজের ভাষাই এদের মধ্যে রাজকার্য্যের শাসনের আর শিক্ষার ভাষা আর কতকটা আন্তর্জাতিক ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। উত্তর-নাইজিরিয়ার লোকেরা বেশির ভাগ মুসলমান, এবং বিশেষ ক'রে তারা Hausa হাউসা জাতির অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণে, নাইজার নদীর দক্ষিণ উপকূল ধ'রে, এই বিরাট্ নদীর দক্ষিণমুখী বাঁকের ঘেরের মধ্যে, আজকালকার পশ্চিম-নাইজিরিয়া প্রদেশে, Yoruba য়োরুবা জাতি বাস করে। এরা সংখ্যায় প্রায় ৫০ লাখ বা ৫ মিলিয়ন হবে। য়োরুবাদের দেশের পুবে, নাইজারের বাম উপকূলে আর বেনুয়ে নদীর দক্ষিণে হ'চ্ছে পূর্ব-নাইজিরিয়া। এখানে পরস্পর-সম্পৃক্ত কতকগুলি আফ্রিকান উপজাতি বাস করে, তাদের মধ্যে Igbo ইগ্বো বা Ibo ইবোরাই প্রধান— এরা সংখ্যায় য়োরুবাদের সমান হবে, ৫০ লাখের কিছু কম বা কিছু বেশি। এ-ছাড়া ইগ্বোদের আর য়োরুবাদের উভয়ের সঙ্গে সংযুক্ত Bini বিনি বা Edo এদো জাতির লোক আছে। Ijo ইজো, Ibibio ইবিবিও প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্রতর জাতিও আছে। ইগ্বো আর য়োরুবা— এই দুই জাতি মিলে সংখ্যায় প্রায় ১ কোটি। আফ্রিকান জাতি— বিশুদ্ধ কৃষ্ণকায় আফ্রিকান— একই ভাষা বলে আর একই সংস্কৃতির অন্তর্বর্তী, সংখ্যায় ৫ মিলিয়ন ক'রে প্রায় আর কোথাও নেই।

য়োরুবা আর ইগ্বোরা আফ্রিকার সব-চেয়ে প্রগতিশীল অগ্রগামী কৃষ্ণকায় জাতির মানুষের মধ্যে অন্যতম। এদের মধ্যে লেখা-পড়া শেখা—ইংরেজি-শিক্ষিত আর ইউরোপে গিয়ে প'ড়ে আসা পণ্ডিত লোক প্রচুর। আর তারাই এই দেশকে এখন পরিচালিত ক'রছে। ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, যান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক প্রচুর। এদের সঙ্গে তুলনা করা যায় আফ্রিকার মাত্র আর ৩।৪টি জাতির মানুষকে— Gold Coast গোল্ড-কোস্ট (বা Ghana গানা) রাষ্ট্রের Akan আকান জাতির লোকেদের, আর উগাণ্ডা প্রদেশের Baganda বাগাণ্ডা লোকেদের, আর তা-ছাড়া আরও সামান্য কয়টি জাতির মানুষদের। ইগ্বোদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম অনেকটা প্রসারলাভ ক'রেছে— কিন্তু মুসলমান ধর্মের প্রভাব কম, আর প্রাচীন ধর্ম এখনও বেশি লোকের

মধ্যেই বিদ্যমান। য়োরুবাদের মধ্যে মুসলমান ধর্মের প্রচার একটু বেশি। খ্রীষ্টানও অনেক আছে, আর তা-ছাড়া কিছু লোক প্রাচীন ধর্ম আঁকড়ে রয়েছে— য়োরুবারা বোধ হয় শতকরা ৪০ মুসলমান, ৪০ খ্রীষ্টান, আর ২০ প্রাচীন ধর্মের। নাইজিরিয়ায় য়োরুবা আর ইগ্বো এদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। আর উত্তর-নাইজিরিয়ার মুসলমান এবং শিক্ষায় অনগ্রসর Hausa হাউসা আর Fulani ফুলানি প্রভৃতি জাতির লোকেরা, এই খ্রীষ্টান অথবা প্রাচীন-ধর্মী য়োরুবা আর ইগ্বোদের পছন্দ করে না, তাদের আশঙ্কা যে ইংরেজি লেখাপড়ার জ্ঞানের ফলে দক্ষিণের এই লোকেরা উত্তরে গিয়ে সকলের উপরে আধিপত্য ক'রবে। এইজন্য উত্তরের লোকেরা এখন য়োরুবা আর ইগ্বোদের সঙ্গে মিলে স্বাধীন হ'তেও চায় না। তারা বরং আলাদা রাজ্য গঠনের পক্ষপাতী। এ ঠিক যেন পাকিস্থানী ব্যাপার। উত্তরের মুসলমান হাউসারা সংখ্যায় ১৫ মিলিয়ন বা ১২ ক্রোড়, দুর্ধর্ষ লড়াকিয়া জাতির মানুষ, ব্যবসায়-বুদ্ধিও এদের আছে, চারিদিকে এরা ছড়িয়ে' প'ড়েছে, এদের পুরাতন ইতিহাস আছে, এরা স্বতন্ত্র জাতি হ'তে চায়।

আফ্রিকার অন্য নানা জাতি আর উপজাতির মধ্যে, য়োরুবাদের সম্বন্ধে একটু জানবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। য়োরুবাদের সঙ্গে নিকট-সম্পৃক্ত Edo এদো জাতি আছে (যেমন বাঙালী আর উড়িয়া)। এদোরা Bini বিনি বা Benin বেনিন নগরে নিজেদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ক'রে আছে। সেখানে আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে তারা একটি খুব লক্ষণীয় সভ্যতা গ'ড়ে তোলে। এই সভ্যতার এক বাহ্য প্রকাশ ঘটেছিল, শিল্পে। কাঠের খোদাই, হাতীর দাঁতের খোদাই, হাতে বোনা ছাপা কাপড়, আর মাটির আর ব্রঞ্জে ঢালা মূর্তি, ব্রঞ্জে ঢালা ফলক, এইসবে এই শিল্প আফ্রিকার সভ্যতার, এমনকি বিশ্বসভ্যতার এক গৌরবের বস্তু। লণ্ডনে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ-মিউজিয়মে বেনিনের এই শিল্পসম্ভারের নিদর্শন দেখে, নিগ্রো বা আফ্রিকান জাতির সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব উচ্চ হ'য়ে যায়। তখন লণ্ডনেই নাইজিরিয়ার কতকগুলি য়োরুবা ছাত্র আর অন্য ভদ্রসজ্জনের সঙ্গে আলাপ হয়। য়োরুবাদের সম্বন্ধে, এদোদের সম্বন্ধে হাতের কাছে যা পাই তা প'ড়ে ফেলি। ওদের ধর্ম সমাজ প্রভৃতির সম্বন্ধে একটু জ্ঞানলাভ করি। এর বহু পরে খবর পাই, খাস য়োরুবাদের সংস্কৃতির এক প্রধান কেন্দ্র Ife ইফে নগরে স্থানীয় রাজা যাঁর পদবী হ'চ্ছে Oni 'অনি', তাঁর প্রাসাদ খুঁড়তে খুঁড়তে অনেকগুলি ব্রঞ্জে ঢালা প্রমাণ-আকারের নৃমুণ্ড পাওয়া যায়— আফ্রিকান মেয়ে পুরুষের, প্রাচীন দেবদেবী আর রাজাদের মুণ্ড— ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলি প্রায় ১০০০ বছর আগে এই য়োরুবাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা তৈরী হয়েছিল। এগুলির ভাস্কর্য এত সুন্দর যে শ্রেষ্ঠ প্রাচীন গ্রীক অথবা রেনেসাঁস ইটালির ব্রঞ্জমূর্তির সঙ্গে টক্কর দেয়। আমি এগুলির ছবি দেখি, আর শুনি যে এগুলিকে ইউরোপে প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হ'য়েছিল। পরে অনি নিজের রাজধানী Ife ইফেতে একটি মিউজিয়ম ক'রে এগুলি রক্ষা ক'রছেন। য়োরুবাদের ধর্ম সম্বন্ধে, আফ্রিকান শিল্প সম্বন্ধে, ইংরেজি আর বাঙলায় কতকগুলি প্রবন্ধও লিখি।

বহু দিন ধ'রে পশ্চিম-আফ্রিকা— বিশেষ ক'রে নাইজিরিয়া আর গোল্ড-কোস্ট (বা Ghana গানা)— একবার ঘুরে আসবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। যোগাযোগে গত ১৯৫৪ সালে তিন সপ্তাহের জন্য গোল্ড-কোস্ট, নাইজিরিয়া ও স্বাধীন নিগ্রো প্রজাতন্ত্রদেশ Liberia লাইবিরিয়া দেখে আসবার সুযোগ আমার ঘ'টে যায়। নাইজিরিয়ায় য়োরুবাদের বাসভূমি পশ্চিম-নাইজিরিয়ার কয়টা শহর দেখতে পেরেছিলুম— সমগ্র দেশের রাজধানী Lagos লেগস, আর য়োরুবাদের দুটো শহর Ibadan ইবাদান আর Ife ইফে, আর এ-ছাড়া

Abeokuta আবেওকুতা শহরে কতক্ষণ কাটাতে পেরেছিলুম। তারপরে, উত্তরে হাউসাদের প্রধান কেন্দ্র Kano কানো নগরেও দুদিন কাটিয়েছিলুম।

দিল্লী, বোম্বাই, কাইরো, ত্রিপোলি, কানো— এই পথে আকাশ-যানে পশ্চিম-আফ্রিকা যাই। ত্রিপোলি থেকে পূর্ব-সাহারা মরু পেরিয়ে ২৮শে জুলাই ১৯৫৪ বৃহস্পতিবার প্রাতে কানো নগরে পৌছুই। ঘণ্টাখানেক সেখানে থেকে, আমরা সোজা গোল্ড-কোস্টের রাজধানী Accra আক্রার দিকে পাড়ি দিই— সকাল সাড়ে দশটায় সেখানে পৌছুই। প্রথমটা গোল্ড-কোস্টের ভ্রমণ শেষ ক'রে, ৩রা আগস্ট মঙ্গলবার বেলা তিনটের পরে হাওয়াই জাহাজে আক্রা ত্যাগ ক'রে, বিকালে ৬টায় লেগস নগরে হাজির হই। য়োরুবা দেশে ছিলুম মাত্র ছ দিন, পরে ৯ই আগস্ট লেগস ত্যাগ করে উত্তর-নাইজিরিয়া হাউসাদের প্রধান নগর কানোতে উপস্থিত হই। হাউসাদেশের অভিজ্ঞতার কথা এখন ব'লবো না। য়োরুবাদের কয়টি মুখ্য কেন্দ্র দেখে আসতে পেরেছিলুম মাত্র, তারই কথা ব'লবো।

একটু পূর্বকথা ব'লে নিই। আফ্রিকার, বিশেষ ক'রে পশ্চিম-আফ্রিকার শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে ঘরে ব'সে "স্বান্তঃসুখায়" নাড়াচাড়া ক'রে আসছি। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন, বাইরের পাঁচটা জাতির সঙ্গে এখন, ইংরেজের মাধ্যমে আর নয়, সোজাসুজি, সমান-ভাবে মেলবার মেশবার সুযোগ আমাদের হ'য়েছে। এখন নানা দেশের প্রধান লোক বা প্রতিনিধি আমাদের দেশে আসছেন, আর আমাদেরও বিশিষ্ট ব্যক্তি বিদেশে যাচ্ছেন, যাবার আমন্ত্রণ পাচ্ছেন। ১৯৫২ সালের শেষ ভাগে আর ১৯৫৩ সালের গোড়ায় নাইজিরিয়া দেশ থেকে দুইজন মন্ত্রী স্বাধীন ভারতবর্ষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে, আর নিজের জাতির শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে, এদেশে এসে বেড়িয়ে যান। এঁরা দুজনেই পশ্চিম-নাইজিরিয়া দেশের য়োরুবা জাতির লোক। একজন হ'চ্ছেন শ্রীযুক্ত Obafemi Awolowo ওবাফেমি আরোলোরো, ইনি পশ্চিম-নাইজিরিয়া প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী; আর দ্বিতীয় জন হ'চ্ছেন শ্রীযুক্ত Augustus Akinloye আগস্টস্ আকিন্‌লোয়ে, ইনি ঐদেশের কৃষিমন্ত্রী। এঁদের সঙ্গে ছিলেন তিনজন আফ্রিকান আর একজন ইংরেজ সেক্রেটারি। দিল্লী আর অন্য নানা জায়গা ঘুরে এঁরা ক'লকাতায় আসেন ১৯৫৩ জানুয়ারিতে। এঁদের সম্মানের জন্য আমাদের পশ্চিম-বাঙলা বিধান-সভা-গৃহে একটি বৈকালিক চা-যোগের ব্যবস্থা হয়, এবং তাতে এঁদের স্বাগত ক'রে, শিষ্টাচার দেখিয়ে, বক্তৃতাদিও হয়। তখন অবসর পেয়ে, য়োরুবা জাতির সম্বন্ধে, তাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে যথাজ্ঞান দু-চার কথা আমি বলি। এঁদের সম্বন্ধে সহানুভূতির দৃষ্টি দেখে, আর এঁদের বিষয়ে আমার মনে জিজ্ঞাসার ভাব দেখে, উপস্থিত আফ্রিকান সজ্জনগণ খুবই খুশি হন। পরে তাঁরা আমার বাড়িতেও একদিন পদার্পণ করেন, আর তাঁদের দেশে যাবার জন্যে অনুরোধও করেন। শ্রীযুক্ত আরোলোরো পশ্চিম-আফ্রিকার একজন সর্বজনমান্য নেতা। নাইজিরিয়ার পশ্চিমে গোল্ড-কোস্ট বা গানা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী Dr. Kwame Nkrumah কামে ঙ্‌ক্রুমা, পশ্চিম-নাইজিরিয়ার শ্রীযুক্ত আরোলোরো আর ইবোদের দ্বারা অধ্যুষিত পূর্ব-নাইজিরিয়ার Dr. Azikiwe আজিকিবে, এই ত্রয়ী এখন পশ্চিম-আফ্রিকার ইংরেজের অধীনে যে কয়টি দেশ আছে সে কয়টির রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নেতা, এঁরা সব বিষয়ে দেশের আফ্রিকানদের মধ্যে নবজাগরিত জাতীয়তা এবং দেশাত্মবোধের প্রতীক; ডক্টর ঙ্‌ক্রুমাকে "পশ্চিম-আফ্রিকার নেহরু" আখ্যা দিয়ে স্থানীয় লোকেরা আনন্দ পান। এঁদের সংস্পর্শে এসে, আর এখন পশ্চিম-আফ্রিকার লোকেরা যে-ভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

স্বাধীনতার দাবি নিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছেন, পত্র-পত্রিকায় তার খবর পেয়ে, পশ্চিম-আফ্রিকার অন্ততঃ একবার 'ঝাঁখী'-দর্শন করবার জন্যে আগ্রহে বেড়ে যায়। যোগাযোগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নেহরুর অনুমোদন ও শুভেচ্ছা নিয়ে, দিল্লীর আধা-সরকারি সংস্থা Indian Council for Cultural Relations (ICCR) -এর ব্যবস্থায়, তিন সপ্তাহের জন্য পশ্চিম-আফ্রিকা ঘুরে আসবার সুযোগ ১৯৫৪ সালে আমার হ'ল। গোল্ড-কোস্ট, নাইজিরিয়া, লাইবিরিয়া এই তিনটে দেশের উপর চোখ বুলিয়ে, আর ওখানকার জনকয়েক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ ক'রে, ফরাসি-আফ্রিকার Dakar ডাকার আর Casablanca কাসাব্লাঙ্কা ছুঁয়ে পারিসে যাই, তার পরে পারিস থেকে কেম্ব্রিজে ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অন্যতম প্রতিনিধি-রূপে ত্রয়োবিংশ আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ মহাসম্মেলন-এ যোগদান ক'রে, সোজা দেশে ফিরি। আফ্রিকায় এই অভিজ্ঞতাটুকু এত চমৎকার লেগেছে যে কথায় তা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। তার একাংশ য়োরুবাদের দেশে যাত্রার কথা এখন কিছুটা লিখছি।

আমি একজন ভারতীয় শিক্ষাবিৎ, আর একটি ভারতীয় রাজ্যের বিধান-পরিষদের সভাপতি ব'লে, আমার ভ্রমণের সুবিধা ক'রে দেবার জন্যে ভারত সরকার থেকে আমার গন্তব্য দেশগুলির কর্তৃপক্ষকে খবর দেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতের একজন বেসরকারি প্রতিনিধির জন্য বিশেষ সৌজন্যের সঙ্গে এই-সব দেশের সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়। নাইজিরিয়ায় একটা ভ্রমণের প্রোগ্রাম ওঁদের সরকার থেকেই আমার জন্যে তৈরি ক'রে রাখা হয়, কিন্তু সময়ের অভাবে সেইটি আমি অনেকটা কাটছাঁট ক'রে ছোট ক'রে নিতে বাধ্য হই। এঁরা বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি কর্তৃপক্ষের অতিথি হবার ব্যবস্থা ক'রে দেন, কিন্তু ভ্রমণের খরচ এঁদের দায়িত্বের মধ্যে ছিল না। পশ্চিম-আফ্রিকায়, বিশেষ ক'রে ব্রিটিশ এলাকার দেশগুলিতে, ভারতবর্ষের সিন্ধী বণিকেরা গত কয়েক দশকের মধ্যে ব্যবসার-ক্ষেত্রে নিজেদের একটা বেশ লক্ষণীয় মর্য্যাদাপূর্ণ স্থান ক'রে নিয়েছেন। এঁরা আগে সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন বড় বড় শহরে রেশম, কিউরিও বা মনোহারি দ্রব্য, জহরৎ প্রভৃতির দোকান ক'রে চালাতেন— এই কাজ এঁদের একচেটে ছিল। কিন্তু প্রায় সব দেশেই বিদেশী ব্যবসায়ীর প্রতি একটা বিরোধ-ভাব এসে পড়ায় এঁদের অন্য নানা ক্ষেত্রে প্রসার ক'রতে হ'চ্ছে। সিরিয়া আর লেবানন থেকে আগত আরবী-ভাষী খ্রীষ্টান ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা এ অঞ্চলে অনেকটা প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু তারা স্থানীয় কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকানদের সঙ্গে শ্বেতকায় ইউরোপীয়ানদের মতনই অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার ক'রত, আর নানা ভাবে অজ্ঞ আফ্রিকানদের শোষণ ক'রত। সেইজন্যে তাঁদের বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠেছিল। ভারতের হিন্দু সিন্ধী বণিকেরা কিন্তু তাঁদের স্বাভাবিক মধুর ও কোমল ব্যবহারের দ্বারা আর ব্যবসায়ের লেন-দেনে সততার দ্বারা, সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হ'য়েছেন। এ ছাড়া, এঁরা প্রচুর পরিমাণে নিজেদের কারবারে স্থানীয় লোকদের নিযুক্ত ক'রে থাকেন, আর ভারতবর্ষে গিয়ে যাতে উচ্চশিক্ষা পেতে পারে এই জন্য কতকগুলি বৃত্তি দিয়ে আফ্রিকান ছেলেদের ভারতবর্ষে পাঠাচ্ছেন। এঁরা পৃথিবীর সব দেশ থেকেই স্থানীয় লোকেদের চাহিদা অনুসারে নানা রকম জিনিসের আমদানি করেন, তার মধ্যে কাপড়চোপড়ই প্রধান। ভারতবর্ষের তৈরি নানা বস্তু, যেমন সেলাইয়ের কল, লণ্ঠন, থার্মোফ্লাস্ক্ প্রভৃতি এঁরা আমদানি করেন। লেগস শহরে চেলারাম Messrs K. Chellaram and Sons (Nigeria) Ltd. সবচেয়ে বড় সিন্ধী ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান। এঁদেরও খবর পাঠানো হয়। সিন্ধীরা বিশেষভাবে অতিথিবৎসল জাতি, আর দেশের বাইরে প্রত্যেক ভারতবাসীকে এঁরা আপন জন বলে

গ্রহণ করেন। লেগস হাওয়াই-জাহাজের আড্ডায়, চেলারামের আপিসের দুজন ডাইরেকটর শ্রীযুক্ত নিহালচন্দ্‌ মীরপুরী আর শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌ সামতানী তাঁদের গাড়ি নিয়ে উপস্থিত হন। তাঁরা আমাকে সোজা প্রথমে তাঁদের আপিসে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমাকে চিঠি দিলেন নাইজিরিয়ার বিদেশ-মন্ত্রীর পক্ষ থেকে ; Ikoyi Hostel ইকোয়ি হস্টেল ব'লে সরকারি কর্মচারী আর অতিথিদের জন্য যে বাসভবন নির্দিষ্ট আছে, সেখানে আমার জন্য থাকবার স্থান ঠিক হ'য়েছে। সিন্ধী বন্ধুরা নিজেদের গাড়ি করে আমাকে সেখানে পৌছে দিলেন, আর ব'ললেন, ঐ রাত্রে তাঁদেরই বাড়িতে গিয়ে আমাকে তাঁদের সঙ্গে আহার ক'রতে হবে।

ইকোয়ি হস্টেল-এর ব্যবস্থা ভাল, যত উচ্চশ্রেণীর কর্মচারী রাজধানী লেগস শহরে এলে এখানেই স্থান পান। বড় দরের হোটেলের মত সব ব্যবস্থা। আমি লেগসে দুদিন এখানেই ছিলুম। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌ তাঁদের কোম্পানীর গাড়ি ব্যবহার ক'রতে দেন, তাঁদের এই আতিথেয়তার জন্য সমস্ত দেখবার সুবিধা হ'য়েছিল। এঁরা নিজেরাও অনেক সময়ে আমার সঙ্গে ঘুরতেন। রাত্রে ওঁদের ওখানে আহারকালে আমার য়োরুবা দেশ ভ্রমণের প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে নিলুম, আর তদনুসারে যে ইংরেজ সহকারি-সেক্রেটারি সরকারের পক্ষ থেকে আমার ভ্রমণের ব্যবস্থার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁকেও জানিয়ে দেবার বন্দোবস্ত ক'রলুম। পরের দিন সকালে হস্টেলেই প্রাতরাশ সেরে সহকারি-অ্যাসিণ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারির সঙ্গে টেলিফোনে কথা ক'য়ে নিলুম। চেলারাম কোম্পানির গাড়ি এসে আমাকে ওঁদের আপিসে নিয়ে গেল। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌ আমাকে British Council নামে ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শ্রীযুক্ত Lowden লাউডেন-এর সঙ্গে দেখা ক'রতে নিয়ে গেলেন। এঁর কাছ থেকে নাইজিরিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থার সম্পর্কে কতকগুলি খবর পাওয়া গেল। Ibadan ইবাদান শহরে আছেন এঁদেরই প্রতিনিধি স্থানীয় পরিচালক (Regional Director of the British Council) শ্রীযুক্ত John Danford জন ড্যানফর্ড। ইনি ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। আর শুনলুম যে সম্প্রতি ইনি বিলেত থেকে বেনিন শহরে প্রাচীন কালের স্থানীয় একজন রাণীর একটি প্রমাণ-আকারের ব্রঞ্জ-মূর্তি তৈরি ক'রে ঢালিয়ে এনেছেন, এবং সেটি বেনিনে স্থাপিত হ'য়েছে। তারপরে আমরা Methodist Bookshop-এ গিয়ে কিছু বই, আর য়োরুবা কারিগরের কাজ একটি ছোট কাঠের নারীমূর্তি কিনলুম। পথে লেগস শহরের প্রবহমান জীবনস্রোতের সঙ্গে পরিচয় শুরু হ'ল। দেশের অধিবাসী কৃষ্ণকায় আফ্রিকান (Negro 'নিগ্রো' শব্দটি এখন আর ব্যবহার হ'চ্ছে না, এই শব্দের বিকৃত ইংরেজি Nigger 'নিগার'-এর মত মূল শব্দটিও কৃষ্ণবর্ণ আফ্রিকানদের কাছে অপমানজনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সেইজন্য এই শব্দের বদলে 'আফ্রিকান' শব্দই এখন সকলে ব্যবহার ক'রছেন)। রাস্তায় মানুষ সবই প্রায় আফ্রিকান— পিল্ পিল্ ক'রছে। পুরুষেরা বেশির ভাগই হাফপ্যাণ্ট আর নানা রকমের রঙিন বা সাদা গেঞ্জি পরা, এবং খালি পা— এই হ'চ্ছে সাধারণ শ্রমিকের পোশাক। খাঁটি ইউরোপিয়ান পোশাক ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই প'রে থাকেন, কিন্তু ঢিলে আলখাল্লার মত য়োরুবা পোশাক, হাঁটুর নীচে পর্যন্ত যার ঝুল, এবং নানা রঙিন ছিটের কাপড়ে যা তৈরি, আর মাথায় গোল কাপড়ের টুপি (সাটিন অথবা সুতির কাপড়ের), পায়ে চপ্পল, এই বেশের জাতীয়তা-ভাবযুক্ত য়োরুবা ভদ্রলোকও প্রচুর। সাধারণতঃ সাদা বা নীল রঙের কাপড়ের, গোড়ালি পর্যন্ত আলখাল্লা পরা হাউসা বা অন্য জাতীয় মানুষও অনেক দেখা যায়। মেয়েরা বেশির ভাগই একটা বেশ 'চকাবকা' নানা

রঙের নকশাওয়ালা ছাপা কাপড় লুঙ্গির মত ক'রে কোমরে জড়িয়ে পরে। একটু অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা গায়ে একটা রঙিন কাপড়ের জ্যাকেট পরে। কেউ কেউ লুঙ্গির মত কাপড়টা বুকের উপরে বেঁধেই আবরু রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুই কাঁধ খোলা। অনেকেই আর-একখানা কাপড়ে শিশুসন্তানকে পিঠে বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা পৃথিবীর অন্য নানা দেশের মত এখনও ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখে। আফ্রিকান মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ লম্বা চুল রাখবার রীতি নেই, চুল ছোট ক'রে কাটে, আর কোথাও কোথাও মাথা একেবারে ন্যাড়া ক'রে রাখে। কিন্তু মাথায় কেশের অল্পতা বা সম্পূর্ণ অভাবকে এরা অন্য ভাবে মানিয়ে নেয় — মাথায় একখানা রঙিন কাপড়ের রুমালের মতন পাগড়ির আকারে জড়িয়ে রাখে। এদের গায়ের কালো রঙের সঙ্গে মাথার কাপড়ের, গায়ের জ্যাকেটের, আর পরিধেয় বসনের বিভিন্ন উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশের ফলে যে একটি রঙের খেলা দেখা যায়, সেটি বিশেষ নয়নাভিরাম। মেয়েরা মাথায় যে কাপড় বাঁধে সেই কাপড়টা একটা বীড়ার মত কাজ করে, আর কিছু জিনিস-পত্র কিনলে বা নিয়ে যেতে হ'লে মেয়েরা মাথার উপরেই রাখে। মেয়েরা সাধারণত খালি পায়েই ঘরে আর বাইরে পথে-ঘাটে চলা-ফেরা ক'রে থাকে।

লেগস শহর একটি দ্বীপের উপরে। এক সময়ে এই জায়গাটা প্রায় সম্পূর্ণ জলাভূমি ছিল। পোর্তুগীজ আর অন্য ইউরোপীয় বণিক জাতি আসার ফলে এখন একটি বেশ বড় বাণিজ্যকেন্দ্র আর পরে বিরাট্ শহর গ'ড়ে উঠেছে এখানে। লেগস শহরটিকে এখন একটি লম্বা সাঁকো দিয়ে জলের ওপারের দেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে। লেগস য়োরুবাদের দেশে হ'লেও, নাইজিরিয়ার রাজধানী ব'লে এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আর পশ্চিম-আফ্রিকার নানা স্থানের বহু লোক এখানে এসে বাস ক'রছে।

আমি ওদেশে গিয়েছিলুম ওখানকার মানুষ দেখতে; কিভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার এদের মধ্যে হ'চ্ছে বা সংরক্ষণ হ'চ্ছে তাই দেখবার জন্যে। সমগ্র নাইজিরিয়া দেশের উপরে আছেন একজন ইংরেজ গভর্ণর, এবং এই গভর্ণরের নীচে আছেন তিনজন প্রাদেশিক গভর্ণর। নাইজিরিয়ার গভর্ণর Sir John Macpherson স্যর জন ম্যাক্ফারসান ছিলেন স্থানীয় লোকেদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল যে দেশের লোকেরা স্বাধীনতা লাভ করে। আমি যখন লেগসে পৌঁছুই তখন তিনি ইংলাণ্ডে ছুটিতে গিয়েছিলেন; কিন্তু আমি থাকতে থাকতেই তিনি ফিরে আসেন, আর সৌভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার লেগস-পরিত্যাগের পূর্বের দিন, ৮ই আগস্ট, প্রায় আধ ঘণ্টার উপর ধ'রে আলাপ-আলোচনা হ'য়েছিল। সে কথা পরে ব'লবো।

আমার নাইজিরিয়া-ভ্রমণের ব্যবস্থা করবার জন্যে সহকারি-সেক্রেটারি Mr. Smith মিস্টার স্মিথের আপিসে গেলুম। ইনি একজন অল্পবয়সী ইংরেজ, খুব ভদ্র, তবে খুব বেশি হৃদ্যতা বা আগ্রহশীলতার ভাব দেখালেন না। যেখানে যেখানে আমার যাওয়ার কথা ছিল অথচ যাওয়া হ'ল না, সেখানকার সেখানকার কর্তৃপক্ষদের চিঠি লিখে দেবার ভার নিলেন। য়োরুবাদের দেশ দেখা শেষ ক'রে, লেগস থেকে উত্তর-নাইজিরিয়ার কানো যাবার হাওয়াই-জাহাজের টিকিট ঠিক ক'রে রেখে দেবেন, কথা রইল। অন্যত্র যাবার কথা পাকা ক'রে জানিয়ে দিলেন। শহরে খানিক ঘুরে একটি দোকানে নাইজিরিয়ান বা য়োরুবা-শিল্পীদের আঁকা ছবি আর কাঠের মূর্তির দোকান পেলুম। দোকানটির নাম হ'চ্ছে Nigerian Art Centre, আর এর প্রতিষ্ঠাতা শিল্পী শ্রীযুক্ত A. Orisadikpe ওরিসাডিক্পে, অতি সজ্জন ব্যক্তি, আমাকে সমস্ত দেখালেন। এখানে একরকম খুব হালকা কাঠ, তাকে ইংরেজিতে thorn-wood বলে, তা থেকে অতি সুন্দর সুন্দর

ছোট ছোট মূর্তি এঁদের শিল্পীরা তৈরি করেন— আমাদের কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের মত নানা type অর্থাৎ বিভিন্ন বৃত্তির বা বিভিন্ন কার্য্যে রত নানা রকমের মেয়ে আর পুরুষের মূর্তি। এগুলির গঠনরীতি অতি সুন্দর, আর নিছক প্রকৃতির অনুকারী না হ'লেও জীবন্ত ব'লে লাগে। পরে একদিন এঁর দোকানে আমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়ে এঁর সঙ্গে ছবি তোলাতে হ'ল, আর ইনি আমাকে নিজের তৈরি একটি ছোট মূর্তি উপহার দিলেন। আমি সানন্দে এঁর স্বদেশের শিল্পের উন্নতির জন্যে প্রচেষ্টার প্রশস্তি ক'রে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি পত্র লিখে দিলুম।

আজ দুপুরবেলা, এখানকার গভর্মেণ্ট হাউসে, স্যর জন ম্যাক্‌ফারসনের অবর্তমানে যিনি গভর্ণরের কাজ ক'রছেন, ডেপুটি গভর্ণর Sir Hugo Marshall স্যর হিউগো মার্শাল-এর সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন ক'রতে হ'ল। বেলা একটার সময় গভর্ণরের একজন এডিকং হস্টেল থেকে আমাকে নিয়ে গেলেন। স্যর হিউগো মার্শাল একজন ভারিক্কি চেহারার ইংরেজ, solid qualities ব'ললে যা বোঝায় যেন সেই গুণের মানুষ, এঁরাই নানাভাবে ব্রিটেনের প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতা গ'ড়ে তুলতে সাহায্য ক'রেছেন। এঁর সেক্রেটারি একজন খুব ঢ্যাঙা ইংরেজ, ব্যবহারে বিশেষ ভদ্র। আহারের আগে পানীয় এল, আমরা সকলেই লেমনেড-জাতীয় জিনিস পান ক'রলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে নানা আলোচনা আরম্ভ হ'ল। ভোজনের সময়েও তাই। মোটের উপর দেখলুম যে, এইসব ইংরেজ কর্মচারী, যাঁরা এই দেশটিকে গ'ড়ে তুলেছেন, তাঁরা সকলেই একরকম মন স্থির ক'রে ফেলেছেন যে এই কালো মানুষের দেশে স্থানীয় লোকেদের হাতেই তাঁদের রাজ্য-পরিচালনার ভার তাঁরা তুলে দেবেন। দেশের লোক জ্ঞান-অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মনেপ্রাণে সাবালক হ'চ্ছে, ইংরেজ আর জোর ক'রে তাদের উপর প্রভুত্ব ক'রতে পারবে না। যেখানে প্রভু আর দাস সম্পর্ক আর সম্ভব নয়, যেখানে বন্ধুর মত ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত— এই সহজ বুদ্ধির কথা ইংরেজ মেনে নিতে পারছে বলেই এখানে. ইংরেজের গৌরব। আমাদের দেশের সম্বন্ধে এঁদের কাছ থেকে কোনোরকম বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ পেল না, মনের কথা যাই হোক্ না কেন। Factum Valet— যা হ'য়ে গিয়েছে তাকে মেনে নেওয়ার সুবুদ্ধি ইংরেজের আছে। একটা জিনিস দেখলুম, এরা কেউ আমেরিকাকে পছন্দ করে না। আমেরিকা চার দিকে টাকা ঢালছে বটে, কিন্তু আমেরিকার অন্তর্দৃষ্টি নেই, তাদের সূক্ষ্মতা নেই, তারা ভাসা-ভাসা অভিজ্ঞতাকেই সার করে। এইসব কারণে তাদের কেউ পছন্দ করে না, এইরকম ধরণের কথা শুনলুম।

তিনটের দিকে হস্টেলে ফিরে এলুম। চেলারামের আপিস থেকে গাড়ি এলে, একাই শহরে বেড়াতে বেরোলুম। ইচ্ছে ছিল, একটি সরকারি গ্রন্থপ্রকাশ-দপ্তরে যাই, নাইজিরিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি বই কেনবার জন্যে, কিন্তু আমার গাড়ির চালক সে দপ্তর খুঁজে বা'র ক'রতে পারলে না। এই চালকটির নাম William উইলিয়াম— বিশুদ্ধ য়োরুবা আফ্রিকান, ইংরেজিও বেশ জানে। এ-ই পরে আমাকে এদের আপিসের গাড়ি করে ইবাদান ও ইফে শহর দুটি ঘুরিয়ে আনে। লম্বা চেহারার মানুষটি, অতি মৃদুভাষী, বেশ ভদ্র আর কর্মকুশল। আমরা একটু বিভ্রান্ত হ'য়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ঘুরছি, এমন সময়ে একটি আফ্রিকান যুবক আমাদের সাহায্য করবার জন্যে আগ্‌বাড়া হ'য়ে এল। সে কাছেই Daily Post ব'লে এক ইংরেজি সংবাদপত্রের আপিসে নিয়ে গেল, সেখানে কিন্তু কেউ কিছু খবর দিতে পারলে না। এই যুবকটির পরিচয় নিলুম, তার নাম J. A. Makoli জে. এ. মাকোলি— তার বাড়ি নাইজিরিয়ায় নয়, পশ্চিম-আফ্রিকার সুদূর পশ্চিমে Sierra Leone সিয়েরা-লিওনি রাজ্যে। এখন লেগসে বিজলির মিস্ত্রি। একে আমি নাইজিরিয়ার শিল্প-

দ্রব্যের কথা জিজ্ঞাসা করলুম। এ আমায় ব'ললে, কাছেই বেনিন শহর থেকে আগত কাঠের খোদাইকারদের একটা আড্ডা আছে, সেখানে আবলুস কাঠের নানা মূর্তি আর সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যাবে। আমি সানন্দে তার সঙ্গে সেই আড্ডায় গেলুম। গাড়ি বড় রাস্তায় রইল, মাকোলি আমাকে দুই-একটি ছোট রাস্তা দিয়ে তাদের আড্ডায় নিয়ে গেল (Legos Association of Benin Carvers, 16 Tinubu Street)। এখানে বড় বড় আবলুস কাঠের গুঁড়ি প'ড়ে আছে, আর একটা কাঠে ঢাকা লম্বা ঘরের মধ্যে গুটি দশ-পনেরো শিল্পী বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে শক্ত আবলুস কাঠ কেটে কেটে মূর্তি আর নানা আসবাব বানাচ্ছে। এই জায়গাটায় পৌঁছবার পথে কতকগুলি আফ্রিকান শ্রমিকদের খাবার আড্ডার ভিতর দিয়ে যেতে হ'ল— সেখানে মেয়েরা এদের প্রধান খাদ্য Foufou 'ফুফু' অর্থাৎ মানকচু-সিদ্ধ চটকানো আর বাতির মতন নলি-পাকানো, আর Palm-oil Chop অর্থাৎ একটা মাছের ও মাংসের ও সবজির ঝোলের মতন তৈরি ক'রছে, বিক্রি করছে। এই Palm-oil Chop এদেশের একটি বিশিষ্ট খাদ্য, ভারতের Curry-Riceএর মত ফুফু ও পাম-অয়েল চপ এদেশের প্রধান খাদ্য। 'চপ' মানে 'খাদ্য' বা 'ব্যঞ্জন'।

পশ্চিম-আফ্রিকায় একরকম নারকেল-জাতীয় গাছ হয়, সেই গাছ উচ্চতায় নারকেল গাছের মতন, কিন্তু তার পাতা খেজুর-পাতার ধরণের। ফল হয় ঠিক অনেকটা খেজুর বা সুপারির মতন, থোকা থোকা। ফলের উপরটা হলদে' আর এই ফলের ভিতরে কালো রঙের বিচি হয়। এই ফলের শাঁস আর বিচি পিষে তেল বার করে, শাঁস থেকে যে তেল বেরোয় সেটা এদেশের একটা প্রধান খাদ্য। আমাদের দেশের সরষের তেল, দক্ষিণ-দেশের তিলের তেল, কেরলের নারকেল-তেলের মতন এই পাম-অয়েল এদেশের রান্নায় ব্যবহৃত হয়। এই পাম আমাদের দেশে জন্মায় কি না আর আমাদের দেশেরও আপন উদ্ভিজ্জ সম্পদ্ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে কি না তা দেখা উচিত। Oil-Palm অয়েল-পাম-এর বাঙলা কি করা যায়? 'তৈল-খর্জূর' বা 'তেল খেজুর', অথবা 'তৈল-গুবাক'? কিন্তু ফলটা খেজুরের মতন মোটেই নয়, বরং সুপারির মত। নানা রকমের সবজি— আলু, ঢেঁড়স, বেগুন, টমাটো, সিম প্রভৃতি মাছ বা মাংসের টুকরোর সঙ্গে হাঁড়িতে সিদ্ধ করে, এখানে একরকম সিমের ডাল হয় সেই ডালবাটা প্রচুর দেয়, আর দেয় লঙ্কা আর অন্য মসলা-জাতীয় উদ্ভিদ্, আর তার উপরে দেয় এই গুবাক-তৈল বা গুয়া-তেল। এই 'পাম-অয়েল চপ' আমি ওদেশে খেয়েছি এবং আমার চমৎকার লেগেছিল। এইসব আফ্রিকান শ্রমিকদের খাবার আড্ডার মধ্যে, লাটবাড়িতে ভরপেট খেয়ে আসবার পরেও পাম-অয়েল চপের সৌরভ মন্দ লাগছিল না।

কাঠের কারিগররা সবাই লেগস থেকে অনেক দূরে বেনিন নগরের লোক, আর এরা হ'চ্ছে ভাষায় আর জাতিতে Edo এদো— য়োরুবাদেরই নিকট-সম্পৃক্ত, কিন্তু ঠিক য়োরুবা নয়। পশ্চিম-আফ্রিকায় বেনিন একটি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। এখন থেকে পাঁচ-শ বছর আগে, যে সময়ে পোর্তুগীজরা এ অঞ্চলে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে আসা শুরু করে দিয়েছে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পনের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বেনিনের শিল্পীরা কাঠখোদাইয়ে, হাতির দাঁতের কাজে আর ব্রঞ্জ বা কাংস্যের ঢালা মূর্তি আর চিত্রফলকে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিল, এ কথা আগে বলেছি। এই-সমস্ত কারুকার্য্য বিশুদ্ধ আফ্রিকান জাতির কৃতিত্বের পরিচায়ক। কোথা থেকে এরা এই ব্রঞ্জ-ঢালাই কাজ শিখেছিল তা ঠিক-মত জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ সুপ্রাচীন যুগে মিসর আর তার পরে রোমক সাম্রাজ্য থেকে এই শিল্পরীতি পশ্চিম-আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ জাতির মধ্যে সংক্রামিত হয়, আর পরে বেনিনের এদো জাতির হাতে, আর ইফে শহরে আর অন্যত্র য়োরুবা জাতির হাতে এই ব্রঞ্জ-শিল্প একটা

অভূতপূর্ব উন্নত শিল্পের স্থান গ্রহণ করে। ইফের য়োরুবা ব্রঞ্জ-শিল্পের ইতিহাস বেনিনের চেয়ে আরও অন্ততঃ পাঁচ-শ বছরের পুরানো— খ্রীষ্টীয় এক হাজারের দিকের ব্যাপার। ১৮৯৭ সালে ইংরেজরা বেনিন দখল ক'রে, সেখানকার শিল্পসম্ভার লুঠ ক'রে আনে, আর এই লুঠের মাল ব্রিটিশ মিউজিয়মে আর বার্লিনের নৃতত্ত্ব-বিষয়ক সংগ্রহশালায় জমা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আলোচনা শুরু হয়। বেনিনে মূর্তিশিল্প, বিশেষতঃ কাঠে মাটিতে আর ব্রঞ্জে, এখনও টি'কে আছে। আজকাল ইউরোপীয় কলারসিক-মহলে বেনিনের আর আফ্রিকার অন্য স্থানের শিল্পের উপযুক্ত বিচার আর সমাদর হওয়ার ফলে, অনেকের দৃষ্টি অফ্রিকার অবজ্ঞাত কালো মানুষের স্বকীয় শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছে, আর অল্পস্বল্প চাহিদাও এর বাড়ছে। বেনিনের কতকগুলি কাঠের শিল্পী রাজধানী লেগসে একটা আড্ডা জমিয়ে নিজেদের হাতের কাজ বিক্রি করবার সুবিধে পেয়েছে। এরা আবলুস কাঠের চমৎকার ছড়ি তৈরি করে, ছড়ির হাতলে সুন্দর ভাবে খোঁদা আফ্রিকান মানুষের মুণ্ড; তা-ছাড়া এই কালো আবলুস কাঠের আফ্রিকান মেয়ে ও পুরুষের ছোট-বড় আবক্ষ মূর্তি, আর নানা রকমের বসা বা দাঁড়ানো মূর্তি। কতকগুলি মূর্তি আবার বিজলির আলো বসাবার জন্যে তৈরি হ'য়েছে। এ-ছাড়া আবলুস কাঠের নানা রকম আসবাব, কটোরা ও অন্য পাত্র ইত্যাদি এরা তৈরি করে। এদের এই কর্মশালায় দেখলুম, এরা গল্পগুজব ক'রতে ক'রতে হাসিঠাট্টার মধ্যে নিজেদের কাজ ক'রে যাচ্ছে। মাকোলির সঙ্গে আমি হাজির হ'তেই, বিদেশী খরিদ্দার বুঝে এরা আমায় ঘিরে দাঁড়াল, আর নিজেদের হাতের কাজ দেখাতে লাগ্ল। আমি ১৫ শিলিং দিয়ে, হাতলে আফ্রিকান মানুষের মুখ এরকম একটি ছড়ি কিনলুম, আর একটি ছোট আফ্রিকান মা ও শিশুর মূর্তির ফরমাশ দিলুম, সেটি দুদিনের মধ্যে তৈরি ক'রে চেলারামের দোকানে পাঠিয়ে দেবে। ৫ শিলিং বায়না নিলে, আর দামের বাকি ১০ শিলিং জিনিস পৌঁছে দিয়ে নেবে। যে কারিগর এ মূর্তি তৈরির ভার নিলে তার নাম Immanuel Obayagbomne ইম্যানুয়েল ওবায়াগ্বোম্নে। নামে লোকটি খ্রীষ্টান বটে, কিন্তু এদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম উপর-উপর ভাসা-ভাসা ভাবে প্রচার হ'য়েছে মাত্র। এই সওদা ক'রে আমার বেশ ভালই লাগ্ল।

মাকোলি আমার আগ্রহ বুঝে, কাছেই লেগস শহরের দেশী লোকেদের এক বড় বাজার ছিল, আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। বাজার আমাদের দেশের বড় শহরের বাজারেরই মত, অনেকটা অপরিষ্কার, তবে যথাসম্ভব সাফ-সুথরা রাখবার চেষ্টা আছে। বিভিন্ন প্রকারের জিনিসের জন্য বাজারের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট আছে। যেমন কোথাও নানা রকমের ছাপা ছিটের কাপড়, বেশির ভাগ ইংলাণ্ড থেকেই আমদানি, স্থানীয় তাঁতে হাতে বোনা সরু সরু ফালি কাপড়, বেশির ভাগ নীল আর কালো রঙের ছক আর ছড়ির নকশা; কিছু ভারত থেকে আমদানি বস্ত্র আছে, যেগুলি এদেশের মেয়েরা আধা-পাগড়ি আধা-রুমাল হিসেবে মাথায় বাঁধে। অন্য নানা জিনিসপত্রের, কাঁচা খাদ্যদ্রব্যের, তাজা ও শুঁটকি মাছের, মাংসের পসরা বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া। বাজারের বাইরে মুসলমান হাউসা-জাতীয় ব্যাপারীরা রাস্তার উপরে কাপড়ের স্তূপ সাজিয়ে বিক্রি ক'রছে, এরা এসেছে উত্তর-নাইজিরিয়া থেকে। দু-একজন ওরই মধ্যে পুব-মুখে নমাজ প'ড়ছে, পশ্চিম-আফ্রিকা থেকে মক্কার দিকে মুখ ক'রতে গেলে পুব দিকেই মুখ ক'রতে হয়। মাকোলি একজন আফ্রিকান জড়ি-বুটি জাদু-টোনার মাল-মসলার দোকানে নিয়ে গেল। এরকম দু-চারটি দোকান আফ্রিকার বাজারে বা হাটে থাকবেই। এখানে অনেক রকম অপ্রত্যাশিত এবং বীভৎস জিনিসের সমাবেশ দেখলুম— ছোট ছোট বাঁদরের শুখানো মাথা, রকমারি জানোয়ারের মুণ্ডের পরিষ্কার করা কঙ্কাল, নানা পাখির পালখ,

শুখানো গো-সাপ জাতীয় জানোয়ার ইত্যাদি, আর বিভিন্ন গাছের শিকড় লতা ও শুখানো পাতা, ছোট ছোট চামড়ার চৌকো ব্যাগের মতন তার ভিতরে কোরানের আয়েৎ লেখা কাগজ (মাদুলির মতন এইসমস্ত চামড়ার তাবিজ অমুসলমান য়োরুবা ও অন্য আফ্রিকানেরাও ব্যবহার করে), য়োরুবাদের দেবতার কাঠের মূর্তি ও তাদের দেবার্চনার কাঠের পাত্র, আর এ-ছাড়া প্রাচীন প্রস্তরযুগের দু-চারটে ছোট অস্ত্র, যেমন বর্শার ফলা, তীরের মুখ, কুড়ুল ইত্যাদি— এগুলিকে এরা মনে করে য়োরুবা দেবলোকের ইন্দ্র, বজ্রের দেবতা, Shango শাঙ্গো কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রাশ্ম বা বাজের পাথর। য়োরুবা দেবতাদের মূর্তির সম্বন্ধে আমার আগ্রহ দেখে এইরকম একটি দোকানের মালিক তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যেতে চাইলে, সেখানে নাকি বিক্রির জন্যে রাখা অনেকগুলি মূর্তি আছে। আমি হাওয়াই জাহাজেই ঘুরবো, ভারী বড় কাঠের মূর্তি, তাও আবার বেশি দাম দিয়ে কিনে, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আমি ছিলুম ছোট-খাট কাঠের বা হাতির দাঁতের মূর্তির সন্ধানে, যা অনায়াসে সুটকেসে ক'রে নিয়ে আসা যায়। আর এইরকম দুই-একটি হাতির দাঁতের জিনিস গোল্ড-কোস্টে সংগ্রহও করেছি। শাঙ্গোর বজ্রের পাথর একটি ১০ শিলিঙে বিক্রি ক'রতে চাইলে। কিন্তু তার প্রতি আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। মাকোলি সঙ্গে থাকায়, লেগসের দেশীয় লোকদের জীবনের সঙ্গে একটা চাক্ষুষ পরিচয়ের এই সুযোগটি বেশ উপভোগ করা গেল। মাকোলির বড় ইচ্ছা যে সে কোনোরকমে ভারতবর্ষে এসে তার নিজের আলোচ্য বিদ্যুৎ-বিদ্যার প্রয়োগ-শিল্প আয়ত্ত ক'রে যায়; আর এদেশে ঘুরে যা বুঝলুম, ভারতবর্ষ এদের কাছে যে একটা কল্পনার রাজ্য হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই ভারতবর্ষ দেখে যায়। ভারতবর্ষের প্রতি এদেশের লোকের মনে একটা গভীর শ্রদ্ধা এসে গিয়েছে— ভারতবর্ষ প্রাচীন আর সুসভ্য দেশ ব'লে ততটা নয়, যতটা এই কারণে যে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাত থেকে সম্প্রতি উদ্ধার পেয়েছে, যে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা এদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে; আর জবাহরলাল প্রমুখ ভারতবর্ষের নেতারা মুক্তকণ্ঠে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিপীড়িত অশ্বেত জাতির মুক্তির দাবি প্রকাশ ক'রছেন, এই কারণেও বটে।

মাকোলির কাছে বিদায় নিয়ে আমি চেলারামের দোকানে ফিরে এলুম। চেলারামের বড় দোকান সমুদ্রের ধারে Marina মারিনা নামে রাস্তার উপরেই। বেশ বিরাট্ এঁদের দোকান, গুদাম বা আড়ত নিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে। দোকানের উপরতলায় এঁদের ভারতীয় কর্মচারীরা থাকে। অল্প মাইনের কর্মচারীরা কেউ পরিবার নিয়ে আসে না। দু বছর আড়াই বছরের মেয়াদে এরা কাজ করে, তার পরে মালিকের খরচায় হাওয়াই জাহাজে ছ মাস এক বছরের জন্যে দেশে ফিরে যায়, আবার ছুটি ফুরোলে ফিরে আসে। এইসব কর্মচারী স্থানীয় ভাষা বেশ চট্‌পট্ আয়ত্ত ক'রে নেয়। সিন্ধী বানিয়া বা ব্যবসায়ী জাতির লোকের মধ্যে বোধ হয় পৃথিবীর সব ভাষা ব'লতে পারে এমন লোক পাওয়া যাবে— অর্থাৎ যেসব দেশে এদের কাজকর্ম চলে। চেলারামের এই কারবারে জন পঁয়তাল্লিশ সিন্ধী কর্মচারী আছে, আর তা ছাড়া শতখানেক আফ্রিকান কর্মচারী; এ ছাড়া আফ্রিকান কুলি মজুর তো আছেই। এঁদের হেড-ক্লার্ক একজন য়োরুবা ভদ্রলোক, তাঁর নাম Josephus Oluwole Majola যোসেফাস ওলুয়োলে মাজোলা। লোকটি বেশ বুদ্ধিমান্, কিছু পড়াশুনাও আছে, খ্রীষ্টান হলেও মনে প্রাণে খাঁটি য়োরুবা, এবং খাতির ক'রে আমার জন্যে য়োরুবা-ধর্ম-সংক্রান্ত একটি দুষ্প্রাপ্য বই, যেটি সংগ্রহ করবার আমার ইচ্ছা ছিল, সন্ধান ক'রবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কথা শুনে মনে হ'ল তাঁর ভারতীয় মনিবের কাছে কাজ ক'রে বেশ আনন্দেই আছেন।

শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্-এর সিন্ধী কর্মচারীরা আমাকে নিয়ে এঁদের কারবারের বিভিন্ন বিভাগ দেখালেন। বেশ বড় Departmental Store-এর মতো ব্যাপার। বহু বহু প্রকারের জিনিস পাওয়া যায়, খদ্দেরও প্রচুর, আফ্রিকান ও য়ুরোপীয়। কাপড়চোপড় পোশাক-পরিচ্ছদের দিক্‌টাই বড়, আর তা-ছাড়া বহুপ্রকারের ঘরগৃহস্থালির জিনিস আছে, নানা আধুনিক শ্রমলাঘবকারী যন্ত্রপাতিরও আমদানি এঁরা করেন, শখের জিনিসও প্রচুর। পশ্চিম-আফ্রিকার অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভালো, এরা পাম-অয়েল বা গুবাক-তৈল, কোকো, আর চিনেবাদাম প্রচুর রপ্তানি করে। প্রথমোক্ত দুটি জিনিসের উৎপাদন পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে বেশি এই দেশেই হয়। কোকো থেকে চকোলেট হয় এবং এই চকোলেট-মিঠাই না হলে পাশ্চাত্ত্য জাতির চলে না। এ-ছাড়া কফি আছে, নানা উদ্ভিজ্জ এবং খনিজ পদার্থও আছে। এইসব জিনিস বিদেশে চালান ক'রে এদের হাতে নগদ টাকা বেশ ভালোই আসে। খাদ্যশস্যের দিকে এরা তেমন নজর দেয় না, কারণ খাবার জিনিস আর বিলাসের জিনিস এরা টাকা ফেলে কিনতে পারে।

চেলারামের বস্ত্রবিভাগ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য পাওয়া গেল শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ ও তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে। স্থানীয় আফ্রিকানরা আগে তাঁতের ছোট ছোট লম্বা ফালি কাপড় তৈরি ক'রত, এখনও করে। সহজ সহজ কতকগুলো নকশা সাদা জমির উপর নীল আর কালো রঙের সুতোয় এরা তোলে। এই কাপড় সাধারণতঃ আধ হাতের বেশি চওড়া হয় না, তাই এই ফালি কাপড় পাশাপাশি অনেকগুলি রেখে সেলাই ক'রে চাদর তৈরি করে। সেই চাদর এদেশের লোকেরা গায়ে জড়াত, বা তা থেকে আলখাল্লার মত পোশাক তৈরি ক'রত। মেয়েরাও সেইরকম চাদর লুঙ্গির মত প'রত, আর ঊর্ধ্বাঙ্গ সাধারণতঃ অনাবৃতই রাখ্‌ত। এখন এদের পরবার কাপড় বেশির ভাগ ইউরোপ থেকে আসছে। আগে আফ্রিকানরা কাঠের ব্লকে নকশা খুঁদে নানা রঙ দিয়ে সেই নকশা কাপড়ের উপর ছাপ্‌ত। আর এইভাবে লাল নীল হলদে' কালো প্রভৃতি গাঢ় রঙের ছাপা অলংকরণে এদের পরনের কাপড় অতি সুন্দর দেখাত। কিন্তু এই প্রাচীন তাঁতে-বোনা ছাপা কাপড়ের পাট উঠে যাচ্ছে বা গিয়েছে। এখন ইউরোপ থেকে— ইংলাণ্ড আর হলাণ্ড থেকে— নানা রকমের আর বিভিন্ন রঙের সুন্দর বা কুৎসিত নকশায় ছাপা ছিটের কাপড় আমদানি হয়, আর এদেশের পুরুষ ও মেয়েরা এইসব উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশের অদ্ভুতদর্শন কাপড়চোপড় প'রে থাকে। এদের ঘনকৃষ্ণ দেহত্বকের সঙ্গে এইসব গাঢ় উজ্জ্বল রঙের কাপড় বেশ খাপ খায় কিন্তু। আগে ইউরোপীয় ও সিরিয়ান বণিকেরা এই আমদানি ব্যবসায় একচেটে ক'রে নিয়েছিল, কিন্তু এখন সিন্ধীরা এই কাজে নিজেদের একটা স্থান ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু সিন্ধীরা ভারতবর্ষকেও ভোলেন নি। এদেশে ভারতবর্ষের কলের কাপড় সুবিধে পেলেই চালিয়ে দেন, কিন্তু বেশির ভাগ এঁরা মাদ্রাজের তৈরি হাতে-বোনা লুঙ্গি-জাতীয় কাপড়ের কারবার করেন, এবং এর একটা বড় বিক্রয়ক্ষেত্রও এদেশে এঁরা গ'ড়ে তুলেছেন। এখানকার মেয়েরা মাথায় একখানা ক'রে গামছার মতন নকশাদার রঙিন কাপড় জড়িয়ে রাখে। এই মাথার কাপড় এদের মেয়েদের পোশাকের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই মাথার কাপড় সাধারণতঃ দু গজ লম্বা আর ছত্রিশ ইঞ্চি বহরের হয়, নকশাগুলি কাপড়ের সঙ্গেই বোনা হ'য়ে থাকে। কতকগুলি নয়নাভিরাম সেকেলে আফ্রিকান নকশা আছে— লাল চক্র, নীল বা কালো ত্রিকোণ, হলদে' চেক বা রেখা ইত্যাদি ; সহজ নকশা, কিন্তু কতকগুলি মৌলিক বর্ণের সম্মিলনে নয়নমুগ্ধকর। নোতুন নোতুন নকশাও এরা পছন্দ-মত গ্রহণ করে। নীল আর কালো রঙেরই প্রাধান্য বেশি। মাদ্রাজি তাঁতিরা সিন্ধী ব্যাপারীদের নির্দেশমত এই ছত্রিশ ইঞ্চি বহরের কাপড়ের আটগজি থান বুনে দেয়। চেলারামের ফার্ম

প্রতি মাসে এক হাজারের উপর এইরকম কাপড়ের গাঁট ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করেন। প্রত্যেক গাঁটে থাকে এইরকমের ১২০টি আটগজি থান। সমগ্র পশ্চিম-আফ্রিকায়, বর্মা শ্যাম ইন্দোনেসিয়া আর আমাদের মণিপুরের মত, মেয়েরাও ছোটখাট ব্যবসা করে, দোকান চালায়। এই মেয়ে দোকানিরা পাইকারি দরে ভারতবর্ষের তাঁতে-বোনা এই কাপড় কিনে নেয় আর একখানি আট-গজি থানকে দু-গজি চার টুকরো করে কেটে খুচরো বিক্রি করে। এতে এদের বেশ লাভ থাকে। জনপ্রিয় নকশা এলে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যায়, আমি ইবাদান শহরের পরে স্বচক্ষে এরকম কাড়াকাড়ি দেখি, সে এক নোতুন অভিজ্ঞতা। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ আমাকে ব'ললেন যে, এই ভারতীয় তাঁতে-বোনা কাপড়ের ব্যবসা এখন বেশ বিস্তৃতি লাভ ক'রছে। কিন্তু এর মধ্যে আবার জাপানী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসে যাচ্ছে। জাপানীরাও আফ্রিকার বাজারে স্থান ক'রতে চায়; তাদের ব্যবসায়ের প্রতিনিধি পাঠিয়ে, নিজেদের কাপড়ের প্রচারও তারা করছে। কিন্তু আফ্রিকানদের একটা স্বাভাবিক মার্জিত রুচি থাকায়, ভারতের হাতে-বোনা কাপড়ই তারা পছন্দ করে। ভারতের তাঁতিরা এই কাপড় বোনবার সময় সুতোর পাটের জন্য হলুদ ব্যবহার করে, আর সেই হলুদের গন্ধ অনেক আফ্রিকানের ভালো লাগে। শুনলুম, জাপানীরাও ব্যাপারটা টের পেয়ে, তাদের মিলের কাপড়ে এই হলুদের গন্ধ দেবার চেষ্টা ক'রেছে; কিন্তু এখনও ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা আছে। আমার খুব লোভ হ'চ্ছিল, কতকগুলি খাঁটি আফ্রিকান নকশার নমুনা হিসাবে পাঁচ-দশ টুকরো এই ভারতীয় কাপড় নিয়ে আসি, কিন্তু এঁরা তো আটগজি থান ছাড়া— আর তাও পাইকারি হিসাবে ছাড়া— বিক্রি করেন না। আর আমার সময়ও ছিল না যে, এঁদেরই খরিদ্দার কোনো মেয়ে দোকানির কাছ থেকে খুচরো হিসেবে কিনে নিই।

এইসব দেখতে দেখতে বেলা প'ড়ে এল। লেগসে দুদিন মাত্র থাক্‌বো— এরই মধ্যে আমার পূর্বপরিচিত দুই-একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা ক'রে নিতে হবে। ১৯১৯-২১ সালে যখন লণ্ডনে ছাত্র ছিলুম, তখন একটি য়োরুবা ছাত্রের সঙ্গে খুব পরিচয় হয়, তার নাম ছিল Benjamin Akinremi Fadikpe বেঞ্জামিন আকিন্‌রেমি ফাডিক্‌পে। বড়ই সরল আর মিশুক ছিল এই দীর্ঘবপু আফ্রিকান ছেলেটি— তার দেশের অনেক কথা আমাকে সে ব'লত। ১৯২০-২১-এর পরে, লণ্ডনেই আর একবার এর সঙ্গে ১৯৩৫ সালে দেখা হয়। বন্ধুবর ডাক্তার শশধর সিংহ (এখন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় Ministry of Information & Broadcasting অর্থাৎ সূচনা এবং প্রচারমন্ত্রীর দপ্তরের Publications Division অর্থাৎ প্রকাশনবিভাগের অধ্যক্ষ) আর তাঁর স্ত্রী (ইনি ইউরোপীয় মহিলা) লণ্ডনে একটি পুস্তক প্রকাশন ও বিক্রয়ের দোকান ক'রেছিলেন। সেই দোকানকে অবলম্বন করে নানা বিদেশীয় ছাত্র ও যুবকদের একটা মিলনকেন্দ্র ১৯৩৫ সালের আশ-পাশে লণ্ডনে গ'ড়ে উঠেছিল, ফাডিক্‌পের সঙ্গে আমার সেখানে আবার দেখা হয়। পরে খবর পাই, ফাডিক্‌পের মৃত্যু হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত Herbert Macaulay হার্বার্ট মেকলে ব'লে একজন য়োরুবা ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও ইংলাণ্ডে আমার আলাপ হয়। ইনি নাইজিরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নেতা ছিলেন; আর পূর্ব-নাইজিরিয়ার অবিসংবাদিত নেতা ইবো-জাতীয় Dr. Azikiwe আজিকিবে, যাঁর কথা আগে ব'লেছি, হার্বার্ট মেকলে ছিলেন তাঁর মন্ত্রগুরু। মেকলে বহুদিন হল দেহরক্ষা ক'রেছেন, কিন্তু তাঁর প্রভাব ওদেশে এখনও আছে। ১৯২০ সালে আমি বকর-ঈদের সময়ে, লণ্ডনের কাছে Woking উওকিং বলে একটি গ্রামে, ভোপালের বেগমের অর্থানুকূল্যে ভারতীয় মুসলমানরা যে একটি ছোট মসজিদ ক'রেছেন, সেই মসজিদে গিয়েছিলুম। আমার এক পাঞ্জাবী

মুসলমান বন্ধু, যিনি ঐ মসজিদে বাস ক'রতেন আর সেখান থেকে রোজ লণ্ডনে আসতেন, আমাকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে বকর-ঈদের সময়ে যেতে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি আমায় বলেন যে, ঐদিন ওখানে নমাজ প'ড়তে ইংলাণ্ড-প্রবাসী বহু ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের মুসলমান সজ্জন জমা হ'য়ে থাকেন, এঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হ'তে পারবে। আর একটা লোভ দেখালেন তিনি— যাঁরা ঐদিন মসজিদে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসবেন, তাঁদের বকর্-ঈদের ভোজ খাওয়ানো হবে— পোলাও, কাবাব, মটন কোর্মা আর ফিরনি। বহুদিন পরে ভারতীয় খাদ্যের কথা শুনে রসনা রসগ্রস্ত হল, আগ্রহ ক'রে আমিও ঐদিন আটটার ট্রেনে বন্ধুর নির্দেশমত উওকিং যাত্রা করি। দেখলুম প্রায় ৬০।৭০ জন ভারতীয় ও বিভিন্ন দেশীয় মুসলমান সজ্জন আমার মত উওকিং-এর ট্রেনে যাত্রা ক'রছেন। খুব লাল উঁচু তারবুশ বা তুর্কি টুপি পরা লম্বা-চওড়া চেহারার কতকগুলি মিসরীয় ভদ্রলোক; তা ছাড়া তুর্কি, ইরানী, মালাই, আর আফ্রিকার নানা দেশের মুসলমান। লণ্ডনের স্টেশনেই দেখলুম, একটি প্রৌঢ় আফ্রিকান ভদ্রলোক, সাদা রঙের কাপড়ের আলখাল্লা প'রে গাড়িতে উঠলেন; তাঁর মাথায় সাদা কাপড়ের গান্ধি-টুপির মত একটি গোল টুপি, আর সেই টুপির সামনে কপালের উপর কালো রঙের রেশমের সুতোর অক্ষরে ইংরিজিতে এই দুটি কথা বড় বড় ক'রে সেলাই ক'রে লেখা— Chief Oluwa অর্থাৎ সর্দার ওলুবা। এ জিনিসটি অদ্ভুত লাগ্‌ল— যদি আমাদের দেশের কোনো রাজা বা জমিদার নিজের মাথার টুপিতে জরির কাজে নিজের নাম ঘোষণা ক'রতেন, সে এই রকম ব্যাপার হ'ত। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন, হাতে একটি লাল রঙের বড় ছাতা নিয়ে একটি যুবক আফ্রিকান, এ ভদ্রলোক গায়ে একটি লাল নীল সবুজ হলদে' কালো রঙের ছোপ দেওয়া চাদর জড়িয়েছেন, ডান কাঁধ আর ডান হাতটি খোলা, রোমানদের টোগা-র মতন, গায়ে একটি সাদা হাত-কাটা জামা আমাদের পাঞ্জাবির মতন, মাথায় ঐরকম কাপড়েরই একটি রুমাল বাঁধা। এঁদের সঙ্গে ইউরোপীয় পোশাক পরা দুটি বৃদ্ধ আফ্রিকান ভদ্রলোকও উঠলেন। একজন বেশ লম্বাচওড়া চেহারার, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল এবং মুখে লর্ড কিচেনারের গোঁফের মত একজোড়া সাদা গোঁফ, দীর্ঘ ঋজু দেহে সোজা দাঁড়িয়ে; আর অন্য ভদ্রলোকটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্বকায়, গোঁফদাড়ি কামানো, পরণে উলটো-কলার সমেত খ্রীষ্টান পাদরির কোট। এঁরা কে, আর কোথা থেকে আসছেন, কিছুই বুঝতে পারলুম না, তবে এটা বুঝলুম যে, সর্দার ওলুবা নিশ্চয়ই মুসলমান, এবং তিনি সদলে বকর-ঈদের নমাজের জন্যে যাচ্ছেন। আমরা যথাকালে অর্থাৎ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে Camberley ক্যাম্‌বার্‌লি স্টেশনে নামলুম, সর্দার ওলুবা এবং তাঁর সঙ্গের আফ্রিকান পোশাক-পরা যুবকটিও নামলেন। যুবকটি নেমেই হাতের ছাতাটি খুলে সর্দারের মাথার উপর ধ'রলেন। এইরূপে ছত্রপতি সর্দার ওলুবা ধীর-গম্ভীর পদক্ষেপে স্টেশনের ভিতর দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আমাদের উওকিং পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে হবে, সেটি মাইল-খানেকের পথ। ছোট গেঁয়ো স্টেশন, দুখানি মাত্র ট্যাক্সি ছিল, একটিতে সর্দার ও তাঁর সহযাত্রীরা উঠলেন; আর মিসরের Khedive খদীব বা রাজার ভাই ছিলেন, তিনি নিজের লোকজন নিয়ে আর একটি ট্যাক্সি নিলেন। উওকিং মসজিদে পৌঁছে, মুসলমান পুরুষেরা আর সঙ্গে কতকগুলি ভারতীয় আর অন্য প্রাচ্য দেশীয় মহিলা, আর বিবাহের দ্বারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন এরকম কতকগুলি ইউরোপীয় মহিলা— এঁরা আলাদা আলাদা জায়গায় যথারীতি কাতার দিয়ে নমাজের জন্যে দাঁড়ালেন। আমরা অ-মুসলমান জনকয়েক আলাদা দাঁড়িয়ে এই সমবেত প্রার্থনা দেখতে লাগলুম। মসজিদের ইমাম একজন পাঞ্জাবী মুসলমান, তিনি সকলের সামনে নমাজ পরিচালনার জন্যে ইমামের স্থানে দাঁড়ালেন।

তাঁর পিছনের কাতারে দাঁড়ালেন মিসরের রাজবংশীয়েরা, আর তাঁদের সঙ্গে দাঁড়ালেন এই আফ্রিকান সর্দার ও তাঁর যুবক সাথী, আর কতকগুলো বিশিষ্ট ব্যক্তি, ভারতীয় আর অভারতীয়। একটু দূরে অমুসলমান দর্শকদের দলে আমি ছিলুম, আর ছিলেন দুটি হিন্দু যুবক, আর তা-ছাড়া ইউরোপীয় পোশাক-পরা আফ্রিকান ভদ্রলোক দুটি, যাঁরা আফ্রিকান সর্দারের সঙ্গে এসেছিলেন; আর পরে কথায় বুঝলুম উওকিং গ্রামের গির্জার ইংরেজ পাদরি, তিনিও দর্শকরূপে ছিলেন। নমাজ শেষ হ'ল, ইমাম সাহেব তাঁর পাঞ্জাবী ঢঙের ইংরেজিতে পৃথিবীর সব ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তার পরে মুসলমান সজ্জনদের মধ্যে কোলাকুলির পালা। আমাদের ভোজনে আহ্বান করা হ'ল, কিন্তু মিসরীয় ও অন্যান্য কতকগুলি বিদেশী আহার না ক'রেই চ'লে গেলেন, তাঁদের তাড়া ছিল।

আফ্রিকান ভদ্রলোক দুটির সঙ্গে আমি আলাপ জমাবার চেষ্টা করলুম— "কিবা নাম, কিবা ধাম, কিবা পরিচয়?" দীর্ঘাকার ভদ্রলোকটি নিজেদের পরিচয় দিলেন। ব'ললেন, তাঁরা নাইজিরিয়ার লেগস থেকে আসছেন। পেশায় তিনি ইঞ্জিনিয়ার, বিলাতে শিক্ষিত। পরে জানলুম, ইনি নাইজিরিয়ার বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা হার্বার্ট মেকলে। সর্দারটি লেগস অঞ্চলের White Cap Chiefs অর্থাৎ সাদা টুপি পরবার সম্মানের অধিকারী ১২ জন বিশিষ্ট সর্দারের অন্যতম। তাঁর ছত্রধারী যুবক সঙ্গীটি হ'চ্ছেন তাঁর এক ছেলে। অন্য আফ্রিকান ভদ্রলোকটি আসছেন গোল্ড-কোস্ট থেকে, এঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ নেই। ইঞ্জিনিয়ার মেকলে সাহেব ব'ললেন যে, লেগসে এই সর্দারের বিস্তর জমি আছে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সেইসব জমি এই অজুহাত দেখিয়ে কেড়ে নিতে চাইছে যে, তিনি যখন আর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন রাজা নন, ইংরেজের অধীন হয়েছেন, তখন এইসব জমিতে তাঁর আর ব্যক্তিগত স্বত্ব বা অধিকার নেই— সেইসব জমি গভর্ণমেণ্টকে ছেড়ে দিতে হবে, সেখানে লেগস বন্দরের ইমারত ইত্যাদি হবে। জমির দাম হু-হু ক'রে বেড়ে যাচ্ছে, সর্দার তাঁর অধিকার সহজে ছাড়তে চান নি, সেখানে এই নিয়ে মোকদ্দমা হয়। লেগসে তিনি হেরে যান, কিন্তু হার্বার্ট মেকলেকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে প্রিভি-কৌন্সিলে আপীল করে ল'ড়তে এসেছেন। মেকলে ইংলাণ্ডেই শিক্ষিত, তিনি ইংলাণ্ডের সব ব্যাপার জানেন, সর্দার ওলুবার সেক্রেটারি হ'য়ে এসেছেন।

এঁদের সঙ্গের পাদরির পোশাকে অন্য আফ্রিকান ভদ্রলোকটি গোল্ড-কোস্টের একজন রাজনৈতিক নেতা। এঁদের আপসের মধ্যে কথায় বুঝলুম যে, এঁরা ইংরেজ-শাসিত তিনটি দেশ, নাইজিরিয়া, গোল্ড-কোস্ট ও সিয়েরা-লিওনি, এই তিন জায়গায় পৃথক ও বিক্ষিপ্ত ভাবে স্বরাজ আন্দোলন চালাচ্ছেন। এঁদের ইচ্ছা, সম্মিলিত-ভাবে British West African Congress বা অনুরূপ একটা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলেন। আমাকে ওঁদের সম্বন্ধে কৌতূহলী ও সহানুভূতিপূর্ণ দেখে, পাদরি-পোশাক-পরা গোল্ড-কোস্টের ভদ্রলোকটি মেকলেকে ব'ললেন, Brother, we should follow the lead given by our friends in India, in their Indian National Congress, for example। পরে কথায় বুঝলুম, এঁরা আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের কিছু কিছু খবর রাখেন। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর পূর্বেকার কথা— আমি পরে আমাদের তখনকার দিনের বড় বড় রাজনৈতিক নেতা লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির কিছু বক্তৃতাদি আর আমাদের কংগ্রেস সম্বন্ধে কিছু কাগজপত্র এঁদের দিই— গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন তখনও শুরু হয় নি। শ্রীযুক্ত মেকলে সর্দার ওলুবার সঙ্গে আমার পরিচয়

করিয়ে দিলেন ভারতীয় ছাত্র ব'লে, নিজের দেশের ভাষায়—সর্দার ইংরেজি জানতেন না। তাঁর ছেলেকে এইবার ভালো ক'রে দেখলুম, চমৎকার athletic বা ব্যায়ামবীরের মত দেহের গড়ন, মুখের ভাব সরলতা-মাখানো, আর আফ্রিকান আদলের হ'লেও সুন্দর; দেহের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ, আর তার সঙ্গে সাদা আধা-আস্তিন পাঞ্জাবীর মতন জামা আর গায়ে রোমান টোগার মতন জড়ানো অঙ্গবস্ত্র; খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। পরে লণ্ডনে এঁদের বাসায় এই যুবককে দেখি, তখন সে খালি গায়ে অঙ্গবস্ত্র জড়িয়ে ছিল, পায়ে চপ্পল, ঠিক যেন ব্রঞ্জে-ঢালা একটি গ্রীক বা রোমান নেতার মূর্তি। এঁরা সকলে আমাকে লণ্ডনে এঁদের বাসায় একদিন যেতে নিমন্ত্রণ ক'রলেন, ঠিকানা দিলেন; আর দেখলুম যে আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রতে এঁরাও উৎসুক। পরে আমি লণ্ডনে দুবার এঁদের বাসায় গিয়েছিলুম, আর সেখানে হার্বার্ট মেকলে ও ওলুয়া সর্দার ছাড়া আরও কতকগুলি লণ্ডন-প্রবাসী য়োরুবা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। একজন ছিলেন ব্যারিস্টার-অধ্যাপক, London School of Oriental Studies-এ য়োরুবা ভাষা পড়াতেন, পাক্কা আফ্রিকান, সুন্দরকায় যুবক আর সঙ্গে এঁর স্ত্রী ছিল, স্ত্রীটী একটী ইংরেজ মেয়ে। এবার পশ্চিম-আফ্রিকায় গিয়ে দেখলুম, ইংরেজ আর ফরাসীদের অধীন দেশে এ-রকম বিবাহ—ইউরোপিয়নরা অবশ্য একে প্রতিলোম-বিবাহই ব'লবে—বিরল নয়। নিজের ঘরে সর্দার সাধারণ চেয়ারে ব'সতেন না তাঁর জন্যে একখানা বড় কাঠের গুঁড়ি থেকে তৈরি, তাতে কোনো জোড় বা পেরেক-ইস্ক্রুপ নেই—আফ্রিকান ধাঁচের, বাটালীতে কাটা ছোট কাষ্ঠাসন, তিনি সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন—তাইতেই ব'সতেন। অন্ততঃ আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যখন নীচে নামলেন তখন তিনি সঙ্গে-আনা এই বিশিষ্ট আসনেই ব'সলেন। এইরূপ কাষ্ঠাসন পশ্চিম-আফ্রিকার রাজা আর সর্দারদের এক লক্ষণীয় লাঞ্ছন, এবং এই নিয়ে অনেক জটিল সমাজ-ব্যবস্থা আর ধর্মতত্ত্ব, বিশেষ করে গোল্ড-কোস্টের আশান্তি জাতির মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে।

হার্বার্ট মেকলে নিজের কুলপরিচয় দিলেন—তাঁর মাতামহ ছিলেন পশ্চিম-আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণকায় বিশপ—এঁরা চার্চ-অব-ইংলাণ্ডের অধীন খ্রীষ্টান। তাঁর মাতামহের নাম ছিল Bishop Crowther বিশপ ক্রাউদার। যখন ইনি অল্পবয়সের বালক ছিলেন, ১৮৫০ সালের পূর্বে, তাঁকে দাসব্যবসায়ী মানুষ-ধরারা নিজের গ্রাম থেকে চুরি ক'রে ধ'রে নিয়ে যায় আর জাহাজে ক'রে অন্য আফ্রিকান ক্রীতদাসদের সঙ্গে আমেরিকায় চালানের ব্যবস্থা করে। ইংরেজরা তখন ক্রীতদাস-ব্যবসায় বন্ধ ক'রতে বদ্ধপরিকর। ইংরেজ মানওয়ারি জাহাজ এঁকে দাস-ব্যবসায়ীদের জাহাজ থেকে উদ্ধার করে, তার পরে ইংলণ্ডে নিয়ে যায়। সেখানে ইনি বড় হন, শিক্ষা লাভ করেন এবং চার্চ-অভ-ইংলাণ্ডের যাজক নিযুক্ত হন। পরে যৌবন অবস্থায় দেশে ফিরে আসেন, বহুদিন পরে পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হন, আর স্বজাতির মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের কাজে লেগে যান। এঁর চরিত্র ধর্মভাব আর কার্যকারিতা দেখে, রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে এঁকে প্রথম আফ্রিকান বিশপ করা হয়। মেকলে এঁর দৌহিত্র, এবং মেকলের পিছনে তিন পুরুষের শিক্ষা ও আভিজাত্য আছে। সর্দার ওলুয়ার পিতামহ Docemo দোসেমো ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ রূপোয়-বাঁধানো একটি লাঠির আকারের রাজদণ্ড উপহার পান, সেটি মেকলে সঙ্গে ক'রে এনেছেন, আমায় দেখালেন। এঁদের বাসায় বিকালে গল্প ক'রতে গিয়েছিলুম, কথায় কথা জ'মে উঠতে রাত্রি হ'য়ে গেল, এঁদের নির্বন্ধে আমায় ওঁদের সঙ্গে সায়মাশ সেরে আসতে হ'ল। এইভাবে সপার্ষদ এই আফ্রিকান রাজা বা জমিদারের সঙ্গে আমার বেশ একটু হৃদ্যতা ঘটে। শ্রীযুক্ত মেকলে আমার বাসাতেও একদিন এসে আমার সঙ্গে অনেক গল্প

ক'রে যান। এঁর সঙ্গে এঁদের সমাজ আর সংস্কৃতি নিয়ে যে অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়, তার একটু দিগ্‌দর্শন অন্যত্র ইংরেজি আর বাঙলাতে প্রকাশ করেছি। পরে শুনে খুশি হলুম যে, প্রিভি-কাউন্সিলের মোকদ্দমায় সর্দারের জয় হয়েছিল, আর তাঁর সমস্ত জমি তিনি ফেরত পান। সম্রাট পঞ্চম জর্জ তখন গ্রেট-ব্রিটেনের রাজা ও ভারত-সম্রাট। তাঁর এক Levee বা দরবারে দুই হাজার আড়াই হাজার অভ্যাগতের মধ্যে সর্দার ওলুব্বার নিমন্ত্রণ হ'য়েছিল, মেকলেও সঙ্গে ছিলেন তাঁর রাজদণ্ডবাহী দোভাষী ও সেক্রেটারি রূপে। মেকলে ঐ দরবারে উপস্থিত ফোটোগ্রাফারদের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করেন যে, যখন সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ অতিথিদের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এসে এই সর্দারের কাছে পৌছান, তখন সর্দারের রঙচঙে আলখাল্লা গায়ের ঘন কৃষ্ণ রঙ, আর আফ্রিকান পদ্ধতিতে দুই হাতের আঙুল জড়িয়ে বদ্ধাঞ্জলি হ'য়ে, আর ডান হাতের বুড়ো আঙুল বাঁ হাতে ঘ'ষে, য়োরুবা প্রণালীর নমস্কার দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে দাঁড়ান, মেকলে যথারীতি সর্দারের পরিচয় দেন, সম্রাট্ স্মিতহাস্যে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেন— ঠিক সেই অবস্থায় একখানি ছবি তুলে নেওয়া হয়। স্বদেশে সর্দারকে রাজদ্রোহী বলে ঘোষণা ক'রে বিপদে ফেলবার চেষ্টা হ'চ্ছিল; এইভাবে তাঁর জাতীয়তাবোধ-জনিত স্বাধীনতা-কামী মনোভাবকে দমন করার চেষ্টা নাইজিরিয়ার তখনকার দিনের ইংরেজ সরকারের ছিল। এই ছবিখানি নাইজিরিয়ায় সর্বত্র প্রকাশিত হওয়ায়, তাঁদের সেই অপচেষ্টা অনেকখানি ব্যর্থ হ'য়েছিল। ঐ সময়ে আমার মনে হ'য়েছিল, যদি কখনও পশ্চিম-আফ্রিকায় যাওয়া হয় তা হলে, আমাদেরই মত অবস্থায় প'ড়ে আছে আর সেই অবস্থা কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা ক'রছে, এমন আমার আফ্রিকান ভাইবোনদের তাদের নিজেদের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে দেখে আস্‌বো।

আজ, ৪ঠা আগস্ট ১৯৫৪, সন্ধ্যের দিকে, হাতে সময় থাকায়, আর সিন্ধী বন্ধুরা বিশেষ সৌজন্য ক'রে তাঁদের গাড়ি আর সঙ্গে একজন ওয়াকিফ-হাল চালক তাঁদের অতিথির সেবার জন্য দেওয়ায়, আমি বেরোলুম সর্দার ওলুব্বার সঙ্গে দেখা ক'রতে। ইনি এখানে সুপরিচিত ব্যক্তি। নারায়ণদাস বলে চেলারামের ফার্মের একটি কর্মচারী, মোটর-চালককে বুঝিয়ে দিলেন কোথায় যেতে হবে। শহরের বাইরে, সমুদ্রের ধারে, যেখানে য়োরুবা জেলেদের বসতি, সেই পাড়ার মধ্যে দিয়ে, ঘনায়মান অন্ধকারে আমাদের গাড়ি চ'ল্‌ল। এই অঞ্চলটা ইংরেজি কথায় যাকে বলে slum সেই রকম গরীব অঞ্চল। মর্চে-ধরা টিনের দেয়াল আর টিনের ছাদ, বাঁশের দর্মার দেয়াল, এইরকম বিস্তর নোংরা বাড়ি আর দোকান— এর মধ্যে রেস্তোরাঁ আর বার বা পানশালা অনেক। মাঝে মাঝে জাল শুকোচ্ছে— সমুদ্র থেকে মাছ ধরা হয়। আমরা শেষে খুব ঘন-বসতি শহরতলি অঞ্চলে গিয়ে পৌছোলুম। গাড়ি একটি গলির মোড়ে দাঁড়াল, আমরা নামলুম। আমার দোভাষী হিসাবে গাড়ির চালক Thomas টমাস আমার সঙ্গে চ'ল্‌ল। অপরিষ্কার সড়কে একপাল উলঙ্গ আফ্রিকান শিশু ধুলোমাটি মেখে খেলা ক'রছে। য়োরুবা পোশাক পরা আফ্রিকান মেয়েরা গৃহকর্মে নিযুক্ত, জলের কল থেকে কেরোসিন তেলের টিনে ক'রে জল মাথায় ক'রে নিয়ে আসছে, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের ভিতরে রান্না চ'ড়েছে। এই গলি দিয়ে যেতে বাঁয়ে বেশ বড় আকারের একটি ইমারত চোখে প'ড়ল, টমাস ব'ললে যে এটি একটি মসজিদ, সর্দার ওলুব্বা নিজ ব্যয়ে তৈরি ক'রে দিয়েছেন। মসজিদটি ছাড়িয়ে সামনেই সর্দারের প্রাসাদ। মাঝারি আকারের সাদা চুনকাম-করা দোতলা বাড়ি, যেরকম বাড়ি পোর্তুগীজ প্রভাবে লেগস শহরে আফ্রিকান বিত্তশালী লোকেরা নিজ বাসের জন্য তৈরি করেন। বাড়িতে ঢুকেই বাঁ

হাতি এক সিঁড়ি, সেখানে খুব লম্বা-চওড়া চেহারার আলখাল্লা আর অঙ্গবস্ত্র পরা কতকগুলি আফ্রিকান দরওয়ান বা চাকর ব'সে ছিল। টমাস য়োরুবা ভাষায় তাদের ব'লতে তাঁরা আমাকে সিঁড়ি ব'য়ে উপরে এক লম্বা টানা বারান্দায় নিয়ে গেল; সেখানে অনেকগুলো চেয়ার পাতা ছিল, তার একটিতে বসালে। ভিতরে খবর দিতেই, খালি গায়ে, কেবল অঙ্গবস্ত্র জড়ানো একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি এলেন, আর তাঁর সঙ্গে দু-একটি যুবক ও কিশোর। আমার অনুমান হ'ল, আজকের এই সুগঠিত চেহারার প্রৌঢ়টি লণ্ডনের সেই যুবক, যাঁকে আমি চৌত্রিশ বছর আগে দেখেছিলুম। ইনি জিজ্ঞাসু হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে ব'ললেন, Yes? what can I do for you? আমি ব'ললুম, I am from far-away India, and I have come to pay my respects to the Chief Oluwa whom I met 34 years ago in London. প্রৌঢ় ব্যক্তিটি আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে ব'ললেন, The Chief is my father, and I was with him in London. Are you the same Indian student who used to come to see us in our home? আমি শুনে হাত বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন ক'রলুম আর ব'ললুম তিনি আগেরই মতন এখনও handsome youngmanই র'য়েছেন। ভদ্রলোক শুনে অত্যন্ত খুশি হ'লেন, আর আমায় বললেন যে, তাঁর বাবার বয়স এখন ৮৬ বৎসর, তবে এখনও বেশ শক্ত সমর্থ আছেন। তাঁকে এখনই খবর দিচ্ছেন। আমার পরিচয় দেবার জন্যে এই ভদ্রলোককে আমার কার্ড দিলুম। আমার কার্ডের বিশেষত্ব—একদিকে আমার পূরা পরিচয় আছে ইংরিজিতে, আর একদিকে নাগরীতে, আমার কার্ডে এই নাগরী অক্ষর দেখে অনেক বিদেশীর মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল হয়, তখন অবসরমতন দু-চার কথা স্বদেশের সম্বন্ধে বলা যায়। ভদ্রলোক ভালো করে ইংরিজি দিক্‌টা প'ড়লেন, নাগরী লেখা প'ড়তে না পেরে আফ্রিকান-সুলভ সরল হাসি— a broad good-humoured grin— অর্থাৎ বাংলা কথায় যাকে বলে দিলখোলা, কান-এঁটো-করা হাসি— হাসলেন, ঝক্‌ঝকে দাঁতের রশ্মিতে ঘোরকৃষ্ণ বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল তিনি গিয়ে তাঁর বাবাকে ডেকে নিয়ে এলেন। ৮৬ বছর বয়স, মাথায় কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুল, প্রশান্ত সৌম্য মুখমণ্ডল, খুব ঢিলে আলখাল্লার মত পোশাক পরা, পায়ে চপ্পল, হাতে তস্‌বী বা জপমালা, আর মাথায় একটি কালো গোল টুপি, তিনি ধীরে ধীরে এসে আমাকে ঘাড় নামিয়ে অভিবাদন ক'রে, একটি বড় চেয়ার আলাদা করা ছিল তাইতে ব'সলেন— এই চেয়ারটি কিন্তু ইউরোপীয় ঢঙের। এঁর পুত্র আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমি ইংরেজিতে আমাদের সাক্ষাতের পূর্বকথা সব খুঁটিয়ে ব'লতে লাগ্‌লুম, ইনি সানন্দ হাস্যে মাথা নেড়ে নেড়ে শুনতে লাগলেন— এঁর ছেলে তর্জমা ক'রে ব'লছিলেন— মন্তব্য ক'রলেন যে, মেকলে দেহরক্ষা ক'রেছেন, আমার সব কথা মনে আছে দেখে তারিফ ক'রলেন, এবং ব'ললেন, স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র যে পরিবর্তন হ'চ্ছে তাও তিনি লক্ষ্য ক'রছেন, এবং তিনি আশা করেন যে, ভারতবর্ষের মত তাঁর দেশও স্বাধীন হবে, তা হ'লে তিনি সুখে ম'রতে পারবেন। তিনি একজন অতি নিষ্ঠাবান্ ভক্তপ্রাণ মুসলমান, ছেলেকে ব'ললেন তাঁর দেওয়া মসজিদ আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে। আমি লক্ষ্য ক'রেছিলুম, ঐ বারান্দার এক কোণে কালো আলখাল্লা পরা ফকির-গোছের এক বৃদ্ধ আফ্রিকান তস্‌বী নিয়ে জপ ক'রছিলেন, আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ বিত্তশালীর ঘরে যেমন সাধু-সন্ন্যাসীর অবস্থান অনেক সময়ে হ'য়ে থাকে। পিতার কথায় পুত্র আমাকে তাঁদের নানা আসবাব চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো পাশেরই এক বৈঠকখানা-ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে

নানা ছবি, মক্কার কাবা ও অন্য মসজিদের ছবি ইত্যাদির সঙ্গে ফ্রেমে বাঁধা বেশ বড় একটি ব্রোমাইড ফোটোগ্রাফ দেখলুম— সেই বিখ্যাত ছবিটি, কোমর বেঁকিয়ে সর্দার সম্রাট্‌কে অভিবাদন ক'রছেন, সেই অবস্থায় তাঁর সঙ্গে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ করমর্দন ক'রছেন, আর সামনে মুখ ক'রে দৃপ্তভাবে হার্বার্ট মেকলে রাজার রুপো-বাঁধানো রাজদণ্ডটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিটি আমার পরিচিত, এটি ১৯২০ সালে Illustrated London News-এ প্রকাশিত হয়, আর মেকলে আমাকে ঐ ছবি একখানি ক'লকাতায় পাঠিয়ে দেন। এইভাবে কিঞ্চিৎ শিষ্টাচার করা গেল। কিঞ্চিৎ লেমনেড পান ক'রতে হল। তার পরে আমি সর্দার ওলুয়ার কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

তাঁর ছেলে আমার সঙ্গে নীচে নেমে এলেন। দু পা এগিয়েই বাড়ির সামনের মসজিদে আমায় নিয়ে গেলেন। সাধারণ মসজিদের ভাব। মেহেরাবের উপরে আরবী অক্ষরে 'বিস্মিল্লাহি-র্‌-রহ্‌মানি-র্‌-রহীম' ও কলমা লিখিত। তখন মসজিদ একেবারে খালি। এ মসজিদের ভাব অন্য ধরণের, সমস্তটা ঢাকা গির্জার মত। ওঅজু করবার অর্থাৎ হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা অবশ্য বাইরে। ছেলেকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, মোল্লা বা ইমাম-এর বেতন তাঁর পিতাই দেন, এবং এই ইমাম জাতিতে য়োরুবা। অনেক সময়ে উত্তর থেকে হাউসা বা ফুলানি অথবা আরবী-ভাষী সুদানী ইমাম এদেশে এসে মসজিদের ভার নেন।

মসজিদ দেখে সর্দারের ছেলের সঙ্গে করমর্দন ক'রে বিদায় নিলুম। এইভাবে চৌত্রিশ বৎসর পরে পিতা-পুত্রের সঙ্গে পুনরায় আলাপ করাটা আমার কাছে বেশ সুন্দর লাগ্‌ল।

শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌-এর নির্দেশমত আমাকে হস্টেলে নিয়ে এল। একটু বিশ্রাম ক'রে আবার ওঁদের বাড়িতে সান্ধ্য-ভোজনের জন্য যেতে হল। পথে লেগসের Broadcast House বা রেডিও-আপিস হ'য়ে গেলুম। নতুন বাড়ি, তাতে একটি বিরাট্ দেয়াল জুড়ে নাইজিরিয়ার বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রকর Ben Enwonu বেন্ এন্‌ৱোনু, যাঁর সঙ্গে পরে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল ইবাদান শহরে, তাঁর আঁকা একটি Fresco বা ভিত্তিচিত্র দেখলুম, আর দেখলুম তাঁর তৈরি একটি Bas-relief বা দেয়ালের উপরে গড়া ভাস্কর্য-চিত্র। Frescoটি বর্ণোজ্জ্বল এবং সেটি Futuristic পদ্ধতিতে আঁকা, নৃত্যরতা অনেকগুলি আফ্রিকান কুমারীর সারির ছন্দোময় গতিভঙ্গি, রঙিন বহু আফ্রিকান মুখস, গাছপালার বিচিত্র সবুজ, ইত্যাদি নিয়ে খুব সুন্দর লাগ্‌ল। ভাস্কর্য্যচিত্রটি পাথরে খোদাই একটি য়োরুবা একটি ইবো আর একটি হাউসা পুরুষের— এই তিনটি জাতির মানুষ যথাক্রমে পশ্চিম পূর্ব ও উত্তর নাইজিরিয়ার প্রধান জাতি।

শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্‌ ও তাঁর সহকর্মীরা— যাঁরা চেলারামের কার্য্যের পরিচালক— শহরের ধনী লোকেদের পল্লীতে একটি সুন্দর বাড়িতে থাকেন। এই বাড়ি আর এঁদের আপিস গুদাম প্রভৃতি এঁদের নিজস্ব সম্পত্তি। বিশিষ্ট অতিথিদের থাকবার জন্যে ব্যবস্থাও আছে। চমৎকার ভাবে সুন্দর হাতার বাগানের মধ্যে সাজানো এই বাড়িখানি। এঁরা এখানে পরিবার নিয়ে থাকেন, তবে এই সময়ে মেয়েদের কেউ ছিলেন না। ঝি চাকর স্থানীয় য়োরুবা বা ইবো, বেশির ভাগই খ্রীষ্টান। পাচকও য়োরুবা। সিন্ধীরা বেশ ভোজন-বিলাসী, এবং তাঁরা প্রচুর মাংস আহার করেন ; পাচকদের বেশ ভালো করে শিখিয়ে নেন। তাদের হাতের ভারতীয় রান্না খুব চমৎকারই লাগ্‌ল। সিন্ধী ভোজন মানে, দুই-আড়াই ঘণ্টার ব্যাপার। ব'সে ব'সে গল্প করেন, সঙ্গে পান চ'লতে থাকে, মাংসের শুকনো চপ, শামি কাবাব প্রভৃতি নানান রকমের ভোজ্য প্লেটে ক'রে দিয়ে যায়, এবং এইতেই অনেকটা সময় চ'লে যায়। সিন্ধীরা অত্যন্ত মদ্যপান আসক্ত হ'য়ে থাকেন।

অতিথিকে মদ খাবার জন্যে খুবই পীড়াপীড়ি করেন, নানা রকমের মদ পরিবেশন করেন। আমি ও পথের পথিক নই, তা সত্ত্বেও নির্বন্ধের অন্ত ছিল না। এই জন্যেই আবার অনেক বিদেশী সিন্ধীদের আতিথ্য পছন্দ করেন। এইরকম পানে আর অল্প অল্প ভোজনে ঘণ্টাখানেক কাটাবার পর, তবে আহারের টেবিলে বসবার আহ্বান আসে। সেখানে চাপাটি বা পুরি বা পরোঠা, পোলাও, কোর্মা ও রকমারি মাংসের আর মাছের ব্যঞ্জন পরিবেষিত হয়, এবং শেষে অনেক রকমের মিষ্টান্ন। সাড়ে দশটার পরে ছুটি পেলুম, আমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিলে। কতকগুলো চিঠিপত্র লিখে যখন শয্যা আশ্রয় ক'রলুম, তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা।

য়োরুবাদের দেশে আমার প্রথম পুরো দিনটি এইভাবে কাট্‌ল। লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়া দেশের জনসাধারণের জীবনধারারও একটু আভাস পেলুম। বিশুদ্ধ আফ্রিকান জাতির মেয়ে পুরুষ, এদের নিজেদের প্রতিষ্ঠায়— "স্বে মহিম্নি" দেখে মনে বিপুল আনন্দ পেলুম। আগামী কাল, ৫ই আগস্ট বৃহস্পতিবার, আমার ইবাদান যাবার ব্যবস্থা এখানকার সরকারি পররাষ্ট্র-বিভাগের আর আমার সিন্ধী স্বদেশবাসীদের মিলিত চেষ্টায় হ'য়েছে। ইবাদান সমগ্র আফ্রিকার মধ্যে সকলকার চেয়ে বড় খাঁটি আফ্রিকান শহর— এর পত্তনে বা স্থাপনায় আর প্রসারে ইউরোপীয়দের হাত ছিল না। ইবাদান নানা বিষয়ে য়োরুবা জাতির মস্তিষ্ক, কেন্দ্র, পশ্চিম-নাইজিরিয়ার রাজধানী। এখানেই মন্ত্রী আয়োলোয়ো থাকেন।

এর পরের বারে ইবাদানের কথা ব'ল্‌বো।

ক্যারিবিয়নের চিঠি

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রিয়বরেষু

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

এইমাত্র হাভানা শহর থেকে উড়ে এসেছি, জানি না এই চিঠিতে বিখ্যাত চুরটের গন্ধ পাবেন কি না। যদিও সিগারের রাজ্য আমার সম্পূর্ণ অজানা, তবু কার সাধ্য কিউবা দ্বীপে গিয়ে মহার্ঘ ধূম্রকে অস্বীকার করে? মধ্যে মায়ামি শহরে নেমেছিলাম ফ্লরিডায়, সেখানেও ধনীদের ডলার ভস্ম-ধোঁয়ায় রাত্রি হয়ে উঠেছে দিন। অথবা দিন হয়েছে মোহের রাত্রি। হোটেল-অট্টালিকায় ভ্রামণিক বিলাসপতিরা ক্যারিবিয়ন দ্বীপের সৌন্দর্যকে লঙ্ঘন করেছেন, নির্মল জলের নীলে তুলেছেন ক্যাসিনোর মর্মর জুয়াড়ি দেয়াল, বিদ্যুৎ-বিদ্ধ আকাশে ছুটেছে তাঁদের বিজ্ঞাপিত রঙিন মন্ত্রের চিত্রণ। কিন্তু Rock 'n' Roll -এর চীৎকৃত সংগীত-হীনতা ভেদ করেও দেখা দেয় দূরের বিধৃত শৈলশান্তি, অসীম সমুদ্রের ধৈর্যরেখা, এমন কি হাভানাতেও। হঠাৎ মনে পড়ে যায় পৃথিবীতে আছি, যার চতুর্দিকে কালের সমুদ্র, তারও পারে সময়হীন আকাশ, যেন সবটাই ক্যারিবিয়ন যে-কোনো দ্বীপের মতো আত্মসম্পূর্ণ জগৎপরিধি। তার মধ্যে দ্বীপবর্তী মানুষের জীবন ক্রেতা-ব্যবসায়ী-রাষ্ট্রলুব্ধের সম্পূর্ণ করায়ত্ত নয়; আড়কাঠির আক্রমণ সমাজের শেষ মর্মে সেখানে পৌঁছয় না; আখের ক্ষেতে কফি-কোকোর সারিজঙ্গলে যারা কাফ্রি দাস বা indentured labourer-এর ভারতীয় বংশধর তারাও কোনোখানে মরতে-মরতে অমরত্বের সন্ধান পেয়েছে। West Indies-এর দ্বীপরাজ্য সেই সব বিগত বন্দী কর্মমুমূর্ষুদের চক্ষের ভঙ্গীতে আজো সজল, তাদের ভরসার দীর্ঘশ্বাস চাবুকের আঘাত-শব্দের চেয়ে দূরে গিয়ে পরমাশ্রিত। অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের পাশাপাশি অবর্ণনীয় অত্যাচার শ্রান্তির তীব্র বিসংগতি কত দ্বীপে দেখলাম; দৈবের জগতে এসে মানুষের তৈরি নারকীয় কীর্তি। অথচ এই নিরন্ত সংঘাতের মধ্য হতে উৎসিত হয়ে উঠেছে মানবিক বিজয়ী ইতিহাস, তার ধারায় নারায়ণী মহিমার ধ্বনি বারে বারে শোনা গেল। ভাগ্যক্রমে যে-যুগে জন্মেছি তাতে জনসাধারণের মুক্তি সমধিক আসন্ন।

হেইটি দ্বীপে ট্যুরিস্ট-ব্যাসনের অভাব নেই, কিন্তু সব চেয়ে প্রথম স্বাধীন দ্বীপরূপে ক্যারিবিয়নে এর মর্যাদা দ্রুত লক্ষণীয়। হেইটির পার্বত্য দারিদ্র্যপূর্ণ গ্রাম, তার উপরে জড়োয়া মেঘের কাজ, এবং ড্রিমিড্রিমি আফ্রিকান ড্রাম্ আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। তথ্যসঞ্চয়ের শ্রমে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, voodoo নৃত্যে এবং rumএ মেশা অদ্ভুত কৌশলী ধর্মনেশার কারিগরি অনভিভূত আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, চোখে ঠেকেছে সোনার বায়ুতে কাটা বিচিত্র শৈলান্তরেখা। কোথাও আরণ্যপর্বত হঠাৎ বালির তীরে নেমে একেবারে অগাধ ঢেউয়ে অদৃশ্য। কোথাও করতালি দিচ্ছে পাম্ গাছ, ফ্লামবয়ান্ট্ (আমাদের কৃষ্ণচূড়া গোছের) আগাগোড়া ফুলে রক্তিম আচ্ছন্ন।

হেইটিতে ভারতীয় প্রায় কেউ নেই, এক ঘর সমৃদ্ধ দোকানী ছাড়া, কিন্তু "মহামানবের সাগরতীরে" এসে ভারতবর্ষীয় পথিককে ঘরে ঘরেই দেশে ফিরতে হয়। বন্দনা জানাতে নেমেছিলাম ক্রীতদাসের

মুক্ত দ্বীপে, আকাশ যেখানে আজো তাদের প্রাচীন বেদনায় স্মার্ত, উদ্‌গাথা উঠেছে শৃঙ্খলধ্বংসের আবাহনে।

একটু ইতিহাস শুনুন। "The first Africans to set foot in Haiti came in the year 1510. Just precisely when they came from no one knows, but it was somewhere along the stretch from Singal to the Congo. What they went through is an old story: disease, thirst, brutality, sea-sickness. And their trials did not end when they were put ashore in the Indies. The masters who had annihilated the Indian (অর্থাৎ আদিম অধিবাসী "আমেরিণ্ডিয়ান") in less than twenty years were not likely to consider the Africans, darker and stronger, as having any particular human right. One of the first prayers of the slaves in Haiti must have been gratefulness for the oxen, horses, and bourriques; if it were not for them the Negroes would have had to bear even greater burdens.

"In the hard years which followed, more and more slaves were poured into Hispaniola, as Haiti was then called. The West Indies became the most prosperous of slave markets, and Haiti, Martinique and a few of the other island colonies absorbed all the slaves they could get. These men who came in chains were of all classes and types…".

সহৃদয় মার্কিন ঐতিহাসিকের এই বর্ণনা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর যে-কোনো দ্বীপের হৃৎসাক্ষী-রূপে গ্রহণ করা চলে। প্রথম পালায় আমেরিণ্ডিয়ান (তীব্র কারিব্, শান্ত আরায়োয়াক্ এবং অন্যান্য মানুষের সংসার) ধ্বংস, সম্ভব হ'লে নিশ্চিহ্ন বধ (কোথাও তারা দু-চার পরিবার এধারে ওধারে, যেমন দৈবাৎ ডমিনিকা দ্বীপে বা ল্যাটিন আমেরিকান বৃহৎ ভূখণ্ডের দু-এক কোনায়, পালিয়ে বেঁচে বর্তে আছে); দ্বিতীয় পর্যায়ে নিগ্রো আফ্রিকানদের বেঁধে আনা জাহাজ-ভর্তি করে; এবং তৃতীয় স্তবকে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের অবসানে ভারতীয় বা অন্য কোনো এশিয়ান দেশ থেকে "কুলি" চালনা করা। সব দ্বীপে ভারতীয় "কুলি" পৌঁছয় নি, কিন্তু ট্রিনিডাডে, গ্রেনাডায়, ব্রিটিশ গিয়ানায়, ডাচ স্যুরীনামে, জামাইকা দ্বীপে সেই ভাগাহত ভারতীয়দের শত শত দেখলাম যারা এককালে এসেছিল ধিক্কৃত সাম্রাজ্যের "কুলি" নাম নিয়ে। আজ তাদের অনেকের অবস্থান্তর ঘটেছে, কেউ কেউ শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত অথবা ক্বচিৎ ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু গভীর সমুদ্রের দূর অলগ্নতার মধ্যে অতিক্ষুদ্র দ্বীপে যাদের দু-তিন পুরুষ কাট্‌ল তাদের না আছে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ, না আছে পিতৃপুরুষের ধর্ম বা ভাষা। ট্রিনিডাড বিত্তশালী বৃহত্তর দ্বীপ, এবং সেখানে সংখ্যায় গরিষ্ঠ ভারতীয়ের দশা অনেকটা ভালো কিন্তু গ্রেনাডা, সেণ্ট লুস্যা, এমন কি জামাইকা দ্বীপের ভারত-সম্পর্কিত বহু সহস্র লোকজনের দুর্দশা অবর্ণনীয়। ফরাসী মার্টিনিক্ দ্বীপে আফ্রিকানদের অবস্থা সর্বাধম; অব্যবস্থা এবং ঘুণে-ধরা সাম্রাজ্যিকতার একান্ত পরিণাম দেখতে আসবেন ঐ সুশ্রী, ঐ দুঃখ-দীর্ণ সহায়হীন দ্বীপবাসীর ঘরে জঙ্গলে। অন্য দ্বীপের মতো ওখানেও rum-এর দুঃখহরণ স্রোত বইছে, মানুষকে সস্তায়

পাতালের দিকে ঠেলে ফেলে। সেখানেও আখের ক্ষেতের ফালিতে কাঁচা রোদ পড়েছে, ঝরনা-জল ঝরছে, নিপুণ পাথরের নিক্বণে। কিন্তু মানবদিগন্ত এখনো আঁধি-লাগা।

অপ্রাসঙ্গিকভাবে আবার হেইটিতে ফিরে আসি। এখানে এরা তীব্র যন্ত্রণার বিপ্লবে ফরাসী ইস্পানীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। হেইটির কাহিনী আরেকটু বলি। তারপর ক্ষণকালের জন্যে, সোনার দেশ স্যুরীনাম ছুঁয়ে এই চিঠি শেষ করব।

সেই মার্কিন লেখক Harold Courlanger বলছেন—"In the hills of Haiti everyone sings and dances. Babies of three years dance Vodoun and Pétro with their elders. Boys of seven are already master drummers and under the teaching of their fathers, who learned from their own fathers. And old women weighed down by years and infirmities still dance Ibo with their shoulders.

"In Haiti everyone works. If they do not work they do not live. Most of them work very hard. Whether they work so hard or not, living is unbounteous. Women walk great distances with heavy loads on their heads, some of them walk all day and night to get to market, where they may earn eight cents on their Congo bean and cotton, and they walk all day and night to get home. And the men plant and till their garden with a machette or hoe, hang their maize and Kaffir corn high in the branches to dry.

"Sometimes they sit and wait for their big-bananas and the cocoanuts to ripen, but they are not lazy, they are simply patient. They are patient of a summer sun which bakes their ground hard and unfruitful, of earth which often yields not enough to keep their bodies living.

But when it is time to dance and sing, nature pours forth spiritual riches from the large end of the horn. For the moment, life surges in dulled bodies as well as in the quick. Drummers become one with their drums and the drums come alive. People move and sing and vibrate with nature; they dance with each other; with their ancestors, and with old African gods whom they have not forgotten…" (*Haiti Dances* বইখানি পড়ে দেখবেন)।

হেইটি-র ক্রিয়োল্ পুরুষ-মেয়েদের দেখে সাঁওতালি চেহারা এবং প্রকৃতি মনে পড়ে যায়। আগের বছরে গোল্ড-কোস্ট-এ ঠিক ঐরকম "talking drums", "male and female drums" শুনেছিলাম, মৃদঙ্গের দ্রুত আঙ্গিকে প্রাণের স্পন্দন, রক্তের ধ্বনি, সমস্ত অরণ্য থরথর ক'রে উঠেছিল কীবী ট্রাইবল্-নেতার ঘন গাছে ভরা অঙ্গনে।

স্যুরীনাম। পারামারিবো শহর থেকে দূরে "ভারতীয়" বসতি দেখতে বেরোলাম। তারা আজ

ডাচ্-গিয়ানাবাসী গিয়ানিজ; রাষ্ট্র-অধিকারে তারা ভারতীয় নয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাদের চেহারা, ভাষা, ধর্ম, লোকাচার আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হিন্দুস্তানী। শাড়ি ধুতি অনেকে পরেন বিশেষ উপলক্ষ্যে, পুজাপার্বণে, বিবাহের উৎসবে; কিন্তু সদাসর্বদা শাড়ি ব্যবহার করেন এমন গৃহিণীও এখানে চোখে পড়ল। সারামাক্কা নদী পেরিয়ে ফেরি-ঘাটের অনতিদূরে এত সহস্র ভারতীয় জনতা দেখব ভাবি নি। একটি গাঁয়ে দারুণ রোদ্দুর ঠেলে চাষী শ্রমিক বোন-ভাই এসেছিল "আপন দেশী" সদ্য আগত ভাইকে দেখতে। বৃদ্ধ শুভ্রকেশ চাষী সভাপতি হাত জোড় ক'রে স্তোত্রপাঠের নির্দেশ জানালেন; সকলে এককণ্ঠে সেই শক্তির স্তবে যোগ দিলেন যিনি "মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং"। পরিচিত শুভ শ্লোক ঐ সমাবেশে, ধুলোয় পরবাসে হঠাৎ কী মহিমায় আবির্ভূত হল তা কী বলব। কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় এই ডাচ্ রাজ্য, এই লাটিন আমেরিকান দেশের আটলান্টিক তীরের ফালি, ব্রেজিল-এর কাছে। আরো মন্ত্র যোগ হল, "সহনাববতু, সহবীর্যং করবাবহৈ"— যোগসেতু স্পষ্ট হয়ে উঠল কালকে অতিক্রম ক'রে, দেশকে। সুরীনামের ভারতীয়েরা আজো জাগিয়ে রেখেছেন হিন্দি ভাষার দেউটি, জল দিচ্ছেন তুলসীতলায়, আতিথ্যদানের ইচ্ছা এতই বেশি যে সমস্ত গরিব গ্রাম আগে থেকে চাঁদা তুলে আমাকে সুরীনামের সোনায় গড়া একটি সোনার আংটি উপহার দিলেন। কপালে ঠেকল চন্দন, গলায় পরলাম গাঁদা ফুলের মালা। দেশ আর এই দেশের মধ্যে কত দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব, পনেরো হাজার মাইলের কত মহাভূমি-সমুদ্রের দুস্তর ব্যবধান তা ভুলে গেলাম। ভারতবর্ষ থেকে সব চেয়ে দূরে সুরীনামের ভারতী-বসতিতে আজো অনেকে হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম রক্ষা করেছেন, দুই ধর্মের চেয়ে বৃহত্তর গভীরতর মানবধর্মে তারা মিলিত। বিভক্ত ভারত-পাকিস্তানের প্রসঙ্গ তাঁদের পক্ষে একান্ত দুঃখকর; কয়েকজন বললেন, ঐ ভাঙা মাতৃদেশে ফিরব না, তার চেয়ে এইখানেই থাকি। পরে পানামায় গিয়েছি, সেখানেও একটি বাঙালি মুসলমান ঐ কথাই বললেন।

যে সোনার টুকরো হাতে নিয়ে সেদিন অন্ধকারে বেরিয়ে এলাম তার দাম কোনোদিন শোধ হবে না। অন্যভাবে প্রতিদান দিয়েছি, সেটা কেবলমাত্র বস্তুগত, কিন্তু যথার্থ দানের প্রতিদান কোথায়। নদী পেরোবার সময় কারো কণ্ঠে কথা ছিল না, দৃষ্টি নামাতে হল।

ঐ সুরামাক্কার কাছেই ওখানকার একটিমাত্র বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে দেখা হল। হয়তো এখানে-ওখানে ক্বচিৎ বাঙালি ঐ হিন্দিভাষীদের মধ্যে আছেন, ঠিক কেউ বলতে পারল না। হিন্দিকেই সুরীনামের ভারতীয়রা মাতৃভাষা বলে মেনে নিয়েছেন, যদিও অনেকের ভাষা ছিল তামিল, গুজরাটি, মারাঠি, বা অন্য। ঐ বাঙালি ভদ্রলোক বাংলা প্রায় ভুলে গেছেন, নাম বললেন—মন্-মোহন, ত্রিশ বছর কোনো বাংলা কথা বলেন নি। মলিন পাত্লুন পরা, ছেঁড়া শার্ট গায়ে— আস্তে গলায় জানালেন, "বহু কষ্ট পেয়েছি, দাদা।" শুনলাম ভদ্রলোকের কোনো আত্মীয় কোথাও নেই। কোন্ এক জাহাজে চলে এসেছিলেন কলকাতা থেকে। কিন্তু সুরীনামে কিংবা ব্রিটিশ গিয়ানায় "কল্‌কাত্তা" মানে কলকাতায় এসে যে-কোনো জাহাজে ওঠা। অন্য অনেকে বিশেষ জাহাজের নামও জানেন, হিন্দু-মুসলমান তাঁরা নিজেকে সেই জাহাজের "এক-জাহাজী" ব'লে বর্ণনা করেন, ভারতবর্ষের কোন্ অঞ্চলে পিতৃপুরুষের বাসস্থান, তা সকলের স্মরণ নেই।

হঠাৎ দেখি মন্‌-মোহনবাবু গাঁয়ের ভিড়ে কোথায় চলে গেছেন। বাংলা ভাষায় যা মনে জাগল সেই অনুভূতির ভাষা আর তাঁকে জানানো হল না।

ইংরেজ রাজ "indentured labour"-এর ব্যবসা বন্ধ করেছে; স্বীকার করতে হবে সমস্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপগুলিকে এক ফেডারেশন-এর ব্যবস্থায় বাঁধবার উদ্যম তাঁদের প্রশংসনীয়। যে-কোনো স্বাভাবিক, প্রাতিবেশিক রাষ্ট্ররূপ ঐ দ্বীপসভ্যতার বিচিত্র সমাজ ও সংসারকে অর্থ এবং ব্যবসার আদান-প্রদানকে ঐক্যের সহযোগিতা দিতে সক্ষম আমরা তার পক্ষপাতী। কিন্তু এতদিনের হানি-গ্লানি-বিঘ্নের অন্ধতা সহজে শেষ হবে না। অন্য বিধান আজ যদি এগিয়ে এসে থাকে ভারতীয় পর্যটক আমি বলব, স্বাগত। যাঁরা ভারতীয় সংস্কার ভাষা ধর্ম রেখে ক্যারিবিয়ন্‌ রাষ্ট্রসভ্যতার অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাঁদের সমস্ত অধিকার যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। দেশ তাঁদের ভারত নয়, কিন্তু ট্রিনিডেডিয়ান, জামাইকান, গ্রেনাডিয়ানরূপে তাঁরা আপন ইচ্ছা ও বিশ্বাস সংগত আচার ধর্ম ভাষা রক্ষা করবেন।

অবস্থার বিপর্যয়ে এবং একান্ত বিরুদ্ধ পরিবেশে যাঁরা ধর্ম ভাষা সংস্কার হারিয়ে বসেছেন তাঁদের অনেককে দেখলাম। জাহাজ-বোঝাই মানুষ-পণ্য, প্রথমে কাফ্রি "স্লেভ", পরে ভারতীয় "কুলি", কোথায় ছিল তাদের আপন রাষ্ট্র, কোথায় তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধিকার। কোথায় কোন্‌ মুল্লুকে, ডাচ বা ফরাসী-অধিকৃত ভূখণ্ডে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতীয়কে কোন্‌ আইনে নামানো হল তা কে জানে। যেখানে পৌঁছল সেখানে তৎক্ষণাৎ তাদের জায়গা হল মশায়-ভরা জঙ্গলে। ঢুকল তারা আখের অরণ্যে, মরল কেউ সাপের কামড়ে, যারা বাঁচল দলে দলে তারা ভর্তি হল দিনে বারো-চৌদ্দ ঘণ্টার খাটুনিতে। আখের রস যথেষ্ট বেরোলো, চিনির স্তূপ সাদা উঁচু হয়ে উঠল, কারখানার কল থামল না। জাহাজ-ঘাঁটি লাভের বন্দর হল স্ফীতকায়।

পালাবার পথ বন্ধ হল, কেননা শুধু সমুদ্র লাফিয়ে বাড়ি ফেরার অসম্ভবতা নয়, শেষ পর্যন্ত ইচ্ছাশক্তির হ্রাসে মন বন্ধ হয়ে যায়, সম্ভবও হয়ে ওঠে একান্ত অবিশ্বাস্য। অনেক দ্বীপে, যেমন গ্রেনাডায়, এমন কি জামাইকার অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিপূর্ণ পার্বত্য গ্রামে লোকালয়ে দেখেছি বেশির ভাগ ভারতীয়রা ভাষা, ধর্ম, আপন পিতৃপুরুষের নাম-পরিচয় সুদ্ধ সবই গেছেন ভুলে। সামনে এলেন উইলিয়ম জোন্‌স্‌— কিন্তু দেখামাত্র বোঝা যায় ভদ্রলোক না উইলিয়ম না জোন্‌স্‌— অর্থাৎ আসল কোনো ভাবে। দলে দলে ওঁদের ক্রিশ্চান করা হয়েছে; নাম ওঁদের বদলে দিয়েছেন শাসকপক্ষের ধার্মিকেরা, আছে শুধু পুরোনো এবং অ-বদলানো সাক্ষাৎ রং এবং চেহারা, অপরিবর্তনীয় ধরন। ঘরে গিয়ে উইলিয়ম জোন্‌স্‌ অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির রাত্রে ভূতপূজা করেন, পাথরের টুকরো নেড়েচেড়ে জন্তুর লোম বা শিং ছুঁয়ে থাকেন ত্রাণের ইচ্ছায়, রবিবারে যান গির্জায়। নয়তো রবিবার সকালেও পালিয়ে পান করেন rum। সহৃদয় ফ্যাক্টরি-কর্তৃপক্ষ দ্বীপে দ্বীপে রাম্‌-এর আড়ত বানিয়েছেন, একই আখের গাঁজানো রসে চাষীর এবং মালিকের আনন্দবর্ধন হচ্ছে। মালিকেরা একটু সতর্ক, যথেষ্টই রাম্‌-পান করেন, কিন্তু সময় বুঝে; তা ছাড়া পাকস্থলীতে খাদ্যের সঙ্গে মদ্য যোগ হলে অতটা দ্রুত অন্তিম দশা হয় না। দারিদ্র্যের অনুপানে মদ্যের যোগ হলে ব্যাপারটা দারুণ হতে বাধ্য। কোনো কোনো দ্বীপে বক্তৃতায় বলতে বাধ্য হয়েছি— rum-এর রামায়ণে না আছে ধর্ম, না আছে বুদ্ধি। যথার্থ রামায়ণ চর্চা করলে এরা বাঁচত। দুচার জন দেখলাম ঠিকই বুঝলেন কী বলছি। এমন কি রাম্‌-এর ব্যবসা চালান যে-সব "পাণ্ডিত" (কেউ কেউ এরা হিন্দুধর্ম রক্ষা করেছেন

কিন্তু একই সঙ্গে রাম্ এবং রামায়ণের ব্যবসা করেন) ট্রিনিডাডে তাঁদের কাছে থেকেও স্বীকৃতি পেয়েছি। সব সুদ্ধ কী জটিল ব্যাপার তাই বুঝুন। যে-কোনো ধর্ম বা সভ্যতা গ্রহণ করাতে কোনোই দোষ নেই বলাই বাহুল্য, কিন্তু খিচুড়ি বানিয়ে ধর্মের বা সভ্যতার উৎকর্ষ হয় না। খিচুড়িতেও বাধা নেই, যদি সত্যি রান্না হয়, তার সঙ্গে প্রাণের অন্নের যোগ থাকে। যেখানে পাচক বা ভোক্তার দল স্বাধীন ইচ্ছায় যুক্ত, যেখানে কেবলমাত্র হিন্দু বা ক্রিশ্চান বা মুসলমান কিংবা অন্য কোনো ধর্মকে অসহায় সমবেত জনসংঘের সামনে একমাত্র পথ্য ব'লে জাহির করা হয় নি, সেখানে ধর্মে ও সমাজে দেয়া-নেয়ার মঙ্গল পথ উন্মুক্ত। কেউ কেউ ধর্মান্তরে না গিয়ে, সর্বমানবের আধ্যাত্মিক ধর্মে উপস্থিত হতে চান। মানুষের সেবা এবং ঐশ আরাধনায় কেউ বা প্রচলিত বিশেষ ধর্মের গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে আসল ধর্মকে উদ্ধার করেন। হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্ট ধর্ম বা ইস্লামের বিশুদ্ধ রূপ কারো অবিদিত নয়। কিন্তু ক্ষুদ্র খণ্ড যোগচ্ছিন্ন দ্বীপে বা দুর্গম গহন দেশের কোনায় কেবলমাত্র অন্ধ মিশ্রণের বা জবরদস্তির প্রথা শুরু হলে ধর্ম ঠেকে ক্রিয়াকাণ্ডে, ভাষা ঠেকে talkie-talkie-তে। সেই টকি-টকি না হিন্দি, না ইংরেজি, তাতে না আছে মর্যাদা, না আছে কোনো চিন্তা বা সভ্যতা বা ধর্মের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। মার্টিনিক দ্বীপে কাফ্রি এবং ফরাসী ভৃত্য-প্রভু-সম্পর্কের উভয়বিধ দুর্দশায় যে-ভাষা এবং ভঙ্গী তৈরি হয়ে উঠেছে তার মহিমা অবর্ণনীয়। যথার্থ মানবধর্ম প্রকাশ করার পথ অন্য।

ভর্জিন আইল্যাণ্ডগুলি পূর্বে ছিল ডেনিশ ; এখন কিছু তার ইংরেজ, মার্কিনেরা কয়েকটি দ্বীপ কিনে নিয়েছে। বিভীষিকার কালে একদা যখন পশ্চিমজাতীয়েরা বিকৃত আরব এবং আফ্রিকান দাসব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুরোপুরি যোগ দিল এবং যন্ত্রসভ্যতার যোগে তাকে স্ফীত, সম্ভ্রান্ত এবং অত্যন্ত লাভজনক ক'রে তুলল তখন এই দ্বীপগুলিতে ক্রীতদাসদের জড়ো করে পুনর্বার বেচা-কেনা হত। জাহাজের কাপ্তেনদের লগ্-বুক্-এ পড়া যায় আফ্রিকা থেকে এইসব দ্বীপে আসবার পথে প্রত্যহ অনেক মানুষ "নষ্ট" হয়ে যাওয়ায় তাদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হত। মৃত্যুর কারণ জাহাজের বায়ুহীন কক্ষে অসহনীয় ভিড়, কখনো জলের বা খাদ্যের অভাব, নানারকম যন্ত্রণা, রোগ। জাহাজে জন্তুর ব্যবস্থাও আজকের দিনে অন্যরকম। দাসদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে থাকত, তাদের ভাগ্যে স্বামী-স্ত্রী পিতা-মাতার বিচ্ছেদ এবং পুনর্বার বেশি লাভে অন্যদের কাছে বিক্রীত হওয়া। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আনেন বিশ্ববিধাতা, তারই পালা আধুনিক রাজ্যসাম্রাজ্যের তুমুল বিপ্লবে আবির্ভূত, কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেকের। কোনো দেশ বা জাতি এর থেকে পরিত্রাণ পাবে না, কেননা জাতি বা বর্ণ বা "ধর্মে"র নামে পৃথিবী জুড়ে মানুষ অমানবিকতার চর্চা করেছে। St Croix দ্বীপে এসেছিলাম স্মরণ করতে, সকলের হয়ে এবং বিশেষভাবে ভারতীয় হয়েও। অস্পৃশ্যতার ধর্ম যাঁরা মানেন দাস-দস্যুর ধর্মও তাঁদের, যদিও অন্যবিধ। কী শান্ত সুখশ্রী ছড়িয়ে আছে St. Croix দ্বীপের Christiansted নামক ছোট্ট শহরে ; আশীর্বাদী আলো ঝরে পড়ছে চিরবসন্তের বনানীতে, সমুদ্রের স্বনন কোরাল্-বালির উজ্জ্বলতায় মধুর মন্দ্রিত, মিশ্রিত। মনে হল এই দুঃখের তীর্থে ক্ষমার সৌন্দর্য এসে পৌচেছে। সেই ক্ষমা যেন প্রত্যেক সভ্যতায় আমরা অর্জন করতে পারি। গির্জের চূড়ায়, বাড়ির স্থাপত্যে পুরোনো ডেনিশ ভাব চিত্তাকর্ষক। ভর্জিন দ্বীপ ছেড়ে যেতে হল পোর্টো রিকো-তে, সান্-জুয়ান রাজধানীতে। ভাষা ইস্পানী, যদিও শহরে অল্পবিস্তর অনেকে ইংরেজি (বা "মার্কিনি" !) জানে। বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম এই দ্বীপ জুড়ে

আমেরিকানদের চিত্তশক্তি যথার্থ ই ক্রিয়াশীল, তারাই এই দ্বীপের প্রকৃত চালক, কিন্তু এই চালনায় আত্মত্যাগ আছে, অর্থাৎ জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সমৃদ্ধির জন্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা দ্বীপবাসীর নিত্য সহযোগী হয়ে দেখা দিচ্ছে। লাভের অঙ্ক কষে বা সাম্রাজ্যবাদ ফলিয়ে কর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় না।

ক্যারিবিয়ন্ দ্বীপপুঞ্জ ছোটো একটি পৃথিবীর মতো। মানুষজাতির সংঘর্ষ এবং সমধর্মিতার ধারাবাহী আন্দোলিত প্রতিক্রিয়া ক্ষুদ্র আয়তনের মুকুরে স্পষ্ট চোখে পড়ে। "ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্ ফর্ কাল্চারাল রেলেশনস্" দিল্লী থেকে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন এই দ্বীপাবলীর তীর্থে যেতে। অনেক দ্বীপের নাম করেছি; তা ছাড়া গিয়েছি টোবেগো, বার্বেডোস্, সেণ্ট টমাস্, গুয়াডেলুপ, আন্টিগুয়া দ্বীপে। পার হয়েছি, বা ছুঁয়েছি ডমিনিকান্ রিপাব্লিক্, ভেনেজুয়েলা এবং কলম্বিয়া দেশের প্রান্ত। পানামা ক্যানাল প্রদেশে প্রায় হাজার ভারতীয়ের বসবাস, সেখানে কয়েকদিন সৌহার্দ্যের ব্যস্ততায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় ও ভ্রমণে দ্রুত কাটল। ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যানে অতীতের ইতিহাস এবং বর্তমান স্বাধীন ভারতের জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিচয় দেবার ভার ছিল আমার; বিশেষ ক'রে সেই সব দ্বীপবাসীদের কাছে যাদের সংস্কারে সমাজে ভারতীয় সম্পর্ক আজো ঘনিষ্ঠ। কখনো ভাবি নি শুধু ইণ্ডিয়ান নয়, আমেরিণ্ডিয়ান ভাই-ভগ্নীর খোঁজে ব্রিটিশ গিয়ানার গহনে প্রবেশ করতে পারব। একই অপরাহ্নে ব্রেজিলের সীমান্ত পেরিয়ে ওড়া-জাহাজ থেকে দেখলাম পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু জলপ্রপাত, কাইট্যুর Kaiteur ফল্‌স্— মানবহীন আদিম ঘন অরণ্যে প্রকৃতির অশ্রান্ত জলধারা তুমুল গর্জনে শাদা হয়ে উঠছে, ফেনায় ছড়িয়ে যাচ্ছে আবর্তিত খরধার নদী। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে যখন সলজ্জ বিশ্বাসের নির্মল প্রতীতিময় আমেরিণ্ডিয়ান পল্লী-সংসারে নামলাম, ছোটো শিশু এগিয়ে এল হাসিমুখে, তখন মনে হল আমার ভ্রমণতীর্থ একটি সমে পৌঁচেছে। এরাই ক্যারিব দ্বীপাবলী, ল্যাটিন আমেরিকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা অঞ্চলের অধিবাসী। এরা না হোক, এদেরই বংশগত এবং জাতি ও সংস্কারসভ্যতার সব চেয়ে কাছাকাছি মানুষেরা ছিল পৃথিবীর এই অঞ্চল জুড়ে। তাদের আজ ঘন বনে, মরুময় ক্যানিয়ন্ বা খোয়াই রাজ্যে খুঁজে বার করতে হয়। দ্বীপে দ্বীপে তাদের হত্যা করা হয়েছে। এর পিছনে যে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন বা প্রকট তার বর্ণনা এখানে করব না। কেবল ব'লে রাখি গর্বিত আদি আর্যেরা ভারতবর্ষে তুল্য পাপ হতে মুক্ত নয়। মার্কিন দেশে কল্যাণের ধারা "আদি-মার্কিন"দের দিকে ফিরেছে; তা আমেরিকায় নানা ভ্রমণে লক্ষ্য করেছি। ক্যারিবিয়ন্ দেশে এবং ল্যাটিন আমেরিকার তীর-তীর্থে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান্ পথিক জানিয়ে গেলাম আমেরিণ্ডিয়ানকে আমাদের শ্রদ্ধাবেদনার অভিনন্দন। কলম্বাসের ভুলে এই অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান নামের অপপ্রয়োগ ঘটেছে, কিন্তু এর ফলে যদি ভারতীয়ের সঙ্গে দূরের ভাইয়ের নূতন যোগ হয় তাহলে কল্যাণ। ক্যারিব দ্বীপাবলীর ভ্রমণে এদের সঙ্গে মিলন না ঘটলে তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ হত না; ভারতবর্ষ যে সর্বমানবিকতার দুরূহ পরীক্ষায় নিযুক্ত তার পরিচয় ভ্রষ্ট হত। ক্যারিবিয়ানে পশ্চিমদেশীয় নানা জাতির লোক, আফ্রিকার বিবিধ অঞ্চলের নরনারী, ভারতীয় চীন আরবিক সীরিয় ইহুদি সম্প্রদায় একত্র ভাগ্য-পরীক্ষায় মিলেছে। কাউকে বাদ দিয়ে মানরক্ষা শান্তিরক্ষা হবে না। হিন্দু মুসলমান ভারতের বাহিরে সেখানে সহজাত ঐক্যের সন্ধানী, যথার্থ ক্রিশ্চান শিক্ষক ব্রতচারী সেই সহযোগিতায় সমধর্মী। ক্যারিবিয়নের দ্বীপে নূতন দীপালির সূচনা দেখে এসেছি। সব আলো জ্বলে নি। কিন্তু যেখানে যন্ত্রণার ইতিহাস দীর্ঘ ছায়া

ফেলে আজো আখের ক্ষেতে, মদের কারখানায়, ধানের মাঠে জলায় মানুষের উত্তর খুঁজছে সেই পরিবেশে একটি নূতন প্রদীপ জললে অনেকখানি আশ্বাস পাওয়া যায়। দুরূহ সেবার উৎসবে ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞানী শিল্পী সাধকেরা গিয়ানায় ট্রিনিডাডে সুরীনামে নূতন কালের আহ্বানে যোগ দেবেন না কি? অন্যদেশীয়, অন্য রাষ্ট্রের অন্তবর্তী জনসমাজের সঙ্গে মঙ্গলকর্মে মিলিত হবার অধিকার সকলের। ভারতবর্ষ অনেক দূরে, কিন্তু কাছে-আসা মানুষের যুগে তার দায়িত্ব কম নয়। বস্টনে ফিরে এসে এই চিঠি পাঠাই।

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

জর্জ বার্নার্ড শ

১৮৫৬ - ১৯৫৬

শ্রীসরোজ আচার্য

THE DEVIL. The truth is, you have—I won't say no heart; for we all know that beneath all your affected cynicism you have a warm one.

Man and Superman.

CLEOPATRA. No, no; it is not that I am so clever, but that the others are so stupid.
POTHINUS. [Musingly] Truly, that is the great secret.

Caesar and Cleopatra.

আগের কথা পরে। জর্জ বার্নার্ড শ-র অসামান্য প্রতিভা এবং শিল্পসাফল্যের কথা পরে হবে। যে প্রশ্ন উঠেছে অনেকের মনে এদেশে এবং বিদেশে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, সে হল তাঁর সাহিত্য-কীর্তির স্থায়িত্ব নিয়ে। রাষ্ট্রনেতার চেয়েও সাহিত্যিক শিল্পী দার্শনিক গুণীদের পরীক্ষা বড়ো কঠিন— এক হল সমসাময়িক কালের বিচারে উত্তীর্ণ হওয়ার পরীক্ষা; আর একটি হল চিরকালের অথবা ভাবীকালের দরবারে আসন পাওয়ার। ভাবীকাল অর্থাৎ 'পস্টারিটি' কি ভাববে, অনুভব করবে, কি বলবে, তা নিয়ে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই কিছু দুর্বলতা আছে। অতীতের বহু মহৎ শিল্পকীর্তি অনেক শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে চিত্তলোকে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে; সেইসব চিরায়ত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার দিকে তাকিয়ে স্বভাবতঃই আমাদের মনে হয়, আমরা যাঁদের ভালোবেসেছি, যাঁদের লেখায় বচনে ও কাজে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, ভাবীকালে তাঁদের স্থান কোথায় হবে? 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'র প্রশ্ন কেবল রবীন্দ্রনাথের মনেই জাগে নি; সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগী সকলেরই মনে কখনো না কখনো স্পষ্ট অথবা অর্ধস্ফুটভাবে এই প্রশ্নের গুঞ্জরন ওঠে। বার্নার্ড শ সম্বন্ধেও এরকম প্রশ্ন উঠেছে; যেমন কবি য়েট্সের স্থায়িত্ব নিয়ে আলোচনা কিছুকাল পূর্বে প্রখর হয়েছিল।

শ-র শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'ভিকি'র কার্টুনে শ বসে আছেন উর্ধ্বলোকে; নীচে পৃথিবী বিদীর্ণ হচ্ছে পারমাণবিক বোমার আঘাতে, আর শ তাঁর বিখ্যাত 'মেফিস্টোফিলিস' ধাঁচের হাসি-হাসি মুখে যেন বলছেন, 'ওরাই আবার জিজ্ঞাসা করছে আমি টিঁকে থাকব কি না— And they are asking whether I shall survive.' অবশ্য ওরা অর্থাৎ সাহিত্যানুরাগীরা শ-র স্থায়িত্বের প্রশ্ন আর পৃথিবীর পারমাণবিক বিলুপ্তির আশঙ্কাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখছে না। দেখলে হয়ত শ-প্রতিভার উপরে সুবিচার করা সম্ভব হত। কারণ গত এক শ বৎসরের মধ্যে তিনপুরুষকাল ধরে যদি কোনো ব্যক্তি প্রাচীনকালের

'প্রফেট'দের মতো মূঢ়তার বিরুদ্ধে, মহতী বিনষ্টির বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সাবধানবাণী শুনিয়ে থাকেন তবে তিনি আর কেউ নন, একমাত্র জর্জ বার্নার্ড শ। তবু এ ঠিক উত্তর হল না শ-র স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের প্রশ্ন নিয়ে। এই প্রশ্ন অবশ্য একেবারে নতুন নয়, যদিও শ-র শতবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন করে এ নিয়ে কিছু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে।

'দি শেভিয়ান' *The Shavian* পত্রিকা ক্ষুব্ধ হয়েছেন খাস ব্রিটেনে শ-র প্রতি উদাসীনতা দেখে; মন্তব্য করেছেন, 'য়োরোপের নানা স্থানে, মস্কো এবং এমনকি সুদূর পিকিংএ পর্যন্ত শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে [ভারতেও কলকাতা এবং দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে]; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেমনটি হয়, সেইরকম শেভীয় উৎসাহে ভরপুর। কিন্তু ব্রিটেনে 'ওল্ড ভিক'এর শ-অভিনয়ের পালা এবং আরো দু-চারটি অনুষ্ঠান ছাড়া যা হচ্ছে সে হল, শ-র উইল নিয়ে মামলা, তাঁর গ্রন্থস্বত্বের উপরে ট্যাক্স বৃদ্ধি, তাঁর সর্বশেষতম নাটিকাখানির প্রকাশ নিষিদ্ধ করা এবং *Pygmalion* ও *Major Barbara* ফিল্ম দুখানির প্রদর্শন বন্ধ করা।' বার্নার্ড শ 'স্মারক ভাণ্ডার'-এর উদ্যোক্তারা আবেদন জানিয়েছিলেন আড়াই লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহের জন্য; পাওয়া গেছে মাত্র ৪০৭ পাউণ্ড। দরিদ্র হলেও, নানা কারণে উদ্যোগ ব্যাহত হলেও, ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির জন্য এর চেয়ে অনেক বেশি করতে পেরেছে। এসবই হয়তো আনুষঙ্গিক ব্যাপার। শ-র প্রখর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ, তাঁর অনুরাগী লেখক চিন্তাজীবী শিল্পীর সংখ্যা ব্রিটেনেও এখনও নগণ্য নয়। বি. বি. সি. 'থার্ড প্রোগ্রামে' এবং টেলিভিসনে *Back to Methuselah* ও *The Devil's Disciple* অভিনীত হয়েছে শতবার্ষিকী উপলক্ষে; ডেম সিবিল থর্নডাইক তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের এক গৌরবময় মুহূর্ত ফিরিয়ে এনেছিলেন বার্নার্ড শ-র স্মরণে, বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে গির্জায় Saint Joanএর মর্মস্পর্শী বক্তৃতাটি আবৃত্তি করে। শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রান্সে St. Maloতে *Caesar and Cleopatra* অভিনীত হয়; বিরাট ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে প্রাচীন চরিত্রের সঙ্গে শেভীয় হাস্যরস এবং বাক্যছটার সংমিশ্রণ ফরাসী এবং ইংরেজ দর্শকেরা ভালোমতই উপভোগ করেন।

এসব সত্ত্বেও শ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইংরেজ সমালোচকেরা শ-প্রতিভার স্থায়ী আবেদন এবং চিরায়ত গুণ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোনো একজন সমালোচক আশা দিয়েছেন, একপুরুষ পরে তরুণ লেখকেরা *Back to Methuselah* থেকে প্রেরণা সংগ্রহে উৎসুক হবেন। হয়তো এই মন্তব্যের মধ্যে সমসাময়িক কালের প্রতি কিছু শ্লেষ আছে। আমাদের এই যুগ আবেগজর্জর, প্রবৃত্তিতাড়িত, সমস্যা-পীড়ায় দিশাহীন, প্রায় আশাহীনও। *Back to Methuselah*-র শেভীয় কল্পলোকে সব আসক্তি ও বাসনার সমাপ্তি; সেখানে কেবল বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল সুদীর্ঘ জীবন ধরে নিরাসক্তির সাধনা। শ নিজে পৌঁচেছিলেন প্রায় সেই পরম প্রশান্তির স্বর্গে; তাঁর আয়ুষ্কাল শতাব্দীপূর্তির মাত্র ছ বৎসর পূর্বে হোঁচট খেয়ে অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেলেও জীবনের প্রান্তিক সময়ে তিনি Methuselahর জ্ঞানবৃদ্ধের মতোই হয়েছিলেন আবেগহীন বুদ্ধির নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। তাই তাঁর সাফল্যের পরিচয়, পরাজয়েরও। পরাজয় নিশ্চয়ই, নতুবা মৃত্যুর মাত্র ছ বৎসর পরে শ-র স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠত না। পরাজয়, কারণ শ বেঁচেছিলেন সুদীর্ঘকাল, তাঁর ব্যক্তিত্বের অসামান্য দীপ্তিতে, ক্ষিপ্রতায় মুগ্ধ করেছিলেন তিন পুরুষ ধরে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, চিন্তানায়কদের। তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে। কোনো কোনো সমালোচক হয়তো ঠিকই বলেছেন, এর জন্য ত্রুটি শ-র নয়।

প্রথমতঃ তিনি ছিলেন বিরাট প্রতিভাধর ; এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধের আর যত শক্তিই থাক্‌-না কেন, কোনো বিরাট প্রতিভাকে বহন করা তার সাধ্যাতীত। বিরাট আদর্শ সংকল্প ও প্রয়াসের যুগ শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে, আর সে যুগের সমাপ্তি হয় বোধ হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। শ-প্রতিভার বিকাশ ও বিরাট সাফল্য মোটামুটিভাবে এই যুগটির মধ্যে সীমাবদ্ধ— ১৮৮০ থেকে ১৮৮৩ হল শ-র সাহিত্যিক শিক্ষানবীশী ; ১৮৮৪ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রে প্রথম পাঠ, লণ্ডনের বস্তিতে পার্কে সভাসমিতিতে এবং সিডনি ও বিট্রিস ওয়েব প্রমুখ ফেবিয়ান সুহৃদদের সাহচর্যে ; তার পরে ১৮৯৩এ *Widowers' Houses* থেকে ১৯২৪এ *Saint Joan* পর্যন্ত অন্তত ৩৭খানি নাটকে জি. বি. এস.-এর প্রতিভাদীপ্ত ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা। *Saint Joan* এর পরও শ-র অশ্রান্ত লেখনী ও অপূর্ব উদ্ভাবন-ক্ষমতা ক্ষান্ত হয় নি। *The Apple Cart* (১৯৩০)-এর প্রাণোচ্ছল হাস্যরসাশ্রিত কমেডি তারুণ্যের, তর্ক ও যুক্তির সুনিপুণ আঘাত-প্রতিঘাতের উদ্দীপনায় বিদ্যুৎময় গতিশীল। *Too True to be Good* (১৯৩৪), *On the Rocks* (১৯৩৪), *Geneva* (১৯৩৯)-তেও জি. বি. এস.-এর অগ্নিবাণ লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ। তবে শেষ যুগের এই জি. বি. এস. বড়ো বেশি পরিচিত ; তাঁর বক্তব্য, বাচনভঙ্গী, নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানের কৌশল সবই যেন প্রায় জানা হয়ে গেছে। নতুন কেবল সমসাময়িক সমস্যাগুলির নাটকীয় প্রতিফলন— গণতন্ত্রের সমস্যা ও সংকট, রাষ্ট্রপরিচালনায় বলপ্রয়োগের নীতিগত সার্থকতা, য়োরোপীয় রাজনীতিতে শক্তি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব। এর কোনোটিই জি. বি. এস.-এর প্রখর দৃষ্টি এড়ায় নি ; জি. বি. এস.-এর মুখর ভাষণ ও ভাষ্যে অদ্ভুতভাবে এগুলির নানা অসংগতি ও প্রতারণা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, ভাব-সংঘাত সৃষ্টি করেছে। জি. বি এস. পেয়েছেন নাটকীয় সাফল্য, ব্যর্থ হয়েছেন জর্জ বার্নার্ড শ।

শ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সমালোচকেরা শেষ পর্যন্ত এই সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, অর্ধ শতাব্দী পরে য়োরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক-কতিপয়ের মধ্যে শ নিঃসন্দেহে স্থান পাবেন। সাহিত্যের মামুলি বিচারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে সেক্সপীয়রের পরেই বার্নার্ড শ-র স্থান। কন্‌গ্রীভ, শেরিডান, অস্কার ওয়াইল্ড প্রত্যেকেই নাট্যকার হিসাবে কিছু-না-কিছু কৃতিত্বের অধিকারী। কেউই কিন্তু বানার্ড শ-র সমকক্ষ নন নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্রসৃষ্টির বৈচিত্র্যে ; সংলাপের তীব্র তীক্ষ্ণ বৈদ্যুতিক স্ফুরণে ও ক্ষিপ্রতায়। ইংরেজি সাহিত্যের ঋণ আয়ারল্যাণ্ডের কাছে নিতান্ত কম নয়। তখনকার কালে রাজনৈতিক মর্যাদায় খাটো হলেও আইরিশদের কাছ থেকেই ইংল্যাণ্ড পেয়েছে এড্‌মণ্ড বার্ক এবং গোল্ডস্মিথকে, সুইফ্‌ট্‌, শেরিডান অস্কার ওয়াইল্ড এবং বার্নার্ড শ-কে। আয়ারল্যাণ্ডের যে ভাগ্যতাড়িত তরুণটি জমিদারী সেরেস্তায় লোভনীয় খাজাঞ্চিগিরির চাকরি ছেড়ে ভিক্টোরিয়ার ইংলণ্ডে এসেছিলেন ১৮৭৬এ, তাঁর অন্য কিছু সম্বল না থাক্‌, ছিল ছাই-চাপা প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ আর অদম্য আত্মবিশ্বাস। 'লণ্ডনকে কিছু শেখাতে হবে' (to educate London) এবং ইংরেজি সাহিত্যের রাজা হতে হবে, এই ছিল তরুণ বার্নার্ড শ-র সংকল্প। শ-প্রতিভার চিরস্থায়িত্বের প্রশ্ন বাদ দিয়েও তাঁর শতবার্ষিকীতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর দুটি সংকল্পেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, অনায়াসে অবশ্য নয়, দুস্তর সংগ্রাম করে। লণ্ডনকে শুধু নয়, সারা পৃথিবীকেই তিনি কিছু শিখিয়েছেন, ইংরেজি সাহিত্যের রাজতিলকও তিনি পেয়েছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম অর্ধে হার্ডি, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, ওয়েল্‌স্‌, বেনেট, য়েট্‌স্‌, ব্রিজেস প্রভৃতি সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠদের মধ্যমণি ছিলেন বার্নার্ড শ। আর ইংরেজি ভাষার রচনাশৈলীতে শেভীয় দ্রুত কথনভঙ্গী, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, তিরস্কারের সহস্রধার দীপ্তি ও স্বচ্ছতা যে

জর্জ বার্নার্ড শ

শিল্পী পিকভ

নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে তা অনন্যসাধারণ, তার অনুকরণ প্রায় সাধ্যাতীত। শ-র নাটকের সংলাপ হল ক্ষিপ্র-গতি, মুক্তছন্দ, ধ্রুপদী তালের ; সাধারণ, অসাধারণ সব চরিত্রই সমান বাক্‌পটু, নাটকীয় ভাবে অমিত-ভাষী, প্রগল্‌ভ ; অথচ প্রত্যেকটি কথাই সুমিত, প্রসঙ্গ থেকে আলগা নয়, কখনো অনর্গল তর্কের খরস্রোতে প্রবহ-মান, কখনো বা একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত উক্তিতে বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। তাঁর নাটকের ভূমিকার রচনাশৈলীতে প্রসাদগুণ কতকটা অন্যরকম, এখানেও ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি, তবে যুক্তি আরো দৃঢ়সংবদ্ধ, নাটকের বিদূষক-স্রষ্টা তাঁর ভূমিকায় দার্শনিক তর্কযোদ্ধা এবং প্রচারক। লণ্ডনকে তথা পৃথিবীকে কিছু শেখাবার সংকল্প শ কখনো ভোলেন নি। তবে শ-র নাটকের দীর্ঘ ভূমিকা সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকে তাঁর প্রতি কিছু অবিচারও হয়েছে। অনেকের মতে শ তাঁর তত্ত্ব এবং বক্তব্য ভূমিকায় লিখেছেন প্রথমে এবং পরে তা প্রতিপাদনের জন্য নাটকের আশ্রয় নিয়েছেন এবং সেজন্য তাঁর সব নাটক ও নাটকীয় চরিত্রই তাঁর নিজস্ব মতের প্রতিধ্বনি মাত্র। প্রকৃত-পক্ষে শ প্রথমে নাটকই লিখেছেন, ভূমিকার কথা চিন্তাই করেন নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই নাটক অভিনীত হওয়ার অনেক পরে তার ভূমিকা সংযোগ করেছেন।

শেভীয় নাটক যে রসোত্তীর্ণ, অভিনয়সাফল্য তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কালোত্তীর্ণ কি না এই প্রশ্ন ঠিক স্বাভাবিক ভাবে উত্থাপিত হয় নি। প্রশ্ন যে উঠেছে তার একটি কারণ জর্জ বার্নার্ড শ ছিলেন জি. বি. এস. -এর চেয়ে অনেক মহৎ ও বৃহৎ। জি. বি. এস. হল জর্জ বার্নার্ড শ-র নাটকীয় পরিচ্ছদ। সেই পরিচ্ছদ অবশ্য কালক্রমে জর্জ বার্নার্ড শ-র শরীরে এমনই এঁটে বসেছিল যে, অনেক সময়েই শ-র সুস্থ মানবিক স্বরূপটি হারিয়ে যেত জি. বি. এস.-এর বেপরোয়া ভাঁড়ামি, অতিশয়োক্তি এবং নানা বিপরীতকথনের হতবুদ্ধিকর প্রকাশের মধ্যে। জি. বি. এস. এবং বার্নার্ড শ একই ব্যক্তি হলেও একাত্ম নন, একার্থক নন। জি. বি. এস.-এর প্রগল্‌ভতা কখনো কখনো অসহনীয় হয়েছে, কেবলমাত্র আমোদ পাওয়া এবং দেওয়ার উদ্দেশ্যে জি. বি. এস.-কে বুদ্ধির ফুলঝুরি ছড়াবার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন বার্নার্ড শ, আর সেজন্য তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সাধারণ লোকে মনে করেছে তাঁকে সুচতুর আত্মম্ভরি নাম-কা-ওয়াস্তে ক্লাউন। লর্ড রাসেলের মতো ব্যক্তিও তাঁকে বলেছেন, 'অসাধারণ চতুর কিন্তু বিজ্ঞ নয়—Immeasurably clever but not wise'। ডেস্‌মণ্ড ম্যাকার্থির মতো অনুরাগী সমালোচক বলেছেন, শ-র মনোজগতে অসংখ্য স্বচ্ছ চিন্তার হুড়োহুড়ি, মহা বিশৃঙ্খলা—'chaos of clear ideas'। আমরা দূর থেকে যে বার্নার্ড শ-কে জানি তিনি হলেন তিন পুরুষের কিম্বদন্তী অথবা পৌরাণিক কাহিনী-চরিত্র— জ্ঞান-তপস্বী, বিদূষক-দার্শনিক এবং সমাজপ্রগতির শিল্পী-যোদ্ধা। আমাদের কল্পিত এই বার্নার্ড শ কিছুটা সত্য, আর কিছু পরিমাণে খ্যাতিমাহাত্ম্যে অতিরঞ্জিত। যেটুকু সত্য সে হল শ-র অনাড়ম্বর তপস্বীসুলভ জীবন, নির্ভীক ব্যক্তিত্ব এবং অপ্রিয় সত্য কথনের ক্ষমতা। এই বার্নার্ড শ-র তিরোধানে তাঁর নাটকীয় জি. বি. এস. জীর্ণ পরিচ্ছদের মতো কতকটা অনাদৃত হবেই তাতে সন্দেহ কি ? সেক্সপীয়রকে মনে করার দরকার হয় না সেক্সপীয়রের নাটকের রসাস্বাদনে। এদিকে ভল্‌টেয়ার, ডাক্তার জন্‌সন্‌ এবং বার্নার্ড শ-র ব্যক্তিত্বই প্রধান আকর্ষণ, এঁরা কি লিখেছেন তা না জেনে, না পড়েও এঁদের অস্তিত্বের প্রবল পরিচয় এবং ঐতিহাসিক বিস্তৃতি অনুভব করা যায়। শ-প্রতিভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কেবলমাত্র এইটুকু সান্ত্বনার আশ্রয় নিলেও কিন্তু শ-র প্রতি অবিচার করা হবে।

বার্নার্ড শ অথবা জি. বি. এস. কেউই শুদ্ধমাত্র দায়িত্বহীন 'ক্লাউন' ছিলেন না। পরিহাস হল শেভীয়

প্রতিভা প্রকাশের আধার, সে আধারও শেভীয় শিল্পকৌশলে অনন্যসাধারণ গড়ন নিয়েছে। বোধ হয় বার্ক কোনো এক জায়গায় বলেছেন, 'যে খাবার পাঁজরে এঁটে যায় সেরকম খাবারই ইংরেজরা পছন্দ করে— 'The English like the food that sticks to the ribs'। আইরিশ বার্নার্ড শ সেইমতোই ইংরেজের জন্য তাঁর নাটকীয় ভোজ্যবস্তু তৈরি করেছিলেন। আরো একটি কারণ হয়তো আছে। ফেবিয়ান পিতামহ শ-র ব্রত হল, বুদ্ধি এবং যুক্তির নিপুণ প্রয়োগে মানুষের মনে চিন্তার বিপ্লব ঘটাতে হবে এবং সংঘর্ষ ও রক্তপাত বিনা সমাজের আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। শেষ জীবনে শ এই পদ্ধতির উপরে অনেকখানি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের চেয়ে ডিক্টেটরশিপের প্রতি তাঁর ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। অনেক সময়ে তিনি ডিক্টেটরদের প্রশংসায় আতিশয্য দেখিয়েছেন। এর কারণ অবশ্য প্রতিভার খামখেয়ালী মাত্র নয়। অসংখ্য পরস্পরবিরোধী আইডিয়ার আকর্ষণে ধাবমান হওয়া শেভীয় প্রতিভার স্বভাবধর্ম, তার পরিচয় তাঁর নাটকগুলির আইডিয়া-গত দ্বন্দ্বসংঘাতে হঠাৎ উল্টোপাল্টা পরিণতিতে। অধিকাংশ শেভীয় নাটকে ঘটনার সুপরিচ্ছন্ন কোনো ছক পাওয়াই দুষ্কর; শেখভের নাটকে যেমন ঘটনা ও চরিত্র-সমাবেশের জটিলতা, শ-র নাটকে তা নেই; সেক্সপীয়রের যেমন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিকাশের ধারা, তারও চিহ্ন সামান্যই শ-র আইডিয়া-আশ্রিত 'হাই কমেডি'তে। সোক্রেটিস নিশ্চয়ই নাট্যকার ছিলেন না, তবু তাঁর দার্শনিক কথোপকথনে নাটকীয় রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। সোক্রেটিসের কথোপকথন বিশ্বসাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছে। বার্নার্ড-শ-কে বিংশশতাব্দীর সোক্রেটিস বললে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে; তবে শেভীয় নাট্যপ্রতিভা সোক্রেটিক-গুণসম্পন্ন এবং সেইজন্যই শ-র শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির চিরস্থায়ী আবেদন নষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। *Man and Superman* (1903), *Back to Methuselah* (1921), *Saint Joan, Candida* (1898), *Major Barbara* (1907), *You Never Can Tell* (1898), *Pygmalion* (1916) ও *Caesar and Cleopatra* (1901) যেসব আইডিয়া আশ্রয় করে গড়া হয়েছে সেগুলি প্রায় সবই মানব-জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সংযুক্ত। শেক্সপীয়রের কিং লীয়র, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, মার্চেণ্ট অফ্ ভিনিস এবং অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর ঘটনা এবং চরিত্রাবলী আধুনিক জগতের সঙ্গে আদৌ মেলানো যায় না; তবু এই নাটকগুলির গঠনসৌন্দর্য, চরিত্র এবং ঘটনাসংঘাতের মূল মানবিক রূপটির আবেদন এখনো জীবন্ত। শ-র শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা। যে আইডিয়া *Man and Superman*-এ অ্যান এবং ট্যানারকে আশ্রয় করে জীবনসৃজনশক্তির লীলারহস্য প্রকাশ করছে, *Candida*-য় 'চিরন্তন ত্রিভুজটি'র যে পরিহাসোজ্জ্বল নব আবির্ভাব, মানবসভ্যতার পরিণাম নিয়ে যে সুদূরপ্রসারী কল্পনা *Back to Methuhselah*-তে বিধৃত, সেগুলির মানবিক আবেদন ও যুগপরম্পরায় সজীবতা হারাবে না আশা করা যায়। শেভীয় নাটক মাত্রেই সাময়িক সমস্যা-মূলক নয়। *Pygmalion, You Never Con Tell* অথবা *Arms and the Man* (1898)-এর অনাবিল হাস্যরস, রোমান্টিকতা এবং বাস্তবতার ঘাতপ্রতিঘাত, এসবই সাহিত্যের চিরন্তন গুণসম্পন্ন। তবু পঁচিশ বৎসর পূর্বে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস শেভীয় নাটকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস অবশ্য দৃঢ়ভাবে নিজস্ব দুঃসাহসিক মত ঘোষণা করায় জি. বি. এস.-এর কাছ থেকেই গুরুমারা বিদ্যা শিখেছিলেন। চমৎকার চাঞ্চল্যজনক শোনায় তাই হ্যারিসের একক ঘোষণা— পঞ্চাশ বৎসর পরেও লোকে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া পড়বে, শ-র নাটক পড়বে না কেউ, শ-কে জানবে লোকে কেবলমাত্র রোঁদার গড়া

অপরিচিত কোনো ব্যক্তির আবক্ষমূর্তি রূপে। হ্যারিসই বলেছিলেন, 'শ টিঁকবেন না; তাঁর দু-একখানা নাটক শেরিডান, কন্‌গ্রীভ, অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকের পাশে জায়গা পেতে পারে, উপরে নয়। ইব্‌সেন যেমন আজ অচল হয়ে গেছেন, শ-ও তেমনি মারা যাওয়ার পর কুড়ি বৎসরের মধ্যে অচল হয়ে যাবেন।' ইব্‌সেনের কাছে শ ঋণী হলেও, শেভীয় নাটক ইব্‌সেনীয় আদর্শ এবং পদ্ধতি অন্ধভাবে অনুকরণ করে নি। কেবলমাত্র সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটকসৃষ্টি করলে সে নাটক কালক্রমে নীরস নিষ্প্রাণ দলিলের টুকরো হয়ে দাঁড়ায়, সে কথা শ ভালোমতোই জানতেন। *Man and Superman, Back to Methuselah, Saint Joan, Caesar and Cleopatra* সমসাময়িক চেতনার স্বাক্ষর বহন করলেও এই শেভীয় কমেডি সেক্সপীয়রের রোমান্টিক কমেডির মতোই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ এবং এই জগতের শেভীয় চরিত্রগুলি রোজালিণ্ড, অর্লাণ্ডো, বেনেডিক্, বিট্রিস, ম্যান্‌ভলিও, অলিভিয়ার মতোই অবিশ্বাস্য, তাই চিরজীবীও— চিরজীবী শ্রেষ্ঠ শেভীয় চরিত্রগুলির আইডিয়াগত স্পন্দন ও মুখরতা। কোন্ নাটক কালের ধারায় তার অস্তিত্ব হারাতে পারে তা শ নিজেই ভালোমতো জানতেন।

আইডিয়ার প্রতি অনুরাগ এবং দারিদ্র্যের দুর্গতির প্রতি চরম ঘৃণা ছিল জর্জ বার্নার্ড শ চরিত্রের মৌলিক ও মহৎ মানবিক প্রেরণা। দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণা তাঁকে বই পড়ে আয়ত্ত করতে হয় নি— বিত্তহীন বনেদী পরিবারের 'downstart' বার্নার্ড শ নিজের জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই জেনেছিলেন, দারিদ্র্যই হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো অপরাধ। ভল্‌টেয়ারের যেমন সংকল্প ছিল, 'দূর করো এই পাপ', Erase the infamy, শ-র তেমনি সংকল্প 'দূর করো দারিদ্র্য'। ধনতন্ত্রের ছলনা ও বিকার, মধ্যবিত্ত মানসের রোমান্টিক ভাবালুতা, ভিক্টোরীয় যুগের অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীলতা, সমাজের কর্তাব্যক্তিদের নীতিবাগীশ কপটাচার— এইসব জঞ্জাল থেকে মানুষের মনকে মোহমুক্ত করার কাজে প্রথম জীবনের বার্নার্ড শ হলেন রাজনৈতিক প্রচারক কর্মী ও সংগঠক; মধ্যজীবনে সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে নাটককে তিনি সামাজিক প্রগতির অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। শেভীয় কমেডির একটি অংশ তাই প্রচারধর্মী, চিন্তার জড়তা ও দাসত্ব থেকে মুক্তির মোহমুদ্গর। *The Widowers' Houses* এবং *Mrs. Warren's Profession* (1898) অবশ্যই উদ্দেশ্য-মূলক নাটক; বস্তি এবং গণিকালয় চালিয়ে শতকরা ৩৫ পার্সেন্ট মুনফা নিয়ে সমাজের উপরতলায় সভ্যভব্য থাকা যায়, পরিবারের পবিত্রতা, স্বদেশপ্রেম, দানধর্ম সবই অনুশীলন করা যায় এবং এইসব ভালো জিনিস চর্চা করা যায় বলেই ধনতন্ত্রের উল্টো পিঠের বীভৎস রূপটা নজরে পড়ে না। সেই কথাটি চমকপ্রদ কায়দায় উল্টেপাল্টে নানা ঢঙে ও সুরে বলেছেন হেনরি জর্জ, মার্ক্স এবং জেভন্‌স্-এর মানস শিষ্য, ফেবিয়ান-গোষ্ঠীর পোষ-না-মানা মন্ত্রপ্রচারক বার্নার্ড শ। এই কথা বলার প্রয়োজন যখন ফুরোবে অথবা যদি ফুরিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই *The Widowers' Houses* এবং *Mrs. Warren's Profession*-এর মূল বক্তব্য পাঠক-দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করবে না। বস্তি এবং গণিকালয়, শতকরা ৩৫ পার্সেন্ট মুনফার উপরে, সভ্যতার চটক যখন নির্ভর করবে না তখন শ-র আজীবন সাধনার অনেকাংশ সার্থক হবে সন্দেহ নেই। শ নিজেই সে কথা বলে গেছেন তাঁর *The Widowers' Houses* নাটকখানির উদ্দেশ্য-প্রসঙ্গে: 'I heartily hope that the time will come when this play will be both utterly impossible, utterly unintelligible.' বস্তি এবং গণিকালয়ের ৩৫ পার্সেন্ট মুনফা ভোগ করার ভদ্র ব্যবস্থা এক সময়ে একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে, সমাজের মানুষের কাছে এই ব্যবস্থা একেবারে

ধারণাতীত দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে পারে। শ-র কাছে এরকম পরিবর্তনের সম্ভাবনা আনন্দেরই। ভিক্টোরীয় সমৃদ্ধির স্বর্ণলঙ্কায় নবাগত আইরিশ তরুণ বার্নার্ড শ এরকম মহৎ স্বাস্থ্যকর সামাজিক সম্ভাবনার চিহ্নমাত্র দেখতে পান নি। কেবল তিনি নন, দেখতে পান নি ডিজ্‌রেলি, যাঁর চোখে ধরা পড়েছিল 'মেরি ইংল্যাণ্ড' ভয়াবহভাবে দ্বিধাবিভক্ত, বিভক্ত দুই জাতিতে— এক হল ধনী, আর হল দরিদ্র। কার্লাইল দেখেছিলেন একই বৈষম্য, এবং সকল মানুষের মধ্যে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব -বোধের অভাব। কার্লাইলের চোখে ধরা পড়েছিল দুই শ্রেণী— এক হল 'ফুলবাবু', আর হল নিরানন্দ বিস্বাদ মেহনতের চাকায় বাঁধা জনসাধারণ—'Dandies and Drudges.' শ-র মানসপটে একই চিত্র খরতর হল হেনরি জর্জ এবং মার্ক্স অধ্যয়নের ফলে, শ্লেষময় ব্যঙ্গে বিচ্ছুরিত আলোকে উদ্ভাসিত হল তাঁর অনেক নাটকের সমাজদর্শন, ভাষ্য ও ভাষণ। গত পঞ্চাশ বৎসরে সমাজ-প্রগতির ফলে এইসব নাটকের সার্থকতা হ্রাস পেয়ে থাকতে পারে। অন্ততঃ কোনো কোনো সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, 'ওয়েল্‌ফেয়ার স্টেট'-এ বস্তি ও গণিকালয়, দারিদ্র্যের চরম দুর্গতির প্রতি শেভীয় আক্রমণের এখন কোনো সার্থকতা নেই। এ যদি সত্যও হয় তবে তার জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব শ-র প্রাপ্য। তবে ওয়েল্‌ফেয়ার স্টেট শ-র নাট্যসাহিত্য অর্থহীন করে ফেলেছে এতবড়ো দাবি করার সময় এখনো আসে নি। অন্ততঃ য়োরোপে ওয়েলফেয়ার স্টেট যে বনিয়াদের উপরে গড়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে তাতে শ-র ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে মনে হয়। *Major Barbara*-র অ্যাণ্ড্র আণ্ডারস্যাফ্‌ট্‌ সংকল্প করেছিলেন দারিদ্র্যের ঘৃণ্যতম পাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করবার। কামান বন্দুক বোমা বারুদের কারবারী আণ্ডারস্যাফ্‌টের সুসমাচার gospel হল, মানবমুক্তির জন্য চাই 'money and gun-powder ; freedom and power ; command of life and command of death.' আজকের য়োরোপের ওয়েল্‌ফেয়ার স্টেটের হর্তাকর্তা-বিধাতারা আণ্ডারস্যাফ্‌টেরই মন্ত্রশিষ্য।

জি. বি. এস. নিজে অবশ্য কোনো নতুন মন্ত্র রচনা করেন নি। তিনি বিশেষভাবে কোনো একটি তত্ত্ব বা মতকে আশ্রয় করেন নি। এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌-এর সঙ্গে শ-র মৌলিক পার্থক্য এই একটি— ওয়েল্‌স্‌ও সামাজিক বৈষম্য এবং অসংগতি সম্বন্ধে সচেতন, তবে তিনি কখনো অজস্র আইডিয়াকে খুশিমতো প্রমাণ এবং অপ্রমাণ করতে উৎসাহী হন নি। শ-র মধ্যে ছিল একটি অস্থির সুচতুর তর্কসন্ধানী মন, আর সে মন অর্ধশতাব্দীরও উপরে বহু বিচিত্র আইডিয়ার পিছনে ছুটেছিল শেভীয় 'দুষ্ট'বুদ্ধির তাড়নায়। তরুণ বয়সের শ থেকে পরিণত বয়সের জ্ঞানবৃদ্ধ বার্নার্ড শ তাঁর বুদ্ধিকে পরিচালনা করেছিলেন একই অপরিবর্তনীয় ধারায়। একমাত্র সমাজবাদের মূল আদর্শের উপরে ছাড়া আর কোনো মত-বিশ্বাসে বোধ হয় শ-র হৃদয়গত অনুরাগ ছিল না। অন্য সব আইডিয়াই তাঁর কাছে সমান আকর্ষণীয়, সমানভাবে বুদ্ধি ও ব্যঙ্গকৌশল প্রয়োগের সূত্রমাত্র। Peter Pan পিটার প্যান এবং Puck পাক্‌ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শ-চরিত্র প্রতি পর্বে পর্বে অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। মনোবিজ্ঞানী Jung ইয়ুঙ বোধ হয় বলেছিলেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি এবং সেগুলির জটিল যন্ত্রণা, ব্যাকুলতা, বিকাশ ও বিকার থেকে বার্নাড শ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। এলেন টেরির সঙ্গে প্রণয়লীলার অভিনয় তাই অভিনয়ই, অন্ততঃ শ-র দিকে ; পিটার প্যান ও পাক্‌ বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে শ-কে ধরা যাবে না প্রেমের ছলনায়। এর চেয়েও মারাত্মক অথচ অসামান্য বুদ্ধির চপলতা স্টানব্রুকের মঠকর্ত্রী সন্ন্যাসিনী-মাতার সঙ্গে শ-র ব্যবহারে। শ-র *Saint Joan* পড়ে সন্ন্যাসিনী-মাতা মুগ্ধ হয়েছিলেন, প্রতিদিন শ-র কল্যাণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন।

অতঃপর ঈশ্বর এবং স্টানব্রুকের সন্ন্যাসিনী-মাতা দুজনেই জানলেন শ-র চরিত্র স্বর্গীয় প্রার্থনার চেয়েও প্রবল; লেখা হল *Adventures of the Black Girl in Her Search for God* (1932)। শ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে দাবি করলেন ঈশ্বরই তাঁকে এই বই লিখবার প্রেরণা দিয়েছেন; বুদ্ধির শানিত অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন হয়েছে সব অলৌকিক মত-বিশ্বাস; তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও শেভীয় ব্যঙ্গ থেকে রক্ষা পায় নি। এ-হেন বুদ্ধিদর্পী প্রতিভাকে মত-বিশ্বাসের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা যায় না। তবে বুদ্ধিদর্পী হলেও শ নীরস নিভাঁজ যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ছিলেন বলা যায় না। জীবনসৃজনশক্তির রূপকারের কল্পনায় মরমী অনুভবের স্পর্শ নিশ্চয়ই ছিল—*Man and Superman, Back to Methuselah*-য় তার কাব্য-সুষমামণ্ডিত নিদর্শন অনেকই পাওয়া যায়। শ-র *Saint Joan* টি. এস. এলিয়ট-এর Becketএর চেয়ে বোধ হয় অনেক বেশি ভগবদনুভূতিতে ভরপুর।

সুইস দার্শনিক দেনিস্ রুজর্মঁ বলেছেন, গত পঞ্চাশ বৎসরের য়োরোপীয় সাহিত্য হল 'নাশকতামূলক', subversive; উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন ফ্রয়েড, জিদ্, প্রুস্ত প্রভৃতি চিন্তাজীবী সাহিত্যিক-শিল্পীদের নাম। বার্নাড শ-ও সাব্ভার্সিভ, কিন্তু আরো মহৎ ও বৃহৎ অর্থে। বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় তিনি মৌলিক কোনো তত্ত্ব অবতারণা করেন নি; মৌলিক হল তাঁর নির্ভীক বুদ্ধিগত আবেদন এবং নাটকীয়ভাবে সব বিশ্বসমস্যার সোক্রেটিক আলোচনা। তাঁর তর্ক এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ একাধারে সাব্ভারসিভ এবং ক্রিয়েটিভ, নাশকতামূলক ও সৃজনধর্মী। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে দায়িত্বহীনতার অভিযোগ এনেছে; জি. বি. এস.-এর অতিরঞ্জন, খেয়ালি-আতিশয্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তবে জি. বি. এস. এবং বার্নার্ড শ মূল সংকল্প সাধন সম্পর্কে কখনো দায়িত্বহীন নন; চেস্টারটন শ-র সমাজ-দর্শনের সমর্থক না হয়েও তাই বলতে পেরেছেন, শ-র দায়িত্ববোধে ইস্পাতের মতো টংকার—'his responsibility rings like steel'। শেষ জীবনে ডিক্টেটরশিপের প্রতি তাঁর অনুরাগ অনেককে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ করেছিল। শ ছিলেন যাকে বলা যায় সমাজবাদের জনসংযোগকারী, 'Public Relations Officer'; সমাজবাদ যখন লেবর পার্টির হাতে ম্যাক্ডোনাল্ডী মুরুব্বি-ভক্তির শরণ নিল তখন ফেবিয়ান পিতামহ শ-র লেখনী স্বভাবতঃই ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল। Applecart-এর আত্মম্ভরি কর্তাভজা কপট সমাজবাদী Boanarges হয়তো ম্যাক্ডোনাল্ডের ব্যঙ্গানুকৃতি, হয়তো পরবর্তীকালের আর্নস্ট্ বেভিনেরও। কাজেই ফেবিয়ান তৃতীয় পুরুষের সাবধানী হিসাবী বুদ্ধিজীবীরা ফেবিয়ান পিতামহের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এককালে শ-র *The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism* (1928) সমাজবাদকে জনপ্রিয় করেছিল; অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ সময়ে লেখা *Everybody's Political What's What* (1944) উপেক্ষিত হয়েছে, তার একটি কারণ এই গ্রন্থে ফেবিয়ান শ মার্ক্স এবং মার্ক্সবাদকে প্রবলভাবে সমর্থন করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে। শ তখন অতি মহামান্য ব্যক্তি, super V. I. P. হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, কাজেই তাঁর মতামতের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল হয় নি, কিন্তু চিন্তাজীবীরা সে মতামত গ্রহণও করেন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বার্নার্ড শ-র প্রখর উক্তি এবং যুক্তি বিশেষ কোনো সাড়া জাগায় নি, তার কারণ, য়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীরা সমাজবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, বিপ্লবের বিকৃত পরিণাম সম্বন্ধে নানা গভীর সংশয়ে পড়েছিলেন। 'ইউটোপিয়া' গড়ার বৈপ্লবিক উৎসাহে ভাঁটা পড়ায় জি. বি. এস. তথা বার্নার্ড শ-র সমাজদর্শন অনেকের কাছে অবাস্তব

মনে হয়েছে। শ-র খ্যাতি, প্রভাব ও বুদ্ধিগত আবেদন হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ এই। দ্বিতীয়-যুদ্ধোত্তর কালের প্রফেট আর বার্নাড শ নন ; অর্‌ওয়েল এবং কেস্‌লার হলেন সমসাময়িক কালের জনপ্রিয় প্রফেট। শ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ধনতন্ত্রের অসংগতি মূঢ়তা ও কপটাচারের বিরুদ্ধে ; অর্‌ওয়েল-কেস্‌লারের অভিযান হল সমাজবাদী বিকার ও অপচারের বিরুদ্ধে। মধ্যশতাব্দীর আধ্যাত্মিক সংকটের দোটানায় ফেবিয়ান পিতামহ শ লক্ষ্যভ্রষ্ট কক্ষচ্যুত হন নি বটে, তবে তার বিদ্রোহী-ব্যক্তিত্ব অনেকের কাছে নিষ্প্রভ মনে হয়েছে, মনে হয়েছে যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে শ-র চিন্তাধারার সংযোগ শিথিল হয়েছে। সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকা এবং অনর্গল কথা বলে যাওয়ার জন্য বড়ো প্রতিভাকেও বেশ কিছু জরিমানা দিতে হয়। শ-কেও দিতে হয়েছে। শেষ জীবনে শ তাই প্রায় নিঃসঙ্গ ; তাঁর অনেক কথাই হয় স্বগতোক্তি নয়তো পুনরুক্তি। হয়তো আগামীকালে তাঁর দুঃসাহসিক স্পষ্টভাষণ ও স্ব-বিরোধী প্রতিভা (অসংখ্য জি. বি. এস.-এর পরিহাসোজ্জ্বল পরস্পর-সংঘাত) নতুন পরিচয়ে সার্থকতা লাভ করবে। আমাদের কাছেও সেণ্ট বার্নার্ড তাঁর ব্যক্তিত্বে, জীবনশিল্পের সমারোহে, প্রাণশক্তির অজস্রতায় কম বিস্ময়কর, অর্থপূর্ণ নন। গুরু নয়, মন্ত্রদাতা নয়, সেণ্ট বার্নার্ডকে গৃহদেবতা হিসাবে গ্রহণ করাও কারো সাধ্য নয় ; শ হলেন মুক্তবুদ্ধির উদ্বোধক এ যুগের শেষ সর্বজনীন প্রতিভা। তাঁর জীবনই এক বৃহৎ মহৎ শিল্পকীর্তি, টল্‌স্টয় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর মতো। কোনো বাঁধাধরা বুলি, তত্ত্ববিশ্বাস অথবা সমস্যা-সমাধানের গুপ্ত মন্ত্রের জন্য বার্নার্ড শ-কে আশ্রয় করা কল্পনাতীত, অসম্ভব। প্রিস্ট্‌লে যাকে বলেছেন 'great cleansing winds of doctrine', সেই বিরাট প্রতিভাদীপ্ত বুদ্ধি ও মানবিক শুভচেতনার আবহাওয়ায় আমাদের ভাবনা-ধারণাকে নিরন্তর পরিশোধন করার প্রয়োজন এখনো আছে এবং থাকবেই। শ-র স্বচ্ছ বুদ্ধির অনুশীলন ও নির্ভীক প্রয়োগ সামাজিক এবং সাহিত্যিক ক্ষেত্রে করবার প্রয়োজন ভারতবর্ষে অন্ততঃ ফুরিয়ে যায় নি।

প্রাচীন মানুষের নূতন বিপদ

শ্রীপরিমল গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথ যে সময় 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' লিখেছিলেন, দেবতাদের বিপদ তার চেয়ে এখন অনেক গুণ বেশি বেড়ে গেছে। দেবতাদের অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। পৃথিবী-শাসনে তাঁদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দৈবনীতি এখন ধুলায় লুন্ঠিত।

দেবতারা ছিলেন অজ্ঞ। তাঁদের কমনসেন্সের অভাব ছিল। বিদ্যা বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁরা নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনায় সিন্‌সিয়ার ছিলেন। তাঁরা মানুষের বিশেষভাবে অনুগতদের শুভার্থী ছিলেন। ভুল তাঁরা অনেক করেছেন, কিন্তু তাতে মানুষের কোনো গুরু অসুবিধে হয় নি।

দৈব শাসনে মানুষ এক রকম শান্তিতেই ছিল, এবং বহুদিনের অভ্যাস এক-একটি বিষয়ে তারা এক-একটি বিশেষ ধারণা গঠন ক'রে তাকেই ধ্রুব মনে ক'রে মহানিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু আজ সে সব ধারণার মূলে আধুনিক 'সাধারণ জ্ঞান'-এর এমন এক-একটি ধাক্কা এসে লাগছে যে আজ প্রাচীনমানুষ সেদিনকার প্রাচীনদেবতাদের অপেক্ষাও অধিকতর বিপন্ন বোধ করছে।

আধুনিককালে আমাদের গৌরব এই যে, একালে জ্ঞানের পরিধি আমাদের বহুবিস্তৃত হয়েছে।

কথাটা খুবই ঠিক। এমন বিস্তৃত হয়েছে যে স্বয়ং সরস্বতী দেবী এর কূলকিনারা পাচ্ছেন না। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোনো এক ইঞ্চি জায়গা বাকি নেই যেখানকার কিছু-না-কিছু তথ্য মানুষ সংগ্রহ করে নি। একদিকে ইলেকট্রোনিক মাইক্রোস্কোপ, অন্যদিকে প্যালোমার মানমন্দিরের দুই শ ইঞ্চি প্রতিফলকযুক্ত সর্বাধুনিক টেলিস্কোপ। (এর মধ্যে দেবতাদের বাসস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা এ বিশ্ব ত্যাগ ক'রে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবেন)।

কিন্তু তথ্য-আবিষ্কারের ক্ষমতা তো শুধু এইসব বাইরের যন্ত্রে সীমাবদ্ধ নয়, আসল যন্ত্র রয়েছে মানুষের মগজে। সে যন্ত্রে বিশ্বের অনন্ত কোটি বিস্ময় এসে তাদের লিখন এঁকে যাচ্ছে। জ্ঞান এখন তাই বহু শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত। সামাজিক জীবনে শ্রেণীবিভাগ যত কমানো হচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগের সম্ভাবনা তত বাড়ছে— সম্ভাবনার ক্ষেত্র সীমাহীন। আগে যেমন বৃত্তি হিসেবে এক-একটি 'জাতি' তৈরি হয়েছিল, এখন জাতিভেদ তুলে দিয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং কাজের ক্ষেত্রে নতুন নতুন জাতি তৈরি হচ্ছে। না হয়ে উপায় নেই। বিশেষজ্ঞ না হলে কাজ চলে না। আর বিশেষজ্ঞ হতে হলে শিক্ষার গোড়া থেকেই শিক্ষার বিষয় ভাগ ক'রে দিতে হয়।

শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ধারণার উপর পর পর অনেক ধাক্কা লেগেছে, এখন আর আগের শিক্ষাকে চেনা যায় না। আগে প্রবেশিকা পাস ক'রে কলেজ। কলেজে আর্টস বা সায়েন্স। ধাপগুলো পর পর নির্দিষ্ট ছিল। সবার ছিল প্রায় এক ব্যবস্থা। অনেক ক্রটি ছিল তাতে, কিন্তু তার একটা নির্দিষ্ট চেহারা ছিল। বাংলাদেশে যাঁরা টাকাকড়ির হিসেব সামলে ধনীরূপে, অথবা শিক্ষা ও চিন্তা ক্ষেত্রে

মনীষীরূপে খ্যাত, তাঁরা সবাই ঐ একই শিক্ষা লাভ ক'রে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন ক'রে গেছেন। বিদ্যাসাগর বা রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেন জন্মশিক্ষক, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

কিন্তু এখন গোড়া থেকেই বিশেষজ্ঞ চাই। দেশে কর্মীর চাহিদা। উপায় নেই। বিশেষ শিক্ষার অধিকার লাভের জন্য প্রবেশিকা পাসই যথেষ্ট। কোনো রকমে একখানা সার্টিফিকেট। ছেলেরা গোড়া থেকেই জানে তাদের বেশি পড়তে হবে না, অতএব পড়েই না। তাই পরীক্ষার আসনে বসে টোকা ভিন্ন উপায় নেই। টুকে পরীক্ষা দেওয়া এখন সাধারণ রীতি, এতে কেউ অবাক হয় না। কেউ বা অপরের লেখা কণ্ঠস্থ ক'রে তাই লিখে দিয়ে আসে। প্রশ্নপত্রে বুদ্ধির উপর লেশমাত্র দাবি থাকলে ছেলেরা জোট পাকায়, পরীক্ষা-ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, অনেক সময় দলবৃদ্ধির জন্য অন্যান্য কেন্দ্রে গিয়ে হানা দেয়। এ সবই শিক্ষা ব্যবস্থার যুক্তিসংগত পরিণতি। ছেলেদের এতে খুব বেশি দোষ নেই।

তাই পরীক্ষার আদর্শ ক্রমেই নিচুতে নামানো হচ্ছে। পাস মার্কও আগের চেয়ে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটিও এ ব্যবস্থার যুক্তিসংগত পরিণাম। শিক্ষার মান নিচু করা এ যুগের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর শেষ শূন্যে গিয়ে দাঁড়াবে। হয়তো অবশেষে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তির মানই যথেষ্ট মনে করা হবে, এবং সেকেণ্ডারি এডুকেশন শিক্ষাক্ষেত্রে হবে নিতান্তই সেকেণ্ডারি ব্যাপার।

বাংলাদেশে শিক্ষার মান মধ্যম ছিল বরাবরই। কিন্তু তাতে পূর্বযুগোচিত কিঞ্চিৎ আন্তরিকতা ছিল ব'লে তখন পাইকেরি হারে পাসের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আজকের তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হত। আজকের শিক্ষায় সাধারণজ্ঞান নামক একটি বিভীষিকার আবির্ভাব ঘটাতে সে শিক্ষাটুকু চাপা পড়ে গেছে।

এই সাধারণজ্ঞানই হচ্ছে প্রাচীন মানুষের নূতন বিপদ, অর্থাৎ আগের যুগের শিক্ষায় শিক্ষিতদের।

একদিকে পরমাণুর জগৎ, আর-একদিকে 'কোটি ছায়াপথ মায়াপথ'। সাধারণ শিক্ষিত লোকের এ দুয়ের মধ্যবর্তী বিষয়ে একটি মোটামুটি ধারণা থাকলেই চলত। এখন চলে না। এখন হাজার রকম ন্যারফেস নলেজ চাই। এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এ বিষয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ককে রচনা লিখতে হয়, এবং শিখতে হয় হাইজীন, নইলে 'ব্যালান্সড' খাদ্য খেতে শেখে না, আলোহাওয়াযুক্ত পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকতে শেখে না। আসলে ভালো বাড়িতে থাকতেও ইচ্ছে হয়, ভালো খাদ্য খেতেও ইচ্ছে হয়, কিন্তু ইচ্ছে হলেই হাইজীন পড়ে। জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের এই বিচ্ছেদ ছেলেমেয়েদের এইভাবেই ঘটে। তারপর আধুনিক বিদ্যার হাওয়া গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণজ্ঞানের চিত্তাকর্ষক জগৎ।

এই সাধারণজ্ঞানই এখন লোকের চোখে সম্মানযোগ্য আধুনিক জ্ঞান এবং আধুনিক বিদ্যার আদর্শ। তা ভিন্ন এ বিদ্যার কোথায়ও শেষ নেই ব'লে, এবং পথ চলতি ছিঁড়ে ছিঁড়ে সাজি ভরা যায় ব'লে, এতে বেশ একটা মোহ আছে। চাকরি চাইতে গেলেও এখন ডিগ্রীধারীকেও সাধারণজ্ঞানের পরিচয় দিতে হয়। (জ্ঞানী ব্যক্তিমাত্রেই এই সাধারণজ্ঞানের পরীক্ষায় ফেল করবেন)।

পৃথিবীর কোন্ জিনিসটি সর্বোচ্চ; কোন্ জিনিসটি সর্বদীর্ঘ; পৃথিবীর কোন্ দেশের প্রেসিডেন্ট কে; কে কোন্ আবিষ্কার প্রথম করে; কে সাঁতার কাটতে প্রথম গায়ে চর্বি মাখে; কে প্রথম জলে ডুবে আত্মহত্যা করে; বা এই রকম সব অদ্ভুত অকেজো এবং স্থূলভ প্রশ্নোত্তরে সাধারণজ্ঞান গড়া। এই সাধারণজ্ঞানের সীমা সকল বিভাগে বিস্তৃত। প্রতি বিভাগের একটি বা দুটি কথা শিখলেই সাধারণ

জ্ঞানের দাবি মেটে। এ বিদ্যা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। প্রাচীন মানুষ বিস্মিত হয়ে ভাবে, কে জানত এমন জাহাজ-বোঝাই বিদ্যা ছেলেরা আয়ত্ত করবে!

আধুনিকতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে অন্যের সংগৃহীত উচ্ছিষ্ট উপকরণ নিয়ে এই জাতীয় বাড়াবাড়ি এ যুগের অপরিহার্য পরিণাম। পৃথিবীতে অদ্যাবধি বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার বা যান্ত্রিক উদ্ভাবন, যে কারণেই হোক, তার সবই প্রায় পাশ্চাত্ত্য দেশের। এই রকম মনোভাব এক দেশ থেকে আর-এক দেশের লোকের মধ্যে ছড়ানো যায় কি না জানি না, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য নিয়ে একবার উঠে পড়ে লাগলে হত। রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে সারাজীবন অরণ্যে রোদন ক'রে গেলেন। ইস্কুলের ছেলেরাও কি ভাবে অন্যের লেখা মুখস্থ না ক'রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নিজেরা কিছু দান রেখে যেতে পারে, এ পথেরও নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন। ছেলেরা সেই সব নির্দেশের নোট মুখস্থ ক'রে পরীক্ষা দেয়।

১৯২৩ সালে সম্ভবত অগস্ট মাসে, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন ঘটেছিল। সে সময় কথাপ্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলায় এম. এ. পড়া এবং পরীক্ষার রীতি সম্পর্কে আমার কাছে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। আমাকে বলতে হয়েছিল, শুধু বই পড়ে এবং নোট মুখস্থ ক'রে পাস করা যায়। তা শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ইস্কুলের পড়া আর এম. এ. পড়ার একই রীতি তিনি কল্পনা করতে পারেন না। মনে আছে খুব ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, 'চারুকে অনেকবার বলেছি এ কথা, কিন্তু তার হয় তো ক্ষমতা নেই।' তাঁর ইচ্ছে ছিল মৌলিক গবেষণাজাত জ্ঞানের পরিচয়ে তবে এম. এ. ডিগ্রী দেওয়া হোক।

সে কতদিনের কথা। আজ এম. এ. তে কি হয়েছে জানি না, তবে নিম্নশিক্ষা যে ক্রমে নিম্নতর হচ্ছে এ বিষয়ে এখন আর কারো দ্বিমত নেই।

একদা ইংরেজির কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল না প্রবেশিকা পরীক্ষায়। পরবর্তী কালে নামকরা সব ইংরেজি বই নির্দিষ্ট পাঠ্যরূপে ছাত্রের ঘাড়ে চেপেছে। তবু বলব তুলনায় আগের দিনেই ইংরেজি ভালো শিখত ছেলেরা। বহু পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হওয়াতে এখন আর ইংরেজি শিখতে হয় না, কিছু নোট মুখস্থ করলেই পাস করা যায়, এমন কি সরলতম একটি বাক্য লিখতে না শিখেও।

প্রাচীন মানুষ এদের ইংরেজি বুঝতে পারে না, বিপন্ন বোধ করে। সবই তো 'সাধারণজ্ঞান' থেকে। ভাষা শেখা আর কিছুতেই হয় না। না ইংরেজি, না বাংলা। বাঙালী শিশু বছর পাঁচেক বয়স পর্যন্ত বেশ বাংলা শেখে। তারপর ইস্কুলে যায় এবং ক্রমে বাংলা ভুলতে থাকে, এবং বেশি বয়সে একেবারেই ভুলে যায়। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে হাতে ব্যাকরণ দিলে গোড়াতেই সব চুকে যেত।

একটি ইংরেজ শিশু তিন বছর বয়সে ভাষায় যেটুকু নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, একজন বাঙালী ছাত্র পনেরো বছর ইংরেজি পড়েও সে ভাষায় নিজেকে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে না। ইংরেজির কথা ছেড়েই দিলাম। বাংলাভাষায় নির্ভুল লেখা, কই, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে (ইস্কুল কলেজের) তো আর দেখা যায় না। যাঁরা লেখক হতে চান তাঁদের মধ্যেও দুর্লভ। সাধারণজ্ঞান সব বিদ্যাকে গ্রাস করতে চলেছে। সাঁতার কাটতে কে প্রথম গায়ে চর্বি মেখেছিল, জ্ঞানের রাজ্যে তার স্থান সর্বোচ্চ।

পল্লবগ্রাহিতার যুগ এটি। কথাটি অনেক কালের। শিক্ষার ক্ষেত্রে ওটি নিন্দনীয়। কিন্তু এখন

যে আর ও ছাড়া গতি নেই। অন্যান্য দেশেও শিক্ষার মান এখন নিম্নগামী, কিন্তু এতটা নয়। তবু ওরা যদি ডালে ডালে বেড়ায়, এরা বেড়াবে পাতায় পাতায়। সাঁতারে কে প্রথম গায়ে চর্বি মেখেছিল জ্ঞানরাজ্যের শেষ কথা।

জ্ঞান এত সহজ বলেই বাংলাভাষায় সাময়িক পত্রের এত বাড়াবাড়ি। সংখ্যা সত্যিই অগুনতি। এটি আর এক বিপদ। অবশ্য প্রাচীন মানুষের। লেখা চায়, তাদের নতুন কাগজে ছাপবে। এ বিপদ থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। কেন নতুন কাগজ? জিজ্ঞাসা করলে তার কোনো উত্তর দিতে পারে না। নতুন কাগজের বক্তব্য কি, উদ্দেশ্য কি, উত্তর নেই। কোনো তরুণ সম্পাদকের এমন জোর দেখি নি যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারে, আমাদের এই উদ্দেশ্য, এবং তার জন্য আমরা নতুন শক্তিমান লেখক ভিন্ন আর কারো লেখা ছাপব না।

সাধারণজ্ঞান দেশের এই ক্ষতি করেছে। সাহিত্যপ্রীতি ভাষাপ্রীতি ও আন্তরিকতা— এ তিনের অভাব নিয়ে সাহিত্য পত্র প্রকাশ করার মূলে ঐ প্রথম চর্বি মাখা সাঁতারুর আদর্শ।

সাধারণজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ক্যারিকেচার, মর্কটবৃত্তি।

বিজ্ঞানীরা, দার্শনিকেরা, বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটনের সাধনা করছেন। বিশ্ব প্রথম সৃষ্টি কি ক'রে হল, নক্ষত্র সৃষ্টি প্রথমে কি ক'রে হল, বা পৃথিবী ও পরে প্রাণী ও পরে মানুষ সৃষ্টি কি ক'রে হল এই সব রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয় নি। প্রথম মানুষের আবির্ভাব নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা খুঁড়ছেন, এরই ক্যারিকেচার হচ্ছে, কোন্ সাঁতারু প্রথম গায়ে চর্বি মেখেছিল তাকে খুঁজে বের করা।

এই-শিক্ষায়-শিক্ষিত এক ব্যক্তির লেখা একখানা বই পাঁচ ছ' বছর আগে বেরিয়েছিল। বইখানি বাংলা ছোট গল্পের সমালোচনা বিষয়ক। অতএব রবীন্দ্রনাথের গল্পের সমালোচনাও তাতে আছে। ২৫০ পৃষ্ঠার বই। কিছু নমুনা না দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। জানি না হয় তো বইখানা কোথাও পাঠ্যরূপে এখনও চলে কি না। নমুনা—

১. "একরাত্রি। মোট দু-লাইন উদ্ধৃতি ও চার লাইন সমালোচনা। সমালোচনা—"এই পংক্তি কয়টি হইতে মনে হয় যে হিন্দুবিবাহের নীতিতে রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।"

২. শুভদৃষ্টি। দশ লাইন সমালোচনা, তন্মধ্যে প্রধান বক্তব্য—"এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ বিবাহের শুভদৃষ্টি প্রথার বিরোধিতা করিয়াছেন···এই স্থানে কবি বোধ হয় হিন্দুবিধান অপেক্ষা কোর্টশিপ প্রথার অনুকূলে।"

৩. শাস্তি। মোট সাত লাইন সমালোচনা। "কতকগুলি ক্ষেত্রে তাহারা (কৃষকেরা) যে কি রকম মারাত্মক রকমের অবিবেচক, তাহাও কবি দেখাইয়াছেন।"

৪. দালিয়া। মোট পাঁচ লাইন সমালোচনা। "গল্পটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।" সমালোচক এ গল্পের নিজেই নাম দিয়েছেন ঐতিহাসিক গল্প, তারপর বলেছেন সন্দেহের অবকাশ আছে।

এ বইয়ের শেষে যাঁদের নাম বইতে উল্লেখ করা হয় নি তাঁদের একটি নামের তালিকা আছে। তার শিরোনামা "নব অঙ্কুরিত প্রতিভা"। এই নব অঙ্কুরিত প্রতিভার তালিকায় যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে ষাট থেকে সত্তর বছরের অনেকে আছেন।

বইখানায় লেখকের নামের পূর্ব অধ্যাপক কথাটি জোড়া আছে, তাতে বোঝা যায় 'সাধারণজ্ঞান'এর ক্ষেত্র ঊর্ধ্বদিকেও কম বিস্তৃত নয়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গকৌতুকের কমলাসনা সরস্বতীকে আজ যদি প্রশ্ন করা যায়, "বিদ্যার এই অধোগতির মূলে আপনার দায়িত্ব কতখানি আছে তা প্রকাশ করুন," তা হলে কি ঘটবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর পার্শ্বস্থ হাঁসটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বলবেন, "ওকে জিজ্ঞাসা কর"। কিন্তু এ কথা শোনামাত্র বিপন্ন হাঁসটি উড়ে পালিয়ে যাবে এবং দেবীসরস্বতী মাথাটি নিচু ক'রে পদ্মের পাপড়ি ছিঁড়তে থাকবেন।

তার পর প্রহরখানেক গত হলে কম্পিত কণ্ঠে বলবেন, " 'সাধারণজ্ঞান'এর ক্রিয়া।"

ভ্রম-সংশোধন ॥ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩ সংখ্যা। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস'

পৃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	২৪	১৭৭৪	১৮৭৪
২০	২৮	১৭৭৫	১৫৭৫

‘গোষ্ঠলীলা’

শ্রীনন্দলাল বসু

চিঠি দেখলাম। আর, ছবিটিও দেখলাম। হাঁ, ইহাকে কালীঘাটের landscape বলতে পারো। তবে একটা তফাত আছে; সে হল কালীঘাটের পটের নিদর্শন যা সচরাচর দেখি তা খানিকটা চীনা এক strokeএর কাজের মতো একটি মাত্র rhythmএ করা। আর, এই landscapeএ কেবল আঁকায় ও তুলিচালনার কায়দায় কালীঘাটের পটের মতো ঠিক হয়েছে। খানিকটা রাজপুত ও কাংড়া-ছবির মতো। এইরূপ একটি ছবি হ্যাভেলের কি কুমারস্বামীর বইয়ে আছে; প্রায় একই subject, গোষ্ঠের ছবি।

তবে কি এই ছবির পূর্বপুরুষ রাজপুত ছবি? অন্তত এ ছবির line ও execution একই ধরণের; কেবল সেই-সব tempera কাজে কালীর line নয় এইমাত্র। সাদা কাগজে এর finish করার ধরণ একই রকম। lineএর টান calligraphic lineএর মতন। কিছু পর্দাজ করাও আছে। shade দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া আছে— খানিকটা চীনা ছবিতে যেমন কালী জল-তুলি দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। যা কালীঘাটের পটেও আছে। subjectএর দিক দিয়ে কালীঘাটের পটে একটিমাত্র subject, যাকে হাইকাই ছবি জাপানী আর্টিস্ট্‌রা বলে। ছবির execution ও লাইনের execution সব মিলে complete whole— artist দুবার ভাবে নি। কিন্তু এই landscapeএ বেশ ধ’রে ধ’রে composition করা হয়েছে। কেবলমাত্র কালীতে করা নয়, সাদা কাগজে (জমি তৈরি করা হয় নি) টেম্পারা। এইরকম কাজ আমি ঢাকাই আর্টিস্ট্‌দের করা oil paintingএ দেখেছি— একটি ‘অবিদ্যা’ তব্‌লা বাজাচ্ছে— আর, দুর্গার চালচিত্রে কুমারটুলির পোটোরাও করে। যমপটের scrollএ বাঁকুড়ার আর্টিস্ট্‌রা করে। এসবের নমুনা কলাভবনে আছে।

‘কালীঘাটের ছবি’র জাতই আলাদা। মাত্র একটি ভঙ্গিমা। বড়ো simple। compositionএর জটিলতা নাই। ঠিক বুঝাতে পারলাম কি না জানি না।

শান্তিনিকেতন
২৯. ৮. ১৯৫৬

‘গোষ্ঠলীলা’ চিত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি দেখে শ্রীকানাই সামন্তকে শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু এই চিঠিখানি লেখেন।

প্রাচীন গোষ্ঠলীলার পট

শ্রীঅজিত ঘোষ

সম্প্রতি ইংলণ্ডে কালীঘাটের পটুয়াদের আঁকা রঙিন পট ও রেখাচিত্র সম্পর্কে কথঞ্চিৎ আগ্রহ উদ্দীপিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ ও ভিক্টোরিয়া-আলবার্ট্ মিউজিয়মের উদ্যোগে একটি পুস্তিকা, প্রকাশিত হতে দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, এরূপ আলোচনাদির অনুষঙ্গে যে-সব চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে তা কেবল অক্‌স্‌ফোর্ড্ ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউটের নয়তো পূর্বোক্ত মিউজিয়মের চিত্রশালা থেকে সংগৃহীত এবং কালীঘাট পটের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনও বলা যায় না— অথচ অন্য যে-কোনো চিত্ররীতির সম্পর্কেও যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি বলা যায় যে, কালীঘাট পটকে বুঝতে হলে ও বিচার করতে হলে শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির প্রমাণেই তা সম্ভবপর। বিভিন্ন সময়ে রূপম্ ও বিশ্বভারতী পত্রিকায়[১] আমার যে-সব প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে সেই সঙ্গে আমার নিজের চিত্রসংগ্রহ থেকে ঐরূপ পটই প্রকাশের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছিল। বড়োই আনন্দের বিষয় যে বর্তমানেও বিশ্বভারতী পত্রিকা কতকগুলি উৎকৃষ্ট কালীঘাট পট ছাপতে উদ্যোগী হয়েছেন; তন্মধ্যে গোষ্ঠলীলার রঙিন ছবিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে আঁকা এই ছবিখানি আকারে বড়ো, রূপকল্পনায় ও বর্ণসুষমায় চমৎকারজনক। রবিকরোজ্জ্বল আকাশের তলে নীল যমুনার ধারা আর উন্মুক্ত ছত্রাকারে দণ্ডায়মান পুষ্পিত তিনটি কদম্ববৃক্ষ— নীল ও সাদার নিপুণ প্রয়োগে বিকশিত পুষ্পস্তবক ও ঘনশ্যাম প্রচুর পল্লব যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা বিশেষভাবে মনোহারী— এই পটভূমিতে গোধন ও রাখাল সখাগণে পরিবৃত কৃষ্ণ-বলরামের গোষ্ঠলীলার সজীব সুন্দর একখানি আলেখ্য। বিলাতী জলরঙের ছাপা ছবি বা এন্‌গ্রেভিং শিল্পী দেখে থাকবেন, তারই স্মৃতি থেকে সন্দেহ নেই, ছায়াসুষমারও প্রয়োগ করেছেন এমন বুঝে-সুঝে আর এত নিপুণভাবে যে, এই চিত্র রূপকল্পনার এক ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত হয়েছে। চিরাগত রেখাছন্দ আর রূপসন্নিবেশের দক্ষতা তো আছেই; অধিকন্তু অতি অব্যর্থভাবে আর গড়ন সম্পর্কে কী অপূর্ব দরদ ও বোধ থেকে প্রতিটি গোরু-বাছুরের রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, প্রত্যেকের পৃথক পৃথক্ ভঙ্গিটিও কতদূর যথাযথ, শিল্পীর রূপরসাবিষ্ট মনোযোগ রয়েছে সর্বত্র— অথচ আপনা থেকেই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে সমস্ত আলেখ্যটির কেন্দ্রে তার আসল বিষয় কদম্ববৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিম কৃষ্ণবলরামের দ্বৈত-মূর্তিতে— এঁদের ঘিরে এঁদের চারি ধারে সক্রিয় চঞ্চল রাখাল বালকগুলি আপনার আপনার বিচিত্র ভাবে ও ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলেছে সমগ্র চিত্রের সুষম ছন্দ ও ওজন আর স্বতঃস্ফূর্ত একটি আনন্দের রূপ। বিচিত্র বর্ণের সমন্বয়মাধুরীও চমৎকার। আলতা, হল্‌দি, গেরি ও এলা মাটি, উদ্ভিজ্জ নীল, সাদা মাটি আর প্রদীপের ভুষো— এ দেশেরই সহজলভ্য আর সস্তা রঙের সমবায়ে ও সুনিপুণ প্রয়োগে এই আশ্চর্য সুন্দর ছবিখানি আঁকা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চিত্রকর কাগজের রঙটিও কাজে লাগাতে ছাড়েন নি, তার আদিম ম্যাটমেটে 'সাদা' শতবর্ষের প্রসাদে এখন চমৎকার একটি কনকাভায় বা রৌদ্রদ্যুতিতে পরিণত হয়েছে: সেই হল এই গোষ্ঠলীলার প্রসারিত, প্রশান্ত আকাশ।

---

১ Rupam., July-October 1926
বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৪
প্রথম প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়। ১৩৩৪ শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কালীঘাটের পট

কানাই সামন্ত

'বিচিত্রা'-ভবনের এই ঘরে পশ্চিমের জানলা খুলে হঠাৎ এক-একদিন মনে হয়, কাংড়া কলমের একখানা ছবি দেখছি, ইতিপূর্বে কোনো চিত্রশালায় তা দেখি নি। সত্যের অনুরোধে এ কথাও বলতে পারি, আলো-চোরা কোনো আষাঢ়ের বিকালবেলায় ভাবি, সম্রাট্ হুইৎস্থঙ্গের আঁকা দ্বাদশ শতাব্দীর একখানা ছবি, গিরি নির্ঝর পাইন ও অপার শূন্যতা, সেই কি কোনো যাদুদণ্ডস্পর্শে অকস্মাৎ প্রাণ পেয়ে উঠল? ক্যামেরার সাক্ষ্য হাজির করলে দেখা যাবে— না, কোলকাতা শহরের স্তূপাকার বাড়ি একটার পিছনে আর-একটা (ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে— রাস্তার লোক চলাচল দেখা যাচ্ছে না বটে), গলির মোড়ে বুড়োশিবের আস্তানা-আশ্রিত বুড়ো অশথের আকাশ-ছোঁওয়া ডালপালায় পর্যাপ্ত পল্লব, আর দৃষ্টির শেষ সীমায় হাওড়া-ব্রিজের লৌহময় একটা স্কন্ধ দিগন্তে অঙ্কিত, রাত্রিকালে অন্ধ ড্রাগনের হারানো এক-চক্ষু রক্ত আভায় জ্ব'লে ওঠে। নাহয় সবুজ, পীত, ধূসর, সাদা, নীল ও লোহিত রঙের অসদ্ভাব নেই; আকাশ-অভিমুখী রেখার বিচিত্র সমাবেশ আছে ইট কাঠ লোহায় আর বিরল বিটপীতে— তা ব'লে কাংড়া কলমের ছবি আর চীনা ল্যাণ্ড্স্কেপ? ও শুধু ভাবুকের খেয়াল আর দৃষ্টির বিভ্রম। লালবাজার হাইকোর্ট্ আর হাওড়ার হাটে আনাগোনা না ক'রে— সিনেমা-থিয়েটার না দেখে— লুপ্ত বা জরাজীর্ণ নানা যুগের, নানা জাতির, সচিত্র ইতিহাস ঘেঁটে আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন পুঞ্জিত নিদর্শনে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে, হয়তো বা ত্রাটকযোগ অভ্যাস ক'রে— এরূপ শোচনীয় পরিণামে অবশ্য পৌঁছুতে হবে।

সে কথা মানতে পারি। কিন্তু, কালীঘাটের অজ্ঞাতনামা পোটোর আঁকা হরগৌরীর এই সাদাসিধা ছবিটিতে একটা যুগ, একটা জাতি চক্ষুষ্মান মাত্রেরই চোখের সামনে জেগে উঠেছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে— এটাকে কখনোই মনের ভুল বলতে পারব না। দু-শো তিন-শো বছর কোথায় গেল কেউ তো জানে না, প্রাণে-ভরা পল্লী, গোলায়-ভরা ধান, প্রাচীন দিঘির ঘাটে সকাল-সন্ধ্যায় নারীকণ্ঠের হাস্যকাকলি, সুর ক'রে শোনানো ছেলেভুলোনো ছড়া আর অপরূপ রূপকথা সে হয়তো চির-পুরানো আর চির-নূতন চাঁদই দেখেছে আর শুনেছে— আমাদের কার বা সে সৌভাগ্য হয়েছে? রাগ আর তাল ব্যতীতই মনে মনে গুন্‌গুন্ করতে পারি প্রাণপণে বাস-দণ্ড ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে (পারি কি?) —

> জি. পি. ও.'তে ঘণ্টা বাজে, সময় নাই রে হায়,
> ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ কিসের ব্যর্থতায়!

কোলকাতা শহরের এক টেরে ব'সে আদি গঙ্গার ধারে কোনো এক পর্ণকুটীরে (তখনো ধান-পাটের ক্ষেত ছিল আশেপাশে, রাত্রে শেয়াল ডাকত প্রহরে প্রহরে— এ তো অনায়াসেই অনুমান করা যায়) যে শিল্পী যে কারিগর এই পট এঁকেছিলেন, দু-চার পয়সার বেশি কী এর মূল্য হতে পারে স্বপ্নেও ভাবেন নি, অজ্ঞাত পরলোক থেকে তাঁর দৃষ্টি যদি এ লেখায় পড়ে আধুনিক শহরবাসী 'শিক্ষিত' জনের প্রগল্‌ভতা তিনি ক্ষমা করুন। চিরকালের কানে বাজতে থাকবে এমন কথা তিনি বা তাঁর সজাতি কেউ কইতে শেখেন নি,

আর না-শেখায় কিছু ক্ষতিও হয় নি, চিরকালের চমৎকৃত দৃষ্টিতে বিরাজ করবে এমন অনেক-কিছুকে রূপ দিয়ে গেছেন— যদিও কাগজ অতিশয় সস্তা রকমের, উপকরণ অতিশয় অল্প, বিষয়ের ঘটা-পটা বিশেষ কিছু নেই— এবং ধ'রে ধ'রে কাজ করবার, সূক্ষ্ম কাজ করবার, প্রাচীন পরম্পরাগত রঙের রুচি প্রকাশ করবার সময় সুযোগ আর প্রয়োজনও দেখা যায় নি।

প্রসঙ্গক্রমে পুরোনো দুঃখের কথাটাই বলি। আজও এ দেশের রাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতির যা-কিছু উল্লেখ যোগ্য আলোচনা, প্রকাশিত হচ্ছে ইংরেজি ফরাসী বা জর্মান ভাষায়। বাংলায় বা হিন্দিতে তেমন নয়, অথবা আদৌ নয়। কালীঘাটের পট সম্পর্কেও বিলাত থেকে একটি বই এই প্রথম বেরিয়েছে কয়েক বৎসর হল। তার দোষ ত্রুটি দেখানো কঠিন কিছু নয়। কিন্তু, এ দেশেই কালীঘাট পটের উদ্ভব, এখানেই নানা জায়গায়[১] তার সুসমৃদ্ধ সংগ্রহ আজও আছে, ঐ চিত্ররীতির অক্ষম বা অনাবশ্যক অনুকরণেরও বিশেষ অভাব হয় নি— অথচ, এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা অতিশয় অল্প, আর সুমুদ্রিত সংকলন কিছু আছে ব'লে জানি নে। কালীঘাট-পট সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, বোধহয় ১৯২৬ সালেই প্রথম ; নিপুণ ও দরদী সমঝদারের চোখ দিয়ে দেখে সংগ্রহও করেছেন অমূল্য সব নিদর্শন— বিস্তারিত বিবরণ বিশ্লেষণ ও আলোচনা এখনো এ দেশ থেকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ লাভ করে নি। (সত্য বলতে হলে, 'সর্বসমক্ষে' হল একটা বাঁধা বুলি, এ ব্যাপারে দেশীয় 'সর্ব'জনের আদমসুমারি না নেওয়াই ভালো।)

কালীঘাটের পট বাংলা সুচিরাগত পট আঁকারই একটি বিশেষ ধরণ, বিশেষ পরিণতি। ইংরেজ-রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধির সূচনায়, কালীঘাট-সুতানুটির রূপসমৃদ্ধিশালিনী কলিকাতা-নগরীতে পূর্ণ পরিণতির অনেক পূর্বেই, প্রায় শতবর্ষ সময়ে তার উদ্ভব বিকাশ ও বিলয়। দূরকাল থেকে কয়েকটি নাম মাত্র এ কাল অবধি এসে পৌঁছেচে : নীলমণিদাস, বলরামদাস, গোপালদাস। আমরা অজিতবাবুর কাছে শুনেছি, সাবলীল তুলি দিয়ে টানা কালো রেখার রূপই হল এই পটের আদিম চেহারা। তুলি দিয়ে আঁক্‌বার আগে পেন্সিল দিয়ে হাল্কা হাতে একটি আদ্‌রা আঁকা হয়েছিল, এমনও দেখা যায়— এটি কিন্তু উত্তরকালীন রীতি। আর, নিতান্তই সহজলভ্য হলুদ, নীলবড়ি, আলতা ও ভুষোর মিশ্র বা অবিমিশ্র প্রয়োগে রূপের রঞ্জন এটি আরও পরবর্তী ব্যাপার। কালো রেখার ভূমিডের উপর রঙ বুলিয়ে তাকে অধিকতর জনমনোহারী করা হয়েছে এও যেমন দেখা যায়, পেন্সিলে আঁকা রূপের আভাসকে রঞ্জিত করা হয়েছে, কালো রেখার কাজ শুরু হয়েছে বা পরে হবে— এরূপ পটেরও অভাব নেই। সাবলীল বলিষ্ঠ রেখাতেই কালীঘাটের পটের অতুলনীয় বিশিষ্টতা। অথবা, 'অতুলনীয়' কথাটা একেবারে নির্ভুল হল না ; দেশী ও বিদেশী গুণীগণ, রসিকগণ, বহুপ্রাচীন অজন্তা-বাগের রেখার সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখেছেন। এ রেখাই কথা কয়, কোনো রকমে বস্তুকে ঘের দিয়ে ঘিরে রেখেছে ('আউট্‌লাইন' বললে ঠিক যা বোঝায়) তা নয়। রূপের গড়ন, গড়নের বিভিন্ন স্থলের কঠিন বা কোমল ভাব, স্বভাবস্থিরত্ব সত্ত্বেও সারা পটে একটি নিরন্তর গতির ব্যঞ্জনা, রেখারই নিজস্ব এক শ্রী ও শক্তি যা লেখাঙ্কনের মতো সচেতন ও সর্বেসর্বা না হয়েও কতকটা লেখাঙ্কনেরও গুণোপেত— এ-সবই এই রেখায় নিহিত আছে। কালীঘাট-পটের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি দেখলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। (দুঃখের বিষয়, মূল চিত্রে রেখার যে অপরূপ লাবণ্য ও আশ্চর্য শক্তি, প্রতিচিত্রে তার অল্পই আভাস আছে।)

---

১ যেমন শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সংগ্রহে, বিশ্বভারতীর কলাভবনে ও রবীন্দ্রভারতীতে। বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত 'শিকারী বিড়াল' ছবি রবীন্দ্রভারতী-সংগ্রহের ; অবশিষ্ট সমুদয় চিত্র শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আমার মনে হয়, এরূপ রেখাকেই আচার্য নন্দলাল তাঁর 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে 'গড়নের রেখা' অভিধা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। নানাভাবে এর দূর-দেশকাল-ব্যাপী পরম্পরা চলে আসছে পনেরো-কুড়ি হাজার বৎসরের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র থেকে আজ পর্যন্ত। পূর্বেই এক-প্রকার বলেছি, জৈনপুঁথি-চিত্রের ঘের-দেওয়া রেখা আর পারসিক-চিত্রের লেখাঙ্কনের রেখা থেকে এ পৃথক— উভয়ের মধ্যবর্তীও বলা চলে। আকার-সংঘটনের ব্যাপারে অপ্রধানও নয়, স্বপ্রধানও নয়, আকারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত, এমন-কি একাত্ম। প্রাণময়, বাঙ্ময়। রূপরচনার ষড়ৈশ্বর্যে মণ্ডিত হয়ে এর পরমোৎকর্ষ দেখা যায় অজন্তা-বাগের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি-নিচয়ে। শত শত বৎসর ধরে ক্রমবিকশিত ধারার একটি পরম পরিণাম সেখানে আমাদের দৃষ্টিগোচর। কিন্তু, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তুলনায় চিত্রের আধার ও উপকরণ প্রায়শই অচিরস্থায়ী হয়ে থাকে; তাই উক্ত চিত্রশৈলীর পূর্বে কী ছিল আর পরে কী হয়েছে তার নিদর্শন পাওয়া যায় অল্পই, ধারাবিবরণ দেওয়া কারও সাধ্যায়ত্ত নয়। তবু সারা ভারতের এখানে সেখানে, প্রাচীরে আর পুঁথিতেও, তথা সিংহলের সিগিরিয়ায় আর ব্রহ্মদেশে পাগানের প্রাচীর-চিত্রাবলীতে[২] ঐ একই রীতির বহুধা বিকাশ দেখা যায়। পঞ্চদশ বা ষোড়শ খৃস্টীয় শতকে রাজা মানসিংহের প্রাসাদভিত্তিতে যে ছবি রঙে ও রেখায় আঁকা হয়েছিল, সুধীজন তাতেও দেখেছেন অজন্তাচিত্রশৈলীর বিশেষ প্রভাব। আকবর জহাঙ্গীর শাজাহান বাদশার কালে এসে কি সে ধারা লুপ্ত হয়ে গেল? গেল ব'লেই শোনা ছিল। কিন্তু, সম্প্রতি দু-একখানি গ্রন্থে (অবশ্য, ফ্রান্সে বা লণ্ডনে প্রকাশিত, ফরাসী বা ইংরেজি ভাষার ভূমিকা) মোগল-চিত্ররীতির যে বিস্ময়কর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাতে আমাদের মতো বিদ্যাদীন ব্যক্তির বলতে বাধা নেই যে, ভারতের চিরাগত রীতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ এমন-কি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পারস্য থেকে একটা প্রভাব এসেছিল সত্য; আকবরের সময়ে তার প্রতি পদক্ষেপ গুনে গুনে দেখানো যায় সেও সত্য; কিন্তু সে প্রভাবকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে ভারতের নিজস্ব প্রতিভার পরিচয়পত্র-রচনা ও স্বাক্ষর-লিখন ভারতীয় চিত্রকরগণের অসাধ্য হয় নি। ধর্মে তাঁরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান; প্রতিভায় তাঁরা ভারতীয় ছাড়া আর কিছু নন। অনেক সময় একই চিত্রে দক্ষতা দেখিয়েছেন ফরুক্ বেগ ও বসন, শংকর ও মুশ্‌কিন। অপূর্ব রূপসৃষ্টির কোথাও কোনো ভেদের রেখা পড়ে নি। পূর্ববর্তী পণ্ডিতেরা যাই বলুন, আকবরের পরে মোগল-চিত্রের ক্রমাবনতি দেখা যায়। সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এটুকু বললেই যথেষ্ট বা যথেষ্ট'র বেশিই হবে যে, আকবরের আমলের এই-সব শ্রেষ্ঠ

---

২ এই প্রাচীরচিত্রাবলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ জ্ঞান চিত্রবিদ্ রসিক-মহলেও কতদূর সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অধুনা-প্রকাশিত *The Art and Architecture of India* (*The Pelican History of Art Series*) গ্রন্থে একটিমাত্র বাক্যে বলা হয়েছে: Such fragments of thirteenth-century wall-paintings as survive in various shrines near Pagan are clearly derived from the style of Tantric painting of Bengal.

অর্থাৎ, পাগানের বিভিন্ন মন্দিরে লুপ্তাবিশিষ্ট ভিত্তিচিত্র যা আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে বাংলার তান্ত্রিক চিত্ররীতির সঙ্গে যোগ স্পষ্টভাবে প্রকটিত। (তান্ত্রিকরীতি বলতে, তান্ত্রিক তালপাতার পুঁথি-চিত্রণে যে রীতি দেখা যায়)। গ্রন্থকার উল্লিখিত ভিত্তিচিত্রাবলী নিজে কতদূর পর্যালোচনা করেছেন বোঝা গেল না। কেননা, গান্ধার ভাস্কর্যের অজস্র প্রতিচিত্র দেওয়া হয়েছে— অনেকটা অনাবশ্যক— অজন্তা গুহার চিত্রও অবশ্য আছে, নেপালী তন্ত্রগ্রন্থের একটি চিত্র আছে, পাগান-প্রাচীর-চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতীয় চিত্রকলার পরম্পরায় ও সামগ্রিক বিবরণে এর স্থান কোথায় সংক্ষেপে তার আলোচনা করেছেন শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ১৩৪৫ বৈশাখের প্রবাসীতে 'পাগানের প্রাচীর-চিত্রাবলী' প্রবন্ধে।

শ্রীরাধার মুরলী-শিক্ষা । কালীঘাট

শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে

হরগৌরী । কালীঘাট-পট
শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে

সৃষ্টিতে সাবলীল রেখার ব্যবহারে, রূপকল্পনার সাহসে ও স্বাচ্ছন্দ্যে, পটভূমির সমস্ত ফাঁক ভ'রে দেওয়ার প্রবণতায়— অজন্তা-বাগ-গুহার ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য এবং সাজাত্য রয়েছে প্রচুর। অজন্তা-বাগ-গুহার চিত্রকলা যেমন মূর্তিকলার সঙ্গে সহোদর ভাই-ভগিনী সম্পর্কে বাঁধা, এও তাই। অর্থাৎ, এতেও গড়ন আছে, ছায়াতপের বাড়াবাড়ি নেই। বলা যেতে পারে স্বভাব নেই তা নয়, স্বভাবের অনুকরণ নেই। পারস্য চিত্রকলার জাতই আলাদা। আর, আকবর-পরবর্তী চিত্রকলাও ক্রমে ক্রমে তার স্বধর্ম থেকে চ্যুত হয়েছে। 'সে প্রচণ্ড গতি অবসান'। 'নিরক্ষর' আকবরের ধৈর্য বীর্য সংগঠনশক্তি ও সমন্বয়-ভাবনা পরবর্তীদের ছিল না। তাঁরা পূর্বপুরুষার্জিত ঐশ্বর্য ভোগদখল করেছেন— জড় ঐশ্বর্য— প্রাণপ্রবাহ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মোগল চিত্রকলার এই সাক্ষ্য। নব-অভ্যুদিত পাশ্চাত্য প্রভাবে প'ড়ে নিষ্প্রাণ অনুকরণে তার অকাল মৃত্যু।

এ কথা জানা আছে, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হতে থাকে বড়ো বড়ো রাজধানীতে আর বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যে কালে, ঠিক সেই সময়েই পল্লীর লোকেরা চাষ-আবাদ করে, বাউল ভাটিয়ালি গান গায়, পিঁড়ি আঁকে, পট আঁকে, আর চিরকেলে সুখে দুঃখে দিনাতিপাত করে। অন্তত বিগত দুটি বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এইভাবেই চলেছিল। অর্থাৎ, এক কালে পাটলিপুত্রে উজ্জয়িনীতে আর বহু পরবর্তীকালে দিল্লি আগ্রা লক্ষ্ণৌ শহরে, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, বাদ্‌শাহ ও আমীর-ওম্‌রাহ— এঁদের প্রসাদপুষ্ট, এঁদের আনন্দজনক ও আদরণীয় যে ভাবের কাব্য সংগীত চিত্রকলাই চলুক, সে-সব যত উন্নত বা কালক্রমে যত অবনতই হোক, সমস্ত দেশ ব্যেপে, সমাজ ব্যেপে, সর্বসাধারণের স্তরে ঐ-সবের আর একটা ধারা হয়তো চলত যাকে পণ্ডিতগণ বলেন লৌকিক, কেউ উপেক্ষা করেন, কেউ বা মাত্রাতিরিক্ত বহুমানও দিয়ে থাকেন— এই লৌকিক সাহিত্য শিল্প সংগীতেরও ধারা চলে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে। বর্তমান যন্ত্রযুগে যখন পৃথিবীর আয়তন দেখতে দেখতে 'ছোটো' হয়ে আসছে, সর্বস্তরে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়েছে দ্রুত ও প্রচুর, সমাজ এসে পড়েছে রাষ্ট্রেরই মুঠোর মধ্যে— পূর্বে তো এমন ছিল না। তলে তলে যোগ থাকত সমাজের সর্বস্তরে। প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ত না শহর থেকে পল্লীতে, বিক্রমাদিত্য বা আকবরের রাজসভা থেকে কৃষিজীবী-শিল্পজীবীর শান্ত জীবনে দিনকার দিন। এতে যে সবটাই ছিল লোকশান এমনও বলতে পারি নে।

কালীঘাটের পটই তার অন্যতম প্রমাণ নয় কি? মোগল-সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের সঙ্গে, মোগল চিত্রকলার বিকাশ ও বিকারের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকলে গোপাল-নীলমণি-বলরামের আঁকা এই সহজ সরল সবল অঙ্কনরীতির সাক্ষাৎ মিলত কি? এ দেশের যা চিরন্তন প্রাণধারা সৃষ্টিধারা তার নিঃশব্দ সঞ্চার চলে এসেছে যুগ থেকে যুগে, প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে, তার জন্যে এঁদের প্রতিদিন দিল্লি আগ্রা মুর্শিদাবাদের মুখ চেয়ে থাকতে হয় নি, কোনো আর্ট্‌ স্কুলেও ভর্তি হতে হয় নি। বস্তুত, যখনই কোলকাতা শহর ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল, অন্য অনেক জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে আর্ট্‌ স্কুলেরও উৎপত্তি হল, তখনই কালীঘাটের পটের মুমূর্ষু দশা এসে গেল। যুগের প্রভাব এসে পড়ল সুচিরাগত ধারায়, ধরণে। তার সচিত্র ইতিহাস লেখা কিছু কঠিন নয়। কালীঘাট-পটের বিচিত্র বিবর্তনের প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ এখনও সব নষ্ট হয় নি বা বিদেশে চলে যায় নি।

রেখাই কালীঘাট-পটের প্রায় ষোলো আনা। পরবর্তী কালের ছবিতে রঙ দেওয়া হয়েছে বটে, রঙের

বিচিত্র ব্যঞ্জনা আর অতুল ঐশ্বর্য তেমন নেই।[৩] সর্বদাই এটা মনে রাখতে হবে, কার জন্যে পট এঁকেছিল পটুয়া, কতটুকু সময়ে, কী সামান্য উপকরণে, কত দর আর কী সমাদর পেয়েছিল। তার কদরদাঁ ছিল না আমীর-ওম্‌রাহ্ রাজা-মহারাজা। ম'রে ভূত হয়ে যাওয়ার আগে নবসভ্যতাভিমানী নূতন-শিক্ষিত জনের সঙ্গেও তার জানাশোনা ছিল কি? সব তথ্য বর্তমান লেখকের জানা নেই। এটা জানি, উঠতি শহরের প্রান্তে জাগ্রত কালীমায়ের রক্তপদতলে রক্তজবা ও বিল্বদল যারা দিতে আসত, তারাই ছিল এর ক্রেতা কোম্পানির-ছাপ-

৩ বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত 'গোষ্ঠলীলা' ছবিটি 'জাত কালীঘাটের পট' নয়। কালীঘাট অঞ্চলেই আঁকা হয়ে থাকতে পারে, কোনো কালীঘাট-পটুয়ারই তুলিতে অথবা তাদের কোনো জ্ঞাতিকুটুম্বের। পীতাম্বর বললে যেমন পীত বস্ত্র বা পীতবস্ত্রধারী ব্যক্তি না বুঝিয়ে বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝায়, 'কালীঘাট পট' শব্দও তেমনি তার আদিম পরিচয়-গত বা ব্যুৎপত্তি-গত অর্থকে অতিক্রম ক'রে বিশেষ একটি রূঢ় বা যোগরূঢ় অর্থের ব্যঞ্জনা দিচ্ছে। পূজনীয় শ্রীনন্দলাল বসুর চিঠিতে সেটির ব্যাখ্যা রয়েছে। 'গোষ্ঠলীলা' ছবিটি লিপ্তপদ্ধতিতে আঁকা, বা টেম্পারা। অঙ্কন শুরু করবার পূর্বেই সাদা আস্তরণে 'জমি' তৈরি করা হয় নি সত্য— তবু অনচ্ছ ভারী রঙে, সাদা-মেশানো রঙে, লেপন ক'রে ক'রে এবং ধ'রে ধ'রে কাজ করা হয়েছে। গড়ন ফোটাবার জন্যে ভারতের নিজস্ব পদ্ধতিতে (যেমন অজন্তায়, যেমন উৎকৃষ্ট মোগল চিত্রে) ছায়াসুষমার সুনিপুণ প্রয়োগ আছে, পর্দাজ আছে। আকাশের সবটায়, তা ছাড়া কোথাও কোথাও জমিতে ও গবাদির দেহে, কাগজের রঙটি কাজে লাগানো হয়েছে অতি অপূর্ব দক্ষতায়। কালীঘাট-চিত্রের সজাতীয়তা এর বলিষ্ঠ এবং সাবলীল কালো রেখার ছন্দে— রঙ লাগাবার আগেই সেই রেখাপাত একরূপ সারা হয়েছিল মনে হয়। রেখা ছাড়া, রূপকল্পনারও বিশেষ লাবণ্যে ও কমনীয়তায় বাঙালির জাতিগত প্রতিভার বিশেষ ছাপ রয়েছে। গোরু-বাছুরগুলিতে পর্যন্ত একপ্রকার নিহিত মানবতা ফুটে উঠেছে, কৃষ্ণ-বলরামে একটা যেন অদ্ভুত বাৎসল্য ও প্রীতি; এরা যে ষোলো-আনা অ-বোলা জীব তা মনে হয় না। ফলতঃ, রাজস্থান-কাংড়ার পটুয়াদের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি সময়-সুযোগ উপায়-উপকরণ ও ইচ্ছার সংযোগে, রাজা-মহারাজা বণিক ধনিকের সমাদরপূর্ণ অকুণ্ঠ পোষকতা পাওয়া গেলে, বাঙালি পটুয়ার ছবি যেমন রেখায় তেমনি রঙে কী রুচি এবং কতখানি ঐশ্বর্য প্রকাশ করত এই চিত্র বুঝি সেই সম্ভাবনারই স্ফুট ইশারা। হয়তো বা ঠিক বলা হল না। কারণ, এই চিত্রে বাংলা-দেশের ধারাবাহী পটের সম্ভাবনার ইশারা শুধু ছিল না, অতীত ইতিবৃত্তও প্রচ্ছন্ন। প্রাচীন পুঁথির পাটায় যে রূপ ও রঙের রুচি আবিষ্কৃত হয়েছে তাই শুধু নয়, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এমন পট (বরাহ-অবতার?) পাওয়া গিয়েছে ও আমরা দেখেছি যাতে কাংড়া-রাজস্থানের ছবির মতোই ধ'রে ধ'রে কাজ করা হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে। পুরোপুরি টেম্পারা ছবি; পিউরি হলুদ, কোবাল্টের মতো নীল, লাল, সবুজ, সাদা, বিচিত্র রঙের সমাবেশ তাতে— যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ, আর তেমনি সমন্বিত। বিশ্বভারতী পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় যে 'মহিষাসুরমর্দিনী' ছবিখানি ছাপা হয়েছে, রূপ রেখা রঙ ও অলংকরণের মনোহারী সমাবেশের নিদর্শন হিসাবে, কাংড়া রাজপুত ছবির সঙ্গে সেটিরও তুলনা হতে পারে। ফলত, 'গোষ্ঠলীলা'র যে চিত্রশৈলী, বাংলাদেশে তারও ধারা অনেক দিন থেকে চলে আসছিল সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয় নিদর্শন তার অল্পই রক্ষা পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে, ভারতের ইংরেজ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত Art-Manufactures of India (1888) গ্রন্থে, অভিজ্ঞ লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তৎকালীন বাংলা পট সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে তথ্য দিয়েছেন তাও উদ্ধারযোগ্য—

Until recently, a superior kind of water-colour paintings was executed in Bengal by a class of people called the *Patuās,* whose trade was also to paint idols for worship. These paintings were done with minute care, and considerable taste was evinced in the combination and arrangement of colours. The industry is on the decline, owing to cheaper coloured lithograph representations of Gods and Goddesses turned out by the ex-students of the Calcutta School of Art having appeared in the market. A painting in the old style can still be had, by order, at a price of ₨ 10 and upwards.

['বরাহ-অবতার' বা 'গোষ্ঠলীলা'র সজাতীয় চিত্র]

মারা বা মহারাণী-ভিক্টোরিয়ার-মুখ-আঁকা দু-চারটে তামার পয়সায়। থালা-বাটি, সাঁড়াশি-খুন্তি, তাঁতের কাপড় আর ছেলে-ভুলোনো কাঠের বা মাটির পুতুল কিনত— সেই সঙ্গে কিনত দু-একখানা দেবদেবীর পট। পশুপক্ষীর ছবি[৪] আর হাসি-মশ্‌করা ব্যঙ্গবিদ্রূপের নক্সাও কিনত। কিন্তু কতদিন আর কিনেছিল? বৌবাজার আর্ট্‌ স্টুডিও'র রঙিন লিথো-ছবি পাওয়া যেতে লাগল অল্প দামে। কালীঘাট পটের চেয়ে কত যে চমৎকার! যতদূর তার শক্তি ও সম্বল, রঙ দিয়ে, বিষয়বৈচিত্র্য দিয়ে, ব্যঙ্গ দিয়ে, বিমুখ জনমানসকে ধরে রাখতে চেয়েছিল দরিদ্র পটুয়া। শেষ পর্যন্ত পারে নি। গ্রামে ফেরে নি নিশ্চয়, এখানেই কোনো রকমে শেষ দিনগুলো কাটিয়েছে প্রায় নিঃসম্বল, এবং রুগ্না স্ত্রীর হয়তো চিকিৎসা করাতে পারে নি, বয়স্থা মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় নি এবং ছেলেটা বড়ো হলে বড়ো লোকের দ্বারে ধন্না দিয়ে হয় তাকে খানসামাগিরিতে ভর্তি করেছে, নয়তো কি আর্ট্‌ স্কুলে?

এসব ইতিহাসই হারিয়ে গেছে। সুখের বিষয়, বড়ো জিনিস মরে না, হারায় না। বারে বারে চিতাভস্ম থেকে ওঠে নবদেহ পেয়ে পুরাণপ্রথিত বিহঙ্গের মতো। সে আলোচনা আজ নয়।

কালীঘাট-পটের বিস্তারিত ইতিহাস লিখি বা নিখুঁত বিশ্লেষণ করি সে শক্তি আর সময় আমাদের নেই। যোগ্য ব্যক্তি কোনোদিন সে কাজে প্রবৃত্ত হবেন। আমাদের কাজ সাহেবরাই সব করবেন, আশা করি এ ভাব চিরদিন থাকবে না। এই অসম্পূর্ণ লেখায় ইতি লেখবার আগে আর-একবার চেয়ে দেখব হরগৌরীর মূল চিত্রটির দিকে। অজিতবাবুর অভিমতে চিত্রটি প্রায় শতবৎসরের পুরোনো। সাদা কাগজ বাদামী হয়ে এসেছে; ধারে ধারে ছিঁড়েও গেছে; চিত্রের আয়তন চওড়ায় এক ফুটেরও কম, উচ্চতায়

The *Patuās* now paint rude "daubs" which are sold by thousands in stalls near the shrine of Kalighat . . . . at a price ranging from a farthing to a penny.

[দু-পয়সা চার-পয়সার বেশি দাম নয়]

উল্লিখিত 'বরাহ-অবতার' চিত্র বা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রচুর-তথ্য-পূর্ণ গ্রন্থখানি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কালীঘাট পটের পূর্বাপর ইতিহাস তথ্যের দিক দিয়ে যথেষ্টই পরিস্ফুট হল, সত্যের দিকটা অবশ্য স্বতন্ত্র— বিশেষ দেশকালের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আঘাত-ব্যাঘাতের বহু ঊর্ধ্বে।

৪ নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে আঁকা হ'ত। যেমন সাপে ব্যাঙ ধরেছে, বিড়ালে মাছ বা পাখি শীকার করেছে, অথবা দুটি টিয়া পাখি এক গাছের ডালে উড়ে বসেছে। কালীঘাট-পটুয়াদের রূপ লেখবার বা বিষয়-সাজাবার রীতি যে বিশেষ ভাবে আলংকারিক, সাবলীল রেখার ছন্দে বাঁধা— এ কথা না বললেও চলে। সেই মণ্ডনধর্মী রেখার ছন্দ টিয়াপাখির ছবিতে একান্তভাবে প্রকট, অন্য ছবিগুলিতে অন্যান্য গুণের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে কোনো একটি লৌকিক বা অলৌকিক আখ্যান বলবার দায় নিয়েছে এই-মাত্র— নষ্ট হয় নি বা চাপা পড়ে নি।

লৌকিক শিল্পে কতকগুলি বাঁধা ধরা বিষয়, রূপ, ভঙ্গী ও বিন্যাস থাকে। কতকাল পরে পরে কোনো শিল্পী যখন নতুন একটি রূপকল্পনা করে এবং সেটি স্বগোষ্ঠীতে ও রসিকসমাজে আদৃত হয়, তখন সেই শিল্পীর বংশে পুরুষপরম্পরায় তারই অনুকরণ বা অনুসরণ চলে দীর্ঘকাল ধরে। এরূপ কতকগুলি রূপকল্পনা থাকে এক-এক শিল্পীপরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি। অবশ্য, উৎকৃষ্ট কল্পনা ক্রমশ পরিবারের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। রাজস্থানী কাংড়া মোগল চিত্ররীতিতেও অনুরূপ প্রথা ছিল; এবং সে ক্ষেত্রে ভালো ছবির মূল রেখাচিত্র সর্বদাই সঞ্চয় ক'রে রাখা হত, কোথায় কোন্‌ রঙ দেওয়া হবে তাও হয় লিখে নয় একটু রঙ ছুঁইয়ে স্মরণে রাখা হত। এই মূল রেখাচিত্রকে বলা হত চর্বা। এরই সহায়ে পুরুষানুক্রমে একই ছবি একাধিক রচিত হতে পারত। অবশ্য, ছবিটি স্রষ্টার হাতে প্রথম যে ভাবে ওৎরাতো পরে তেমন আর হতে পারত না বলাই বাহুল্য। কালীঘাটের পটুয়া-মহলে চর্বার চলন ছিল ব'লে জানা যায় না। তাঁদের সরল সাবলীল রূপকল্পনা তাঁদের স্মৃতিতে আর তুলির ডগেই সঞ্চিত থাকত।

সওয়া এক ফুট। তুলি ধরার আগে পেন্সিল ধ'রে হাল্কাহাতে যৎসামান্য আদ্‌রা একটা আঁকা হয়েছিল তারও চিহ্ন আছে; হয় দাগ-মোছা রবারের চলন ছিল না, নয়তো পটুয়ার তাতে প্রয়োজনই ছিল না। ঠিক এই বিষয় এই রূপ প্রায় এইভাবে সাজানো, আরও বহু দেখেছি। কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট অঙ্কন, অপরূপ ছবি, আর তো চোখে পড়ে নি।

সওয়া এক ফুট উচ্চতা বলেছি। আমার মনে হয়, ফণাধরবিজড়িত গিরিশের শির হিমালয় ছাড়িয়ে উঠেছে। হিমালয় পর্বতমালার আকাশচুম্বী যেসব শিখর তারই রেখার সঙ্গে উর্ধ্বমুখী রেখাবলীর একটি মিল আছে। গৌরী শুয়ে আছেন শিবের কোলে মাথা রেখে— কী শান্তি! কী তৃপ্তি! কী নির্ভর! যেন হিমালয়ের জানুতে মাথা রেখে ভারতভূমিই শুয়ে আছেন। এসব কল্পনা এই পট-স্রষ্টার ছিল না। কিন্তু তখনকার সমাজে, সমষ্টি ও ব্যষ্টির জীবনে, যে শান্তি, যে তৃপ্তি, যে অনায়াস ছন্দ ছিল— যে ধর্ম, যে বিশ্বাস, যে গভীর উপলব্ধি ছিল— আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বহু বিড়ম্বনার তলে তলে যে অধ্যাত্মসাধনার ধারা বয়ে চলেছিল অল্পবিত্ত 'অশিক্ষিত' সাধারণ নরনারীরও ভিতরে, তারই তো নিখুঁত একটি প্রতিরূপ এই। আদর্শ গৃহী শিব ও পার্বতী— একাধারে ভুবনেশ্বর ও ভিখারী, একাধারে পতিগতপ্রাণা অবলা আর সর্বশক্তিময়ী। কেবল কৈলাসে নয়, ঘরে ঘরেও তাঁদের লীলা অসংখ্য নরনারীর জীবনে। সেই স্বর্গে-মর্তে-মেশানো, দেবতায়-মানুষে-মেলানো বিশ্বাস ও উপলব্ধি, বাঙালি প্রতিভার বিশেষ লাবণ্য মাখানো, এই একখানি চিত্রে সম্পূর্ণই শরীরী হয়েছে মনে হয়। তাই বলতে হয়েছে, একটি দেশ, কাল, জাতি ও সংস্কৃতি এই চিত্রপটে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আশা করি এ কথায় কোনো অত্যুক্তি ঘটে নি।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়

যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম আমরা ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। প্রবাসী, সাহিত্য এবং অন্যান্য পত্রে তাঁহার লেখা বাহির হইত। তাঁহার লেখার ধরন অন্য সকল হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল, সেইজন্য তাহা গুণগ্রাহী পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিত। লেখার ভঙ্গীর চেয়েও চোখে পড়িত তাঁহার বর্ণলিপি, তাঁহার অক্ষর ও বানান, সেজন্য সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় রহস্য করিয়া তাঁহার বানানের নামকরণ করিয়াছিলেন, 'যৌগেশ বানান'। এখন যে নূতন বানান বাংলায় চলিতেছে তাহার মূলে যোগেশচন্দ্রের চেষ্টা, অনেকগুলি তিনি তাঁহার রচনায় বহুকাল ধরিয়া চালাইয়াছিলেন; প্রবাসীর সম্পাদক এবং যোগেশচন্দ্রের পুস্তকের দুই-একজন প্রকাশক তাঁহার বানান অবিকৃত রাখিবার জন্য নূতন টাইপ করিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের জন্মের সময়েও তিনি লেখক হিসাবে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কটক কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৮৯৬ সালে তিনি প্রকৃতি পরিচয় সম্বন্ধে *A Primer of Physiography* নাম দিয়া একখানা বই লেখেন। বইখানির মধ্যে শিক্ষাদাননীতি যেভাবে গৃহীত ও অনুসৃত হইয়াছে, তাহাতে আজকার দিনেও তাহার মূল্য হ্রাস হইয়াছে কি না সে কথা বিজ্ঞানশিক্ষকেরা বিবেচনা করিয়া বলিতে পারেন। সমতলবাসী বাংলাদেশের ছাত্রদের নিকট আবহতত্ত্ব বেশি কাজের হইতে পারে ও বেশি ভালো লাগিতে পারে বলিয়া তিনি ইহাতে বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, তাপ প্রভৃতি যাহা নিত্য দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অথচ আঠারোটি মাত্র পাঠে এই পুস্তিকা সম্পূর্ণ। লেখকের পরিচয় দেওয়া আছে— Professor of Physical Science, Katak College.

ইহার কিছুকালের মধ্যেই তাঁহার রচিত তিনখানি বইয়ের নাম করি— শঙ্কুনির্মাণ, রত্নপরীক্ষা ও আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ। লেখকের পাণ্ডিত্য তখনকার লেখককে চমৎকৃত করিয়াছিল। বই তিনখানি পণ্ডিতদের মধ্যে কতজন পড়িয়াছেন অবগত নহি; তবে প্রথম দুইটির প্রচার তেমন হয় নাই। আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ-এর আয়তন কম নহে, প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা। জানি না, কয়জন এ বইখানিও পড়িয়াছেন। কিন্তু বইখানির সম্বন্ধে যোগেশবাবুর হৃদয়ে বিশেষ স্থান ছিল। একবার সংবর্ধনাসভায় তাঁহার চটি বইখানিরও নাম হইয়াছিল, কিন্তু এই বইখানির নাম করা হয় নাই বলিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন — 'একজন আমার রত্নপরীক্ষা হ'তে আমাকে F. R. M. S. করেছিলেন। কিন্তু আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ হ'তে কষ্টলব্ধ F. R. A. S. উল্লেখ করেন নাই। বইখানিতে যে তাঁহার পরিশ্রমশীলতার বিশেষ চিহ্ন রহিয়াছে, তাঁর মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় আছে। পণ্ডিত বালগঙ্গাধর টিলকের সুবিখ্যাত *The Arctic Home in the Vedas* বইখানি প্রচারিত হইবার পূর্বেই যোগেশচন্দ্রের আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ -এর ভূমিকা মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তাই যোগেশবাবু অতিরিক্ত পত্রে লিখিয়াছিলেন—

এই গ্রন্থের ভূমিকা মুদ্রিত হইবার পর শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলকের নূতন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে [*Arctic Home in the Vedas*] তিনি প্রদর্শনের চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৈদিক ঋষিগণের পূর্বপুরুষগণ খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ৮০০০ বৎসর পূর্বে

মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে বাস করিতেন। তৎকালে সে প্রদেশ বর্তমানের ন্যায় শীতল ছিল না; পরন্তু সে প্রদেশে চিরশরৎঋতু বিরাজিত ছিল।· · বহুবিধ প্রমাণ দ্বারা টিলক মহাশয় স্বীয় অনুমান সমর্থন করিয়াছেন।· · আমরা টিলক মহাশয়ের অনুমানকে সারগর্ভ মনে করি।· · যে যে বিষয়ের সহিত আমাদের উপস্থিত গ্রন্থের সম্বন্ধ আছে, কেবল সেইরূপ কয়েকটি প্রধান বিষয় সম্বন্ধে টিলক মহাশয়ের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে।

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ দুই খণ্ডে বিভক্ত— প্রথম খণ্ডে আমাদের জ্যোতিষীদের পরিচয় দেওয়া আছে, দ্বিতীয় খণ্ডে আছে আমাদের জ্যোতিষের পরিচয়। গ্রন্থের পূর্বভাগে জ্যোতিষগ্রন্থাবলীর তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকাটি পড়িলেও যোগেশবাবু যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা কিছুটা অনুমান করিতে পারা যায়। শ্রমশীলতার সঙ্গে যুক্তি ও দর্শন মিলিয়া লেখাকে সময় সময় সাধারণগ্রাহ্য অথচ উচ্চস্তরে লইয়া গিয়াছে। একটিমাত্র উদ্ধৃতি এখানে দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—

কোন কোন উপহাস-রসিক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি পুরাণ-বর্ণিত জ্যোতিঃশাস্ত্রকেই প্রাচীন আর্যগণের জ্যোতিষিক জ্ঞানের নিদর্শন মনে করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপ প্লক্ষদ্বীপাদি স্মরণ করিলে কোন কথা ছিল না। সময়ে অসময়ে পুরাণ প্রমাণ নিষ্কাশন দ্বারা প্রাচীনগণের অজ্ঞানতা প্রকাশ করিয়া আনন্দ পান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যে জাতি যত পুরাতন, তাহার পুরাণও তত পুষ্ট। আমাদের ও গ্রীক জাতির যত পুরাণ আছে, অন্য জাতির তত নাই; পরন্তু কোন আধুনিক জাতির পুরাণ তত বৃহৎ হইতে পারে না।

অন্য পক্ষে, পুরাণবর্ণিত জ্যোতিঃশাস্ত্র একমাত্র অভ্রান্ত সত্য, তাহাও প্রদর্শন করা অভিপ্রায় নহে। যাহা পুরাণ, তাহা চিরদিন পুরাণই থাকিবে। সহস্র ব্যাখ্যা করিলেও তাহা কদাপি সিদ্ধান্তের তুল্য হইতে পারিবে না। এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া কেহ কেহ পুরাণকথিত ভূগোল ও জ্যোতিষকেই সত্য মনে করেন; এমন কি, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান মিথ্যা বলিতেও ক্ষান্ত হন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান, পুরাতন কখনও নূতন হইতে পারে না; ভুলিয়া যান, নূতন পুরাতনের পরে, নূতনের পরে পুরাতন নহে।

মানবজ্ঞান চিরদিনই আপেক্ষিক। যে জ্ঞান-গরিমায় আজকাল পাশ্চাত্য দেশ গঠিত, ভবিষ্যমানব তাহার কতটুকু রাখিবে, এবং কতখানি পৌরাণিকী কথা বলিয়া বিস্মৃতি-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আধুনিক আবিষ্কারে কত ভ্রম, কত অভাব, কত দোষ ভবিষ্যৎকালে প্রদর্শিত হইবে, তাহা আমরা এক্ষণে কল্পনাও করিতে পারি না।

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ বইটি লইয়া একটু বিস্তরে আলোচনা করিতেই ইচ্ছা করে। কারণ, মনে হয়, যোগেশবাবুর ভারতীয় সাধনার প্রতি অনুরাগ এখান হইতেই আরম্ভ হয়। জ্যোতিষী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ও হয় এই সময়ে। খণ্ডপাড়া নামে উড়িষ্যার এক ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের রাজবংশে চন্দ্রশেখর সিংহের জন্ম; তিনি সংস্কৃত এবং মাতৃভাষা ওড়িয়া ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানিতেন না, জ্যোতিষের লগ্ন নক্ষত্র ইত্যাদি শিখিয়া দশ-বারো বৎসর বয়সেই আকাশে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান। জ্যোতিষের গণনা ও রাশির প্রকৃত উদয়কালে পার্থক্য দেখিয়া তিনি জ্যোতিষে অনুরাগী হইলেন এবং কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নিজেই তিনি সিদ্ধান্তশিরোমণি ও সূর্যসিদ্ধান্ত টীকার সাহায্যে পড়িয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়; তিনি নিজেই উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত দুই-একটি যন্ত্র নির্মাণ করিরা আকাশের গ্রহনক্ষত্র বেধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পরিদর্শনফল অবলম্বনে সিদ্ধান্তদর্পণ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন। চন্দ্রশেখর সামন্ত তাঁহার গণনা দ্বারা পঞ্জিকার যে সংস্কার সাধন করেন তদনুসারে পুরীর মন্দিরের নিত্যপূজা পরিচালিত হয়। যোগেশচন্দ্রের দ্বারাই চন্দ্রশেখর সামন্তের কৃতিত্ব ইউরোপে পৌঁছায়; তিনি চন্দ্রশেখরকে Tycho Brahe টাইকো ব্রাহীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন; *Nature* পত্রিকা মন্তব্য করেন— Prof. Roy compares the author very properly to Tycho. But we should imagine him to be a greater

than Tycho. *Knowledge* পত্রিকায় মন্তব্য হয়— Of all the numerous works on astronomy that have been published within the last few years, this is by far the most extraordinary, and in some respect the most instructive. মনে রাখিতে হইবে, এসব ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের কথা, তখনও বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হয় নাই।

চন্দ্রশেখর সামন্তের সঙ্গে যোগেশবাবুর পরিচয় নাটকীয় ভাবেই হয়; মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পঞ্জিকাসংস্কারে উৎসাহী হইয়া কটকে চন্দ্রশেখর সামন্তের সন্ধান করেন, কিন্তু ওড়িয়া পণ্ডিতের বিশেষ জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য কটক কলেজের দুইজন অধ্যাপককেও নিমন্ত্রণ করেন। এই দুই জনের মধ্যে যোগেশবাবু ছিলেন। সরল অনাড়ম্বর ভাবে সামন্ত যেরূপে দুই তারার মধ্যে দূরত্ব বুঝাইয়া দিলেন এবং তারা ও নক্ষত্রের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়া দিলেন তাহাতে অধ্যাপক দুইজন চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ক্রমে পরিচয় বাড়িল; সামন্তের একমাত্র কাজ সিদ্ধান্তদর্পণ প্রকাশে ও পণ্ডিতসমাজে প্রচারে যোগেশচন্দ্র অগ্রসর হইলেন। এই পরিচয়ের কথা যোগেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, এবং মুখেও বলিয়াছেন। তাঁহার তরুণ জীবনে কি এই একাগ্র সাধনার আদর্শ কোনোই রেখাপাত করে নাই? এই দিক দিয়া দেখিলেও আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ স্মরণীয় গ্রন্থ।

২

১৯১৩ সালে জুলাই মাসে যোগেশবাবুকে আমি প্রথম দেখি। আমি কটকে পড়িতে গিয়াছি, সেখানে কাহাকেও চিনি না— কটক তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ বিদেশ। দীনেশচন্দ্র সেন আমাদের আত্মীয় হইতেন, তাঁহার নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া যোগেশবাবুর সঙ্গে দেখা করি; পত্রে আমার তত্ত্বাবধানের কথা ছিল। যোগেশবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া দেখি, তিনি কাগজপত্র লইয়া ব্যস্ত। আমাকে বসিতে বলিয়া পরিচয় গ্রহণ করিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন"। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ক্রিয়াপদ সংগ্রহ করিতেছিলেন; ব্যোমকেশ মুস্তফী রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত তালিকা ছাপাইয়া সদস্যদের বাংলা ভাষার যাবতীয় শব্দ সংগ্রহ করিতে বলেন। পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ শব্দ সংগ্রহ করিয়া পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। প্রথমে যোগেশবাবু এ কাজ তাঁহার নয় বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু একবার পুরীতে অবকাশ ছিল প্রচুর, হঠাৎ পরিষদের কথা মনে পড়ায় জানা শব্দ লিখিতে লাগিলেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত বাংলা শব্দ বর্গে বর্গে ভাগ করিয়া এক-এক খণ্ড কাগজে এক-এক শব্দ লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। এইভাবে প্রায় আট হাজার শব্দ লিখিয়াছিলেন। শব্দকোষের আরম্ভ এইখানে।

যোগেশবাবু বাংলা ব্যাকরণ শেষ করিয়া তখন শব্দকোষ পুনরায় দেখিতেছিলেন। আমাকে এ বিষয়ে কিছুটা সাহায্য করার জন্য মাঝে মাঝে আসিতে বলিলেন। এই ভাবে কাজের মধ্য দিয়া আসা-যাওয়ায় তাঁহার সঙ্গে কতকটা ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমার দ্বারা যে তাঁহার এমন কিছু সাহায্য বাস্তবিক হইয়াছিল, তাহা নয়; আমার বিদ্যাবুদ্ধি ও বয়স হিসাব করিয়াই তিনি আমাকে কাজ দিতেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ আমার যথেষ্ট হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তিনি গল্প করিতেন। একবার বলিয়াছিলেন, "আমার কিছু লেখা হইলে আমি তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে দিয়া পড়াইয়া লই।

তাহাদের পড়া হইতে বুঝিতে পারি, নিজের কথা কতখানি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিয়াছে। পাঠকের কোথায় ঠেকিতেছে, কেন ঠেকিতেছে তাহা বোঝাও যে লেখকের কাজ।"

১৯১৩ হইতে ১৯১৭— চারি বৎসর আমার কটক কলেজে পড়ার সময়। এই চারি বৎসর কলেজের ছাত্রসমাজের দিক হইতে নানা কর্মে উৎসবে ও দুর্ভিক্ষাদি বিপদে সাহায্যের জন্য টাকা তুলিতে কয়েকজন অধ্যাপকের নিকট যাইতাম। যোগেশবাবুর নিকটও যাইতাম। তাঁহার দান পরিমিত ছিল, কিন্তু স্বল্প ছিল না। সকল বিষয়েই তিনি কিন্তু খুঁটিনাটি নানারকম প্রশ্ন করিতেন। সামাজিক হিতসাধনের প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব অনেক মত ছিল। আমি যেবার কটক যাই, সেই বৎসরই কলেজের একটি ছেলে কাঠজুড়ি নদীতে সাঁতার দিতে গিয়া বুরুজের নীচে একটা ঘূর্ণীর মধ্যে পড়িয়া যায়। তাহার একজন বন্ধুও সাঁতার দিতেছিল, সে তাহাকে সাহায্য করিতে আগাইয়া যায়। কিন্তু প্রথম ছাত্রটি যখন দেখিল যে তাহাকে সাহায্য করিতে আসিয়া তাহার বন্ধুটি বুঝি দম হারাইয়া ফেলে, তখন সে তাহাকে নিজেই ঠেলিয়া দিয়া অন্তিম নমস্কার করিয়া জলে ডুবিয়া গেল। এই শোচনীয় ব্যাপারে স্মৃতিরক্ষার জন্য যোগেশবাবু প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য শুধু সাঁতার-শিক্ষা নয়, মজ্জমান ব্যক্তিকে বাঁচাইবার কৌশল শিখাইবার ব্যবস্থাও করা হউক। পণ্ডিত হইয়াও তিনি বাহিরের জগতের প্রতি কি সমাজের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, ছাত্রদের কল্যাণ কিসে হইবে তাহা চিন্তা করিতেন এবং উপদেশও দিতেন। নিত্যভ্রমণের সময় দুই-একজন ছাত্রকে সঙ্গে লইতে চাহিতেন। ছেলেরা কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সহজে তাল রাখিয়া চলিতে পারিত না— তিনি জোরে জোরে পা ফেলিতেন, বেড়ানো যে ব্যায়ামের জন্য, অঙ্গপরিচালনার জন্য। শুনিয়াছিলাম, অত্যধিক পড়াশোনা ও একান্তভাবে ব্যায়াম বর্জনের জন্য তিনি নাকি একবার কঠিন অজীর্ণ-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন ; তাহার পর নিজের চেষ্টায় ওজন করিয়া খাদ্যদ্রব্য খাইতেন এবং নিত্য নিয়মিত দ্রুত ভ্রমণ করিতেন বলিয়া পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করেন। বৃদ্ধবয়সেও ভ্রমণ তিনি বাদ দেন নাই। কিন্তু আহারের পরিমাণ স্বাভাবিকই ছিল।

৩

১৯১৭ হইতে ১৯৪৩— এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসরের মধ্যে আমিও কতবার কটক গিয়াছি, যোগেশবাবুও কলিকাতায় আসিয়াছেন ; তাঁহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াই চলিয়াছি। (ইহার কৃতিত্ব আমার নয়, তাঁহার।) সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ বা আলোচনার বিষয়ে তাঁহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে তিনি হয়তো অনুসন্ধানের জন্য আমাকে লিখিয়া পাঠাইতেন, হয়তো দুই-একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করার কথা বলিতেন, নয়তো কিছু অনুবাদ করাইয়া লইতেন। তাঁহার বৈদিক গবেষণা এই সময়ে পুরামাত্রায় চলিতেছিল। আমরা কলিকাতায় থাকিয়াও গবেষণায় বিলাতের সুযোগসুবিধার কথা ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি ; যোগেশবাবু কলিকাতায় থাকিতে পারিতেন না, থাকিতে চাহিতেন না, কিন্তু কটক ও বাঁকুড়ায় থাকার ফলে তাঁহার জ্ঞানচর্চা কোনোদিন ব্যাহত হয় নাই।

তাঁহার চণ্ডীদাস-চরিতের সম্বন্ধেও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। একবার বাঁকুড়ায় গিয়াছিলাম, তিনি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান দেখিয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার নির্দেশে এবং রামানন্দবাবুর অনুরোধে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় চণ্ডীদাস-চরিতের মর্মার্থ
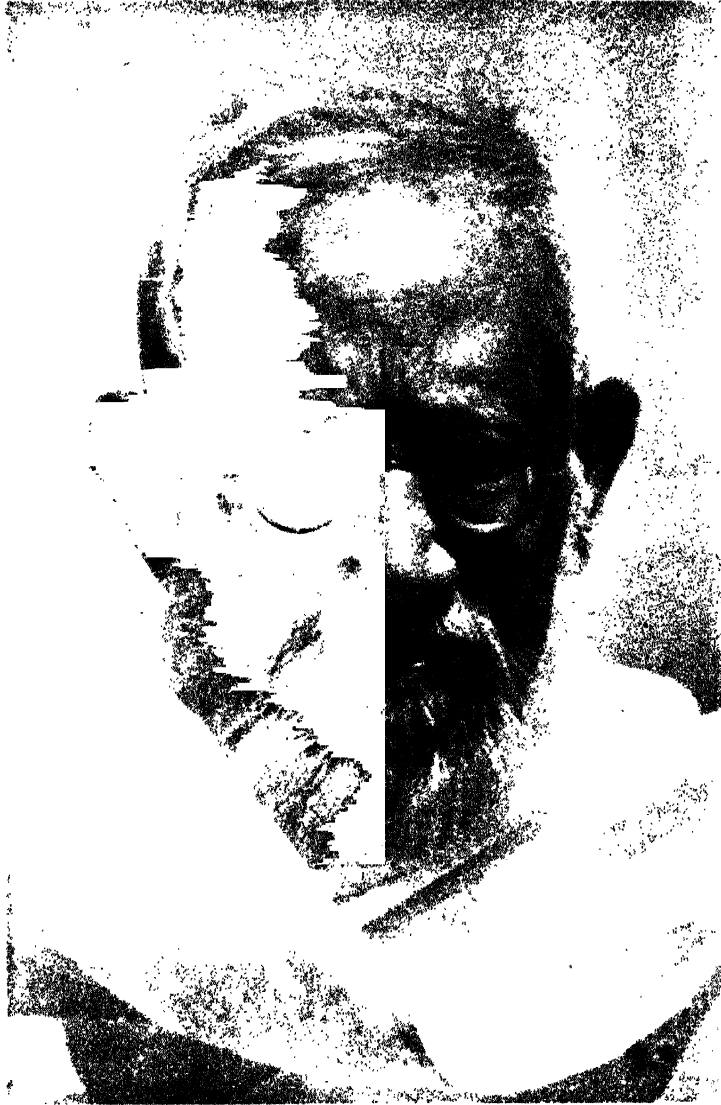
শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

ইংরাজিতে লিখি। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ পণ্ডিতেরা কিন্তু তাঁহার ছাতনা-বাদ গ্রহণ করেন নাই। এবিষয়ে তিনি তাঁহার নিজস্ব মত এবং তাহার পক্ষে যাহা কিছু বলিতে পারেন তাহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেন না। প্রতিকূল সমালোচনায়ও তাঁহার মতের ভিত্তি নড়িত না। ভবিষ্যৎ পাঠকের হস্তে বিচারের ভার দিয়া তিনি নিবৃত্ত হইতেন।

১৯১৭ হইতে ১৯৪৩— রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক দিয়া এই সময়ের গুরুত্ব খুবই বেশি। যোগেশচন্দ্রকে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক দিয়া আমরা পাই নাই। চরকা ও তাঁতের সম্বন্ধে, স্বদেশী প্রচার সম্বন্ধে কিন্তু তাঁহার চিন্তাও ছিল, তিনি পরীক্ষাও করিতেন, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়াছি। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি— "আপনি তো আমাদের বার্তাশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, আপনি কি মনে করেন, ইংরেজরাজ এদেশে থাকিতে আমাদের আর্থিক উন্নতির কোনো সম্ভাবনা আছে, স্বাচ্ছন্দ্য লাভের কোনো উপায় আছে?" ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, "না।" ইহার পর আর কোনোও কথা চলিল না। সরকারী কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক, রায়বাহাদুর, নিষ্ঠাবান্, বিজ্ঞানসাধকের মুখে এই সংক্ষিপ্ত অথচ দৃঢ় অভিমত পাইয়া সেদিন সন্ধ্যায় খুবই ভালো লাগিয়াছিল।

৪

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস। আমার আটকবন্দীর মেয়াদ শেষ হইলে আমি বাঁকুড়ায় যাই, কয়েকদিন তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করি। দমদম জেলে পত্র লিখিয়া তিনি আমার সঙ্গে বাহিরের জগতের যোগ রাখিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের বাত্যাবিধ্বস্ত বঙ্গোপকূলের মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার প্রতিকার-চিন্তা করিয়া প্রবাসীতে অবিলম্বে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা জেলের ভিতরে আমাদের খুবই ভালো লাগিয়াছিল। বিজ্ঞানের অনুশীলন, অবসরপ্রাপ্ত জীবন, বার্ধক্য— এসব সত্ত্বেও তিনি দেশের কল্যাণচিন্তনে ও সেই চিন্তার প্রকাশে কিরূপ তৎপর ছিলেন তাহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম। তখন হইতেই মনে হইতেছিল যে যোগেশবাবুর নানাবিষয়ে লেখাগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা পত্র-পত্রিকায় পড়িয়া আছে, সেগুলি হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিষয়ভেদে প্রকাশ করিলে বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালী পাঠকের সম্পদ্ রক্ষা করা হইবে। এ কথা তাঁহার নিকটে বলিলাম, তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধের তালিকা দিলেন। তাহার পর এই বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার অনেক লেখা তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। যেগুলি প্রবন্ধের আকারে প্রকাশিত ছিল সেগুলিও নূতন ভাবে সাজানো হইয়াছে। বাঙালী পাঠকেরা তাহাদের কথা জানেন। একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরাজিতে লেখাও পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি রচনা একত্র করিয়া পুস্তকের আকারে প্রকাশিত করিবার কথা। এই পুস্তক *Ancient Indian Life*— ১৯৪৮ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, এবং তিনি এজন্য রবীন্দ্রস্মারক পুরস্কার পান। ইহাতে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা, পানভোজন, শর্করাপ্রস্তুতবিধি, বস্ত্রশিল্প, আগ্নেয়াস্ত্র, হিন্দু-পঞ্জিকা, হিন্দু-বিবাহবিধি— এই সকল বিষয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ আছে। অনাথগোপাল সেন স্মৃতি-সমিতির পক্ষ হইতে আমাদের শিক্ষাবিষয়ে তাঁহাকে এক পুস্তিকা লিখিতে বলি; তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার' নামে ১৯৫০ সালে এক পুস্তিকা রচনা করিয়া পাঠান।

পুস্তিকার প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় আছে, তাঁহার মতামত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং পাঠকের চিন্তা করিবার মত অনেক কথাই আছে, তাহা এখনকার প্রচলিত মতের অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক।

তাঁহার লেখার উপযুক্ত সমালোচনা হয় নাই, তিনি তাহা বুঝিতেন; শুধু প্রশংসায় তাঁহার মন ভরিত না। তাঁহার অনেক মত পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতের সঙ্গে মিলিত না; এ দেশের বহু বিদ্বান্ ও পণ্ডিত, বিশেষ করিয়া যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নিকটই শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাঁহাদেও সঙ্গে মিলিত না। অথচ তাঁহার রচনা শিক্ষিত সমাজের সামনে আসে, ইহাও তিনি চাহিতেন।

মৃত্যুর কয়েক মাস মাত্র পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বিশেষ উপাধি দান করিবার জন্য বাঁকুড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য উপাচার্য ও সংসদের কয়েকজন সদস্য পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্মান তিনি সমাদরের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা কেহ কেহ কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই কথাটা তুলিয়াছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্যে ত্রুটি হইতেছে মনে করিতেছিলাম। কিন্তু যোগেশবাবুর মনে এই কারণে কোনো তিক্ততা ছিল না। 'আচার্য' যোগেশচন্দ্র রায় এই কথাতেও তাঁহার একটু আপত্তি ছিল। 'বিদ্যানিধি' ও 'বিজ্ঞানভূষণ' পণ্ডিতসমাজের প্রদত্ত, সুতরাং গ্রহণ না করিয়া উপায় ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে বাংলা সংবাদপত্রে বিশেষ কোনো উল্লেখ ছিল না বলিয়া তিনি সংকোচ বোধ করিতেন।

এই বারো বৎসর ধরিয়া দেখিয়াছিলাম, কিরূপে তিনি জরার আক্রমণ সত্ত্বেও জাগ্রত মন লইয়া জ্ঞানের তপস্যা করিতেছেন। বর্তমান জগতে এইরূপ জ্ঞানচর্চাই তো অগ্ন্যাধান। আহিতাগ্নি যেমন অগ্নি নিরন্তর জ্বালাইয়া রাখেন, তিনিও তেমনই জ্ঞানাগ্নি নিরন্তর জ্বালাইয়া রাখিতেন— চোখে কম দেখিতেন, কানে কম শুনিতেন— নব্বই বৎসরের কাছাকাছি আসিয়া পত্রে লিখিলেন 'জরা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে'— তথাপি তাঁহার মন ছিল সম্পূর্ণ সজাগ। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বদিনই, রোগের শেষ আক্রমণের দশ ঘণ্টা পূর্বেই হয়তো, দৈবক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করি। গিয়া শুনিলাম কয়েকদিন পূর্বে তাঁহার শরীর বড় অসুস্থ হয়, ডাক্তার আসিয়া দুর্বল হৃৎপিণ্ড বলিয়া বেড়ানো পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তখন খাইতে বসিয়াছিলেন, আমরা বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। খাওয়া হইলে বাহিরে আসিয়া আমাদের বসিতে বলিলেন এবং কেন বাঁকুড়ায় আসিয়াছি তাহাও জানিতে চাহিলেন। যখন শুনিলেন যে হরিজন-ব্যাপারেই আসিয়াছি, তখন বলিলেন, "সমাজে এ ভাব একেবারে instinct-এর মত হয়ে গেছে। সময় লাগবে।" তাহার পর আমার পিঠে হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিলেন, "পরিশ্রম কম করবে। কার সঙ্গে বাস করছ, জান তো?" তিনি আমার রক্তচাপের কথা মনে রাখিয়াছিলেন। প্রতি কথায় তাঁহার সজাগ মনের পরিচয়। আমরা যখন চলিয়া আসি, দেখিলাম তিনি বারান্দায় বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন। তখনও আশা রাখিয়াছিলাম, তাঁহার উপদেশ ও স্নেহ হইতে এত শীঘ্র বঞ্চিত হইব না। কিন্তু বিধাতার বিধান আমাদের অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

যোগেশচন্দ্র রায়ের জীবনকথা

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাংলাদেশের একটি শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। তাঁর জীবনের সঙ্গেসঙ্গে শতবর্ষের ইতিহাসের দীর্ঘ অধ্যায়টি সমাপ্ত হয়েছে।

সেই প্রায়-শত বর্ষের ইতিহাস তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্যের কথা আজ মনে পড়ে। ১৯৫২ সালের ৭ অগস্ট তারিখে বাঁকুড়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রথম কথাই তিনি বলেছিলেন, "আমার বয়স কত জান? বিরানব্বই বৎসর নয় মাস।"

তার পর আরো কয়েকটি বছর কেটে গেল। তাঁর শারীরিক বয়স বাড়তে লাগল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মানসিক বয়সের কোনো তারতম্য হল ব'লে মনে হল না। কেননা, তাঁর ধীশক্তি মননশক্তি ও রচনাশক্তি অব্যাহত যে ছিল, তার প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হতে আমরা দেখেছি। যতই দেখেছি আনন্দে ও বিস্ময়ে হতবাকও হয়েছি ততই; সেই সঙ্গে সম্ভবত লজ্জিতও হয়েছি। প্রায়-শতায়ু বৃদ্ধের পক্ষে যা সম্ভব হচ্ছে হয়তো কোনো তরুণ যুবক কিংবা প্রৌঢ়ের পক্ষে ততটা কর্মক্ষমতা সম্ভব নয়।

তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তাঁর পরলোকগমনের কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি মাঝে-মাঝে চিঠি লিখতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর হস্তাক্ষর অস্পষ্ট হয়ে আসছে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু চিন্তাশক্তির কোনো দুর্বলতা ধরা যায় নি।

যোগেশচন্দ্র নিজেকে নিজে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, নিজেকে মানুষ— এবং শেষপর্যন্ত মনীষী— করে গড়ে তুলবার জন্যে তাঁর মধ্যে অসীম প্রেরণা পুঞ্জীভূত ছিল। সেই প্রেরণা সম্বল করে তাঁর জীবনের যাত্রা শুরু, এবং যাত্রা যখন শেষ হল তখনও তাঁর প্রেরণার সমস্তটুকু সঞ্চয় নিঃশেষিত হয় নি। মৃত্যুর পূর্ব দিনও সকালে তিনি লিপিকারের সাহায্যে একটি প্রবন্ধ রচনায় ও সন্ধ্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব সম্বন্ধে আলোচনায় অতিবাহিত করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ইতিহাস সম্পর্কে স্মৃতিকথা লেখার প্রতিশ্রুতি দেন।

এই ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে— ৩০ জুলাই ১৯৫৬। ১৪ শ্রাবণ ১৩৬৩ প্রত্যূষে— করোনারি থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিকথা লেখার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সুযোগ তিনি পেলেন না, সম্ভবত তাঁর স্মৃতিকথা লেখার ভারই অর্পণ ক'রে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর।

সমবয়সীর কাছ থেকে সম্মান পাওয়া— সে বড় ভাগ্যের কথা। যোগেশচন্দ্র সেই দুর্লভ ভাগ্যে ভাগ্যমন্ত। তাঁর জীবনদীপ-নির্বাণের মাত্র কয়েক মাস আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং বাঁকুড়ায় তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে অনারারি ডক্টরেট অব লিটারেচর উপাধি দিয়ে এসেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর যোগেশচন্দ্র প্রায়-সমবয়সী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তির মাত্র কয়েক মাস বাকি, যোগেশচন্দ্রের শতবর্ষপূর্তি হতেও বাকি ছিল মাত্র তিন বছর।

১৭৮১ শক, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ, ৪ কার্তিক, ইংরেজি ১৮৫৯ সালের ২০ অক্টোবর, তারিখে বৃহস্পতিবার হুগলী জেলার আরামবাগের চার মাইল দক্ষিণে দিগ্‌ড়া গ্রামে যোগেশচন্দ্রের জন্ম হয়।

নয় বছর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে পাঠশালায় তিনি লেখাপড়া করেন। এর পর তাঁর পিতা তাঁকে বাঁকুড়ায় নিয়ে আসেন, মাস দুই-তিন এখানকার বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়ে এখানকার জেলা ইস্কুলে তাঁর ইংরেজিতে হাতে খড়ি হয়।

এর পর বৎসর অক্টোবর মাসে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এই পারিবারিক দুর্যোগে বাঁকুড়া থেকে তাঁরা বাড়ি ফিরে যান।

দুর্যোগ কখনো একা আসে না। বর্ধমান থেকে তাঁদের গ্রামের দিকে ম্যালেরিয়া মহামারী গ্রাম উজাড় করতে করতে এগিয়ে এল। তাঁদের গ্রামও শ্মশানে পরিণত হল। বালক-যোগেশচন্দ্রও এই রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি এই ভীষণ রোগের বর্ণনা দিতে দিতে বলেছিলেন, "জীবনের দুটি বৎসরের কথা মনে পড়ে না; আমি বেঁচে ছিলাম না মরে ছিলাম জানি না। তখন আমার বয়স বারো।"

ক্রমে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া একটু কমল। তিনি বর্ধমান মহারাজার ইস্কুলে ভর্তি হলেন, এবং পাঁচ বছর এই বিদ্যালয়ে পড়ে ১৮৭৮ সালে দশ টাকা বৃত্তি পেয়ে এনট্রান্স পাস করলেন। তার পর হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করে ১৮৭৯ সালে কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়ে এফ. এ. পাস করেন। হুগলী কলেজ থেকেই ১৮৮২ সালে প্রথম বিভাগে বি. এ., এবং ১৮৮৩ সালে বটানিতে দ্বিতীয় বিভাগে এম. এ. পাস করেন— এই বৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনিই একমাত্র ছাত্র বটানিতে এম. এ. পাস করেন।

এম. এ. পাস করার পরই, ১৮৮৩ সালেই, তিনি কটক কলেজে লেকচারার ইন সায়েন্স নিযুক্ত হন। কটক কলেজে তিনি তখন একাই বিজ্ঞানের শিক্ষক। কলেজের চারটি শ্রেণী ছাড়াও এম. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিল একজন। এতগুলি ক্লাস নিয়ে এবং এম. এ.-ছাত্রটিকে পড়িয়ে তাঁর দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যোগেশচন্দ্রের এই ছাত্রটি কটক কলেজের প্রথম এম. এ.।

তিন বছর কটক কলেজে কাজ করার পর তিনি কলকাতার মাদ্রাসা কলেজে আসেন। এখানে এসে তিনি সম্ভবত একটু স্বস্তি বোধ করেন। বলেছিলেন, "কটক কলেজে আমি কেবল পড়িয়েছি, নিজে পড়বার-শেখবার সময় পাই নি; মাদ্রাসা কলেজে এসে আমার যথেষ্ট অবসর হল। এখানে মাত্র দুটি এফ. এ. ক্লাস ছিল, বি. এ. ক্লাস ছিল না। পড়াশুনার আবশ্যক বই ও সুযোগও এখানে পাওয়া গিয়েছে।"

মাদ্রাসা কলেজে দুই বছর কাটবার পর, মাদ্রাসার কলেজ-বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যোগেশচন্দ্র এই সময় চট্টগ্রাম কলেজে গিয়ে যোগ দেন, কিন্তু বেশি দিন সেখানে থাকতে হয় না, মাস দেড়েক পরেই তিনি ফিরে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন এবং মাত্র পাঁচ-ছয় মাস এখানে কাজ করেন।

কটক কলেজ থেকে তিন বছর তিনি অনুপস্থিত। তাঁর অনুপস্থিতিকালে সেখানে বিজ্ঞানশিক্ষা অনাদৃত হয়ে পড়ে। এইজন্যে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর তাঁকে পুনরায় কটক কলেজে পাঠিয়ে দেন।

দ্বিতীয় বার কটকে গিয়ে তিনি সেখানকার কলেজে একটানা ত্রিশ বৎসর কাজ ক'রে ১৯১৯ সালে কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২০ সালে তিনি ফিরে আসেন বাঁকুড়ায়। দশ বৎসর বয়সে তিনি বাঁকুড়া ত্যাগ করেন, অর্ধশতাব্দী

বাদে ষাট বৎসর বয়সে ফিরে আসেন সেই বাঁকুড়ায়। সেইদিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বাঁকুড়াতেই ছিলেন।

তাঁর পুরো নাম হচ্ছে যোগেশচন্দ্র রায় এম. এ., বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ, এফ. আর. এ. এস., এফ. আর. এম. এস., রায়বাহাদুর। কিন্তু বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য তাঁকে কেবল বিদ্যানিধি নামেই চেনে। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিত-সভা তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

দ্বিতীয় বার যখন তিনি কটকে যান তখন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পঞ্জিকা-সংস্কার-বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন ; বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার টোলের পরিদর্শক ছিলেন তিনি। যেখানেই তিনি যেতেন সেখানেই পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। দৈবাৎ তিনি শুনতে পান যে, উড়িষ্যার এক পার্বত্য ও জাঙ্গল রাজ্যে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি নিজে নাকি গ্রহ-নক্ষত্র বেধ করে কী-সব করেন ; লোকে বলে তিনি জ্যোতিষী। এই জ্যোতিষী রাজ্যের নাম খণ্ডপড়া, কটক থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। এই জ্যোতিষীর নাম চন্দ্রশেখর। তিনি খণ্ডপড়ার তৎকালীন রাজার খুল্লতাত ছিলেন, এবং সাধারণ লোকের কাছে পঠানী সান্ত নামে পরিচিত ছিলেন। রাজার অনুমতি ব্যতীত তিনি গড়ের বার হতে পারতেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয় কমিশনার সাহেবকে দিয়ে রাজার নামে চিঠি দিয়ে পঠানী সান্তকে কটকে আনান।

এই সময় পঠানী সান্তের বিদ্যাবত্তার, বিশেষ জ্যোতির্বিদ্যার, প্রগাঢ় প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেখে যোগেশচন্দ্র জ্যোতিষের প্রতি আকৃষ্ট হন। পঠানী সান্ত, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর সিংহ, -কৃত সংস্কৃত জ্যোতিগ্রন্থ সিদ্ধান্ত-দর্পনঃ যোগেশচন্দ্রের হাতে আসে। বলেছিলেন, "দৈবক্রমে আমাকে এই বই পড়তে বুঝতে ও সম্পাদন করতে হয়।" সিদ্ধান্তদর্পণ সম্পাদনকালে যোগেশচন্দ্র পঠানী সান্তের জীবনচরিত ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করেন। এর ফলে এদেশে ও বিলাতে পঠানী সান্তের অদ্ভুত কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা হয়। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিতসভা যোগেশচন্দ্রকে যখন 'বিদ্যানিধি' উপাধি দেন তখন মানপত্রে তাঁকে চন্দ্রশেখরের আবিষ্কর্তা ব'লে উল্লেখ করেন।

তাঁর বাল্যের জীবন, বিদ্যারম্ভের জীবন, বিদ্যাদানের জীবন শেষ করে ১৯২০ সালে তিনি অবসর যাপনের জন্যে এলেন বাঁকুড়ায়। কিন্তু অবসর নয়, তাঁর জীবনের প্রকৃত কাজই আরম্ভ হল এই সময় থেকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিদ্যানিধি-জীবনই শুরু হয়ে গেল। যুবকের উৎসাহ নিয়ে ষাট বৎসর বয়সের বৃদ্ধ জ্ঞানান্বেষণে যাত্রা করলেন।

তাঁর জ্ঞানচর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫১ সালে তিনি তাঁর *Ancient Indian Life* গ্রন্থের জন্যে রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর পূজাপার্বণ গ্রন্থের জন্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে ১৯৫২ সালে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৪০ সালে সরোজিনী বসু পদক ও ১৯৪৭ সালে জগত্তারিণী পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৫৫ সালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় অনারারি ডক্টরেট উপাধি দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

কিন্তু সকল সম্মানের শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি পেয়েছেন তাঁর মৃত্যুর মাস কয়েক আগে। যোগেশচন্দ্রের প্রায়-সমবয়সী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঁকুড়ায় গিয়ে ১৯৫৬ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি

দিয়ে এসেছেন। বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অ্যাসেমব্লি হলে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার প্রবীণতম মনীষী ৯৭ বৎসর বয়স্ক জ্ঞানতপস্বী আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন চ্যান্সেলার ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে কম্পিত হস্তে গ্রহণ করলেন উপাধিপত্র —অনারারি ডক্টরেট অব লিটারেচর।

এই তারিখটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে; কলকাতা শহরের বাইরে এরূপ সমাবর্তন-অনুষ্ঠান ইতিপূর্বে হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় এই মনীষীকে এইভাবে সম্মানিত করার সুযোগ পেয়ে নিজেই সম্মানিত হয়েছেন।

বলেছি, তাঁর জীবন ছিল প্রেরণায় পুঞ্জীভূত। তিনি ছত্রিশ বৎসর শিক্ষকতা করেন। তার মধ্যে যে অল্পস্বল্প সময় পেতেন সেই সময়কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন— প্রত্যেক ভাগের জন্যে বারোটি বছর। বলেছিলেন, "আমি প্রায় বারো বৎসর বাংলাভাষা চর্চা করেছি, বারো বৎসর জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করেছি, আর বারো বছর কেটেছে দেশীয় কলা চর্চায়।"

জীবনকে উন্নীত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই পরিকল্পনার উদ্ভব। বলা যায়, সময়কে হত্যা না করে তিনি সময়কে তাঁর ভৃত্য করে নিয়েছিলেন। এইজন্যেই জীবনের প্রতিটি দিন তাঁর কাজে লেগেছে, এবং এইজন্যেই তার ভাগ্যে দুর্লভ সম্মান লাভও সম্ভব হয়েছে।

সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাঁর মন আবদ্ধ ছিল না। এইজন্যেই তিনি নানাবিধ বিষয়ে চর্চা করেছেন, এবং প্রবন্ধে বা পুস্তকে তাঁর অর্জিত জ্ঞান বিতরণ করে গিয়েছেন।

নব্যভারত পত্রিকায় তাঁর রচনা শুরু, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ছিলেন সম্পাদক। দাসী পত্রিকায় 'নানা কথা' নাম দিয়ে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে লিখেছেন। প্রবাসী পত্রিকার জন্মকাল থেকে এতে লিখেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়, সাহিত্যে, নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে, ভারতবর্ষে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবাসীতেই লিখেছেন সবচেয়ে বেশি।

তাঁর এইসকল রচনার কথা বলতে বলতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "লিখতাম বটে, কিন্তু বাংলাভাষা কখনো শিখি নি, শিখবার অবসর পাই নি। তার পর বাংলা ভাষা শিখতে বসি। তারই ফলস্বরূপ 'বাঙ্গালা-ভাষা' নামে দুই ভাগে বিভক্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংকলন করি। বাংলাভাষা চর্চা করবার সময় দেখি, বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরের সংস্কার করতে না পারলে এই ভাষা শিক্ষা সহজ হবে না। রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন, সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরের আকার-রক্ষণ এখন অনেক প্রেসে চলেছে। আমিই প্রথম ১৯১২ [বস্তুত, ১৯০৪ ?] সালে এই সূত্র ধরিয়ে দিই। আমার শব্দকোষ এইরকম অক্ষরে ছাপা হয়েছে।"

যোগেশচন্দ্র রায়ের এই গ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়ের অভিমত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না, তিনি বলেছেন, "এই শব্দকোষ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের এ একটা কীর্তি। এতে কেবল শব্দের অর্থই নেই— এটা আসলে একটা এনসাইক্লোপিডিয়া।"

যে বিষয়েই যোগেশচন্দ্র চর্চা করেছেন, সেই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি তৃপ্তি পান নি। তাঁর জীবনের এইটেই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অন্তরঙ্গ। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ১৩২৯ থেকে ১৩৩০, ১৩৩৮ থেকে ১৩৪২, ১৩৪৫ থেকে ১৩৪৮ ও ১৩৫৪—

এই কয় বৎসর তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি-পদ এবং ১৩৫৫-৫৬ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদ অলংকৃত করেন।

এ ছাড়া বিজ্ঞান-পরিষৎ ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং শেষজীবন পর্যন্ত কটকের উৎকল-সাহিত্যসমাজের বরেণ্য সভ্য ছিলেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বর্ধমান অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিত্ব করেন।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সহকারী সভাপতি সার্ যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঁকুড়া শহরে যোগেশচন্দ্রের উননবতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

দেশবাসীর কাছে তিনি জ্ঞানতাপস, সত্যানুসন্ধী শিক্ষাব্রতী, অক্লান্তকর্মী বৈজ্ঞানিক, একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী-রূপে পরিচিত হয়ে নিজে ধন্য হয়েছিলেন কি না জানি নে, কিন্তু বঙ্গদেশ এজন্যে নিজেকে ধন্য মনে করে।

সুশীল রায়

যোগেশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ। প্রথম ভাগ। সান্যাল এণ্ড কোম্পানি। শক ১৮২৫। ১৯০৩। পৃ ৫১৪।

সূচী॥ প্রথম খণ্ড। আমাদের জ্যোতিষী: বেদ-মধ্যস্থ জ্যোতিষ; জ্যোতিষ-সংহিতা; জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত; জ্যোতিষ করণ; জ্যোতিঃশাস্ত্রের বেদাঙ্গত্ব; বেদাঙ্গ জ্যোতিষ; ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব; প্রাচীন সিদ্ধান্ত কাল; অপরাপর সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড। আমাদের জ্যোতিষ: পৌরাণিক জ্যোতিষ— ব্রহ্মাণ্ড, জম্বুদ্বীপ, গ্রহ, নক্ষত্র; প্রাকৃত জ্যোতিষ— পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহণ, তারাগ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কা, নক্ষত্র, জগতের উৎপত্তি ও লয়; ফলিত জ্যোতিষ— সংহিতা স্কন্ধ, জাতক স্কন্ধ।

১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল যে আমাদের সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু নাই। দৈবক্রমে মহামহোপাধ্যায় সামন্ত শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। তাঁহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ আলাপেই বুঝিতে পারি যে, আমাদের প্রচলিত পত্রিকার মধ্যেই অনেক চিত্তাকর্ষক গণনা আছে এবং দূরবীক্ষণ উদ্ভাবনা ও কোপার্নিকের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বকালের য়ুরোপীয় জ্যোতিষ অপেক্ষা আমাদের জ্যোতিষ কিছুমাত্র ন্যূন নহে।… আমাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটি ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থন করাই আমার উদ্দেশ্য।— গ্রন্থকারের ভূমিকা।

রত্নপরীক্ষা। কেদারনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। শক ১৮২৫। ১৯০৪। পৃ ২১৬

সূচী॥ রত্নশাস্ত্রের ইতিহাস; রত্নগণনা ও রত্নের সামান্য লক্ষণ; মহারত্ন: হীরক, মাণিক্য, সৌগন্ধিক, নীলগন্ধি, নীলমণি, মরকত; স্বল্পরত্ন: বৈদূর্য, পুষ্পরাগ, গোমেদ, বৈক্রান্ত, কর্কেতন, পুলক, ভীষ্মমণি, তুর্মলি;

উপরত্ন : স্ফটিক, রাজাবর্ত, মুক্তা-জ্যোতীরস, শিখরী, রাজমণি, ব্রহ্মময়, তৈলাখ্য, পিঙ্গস্ফটিক, নীলাঙ্গ, স্বর্ণাঙ্গী, সূর্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, জলকান্ত, রুধিরাখ্য, সীস, জ্যোতীরস, পিণ্ড, গন্ধর্ব, গন্ধশস্য, গঞ্জ, পালঙ্ক, পীলু, অয়স্কান্ত, গিরিকাচ, সস্যক, তুত্থক, পারিভদ্র, রুচক ; মুক্তা : শুক্তি, শঙ্খ, মীন, ভেক, সর্প, বরাহ, গজ, বংশ, মেঘ ; প্রবাল ; শঙ্খ ; ধাতু : স্বর্ণ, রূপ্য, তাম্র, বঙ্গ, যশদ, সীস, লৌহ, পিত্তল, কাংস্য, বত্ত, বজ্রসংঘাত ; রত্নের পরীক্ষা : উপাদান, সংস্থান, সস্তেদ, বিভঙ্গ, কঠোরতা, গুরুত্ব, স্বাদ গন্ধ স্পর্শ, প্রভা, অচ্ছতা, বর্ণ, ছায়া, স্ফুরজ্জ্যোতিঃ, তড়িত্ব, চুম্বকত্ব, অগ্নিপরীক্ষা, ক্ষারপরীক্ষা ; উপসংহার।

অন্যান্য বিদ্যায় যাহাই হউক, রত্নপরীক্ষা-বিদ্যায় আমাদের পিতামহগণ কোন জাতির নিকট ঋণী ছিলেন না। এই পুস্তকে পুরাতন ও নূতন জ্ঞান গ্রথিত করিয়া পুরাতন আধারের উপর নূতন মত স্থাপন করা গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহাকে আমাদের পুরাতন রত্নশাস্ত্রের আধুনিক সংস্করণ করাই উদ্দেশ্য।...গ্রন্থকারের ভূমিকা।

শংকু নির্মাণ। অর্থাৎ নানাবিধ সূর্যঘড়ী-নির্মাণ-বিষয়ক উপদেশ। দাসগুপ্ত কোম্পানি। শক ১৮৩০। পৃ ১২০

সূচী ॥ উপক্রম ; পরিভাষা ; সূর্য-ঘড়ীর মূলতত্ত্ব ও নাম ; মধ্যরেখা-নির্ণয় : শংকু দ্বারা, বিলাতী ঘড়ী দ্বারা, চুম্বক-শলাকা দ্বারা, ধ্রুবতারা দ্বারা ; সূর্য-ঘড়ী-নির্মাণ ও স্থাপন : বিষুব-পীঠ, ধরা-পীঠ, সম-পীঠ, যাম্যোত্তর-পীঠ, অপগত-পীঠ, উৎ-পীঠ ; কৌতুক শংকু : ধরা-পীঠ ও সম-পীঠ, বিষুব-পীঠ ও উৎ-পীঠ, বজ্র-শংকু, পংচশংকু ও সপ্তশংকু ; পরিশিষ্ট : যন্ত্রনির্মাণ বিষয়ে সংকেত ; সারণীর বিবৃতি : অক্ষাংশ ও দেশান্তর, কাল-সমীকরণ, জ্যাদি, ধরাপীঠ যন্ত্রের ঘণ্টারেখান্তরাংশ, ধরাপীঠ যন্ত্রের ঘণ্টারেখান্তরাংশের পূর্ণজ্যা ; সারণী : অক্ষাংশ ও কলিকাতা হইতে দেশান্তর মিনিট, কালসমীকরণ সারণী, জ্যাদি সারণী, ধরাপীঠ যন্ত্রের ঘণ্টারেখান্তরাংশ সারণী, ধরাপীঠ যন্ত্রের ঘণ্টারেখান্তরাংশের পূর্ণজ্যা সারণী ; শব্দার্থ-সূচী।

বিলাতী ঘড়ী নির্মাণের পূর্বে বিলাতেও সূর্য-ঘড়ী দৈনিক কালবিভাগের একমাত্র উপায় ছিল। সাবধানে নির্মাণ ও স্থাপন করিতে পারিলে সূর্য-ঘড়ী সাহায্যে এক মিনিটের এদিক্ ওদিকে সময় জানিতে পারা যায়। এদেশে পূর্বকালে তাম্রঘটির ব্যবহার অধিক ছিল। জ্যোতির্বিদের গৃহে অন্যান্য কালমাপক যন্ত্র থাকিত। তন্মধ্যে শঙ্কু-যন্ত্র শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত।...শঙ্কু-যন্ত্র একপ্রকার সূর্য-ঘড়ী।...এখানে অনায়াসসাধ্য এবং শঙ্কু-যন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী কয়েক প্রকার সূর্যঘড়ীর মূল তত্ত্ব, নির্মাণ, স্থাপন ব্যবহার বিবৃত হইতেছে।... 'উপক্রম'।

বাঙ্গালা ভাষা। প্রথম ভাগ

ইহা তিন অধ্যায়ে স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম দুই অধ্যায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার যথাক্রমে পঞ্চদশ ও সপ্তদশ ভাগের অতিরিক্ত সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তৃতীয় অধ্যায় 'পরিষৎ-গ্রন্থাবলী ৩৮' রূপে প্রকাশিত।

প্রথম অধ্যায়। রাঢ়ের ভাষা। ১৩১৫। পৃ ৩৪

দ্বিতীয় অধ্যায়। বাঙ্গালা শব্দ-শিক্ষা। ১৩১৭। পৃ ৩৫-১০৬

তৃতীয় অধ্যায়। ব্যাকরণ। ১৩১৯। পৃ ১০৭-২৯৬

বাঙ্গালা ভাষা। দ্বিতীয় ভাগ, বাঙ্গালা শব্দ-কোষ। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

চারি খণ্ডে প্রকাশিত। ২-৪ খণ্ডে 'পরিষৎ-গ্রন্থাবলী-সং ৩৮' মুদ্রিত।

প্রথম খণ্ড। ১৩২০। পৃ ২৬৪

দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩২০। পৃ ২৬৫-৫২৮
তৃতীয় খণ্ড। ১৩২১। পৃ ৫২৯-৮০০
চতুর্থ খণ্ড। ১৩২২। পৃ ৮০১-৯৭৯

বাঙ্গালা ভাষায় বহু বহু সংস্কৃত শব্দ চলিতেছে। বস্তুতঃ বিভক্তিহীন যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে। যে সকল শব্দ স্পষ্ট সংস্কৃত, উচ্চারণে না হইলেও বানানে সংস্কৃত, সে সকল শব্দের নিমিত্ত সংস্কৃত শব্দ-কোষ আছে। কিন্তু বাঙ্গালা প্রয়োগে যে সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে, সে সকল শব্দ এই কোষে পাওয়া চাই। তদ্‌ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি-অর্থ-প্রয়োগ-প্রদর্শন এই শব্দকোষের উদ্দেশ্য।—সূচনা

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। [প্রথম খণ্ড] সেন ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং। বেঙ্গল লাইব্রেরির তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ১৯১৯। পৃ ১১৬

সূচী॥ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ; কলাগাছ; কবিকঙ্কণ চণ্ডী; তেলেগু দেশ; ফুলের বাগান; কুষ্মাণ্ড; ধূলা; খণ্ডগিরি; দধিবীজ; অগ্নিমন্থন।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। দ্বিতীয় খণ্ড। রাণী বিশ্বেশ্বরী। সান্যাল এণ্ড কোম্পানী। ১৩৩৩। পৃ ৪৬

সূচী॥ রাণী বিশ্বেশ্বরী। দেশে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা, বর্দ্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ; জন্ম ও মৃত্যু; ইতিহাসের ক্রম; স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ; বর পণ; আমাদের দৃষ্টিশক্তি; ১৩০৪ সালের ভূমিকম্প।

শিক্ষাপ্রকল্প। বিশ্বভারতী। বৈশাখ ১৩৫৫। পৃ ৭২

সূচী॥ পাঠশালায় শিক্ষা; শিক্ষার বীজ; মধ্য ও অন্ত্য শিক্ষা; দেশে জ্ঞানপ্রচার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংস্কার। অনাথগোপাল সেন স্মৃতি-সমিতি। ১৯৫০, ভাদ্র ১৩৫৭। পৃ ১০০

সূচী॥ বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা; বিদ্যালয়ের ভাবী মানস-চিত্র; বিশ্ববিদ্যালয়; মহা-বিদ্যালয়, মহা-বিজ্ঞানালয় ও মহা-কলালয়; মহা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিপাটী।

অনাথগোপাল সেন স্মৃতি-পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ।

পূজাপার্বণ। বিশ্বভারতী। আশ্বিন ১৩৫৮। পৃ ১৭৮

সূচী॥ দোলযাত্রা; শারদোৎসব; রাসযাত্রা; সরস্বতীপূজা; বারমাসে তের পার্বণ; দুর্গোৎসব-প্রশ্ন; শ্রীশ্রীদুর্গা; মহিষমর্দিনী; দুর্গার প্রতিমা; দুর্গাপূজা শরৎকালীন যজ্ঞ; দুর্গোৎসব নববর্ষোৎসব; দুর্গোৎসবের পুরাণের দেশ ও কাল; পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ।

কোন্ পথে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ফাল্গুন ১৩৫৯। পৃ ১৯৬

সূচী॥ কোন্ পথে; ছোট ও বড়; আমার মালী; কোন্‌টি চান; অন্নচিন্তা; আকারের উৎপত্তি ও প্রয়োজন; নরনারীর কর্মভেদ; কন্যাদের বিবাহ হবে না?

পৌরাণিক উপাখ্যান। এম্. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স। ভূমিকার তারিখ মাঘ ১৩৬১। পৃ ১৩২

সূচী॥ মুখবন্ধ; পুরাণে দেশ; বিষ্ণুর বরাহ ও কূর্ম অবতার; বিষ্ণুর বামনাবতার; বিষ্ণুর মৎস্য অবতার; ব্রজের কৃষ্ণ; পুরাণে চন্দ্র; অগস্ত্যোপাখ্যান; রামোপাখ্যান; ত্রিশঙ্কু উপাখ্যান; ভারতযুদ্ধকাল; পরিশিষ্ট; তন্ত্র।

ধনুর্বেদ। বিশ্বভারতী। ফাল্গুন ১৩৬১

সূচী॥ প্রস্তাবনা; অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদ; সমরনীতি; বশিষ্ঠ ধনুর্বেদ; কয়েকটি প্রাচীন অস্ত্র।

বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। চৈত্র ১৩৬১। পৃ ১৫২

সূচী॥ প্রস্তাবনা; সরস্বতী; উষা ও উর্বশী; ধ্রুবতারা; কৃত্তিকাই পূর্বদিকে উদিত হয়; যজুর্বেদের কাল; ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গ রচনাকাল; ফল্গুনী পূর্ণিমা; রুদ্র; ঋগ্‌বেদের আদিত্য; ইন্দ্র; অশ্বিদ্বয়; সোম; অগ্নি ও বিশ্বদেব; আর্যভূমি; পরিশিষ্ট।

"১৯৩৬ সালে Astronomical Landmarks in Indian Antiquity এই নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করি। ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত।...এই পুস্তক কোনও কালে প্রকাশিত হইবে কি না, ...সন্দেহ হইতে লাগিল। তখন...প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া বাংলায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলাম।...এই পুস্তক আমার ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ নহে; ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লিখিত। বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয় আমার ইংরেজী পুস্তকের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বেদের দেবতার পরিচয় এই পুস্তকের মুখ্য বিষয়;...ইহাতে দেখাইয়াছি, ঋগ্‌বেদে অন্ততঃ দশ সহস্র বৎসরের পুরাতন ঘটনার উল্লেখ আছে।"—গ্রন্থকারের ভূমিকা।

কি লিখি। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। শ্রাবণ ১৩৬৩। পৃ ২০০

সূচী॥ কি লিখি; বাংলা ভাষার লিখন ও পঠন; বাংলা শব্দ ও বানান; ইংরেজীর বাংলা; প্রাচীন পুথীর সংস্করণ; কবি শকাঙ্ক; বাংলা বিরামাদি চিহ্ন; গল্প; পুরানা গল্প; বাংলা ভাষার প্রসার চিন্তা; বাঙ্গলা নবলিপি।

ইংরেজি গ্রন্থ

THE FIRST POINT OF ASWINI (The Indian First of Āries). Prabasi Press. 1934. Pp. 16.

Contents. Introduction; The Initial Point; The Vedango Jyotisha; Āryabhata; D versus L of Chitrā; Conclusion.

ANCIENT INDIAN LIFE. Published by P. R. Sen. Sen Roy & Co. 1948. Pp. 212.

Contents. Life in Ancient India; Food and Drink in Ancient India; Sugar Industry in Ancient India; Textile Industry in Ancient India; Fire-Arms in Ancient India; The Days of the Hindu Calendar; The Eugenics of Hindu Marriage.

বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ

যোগেশচন্দ্র রায়-লিখিত বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থগুলি সব দেখিবার সুযোগ হয় নাই, উহার তালিকা ও প্রকাশ-তারিখ শ্রীসুশীল রায় লিখিত মনীষী-জীবনকথা হইতে গৃহীত। যেগুলি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে সেগুলির বিবরণও প্রদত্ত হইল।

পুস্তকগুলি গতানুগতিক পাঠ্যগ্রন্থ নহে, তৎকালপ্রচলিত বহু পাঠ্যপুস্তকে তিনি যে-সকল ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহার নিরসনার্থ রচিত; প্রচলিত শিক্ষাবিধির অপূর্ণতা তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

সরল পদার্থ-বিজ্ঞান। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।

সূচী॥ জড়ের বিবরণ; জড়ের সাধারণ গুণ; গতি ও বল; তরল পদার্থ; বায়বীয় পদার্থ; বায়ু-ঘটিত যন্ত্রাদি; শব্দ; আলোক; তাপ ও তাপের ক্রিয়া; তাপ-সঞ্চালন; চুম্বকধর্ম্ম; ঘর্ষণজনিত তাড়িত; রাসায়নিক সংযোগজনিত তাড়িত।

'বালকদিগের জন্য লিখিত অধিকাংশ বিজ্ঞানগ্রন্থে বিজ্ঞান ও তত্ত্বগুলি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রথমতঃ সূত্রস্বরূপ লিখিত হয়। পরে এই সকল সূত্রস্থিত তত্ত্বের প্রমাণস্বরূপ দুই একটি উদাহরণ কিম্বা পরীক্ষা দিয়া তাহা শেষ করা হয়। এই প্রকার প্রণালী প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে…অনুপযোগী…। এজন্য আমি এই পুস্তকে উক্ত প্রথা একেবারে ত্যাগ করিয়াছি। প্রথমতঃ সহজ সহজ উদাহরণ এবং পরীক্ষা দিয়া অল্পে অল্পে সাধারণ নিয়মে উপনীত হইয়াছি। এই প্রণালীতে শিক্ষার্থীর কৌতূহল ও আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।' —ভূমিকা

এই পুস্তকটির অন্তত ছয়টি সংস্করণ হইয়াছিল। ষষ্ঠ সংস্করণ পুস্তক (দাসগুপ্ত এবং কোং। পৃ ১৯৪। ১২৯৬) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারে আছে, এই বিবরণ উহা হইতে গৃহীত।

সরল প্রাকৃত ভূগোল। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

সরল রসায়ন। ১৮৯৮

A PRIMER OF PHYSIOGRAPHY. Indian Depository, 1899. Pp. 118.

Contents: The Air; The Waters of the Ocean; The Land of the Globe; The Sculpture of the Land; The Earth is a Planet.

"My object in writing this little book has been to give our Indian students an elementary knowledge of the general principles of modern Physiography . . . with illustrations drawn . . . . from phenomena falling within the scope of their own observation. It is in this last respect that the numerous existing text-books . . . . fall short of the requirements. . . . ."

PRACTICAL CHEMISTRY FOR BEGINNERS. 1910.

সম্পাদিত গ্রন্থ

সিদ্ধান্তদর্পণঃ। মহামহোপাধ্যায়। সামন্ত-শ্রীচন্দ্রশেখর-সিংহেন। বিরচিতঃ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাদিত। ইণ্ডিয়ান ডিপজিটরী। ১৮২১ শক।

যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত ইংরেজি ভূমিকা ('Introduction') পৃ ৯-৬৬; সংস্কৃত 'ভূমিকা', পৃ ৬৭-৬৮

পত্রালী। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত। কেদারনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮২৫ শক। ১৯০৩। পৃ ২২৮

সূচী॥ প্রকৃতি বৈচিত্র্য ১: গান; চন্দ্র; শুকতারা; কি খাই, কেন খাই; কান্না; দুগ্ধ; প্রকৃতি বৈচিত্র্য ২: বিজ্ঞতা; অঙ্গরাগ কি বিড়ম্বনা নয়; ভূষণ; কবিতা; জগৎ কি আঁধার; ভূকম্প ও পর্ব্বত; প্রকৃতি বৈচিত্র্য ৩: ফুল ফুটে কখন; এক দুই তিন; বিজ্ঞানচর্চ্চা বা প্রকৃতি আরাধনা; বিজ্ঞানে নাস্তিকতা; সখ্য; চিত্রকলা; সুখ-দুঃখ।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার কোন বন্ধুর সহিত এদেশে সাধারণ জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। তাহারই ফলস্বরূপ তিনি পত্রচ্ছলে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া আমার নিকট প্রেরণ করেন। অধিকাংশ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ ছিল। তন্মধ্যে ২০ খানি পত্র যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া পত্রালী নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হইল। —বিজ্ঞাপন।

কৃষ্ণপ্রসাদ সেন-বিরচিত চণ্ডীদাস-চরিত। চণ্ডীদাস-চরিত। সংস্কর্তা শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। প্রবাসী কার্যালয়। ১৩৪৪। পৃ ২৩৬

যোগেশচন্দ্র রায় লিখিত ভূমিকা ('সংস্করণের বিজ্ঞাপন'), পৃ ১-৪

যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অধুনা-প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত অন্যগুলি সহজলভ্য নহে। এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, চৈতন্য লাইব্রেরি রামমোহন লাইব্রেরি এবং শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে দৃষ্ট।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনা

বর্তমান গ্রন্থপঞ্জীতে আচার্য যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার সূচী সংকলিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'পরিষৎ-পরিচয়' গ্রন্থে (ফাল্গুন ১৩৫৬) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১-৫৬ বর্ষ) প্রকাশিত যাবতীয় রচনার একটি বিষয়ক্রম তালিকা প্রকাশিত হয়— এই তালিকায় দেখা যায়, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান (সাধারণ), বিজ্ঞান (পরিভাষা) ইত্যাদি প্রায় সকল বিভাগেই আচার্য যোগেশচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবাসী পত্রে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত তাঁহার বিচিত্রবিষয়ক রচনার তালিকা প্রবাসী ভাদ্র ১৩৬৩ সংখ্যায় সংকলিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬০ সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়াছিলেন।

শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

গ্রন্থপরিচয়

বাংলা সাহিত্যের নরনারী। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য আড়াই টাকা।

ছোট ছোট প্রবন্ধের বই। সূচীপত্র উল্‌টে দেখলে মনে হয় প্রমথবাবু বাংলা সাহিত্যের চল্লিশটি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত চরিত্রের ছবি এঁকেছেন তুলির ছোট ছোট আঁচড়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা হতে আরম্ভ করে মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্ত ও ফুল্লরা, ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী, টেকচাঁদের ঠকচাচা, মাইকেলের রাবণ, প্রমীলা এবং নববাবু, দীনবন্ধু মিত্রের কাঞ্চন, বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী মনোরমা ইত্যাদি, রবীন্দ্রনাথের দেবযানী মালিনী ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রভৃতি, মায় পরশুরামের শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করেই চমকে যেতে হয়। ছোট ছোট প্রবন্ধ, কিন্তু যে পরিমাণে ছোট সেই পরিমাণে গভীর এবং অন্তঃসন্ধানী। সাহিত্যিকের মেজাজ, সমাজসন্ধানীর দৃষ্টি এবং অত্যন্ত শক্তিশালী কলমের সংহত সমন্বয়। এই ক্ষুদ্র পরিসরে এক-একটি সুদূরপ্রসারী ছবির সৃষ্টি। লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই।

যেমন, ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনী। প্রমথবাবু লিখেছেন, "ভারতচন্দ্রের মানসিংহ ও ভবানন্দ রচনা মাত্র।· ·তাহারা কাহিনীর বাহন।· ·বিদ্যা ও সুন্দর বর্ণনা মাত্র। বাক্য-অলংকারে এবং স্বর্ণ-অলংকারে তাহারা এমনি ভারগ্রস্ত যে নড়িতেও অক্ষম। ভবানন্দ ও মানসিংহ তবু নড়িত চড়িত।· ·কেবল হীরাকে বিশ্বাস করিতে হইলে কাহারো সাক্ষ্যের আবশ্যক হয় না; সে শুধু স্বতন্ত্র নয়, স্বয়ম্ভূ। ভারতচন্দ্রের আগে হইতেই সে ছিল, কবি তাহাকে উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন। হীরা মালিনী নিতান্তই tour de force." হীরা মালিনীর অত্যন্ত চমৎকার চরিত্রচিত্রণ। অথবা ঠকচাচা সম্বন্ধে লেখকের অঙ্গুলি নির্দেশ— "দুনিয়া সাচ্চা নয়, মুই একা সাচ্চা হয়ে কি কর্‌বো? আমাদের অধিকাংশেরই ঐ কথা। ঐ সামান্য রন্ধ্রপথে সংসার কীর্তিনাশার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে।" একটি মন্তব্যেই সমস্ত চিত্রটি, সমাজের মেকিভেল্‌কি-সমেত, সামগ্রিক গভীরতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রাবণ সম্বন্ধে লেখকের আলোচনাটি বড়ই মনোজ্ঞ। প্রথমেই তিনি দেখিয়েছেন, অটল গম্ভীর রাবণ-চরিত্রের উত্তুঙ্গশিখরের মতো মহোচ্চতা এবং একাকিত্ব। মহিমা আর আঘাত। খেদোক্তি আর দম্ভ।—

"অতলস্পর্শী শোকের গৌরবে ত্রিদিববিজয়ী রাবণ একপ্রকার মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে— সমুদ্রোপকূলবর্তী তরঙ্গাভিঘাত-অভিষিক্ত মহীধর যেমন স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে উচ্চতর। স্বাভাবিক অটলতার চেয়ে অটলতর মনে হয়, অনেকটা তেমনি। তার উপরে অস্তগামী সূর্য যখন আবার বেদনার আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দেয় তখন আর তাহাকে লৌকিক বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় কোন্ স্বয়ং-কিরীটিত অলৌকিক মহিমা মানব-নয়নের সার্থকতা সাধনের উদ্দেশ্যে ক্ষণকালের জন্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছে।"

কিন্তু শুধু তাই নয়। লেখক, দ্বিতীয়তঃ, দেখিয়েছেন, মাইকেলের রাবণ প্রাকৃতিক শক্তির (elemental force) সৃষ্টি। "প্রাকৃতশক্তি যেমন এখনো মাঝে মাঝে একটা আধটা গিরিচূড়া ঠেলিয়া খাড়া করিয়া দেয়, একটা আধটা উপসাগর অকস্মাৎ খনন করিয়া দেখায়, রাবণ-চরিত্র তেমনি প্রাকৃত শক্তির একটা কাজ— লবণাম্বুভিহত দুর্ধর্ষ গিরিচূড়ার ন্যায় সে দণ্ডায়মান।· ·বাংলা সাহিত্যে মেঘনাদবধের রাবণ ব্যতীত প্রাকৃত চরিত্র তো দেখি না।" তৃতীয়তঃ লেখক দেখিয়েছেন তৎকালীন সামাজিক উপদ্রব মাইকেলের

মনে যে সংঘাত ঘটিয়েছিল রাবণ তারই সৃষ্টি— "ইংরাজি-শিক্ষিতের প্রতিনিধিরূপে মাইকেল রাবণ চরিত্র ঢালাই করিয়াছিলেন।· · মাইকেল মুখে স্বর্ণলঙ্কা বলিলেও মনে মনে ইংলণ্ডের কথাই ভাবিতেন।· ·বাল্মীকির পরে অনেক ভারতীয় কবি রামায়ণ-কাহিনী লিখিয়াছে— কিন্তু মাইকেলের কাব্যের সঙ্গে তাহাদের কাব্যের মূলগত প্রভেদ এই যে, তাহারা কেহই রাবণের জয়ধ্বনি করে নাই। মাইকেল প্রথমে রাবণের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।" কিন্তু এই তৎকালিক ছায়াপাত সত্ত্বেও রাবণ যে সার্বকালিক হয়ে উঠেছে তার কারণ, "মাইকেল রাবণের মহিমার সহিত অপর একটি উপাদান মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেটি অপরিমেয় বেদনা। সেই বেদনার জ্বালাতেই রাবণ আজ আমাদের সমবেদনার পাত্র, আমাদের সগোত্র। আজ ইংরাজি শিক্ষার মোহ অপগত, ইংরাজ-শাসনের ব্যর্থতাই আজ শুধু বিদ্যমান। মহিমার অত্যুচ্চ চূড়ায় আসীন হইয়াও পার্শ্ববর্তী সুগভীর খাদটাই কেবল রাবণের চোখে পড়িয়াছে। এত ঐশ্বর্য, এত প্রতাপ সত্ত্বেও সর্বনাশ যে কেন শনৈঃ শনৈঃ নিকটবর্তী হইতেছে সে বুঝিতেই পারে নাই— তাই সে প্রত্যেকটি বিপৎপাতের পরে এই মর্মে খেদোক্তি করিয়াছে— কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?· ·এইখানেই মাইকেলের যথার্থ কবি-দৃষ্টি, ইহাতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ-দর্শনের পরিচয়।· · তিনি সেকালে বসিয়া দূরকালকে, তাঁহাদের সময় হইতে আমাদের সময়কে, ইংরাজশাসনের প্রারম্ভ হইতে তাহার উপসংহারকে, বাঙালি-সমাজের উন্নতির সূচনা হইতে তদীয় অবনতির সূত্রপাতকে যেন দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আর সেইজন্যই রাবণের চরিত্রে ঐশ্বর্যের সঙ্গে বিষাদকে, প্রতাপের সঙ্গে নৈরাশ্যকে, দম্ভের সঙ্গে সকরুণ খেদোক্তিকে মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এ-হেন বিষম উপাদানে গঠিত বলিয়াই রাবণ দুটি অসমকালের প্রতীক হইতে পারিয়াছে, রাবণ সেকালেরও প্রতিনিধি, একালেরও বটে।" এমনি অজস্র সরস ও গভীর মন্তব্যে বইখানা ভরা। সাহিত্যরসিকেরা পড়ে আনন্দ পাবেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

ডাকের চিঠি। শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা

ডাকের চিঠিগুলি পড়ে অবধি মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে থাকে, কারণ উনত্রিশখানি নাতিহ্রস্ব চিঠি মনোযোগ সহকারে আগাগোড়া পাঠ করেও, যে প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে সেগুলি লিখিত, সে বাস্তবই হোক অথবা কাল্পনিকই হোক, তার নাগাল পাওয়া যায় না। যার জন্য পত্রলেখকের এত উৎকণ্ঠা এত আগ্রহ, সে যে কেমনধারা মানুষ সে কথা ঘুণাক্ষরেও জানা যায় না। মনে হয় সে কোনো রূপসী নারীই হবে বা, নিশ্চয়ই তার গুণেরও অন্ত নেই, খামখেয়ালীও বটে, সেইজন্য চিঠিগুলিতে ব্যাকুলতার সঙ্গে একটা অতিশয় সাবধানী আড়ষ্টভাবও দেখা যায়। যে লিখছে সে নিজের মনকে জানলেও, যাকে লিখছে তার সম্বন্ধেও যেন একটু নিশ্চয়তার অভাব মনে হয়। তাই স্থানে স্থানে চিঠিগুলিকে মনের কথার আদানপ্রদানের বাহন হিসাবে কিঞ্চিৎ অযোগ্য বলে বোধ হয়। চিঠি হিসাবে অচল হলেও, কাহিনী হিসাবে বইখানির অনেক গুণ আছে। যে মানুষটি চিঠি লিখছে তার একটা স্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে। একটি ভাবুক ছেলেকে চাকরির খাতিরে বাড়িঘর ছেড়ে কিছুদিন সম্ভবতঃ বীরভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলে বাস করতে

হয়, তারই একটা নরম মিষ্টি গল্প। কাহিনীর পরিবেশেরও একটা চিত্তাকর্ষক রূপ ফুটে ওঠে। শুক্‌নো রুক্ষ মাটি কিন্তু ভারী উর্বরা, তাল খেজুরের গাছের সারি, শীতকালে সেখানে মেলা বসে, বাউলরা গান গায়, ছেলেরা বসে তেলে-ভাজা কিনে খায়।

বর্ষার জলে পথঘাট পিছল হয়ে যায়, মোটরগাড়ি বিপদে পড়ে; মেলা ফুল ফোটে; সাঁওতাল মেয়ে কালো চুলে ফুল গুঁজে বেড়াতে যায়।

যে সব মানুষদের বিষয় চিঠিতে লেখা হয়, তারা সবও জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। গরিব মুসলমান বৌ ছেলে হবার সময় অচেনা হাসপাতালে যেতে রাজী হয় না।

যাযাবর ভিখারি এর বাড়ি ওর বাড়ি খেয়ে বেড়াবে তবু তার মান-অপমানজ্ঞান হারাবে না। স্বাবলম্বী বুড়োর এক শ বছরের বেশি বয়স, তবু ছেলের কাছে হাত পাতবে না; আহত ডাকাত মর্মান্তিক যন্ত্রণায় হাসপাতালে পড়ে থাকবে, তবু নিজের পরিচয় দেবে না; ছোট ভাই হঠাৎ রেগে বড় ভাইকে প্রায় খুন করে ফেলবে, তবু তার ক্ষমা হবে; ঘর বাড়ি নেই, তবু বাউল তার সব কটি পয়সা দিয়ে ফুলের মালা কিনে যাকে-তাকে বিলিয়ে দেবে; সব ছেড়ে দিয়ে যে-ঠাকুরকে আঁকড়ে ধরে মানুষটা জীবন কাটাবে, হঠাৎ একদিন বলা নেই কওয়া নেই, তাকেও ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। সব কিছুর মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের আদর্শ ফুটে উঠেছে যে লেখককে অভিনন্দন না করে পারছি না। তবে চিঠিপত্রগুলির সর্বজয়ী উদ্দেশ্যটিকে একেবারে উহ্য রাখাটি ভালো হয় নি। মানুষটার যেটুকু প্রকাশ পায় তাও আমাদের পছন্দ হয় না। চিঠির উত্তর প্রায়ই দেয় না, হঠাৎ এসে ছেঁড়া চেয়ারে বসে আবার চলে যায়, কিছু খায় দায় বলেও মনে হয় না। এবং সব চেয়ে বেশি অ-ক্ষমনীয় যেটা সে হল যে ঐ মেয়ে কি বলে এই রকম নৈর্ব্যক্তিক উচ্ছ্বাসে ভরা, থেকে থেকে সুদীর্ঘ সার্মন-বিশিষ্ট, এবং সম্ভবতঃ তৃতীয় ব্যক্তি পড়বে আশা ক'রে অতি সতর্ক ভাষায় লিখিত চিঠিগুলির অবিরাম স্রোতকে গোড়াতেই নির্মম হাতে রোধ করে দেয় নি।

হালকা মেঘের মেলা। সম্পাদক শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। পুস্তক প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

বইখানির মলাটের উপর পালকের মত আঁকিবুঁকি এবং নামকরণের বালসুলভ কবিত্ব দেখে গোড়াতে মনটা কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে পড়লেও, প্রবন্ধসংগ্রহখানি এতই প্রশংসনীয় যে শেষ পর্যন্ত খুশি না হয়ে উপায় নেই। বাস্তবিক এত ভালো প্রবন্ধসংকলন সচরাচর চোখে পড়ে না, সম্পাদক মহাশয় সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধসংগ্রহের ভূমিকাটি তদনুরূপ হয় নি। বরং ভূমিকা না থাকলেই ছিল ভালো, রচনাগুলি আপনারাই আপনাদের পরিচয় দিত।

সম্পাদক মহাশয় নিজে বইএর নাম রেখেছেন "হালকা মেঘের মেলা," অথচ তিনি যে কেন "রম্যরচনা" শব্দের প্রতি এতই বিমুখ যে সেকথা প্রতিপন্ন করবার জন্য গোটা একটা অধ্যায় রচনা করতে হল, এ কথা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হয় না। ফরাসী Belles Lettres (বেল্‌ লেত্‌র্‌)- এর অনুবাদ রম্যরচনাই হোক অথবা ললিতলিপিই হোক, এইটুকু সহজেই বোঝা যায় যে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল সেজেগুজে মানুষকে খুশি করা। ঐ যে চিন্তারাজ্যের উজ্জ্বল স্ফটিকখণ্ডের কথা সম্পাদক বলেছেন, ওসব নিয়ে হাঙ্গামা না করে, বাক্যরাজ্যের রঙিন কাচগুলি দিয়েও মানুষকে খুশি করা যায়। যদি সঙ্গে থাকে

অন্তরঙ্গতা। এবং এই ধরনের প্রবন্ধের মাধুর্যই সেইখানে। বুদ্ধদেব বসুর "আড্ডা", কিম্বা জ্যোতির্ময় রায়ের "কড়া", কিম্বা বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "দাঁত" নামক প্রবন্ধের এতখানি প্রসাদগুণ আছে যে তাদের কোনো গভীর চিন্তার প্রয়োজন থাকে না।

ভূমিকা সম্বন্ধে আরেকটি কথাও বলতে হয়। গদ্যসাহিত্যের মধ্যে প্রবন্ধই যে সর্বাগ্রে রচিত হয়েছিল এ কথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। তবে হয়তো সর্বাগ্রে লিখিত হয়ে থাকা অসম্ভব নয়। পদ্য মনে রাখা সহজ, গল্পও মানুষের মনে থাকে, কিন্তু ভালো প্রবন্ধকে আশু লিপিবদ্ধ না করলে তার লোপ পাবার আশঙ্কা আছে। রচনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ কথা নিশ্চিন্তে বলা চলে যে প্রবন্ধের পূর্বে গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং টেকচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করবারও অনেক পূর্বে বাংলাদেশের ছেলেবুড়ো বেহুলার দুঃখে কাঁদত।

গ্রন্থের শেষাংশে লেখকদের পরিচিতিটুকুর মূল্য অনেকখানি, যদিও ভূমিকাতে তাঁদের লেখার সমালোচনাটা বাদ দিলেও চলত।

প্রবন্ধগুলির কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টির প্রশংসা করব ভেবে পাই না। ১৮৮২ সালে লেখা রাজনারায়ণ বসুর "জ্যেঠামো"কেই প্রথম পুরস্কার দেব, না ১৯৫৫ সালে নন্দগোপাল সেনগুপ্তর "বই-হারানো"কে? অবনীবাবুর 'লুকিবিদ্যে'ও কম যায় না, তবে ওটি প্রবন্ধ নয়, স্রেফ্‌ গল্প। এবং অতি উঁচুদরের গল্প।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এ বইখানি পাঠাগারে রাখবার, বন্ধুকে উপহার দেবার, সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার এবং বারংবার পাঠ করে মন ভালো করবার মতো একখানি বই।

এই ধরনের সাহিত্য শুকনো প্রাণে রস জোগায়, ঘরোয়া জিনিসকে অপরূপ ক'রে তোলে। এর সঙ্গে কাব্যের সাদৃশ্য আছে, এবং এ জিনিস রচনা করতে হলে কবিদের দিব্যচক্ষুর দরকার হয়।

শেষ পর্যন্ত এই ভেবে অবাক্‌ হতে হয় যে ১৮৮২ সালে রচিত 'জ্যেঠামো' নামক প্রবন্ধটিকে তো কেউ অতিক্রম করে যেতে পারে নি। তবে সূর্যের আলোরও তো প্রগতি হয় না। ভাগ্যিস হয় না।

লীলা মজুমদার

যে-তরণীখানি ভাসালে দুজনে আজি, হে নবীন সংসারী।
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী॥
কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন
শুভযাত্রায় আজি তিনি দিন প্রসাদপবন সঞ্চারি॥
নিয়ো নিয়ো চিরজীবনপাথেয়, ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে।
সুখে দুখে শোকে, আঁধারে আলোকে, যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্চায় চলে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে বিশ্বের মাঝে বিস্তারি॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

II সা সা সা । গা গা গমা । পা পা না । পা না না I
যে ত র ণী খা নি॰ ভা সা লে দু জ নে

I [প]র্সা র্সা র্সা । র্সা নর্সরা র্সা । না -ধনর্সা র্সনা । [ধ]পা -া -া I
আ জি হে ন বী॰॰ ন স ॰॰ঙ্ সা॰ রী ॰ ॰

I পা -ধা [ধ]র্সা । ণা ণা ণধা । পা পধা পা । মা গা -া I
কা ন্ ডা রী কো রো॰ তাঁ হা॰ রে তা হা র্

I [স]গা গা গা । গমা গমপা মা । গমা -রা গা । [র]সা -া -া II
যি নি এ ভ॰ বে॰॰ র কা॰ ন্ ডা রী ॰ ॰

[পা]
II {মা -পা পা । [প]না না -ধনর্সা । র্সা র্সা র্সা । র্সনা [র্]র্সা -া I
কা ল্ পা রা বা ॰॰র্ যি নি চি র॰ দি ন্

I [প]র্সা র্সা র্সা । -া র্সর্রর্সা -া । ননা -নধা পা । [প]নধর্সা না -া} I
ক রি ছে ন্ পা॰॰ র্ বিরা ॰॰ ম বি॰॰ হী ন্

I র্সা র্গা র্গা । -া র্গর্মা -র্পা । র্গর্পা র্মা র্গা । র্গর্রা র্সা -া I
শু ভ যা ॰ ত্রা॰ য়্ আ॰ জি তি নি॰ দি ন্

I র্সা র্সগা র্রা । র্সা নর্রা র্সা । নর্সা -ধা না । ধপা -া -মা I
প্র সা দ প বং ন সং ন্ চা রি ৹ ৹

I গা গা গা । গমা গমপা মা । গমা -রা গা । রসা -া -া II
যি নি এ ভং বেং৹ র কাং ন্ ডা রী ৹ ৹

II { সা সা সা । সপা পা পা । পা পা পা । পধা পমা গমা I
নি য়ো নি য়োং চি র জী ব ন পাং থেং য়ং

I পা ধা ণা । ধণর্সা ণা ণধা । পধা -মপা মা । গা -া -া I
ভ রি নি য়ো৹৹ ত রীং কং ৹৹ ন্যা নে ৹ ৹

I সগা গা গা । গা গরা গা । মা মপা মা । গা গরা গা I
সু খে দু খে শোং কে আঁ ধা রে আ লোং কে

I সগা গা গা । গমা গমপা মা । গমা -রা গা । রসা -া -া } I
যে য়ো অ মৃং তেং৹৹ র সং ন্ ধা নে ৹ ৹

[পপা]
I { মপা -া পা । পনা না নর্সা । র্সা নর্সর্রা র্সা । র্সা র্সা র্সা } I
বাঁধা ৹ না হি থে কোং আ লং৹৹ সে আ বে শে

I পর্সা র্সা র্সা । -া র্সর্রর্সা -া । ননা -নধা পা । পনধা -র্সর্সা না } I
ঝ ড়ে ঝ ন্ ঝাং৹৹ য়্ চলে ৹৹ যে য়োং ৹হে সে

I র্সা র্গা র্গা । -া র্গর্মর্পা -া । র্গর্পা র্মা র্গা । র্গর্রা র্সা র্সনা I
তো মা দে র্ প্রে৹৹ ম্ দিং য়ো দে শেং দে শেং

I র্সা -নর্গা র্রা । র্সা র্সা র্সা । নর্সা -ধা না । ধপা -া -মা I
বি ৹শ্ শ্বে র মা ঝে বিং স্ তা রি ৹ ৹

I গা গা গা । গমা গমপা মা । গমা -রা গা । রসা -া -া II II
যি নি এ ভং বেং৹ র কাং ন্ ডা রী ৹ ৹

স্বীকৃতি : যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ফোটো শ্রীবীরেন্দ্র সিংহ কর্তৃক গৃহীত

বীণা বাদিনী

হরিপুরা পট : শ্রীনন্দলাল বসু

১৯৩৮

বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৩৬৩

মৃত্যুশোক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনে যে ব্যক্তি কোনো বড় দুঃখ পেয়েছে অথচ সেই দুঃখের দ্বারা যে কোনো সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পায়নি, জগতে যার কোনো অধিকার বেড়ে যায়নি, সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য কেননা সে মূল্য দিয়েছে, অথচ সেই মূল্যের পরিবর্ত্তে তার যা প্রাপ্য সেইটি সে গ্রহণ করল না, ফেলে রেখে গেল। দুঃখ তার পক্ষে কেবল মাত্র দুঃখই, কেবল মাত্র ক্ষতি।

আমাদের কাছে জীবনের যেমন দাবী আছে, মৃত্যুরও তেমন দাবী আছে। যাদের আমরা ভালবাসি তারা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন আমরা তাদের সেবা করি, সেই সেবার অর্থই ত্যাগ করা, নিজের সুখ নিজের আরামকে ত্যাগ করে আনন্দিত হওয়া। এমনি করে জীবিত প্রিয়জনের জন্য আমরা প্রতিদিন নিজেকে নিজে খর্ব্ব করি ; এইরূপে জীবন যেমন আমাদের কাছে প্রতিদিন অল্প অল্প করে ত্যাগ গ্রহণ করে, মৃত্যু তেমনই আমাদের কাছ থেকে সকলের চেয়ে বড় ত্যাগ একেবারে গ্রহণ করে— চরম ত্যাগ, প্রেমের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন। জীবনে আমরা যা ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করি, উৎসর্গ করি, তা যদি আমাদের প্রিয়জনের মঙ্গলের কারণ হয়, তবে তার মৃত্যু উপলক্ষে আমরা যে এত সাধ একেবারে বিসর্জ্জন করি সে কি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে ? ব্যর্থ হয় যদি এর সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধ ঘটে।

যদি এমন কথা বলতে পারি যে আমার যা গেল সে আমি তোমার জন্যই উৎসর্গ করলুম, আমার এই দুঃখে আমার এই দানে তোমার মঙ্গল হোক্— আমি কিছুই টানাটানি করতে চাইনে, তুমি যে জাহাজে মৃত্যুসমুদ্র পার হতে যাত্রা করচ, সেই জাহাজে তোমার সম্বন্ধে আমার যা কিছু সুখ যা কিছু ইচ্ছা সমস্ত সাজিয়ে দিলুম, তোমার যাত্রা মঙ্গল হোক্, তোমার গতিপথে কোনো বাধা না থাক্, তোমার পক্ষে যা পরম প্রতিষ্ঠা, যা চরম শ্রেয়, তাই যেন সম্পূর্ণ হয়, আমার ব্যর্থ অনিচ্ছা, আমার বিদ্রোহ, আমার পশ্চাতে আহ্বান যেন তাকে কিছুমাত্র ভারাক্রান্ত না করে— এমন কথা যদি অক্ষুণ্ণ শুভ কামনায়, যদি পরিপূর্ণ প্রেমে বলতে পারি তবে তা আমার পক্ষে এবং তার পক্ষে কখনই বৃথা হতে পারে না।

এমন করে বলতে পারার একটা প্রয়োজন আছে। যাকে ভালবাসি, যার মঙ্গল কামনা করি, তার শেষ মঙ্গল কামনা এমনি করেই করতে হয়— এই হচ্ছে প্রেমের শেষ দান, এই হচ্ছে প্রেমের শেষ পরীক্ষা। যে প্রেম মৃত্যুর কাছে আপনাকে এমনি করে দান করতে পারে, সেই প্রেম মৃত্যুর দ্বারাই অক্ষয় পরিপূর্ণতা লাভ করে। চরম ত্যাগই প্রেমের চরম সার্থকতা। এই ত্যাগের দ্বারা শুধু মঙ্গল হোক্, একথা

নয়, সমস্ত মধুময় হোক্, প্রেম মুক্তি লাভ করে অনন্তের মধ্যে ব্যাপ্ত হোক্, দিন মধুময় হোক্, রাত্রি মধুময় হোক্, সূর্য্যের আলোক মধুময় হোক্, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হয়ে উঠুক। বায়ু মধু বহন করচে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করচে, এই কথা ঘোষণা করে আমাদের শ্রাদ্ধের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মৃত্যুকে সত্য বলে মানুষের যে ভ্রম হয় সেই ভ্রমকে এই মন্ত্র একেবারে দূর করতে চায়। জগতের মাধুর্য্যের কোথাও লেশমাত্র ক্ষয় হয়নি— সমস্তই মধুময় হয়ে আছে— এ যখন দেখা যাচ্চে তখন মৃত্যুও এই মাধুর্য্যের ছন্দ রচনা করচে। ছন্দের মধ্যে যে যতি পড়ে সে ত ছন্দকে বাধা দেবার জন্য নয়, ছন্দকে বহন করবার জন্যই। মৃত্যুও জগতের মাধুর্য্যকে বাধা দিচ্ছেনা, তাকে বহন করচে। মৃত্যুর পূর্ব্বে যে মধু ছিল, মৃত্যুর পরেও সে মধু অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সেই মধুকেই আজ সর্ব্বত্র দেখ, সর্ব্বত্র আস্বাদ কর— যাকে এক জায়গায় বিশেষ করে জান্‌তে তাকেই সব জায়গায় জান— অনন্ত মাধুর্য্যের মধ্যে তোমার প্রেমের মুক্তি হোক্। [১৯১০]

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীঅরবিন্দমোহন বসুর ভগিনীবিয়োগে

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

মৃত্যু দীর্ঘকাল ধরে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করলেও তার জন্যে মন প্রস্তুত হয় না। প্রত্যক্ষ হলেও আমাদের প্রাণ তাকে প্রতিবাদ করে। কিন্তু হার মানতেই হয়। হার মানার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনে আসে, যে মৃত্যু কেবল যে অপহরণ করে তা নয়, মৃত্যু জীবনের ভূমিকা। জীবনের অনেক সম্পদ দেখতে পাইনে তার নিজের আলোর মধ্যে মৃত্যুর কালো পটের উপর তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যার কোনো মূল্য দিই নি তারও মূল্য ধরা পড়ে, যা ছোটো বলে কোণে পড়ে ছিল তাও দেখি ছোটো নয়। তখন প্রাণদেবতাকে এই বলে প্রণাম করি তোমার প্রতিমুহূর্ত্তের দান আমাকে ধন্য করেছে, তার বিচ্ছেদে যে শোক করি এতেও প্রমাণ করি সে আমার কতখানি। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে কিছুই তার ব্যর্থ হয় নি, তার মধ্যে সত্য যা তা রয়ে গেছে। হারানোটাকেই বড়ো করে যেন না জানি, পেয়েছিলুম এইটেই বড়ো, সকল হারানোর উপরে সে থাকে। বিচ্ছেদের শোককে কোনো সান্ত্বনাই দূর করতে পারে না, কেন না সেই শোক আমাদের অর্ঘ্য, জীবনের মধ্যে যাদের পেয়েছিলেম মৃত্যুর মধ্যে তাদের সেই পাওয়ার স্বীকৃতি। প্রাণের উপহার থেকে মৃত্যু আমাদের দূরে এনে দাঁড় করিয়েছে বলেই তাকে আমরা সম্পূর্ণ করে দেখতে পেয়েছি, গভীর করে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি। বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের বেদনাতেই আমরা দেবতাকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করি।

তুমি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। ইতি ২৮ আশ্বিন ১৩৩৯

স্নেহাসক্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোনো সান্ত্বনাপ্রার্থীর প্রতি

রবীন্দ্রস্মৃতি

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

পূজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিকথা রচিত। বিশ্বভারতীর মাননীয় উপাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সোৎসাহ প্ররোচনায় এর উৎপত্তি ও কল্যাণীয় শ্রীমান শুভময় ঘোষের সযত্ন অনুলিখনে এর পরিসমাপ্তি। প্রায় পৌনে শতাব্দীর স্মৃতির জটিল জালকে সংগীতস্মৃতি, নাট্যস্মৃতি, সাহিত্যস্মৃতি প্রভৃতি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি— আপাততঃ নাট্যস্মৃতি অংশতঃ বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।— লেখিকা

আমার নাট্যস্মৃতি অনেকাংশ সংগীতস্মৃতির সঙ্গে জড়িত, কারণ রবিকাকা প্রথমজীবনে গীতিনাট্যই রচনা করেছিলেন। আমাদের কালের ব্যক্তিগত স্মৃতি আরম্ভ হয় স্বভাবতই বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর থেকে। মা আত্মীয়স্বজন নিয়ে ঘরোয়া অভিনয় করাতে খুব ভালোবাসতেন। সেজন্য অনেকসময় তাঁর কত মান-অভিমান ভাঙাতে হত, সে গল্পও তাঁর কাছে শুনেছি।

মানময়ী

তাঁরই প্ররোচনায় সম্ভবত মানময়ী নাটক (প্রথম প্রকাশ ১৮৮০) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আপনাআপনির মধ্যে অভিনীত হয়। এটি কার রচনা সেকালে আমাদের অনুসন্ধান করবার কোনো প্রবৃত্তি হয়নি, তবে এখন মনে পড়ে রবিকাকা, জ্যোতিকাকা, স্বর্ণপিসিমা অনেকসময় মিলেমিশে গীতিনাট্য রচনা করতেন।[১]

মানময়ীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও আমার কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। দেবদেবীর মানভঞ্জন নিয়েই কারবার— তা নামেই প্রকাশ। মানময়ীর অভিনয়ে দেবতাদের মধ্যে রবিকাকা আর জ্যোতিকাকা মশায় ছিলেন মনে আছে।

---

১ একদিন জ্যোতিবাবুরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সহ ষ্টীমারে চন্দননগর যাইতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া সমস্ত ষ্টীমারখানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু সুর-রচনা করিতেছিলেন ও অক্ষয়বাবু [চৌধুরী] তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন।…এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই, পরে মানভঙ্গ [মানময়ী] নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল। মানভঙ্গ প্রথমে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে অভিনীত হয়।"

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', পৃ ১৫৭

"জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়…তিনি শুধু অক্ষয়চন্দ্রের নাম করিয়াছেন, মানময়ীতে কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরও গান রহিয়াছে; যেমন শেষ গান—'আয় তবে সহচরি হাতে হাতে ধরি ধরি' ইত্যাদি।"—রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৪৬

"মানময়ীর গানগুলি রবীন্দ্রনাথকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম, তিনি ইহার মধ্যে মাত্র আর দুইটি গান নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।…

১। রতির গান। ছিলে কোথা বল…

২। বসন্তের গান। চল চল, চল চল, চল ফুলধনু…"

—রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী, শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৪৬

সব-প্রথমেই ছিল রতি ও বসন্তের গান—

রতি। ছিলে কোথা বল, কত কি যে হল
জান না কি তা?
হায়, হায়, আহা!
মান দায় যায় যায় বাসবের প্রাণ।
এখানে কি কর,
তুমি ফুলশর,
তারে গিয়ে কর ত্রাণ।
বসন্ত। চল চল, চল চল, চল চল, ফুলধনু,
চল যাই কাজ সাধিতে।…

আরেক জাতের গান মানময়ীতে ছিল যা আমাদের ঐ বয়সে গাওয়া অকালপকতা বলে নিশ্চয় সকলে মনে করবেন—

উর্বশী। সজনী লো বল, কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না?…
এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারি না।

কিন্তু আমরা সমবয়সীর দল নিঃসংকোচে এ গান বাড়িময় গেয়ে বেড়াতুম।

বসন্ত-উৎসব

স্বর্ণপিসিমার গীতিনাট্য 'বসন্ত-উৎসবের' (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯) সঙ্গেও আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত। তার গোড়ার দিকের গান 'ধর্ লো ধর্ লো ডালা এই নে কামিনীফুল' এখনও কানে বাজে।

অন্য গানগুলিও কতক কতক মনে আছে—

লীলা। চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।…

ঢালা বাগেশ্রী রাগিণীতে এই শোকসংগীত নতুনকাকিমা বসে গাইছেন, তাঁর বড় বড় চোখ আর দীর্ঘ ঘন কেশ ছিল বলে তাঁকে বেশ মানিয়েছিল। জ্যোতিকাকা আর রবিকাকা দুজনে মিলে টিনের তলোয়ার নিয়ে এই গানটি গেয়ে যুদ্ধ করেছিলেন—

কিরণ। লও এই লও, লও প্রতিফল।
কুমার। দেখিব বীরত্ব তোর থাকে কি অটল।
কিরণ। মূঢ় হ রে সাবধান!
কুমার। এ অমোঘ সন্ধান।
কিরণ। এ আঘাতে অবশ্যই বধিব পরাণ।

এই নাটকটি পরে সখিসমিতির পক্ষ থেকে কোনো বাগানবাড়িতে অভিনীত হয়। যদিও সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, তাঁদের সাহায্য ছাড়া আমাদের পক্ষে স্টেজ বাঁধা সম্ভব ছিল না। এই নাটকে সুরেন আর জ্যোৎস্নাদাদা আমাদের প্রধান সহকারী ছিলেন। স্টেজের পশ্চাৎপটকে বনের উপযোগী করে সাজাতে গিয়ে তাঁরা দুই ধনুর্ধরে মিলে বাঁশের জাফ্‌রির

উপর শুকনো মস্ গুঁজে তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ডিমের খোলাতে সলতে জেলে জোনাকির ভাব আনতে চেয়েছিলেন। আগুন ও ঘাসের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি তাঁদের ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে বুঝতে পারেননি, তা শীঘ্রই প্রকাশ পেল। পশ্চাৎপটের মাঝে মাঝে আগুন ধরে গেল। চারিদিকে হৈহল্লা পড়ে গেল। আমরা মেয়েরা ছুটাছুটি করে নাবার ঘরের টব থেকে জল আনতে লাগলুম আর সুরেন ও জ্যোৎস্নাদা অগত্যা কামিজের আস্তিন গুটিয়ে পর্দা ছেড়ে বাইরে আসতে বাধ্য হলেন। সে এক হাস্যকর ব্যাপার, যদিও আর একটু বেশিদূর গড়ালে কান্নাকাটি পড়ে যেতে পারত।

এই সময়কার একটি হাসির গানও মনে পড়ে—

ছিলি যেখানে সেখানে যা রে ভৃঙ্গ।
চটক-ফটক দেখালে কি হবে
আস্‌কারা মাস্‌কারা পেয়ে করিসনে কো রঙ্গ।
করিসনে করিসনে মিছে হ্যাকেরা
রাগে গর গর গর গর গর গর জ্বলিছে অঙ্গ।

বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে

মানময়ীর আগে কি পরে ঠিক মনে নেই, রবিকাকা ও জ্যোতিকাকা দুই ভাইয়ে মিলে অভিজাত বন্ধুবর্গের চিত্তবিনোদনের জন্য বিবাহঘটিত একটি ক্ষুদ্র গীতিনাটিকা অভিনয় করেছিলেন। তাতে তাঁরা দুজনে বিবাহের পক্ষ ও বিপক্ষ অবলম্বন করে গান করেছিলেন। রবিকাকা বিবাহের সপক্ষে গাইতেন—

একা একা এতদিন কেটে গেল এখন দুখের নিশা প্রভাত হল।
আর না জ্বালা সব'
দুজনে এক হব
সোহাগে সদা রব ঢল ঢল।
তাহারি মুখ চেয়ে
যামিনী যাবে বয়ে
নিবাব তারি প্রেমে হৃদি-অনল।

তার পর বিপক্ষে জ্যোতিকাকা গাইতেন—

ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর—সেই সে কাঁদুনি কি কব সখা।
কথায় কথায় অভিমান তারি, সাধ্য কি যে সে মন রাখা।
গৃহে থেকে সাধ করে— অরণ্যে যে হবে থাকা।

তার পর আবার সপক্ষের গান—

সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ
তাহা বুঝিলে না তুমি মনে রয়ে গেল দুখ।
অভিমান আঁখিজল নয়ন ছল ছল
মুছাতে লাগে ভালো কত
তাহা বুঝিলে না তুমি মনে রয়ে গেল দুখ।

এই গানটি গীতবিতানে স্থান পেয়েছে।

এই অভিনয়ের সঙ্গে সামান্য একটি মজার স্মৃতি জড়িত আছে। পাইকপাড়ার কান্তিচন্দ্র সিংহ সুরেন সুন্দর ছেলে ছিলেন বলে তাঁকে আদর করে কোলে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বসে ছিলেন। তিনি এই নাটক দেখে এত হাসলেন যে সুরেন গড়িয়ে তাঁর চৌকির নীচে পড়ে গেলেন!

হেঁয়ালি নাট্য

এর পরে ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িত রবিকাকার হেঁয়ালিনাট্যের সঙ্গে। বাবা চিরদিনই স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্যেই বোধহয় বোনেদের মধ্যে স্বর্ণপিসিমাকে বেশি ভালোবাসতেন। আমাদেরও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। স্বর্ণপিসিমারা জোড়াসাঁকো ছেড়ে একসময়ে কাশিয়াবাগান অঞ্চলে একটি বাগানবাড়িতে গিয়ে ছিলেন। সেখানে আমাদের সকলের খুব যাওয়া-আসা ছিল; রবিকাকাও মাঝে মাঝে যেতেন এবং আমাদের আমোদপ্রমোদে যোগ দিতেন। এই সূত্রে তাঁর "খ্যাতির বিড়ম্বনা" (সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশ ১৮৮৬) নাটকটি নিজেরাই অভিনয় করে আমাদের প্রচুর আনন্দ দেন। আর-একটি কথা মনে পড়ে—অঙ্কুরেই যেমন বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি সরলাদিদি আর হিরণদিদিও এইখানেই পাড়ার মেয়েদের শিখিয়ে পড়িয়ে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন।

বাল্মীকি প্রতিভা

বাল্মীকি প্রতিভা (প্রথম প্রকাশ ১৮৮১) ও কাল-মৃগয়ার (প্রথম প্রকাশ ১৮৮২) নাট্যস্মৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে যে এই দুটি নাটকেই আমরা যোগ দিয়েছিলুম। বাল্মীকি প্রতিভায় আমি একবার লক্ষ্মী সেজেছিলুম, রবিকাকা বাল্মীকি। তবে ১৮৮১ সালে প্রথম বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয়ে নয়, সেবারে প্রতিভাদিদি সরস্বতী আর বোধহয় সুশীলাদিদি লক্ষ্মী সেজেছিলেন। জেঠামশায়ের একটু অভ্যাস ছিল হঠাৎ হঠাৎ 'এই যে অমুক সাহেব' বলে স্নেহভাজনদের পিঠ থাবড়ে দেওয়া। প্রথম বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়ের পরে প্রতিভাদিদি সরস্বতী সেজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাঁর পিঠ থাবড়ে 'এই যে সরস্বতী সাহেব' বললেন! আমি সেখানে তখন উপস্থিত।

অভিনয়ক্ষমতা যে আমার খুব ছিল না, তার প্রমাণস্বরূপ একটি ঘরোয়া সাক্ষীর কথা উল্লেখ করব। লক্ষ্মীর ভূমিকায় আমার একমাত্র গান 'কেন গো আপন মনে'র 'আমার শুভক্ষণে হের গো চোখে' অংশটি গাইবার সময় যখন বুকে হাত দিয়ে নিজেকে দেখাতুম, তখন অভি হেসে বলত, "বোন দিদি, অমন কোরো না। মনে হয় যেন পেট কামড়াচ্ছে!" এই বোনদিদি সম্বোধনের ইতিহাসটুকু হচ্ছে, অভি আমার চেয়ে মোটে পনেরো দিনের ছোট ছিল। অভি একাসনে বসে সমস্ত বাল্মীকি প্রতিভা বা মায়ার খেলার গানগুলি প্রথম থেকে অভিনয় করে গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে পারত।

এই এক বাল্মীকি প্রতিভা যে কত বার কত সূত্রে অভিনীত হয়েছে এবং আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে কত ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে অপ্রত্যাশিত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তা বলতে গেলে একটা বই হয়ে যায়। বাবা একবার বিলেত থেকে আসবার সময় তাঁর সহযাত্রী তখনকার লাট-পত্নী লেডী ল্যান্সডাউনকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি আসবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এখানে বলে রাখলে ক্ষতি নেই যে, ইংরেজ জাতির গুণ ও তাদের সামাজিক প্রথার প্রতি বাবার স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। কলকাতায় আসবার

পর লাট-পত্নী এই নিমন্ত্রণ রক্ষার অভিপ্রায় জানালে তাঁর জন্য বাল্মীকি প্রতিভার একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। লেডী ল্যান্স্‌ডাউনের সঙ্গে তখনকার ছোটলাট-পত্নী লেডী এলিয়ট প্রভৃতি আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁদের যথাযোগ্য সমাদর দেখাবার জন্য কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিপুদাদা তাঁর স্বতঃসিদ্ধ রসিকতা করে বলেছিলেন, 'জোড়াসাঁকোর উঠানের সাজসজ্জা দেখে লাট-পত্নী বাড়ি গিয়ে নিশ্চয়ই লাটসাহেবকে বলবেন— 'Darling! All velvet and festoons!'

অক্ষয় চৌধুরী যেমন পারিবারিক বন্ধু বলে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তেমনি অক্ষয় মজুমদার বলে আর-একজন ছিলেন, যিনি অভিনয় ও সংগীত দুয়েতেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দুজনের একই নাম বলে আমরা তাঁদের যথাক্রমে ছোট অক্ষয়বাবু আর বড় অক্ষয়বাবু বলে উল্লেখ করতুম। বড় অক্ষয়বাবুর খুব দরাজ গলা ছিল, যেটি মাঘোৎসবের উঠানে ধ্রুপদ গাইবার সময় বিশেষ কাজে লাগত। তাঁর আর-একটি অভ্যাস ছিল যে, তাঁর যে চড়া সুর গলায় কুলোত না সেটি ঊর্ধ্বে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিয়ে কাজ সারতেন। তাঁর এক রোগ ছিল লেখকের রচনার উপর নিজের কথার রঙ চড়ানো। তাতে আরও রসিকতা বাড়বে বলে মনে করতেন। রাজা ও রানীতে সুমিত্রা রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার সংবাদে যখন বিক্রম অত্যন্ত বিচলিত, সেই সময় ত্রিবেদীর (বড় অক্ষয়বাবু) সঙ্গে পথে দেখা হল। রানীকে ত্রিবেদী যেতে দেখেছেন শুনে বিক্রম যখন ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চোখে অশ্রু ছিল?' সেই নাট্যরসের গাম্ভীর্য নষ্ট করে তিনি নাক ফুলিয়ে বল্লেন, 'ওচ্ছ্‌ ফোচ্ছ্‌ দেখি নাই চোখে'— মূল নাটকে শুধু আছে 'অশ্রু দেখি নাই চোখে।' আর-একবার বাবা যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রাজা ও রানীর অভিনয়ের পরিচালনা করছেন, তখন বড় অক্ষয়বাবু কোনো এক ভূমিকায় তাঁর বক্তব্যের অতিরিক্ত, 'সন্দেশ মন্দেশ রসগোল্লা ফসগোল্লা' জুড়ে দেওয়াতে বাবা ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলেন। তাতে অক্ষয়বাবুর এমন অভিমান হল যে, তিনি তাঁর পরবর্তী অভিনয়ে কথাগুলি কিছুমাত্র রসকষ না দিয়ে একবারে শুকনো ভাবে বলে গেলেন। তখন বাবাকে মা বলতে লাগলেন, 'তুমি কেন ওঁকে এমন করে বললে, এখন দেখ কি করে অভিনয় চলবে।' তখন আবার তাঁর মানভঞ্জন করবার জন্য তাঁকে পঞ্চাশটি টাকা এবং একটি শাল ঘুষ দিয়ে তবে বাগ মানানো গেল। বড় অক্ষয়বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সুযোগ পেলে তিনি শুধু কমেডি নয় ট্রাজেডিও ভালো অভিনয় করতে পারেন। বিচিত্র মানুষের আত্মপ্রত্যয়!

এহেন অক্ষয়বাবু বাল্মীকি প্রতিভার পূর্বোক্ত বিশেষ অভিনয়ে লাট-পত্নীর সামনে প্রথম দস্যু সেজে খুব ফুর্তির সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। তাঁরা ভাষা না বুঝতে পারলেও অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা বিষয়টা সহজেই বুঝে নিতে পেরেছিলেন। অক্ষয়বাবু প্রথম বারের পর দ্বিতীয় বার যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন তখন লেডী এলিয়ট নাকি বলেছিলেন, 'He is my man'। ছোটলাট-পত্নী তাঁকে my man বলেছেন এই গৌরবের কথা অক্ষয়বাবু চিরদিন সকলের কাছে গল্প করে বেড়িয়েছেন। অবনদাদার 'ঘরোয়া'তে আমাদের বাড়ির নাটক-অভিনয়ের সুন্দর বর্ণনা আছে।

কাল-মৃগয়া

কাল-মৃগয়ার অভিনয়ও প্রায় সমসাময়িক এবং এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। আমি একবার

এই নাটকটি করাতে গিয়ে একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিলুম। দিনু সেজেছিলেন অন্ধমুনি এবং তাঁর ভাগ্নে ও ভাগ্নী সঞ্জীব আর সুরমা সেজেছিল ঋষিকুমার ও লীলা। দিনু বললে, 'ঋষিকুমারবধের পরে যে সঞ্জীবকে খাটিয়ায় করে নিয়ে আসবে সে আমি দেখতে পারব না।' আবার ঋষিকুমারের ফিরতে দেরি দেখে তার বোন সুরমা "বল বল পিতা কোথা সে গিয়াছে" গাইতে গাইতে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিল। এসব দেখেশুনে আমি বললুম— 'থাক্, কাল-মৃগয়ার আর অভিনয় করে কাজ নেই।'

"এমন কর্ম আর করব না"

কালানুক্রমে আমাদের ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে বোধ হয় জ্যোতিকাকামশায়ের 'এমন কর্ম আর করব না' (প্রথম প্রকাশ ১৮৭৭) এর পরে আসে। নাটকটির নাম পরে বদলে হয় 'অলীকবাবু'। এটিও অনেকবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু হয়তো স্মৃতির জাদুবশত এর যে অভিনয়টি আমাদের সবচেয়ে সেরা মনে হয় তার পাত্রপাত্রী এরকম ছিল—

সত্যসিন্ধু	জ্যাঠামশায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ
অলীকবাবু	রবিকাকা
গদাধর	সেজপিসেমশায়
জগদীশ	জগদীশ দাদা
হেমাঙ্গিনী	শরৎকুমারী চৌধুরানী
পিস্‌নি	বর্ণপিসিমা

কী স্বাভাবিক অভিনয় করতেন বর্ণপিসিমা। এখনও মনে পড়ে প্রথম দৃশ্যে তিনি দাসীদের মতো মাটিতে বসে হাঁটু তুলে হাতের উপর মাথা রেখে সকালবেলা বসে আছেন আর বাইরে থেকে গদাধর দরজা ঠেলতেই মাথা তুলে বলে উঠলেন, 'দরজা ঠেলে কে ও? ওমা, গদাধর বাবু যে। বড়মানুষের মোসাহেব, দশটা বাজতে-না-বাজতেই ঘুম ভাঙল?' তার পরের দৃশ্যে অলীকবাবু ও সত্যসিন্ধু স্টেজে ঢুকছেন। ঢুকতে ঢুকতে অলীকবাবু বলছেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়, কামাখ্যাদেশের রাজকন্যা, আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি।' সেই ভাব ও কথা এখনও যেন কানে বাজছে। তার পর বন্ধু সেজে অরুদাদার গান, তারই বা কী কায়দা! আর জ্যোতিকাকার সেই চীনেম্যান সেজে চীনেভাষায় কিচিরমিচির কথা— কাকে ছেড়ে কার কথা বলব! হেমাঙ্গিনী যে হাতে বঁটি ধরে 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর' এইরকম কী একটা খুব নাটকীয় ভাবে বলতেন, সেও একটা মনে রাখবার মতো জিনিস।

বিবাহ-উৎসব

বিবাহ-উৎসব নামে আরেকটি ঘরোয়া গীতি-নাটক আমাদের সময় চলিত ছিল। নামেই তার বিষয়বস্তুর প্রকাশ। আমার পিস্‌তুতো বোন সুপ্রভাদিদির বিবাহের সময় মনে পড়ে পুজোর দালান থেকে বরকনে দোতলার বাসরে পৌঁছবার আগেই কনের হল ফিট্। তখন বাড়িতে কি জানি কেন হিস্টিরিয়া রোগটির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। আমি আর উষাদিদি কোনোরকম করে সেই মূর্ছিত কনেকে দুদিক থেকে ধরে অতিকষ্টে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বাসরঘরে এনে ফেললুম। সেখানে তিনি মছলন্দে অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে

রইলেন, পাশে বর সুকুমার হালদার হতভম্ব হয়ে বসে কি মনে করছিলেন তা তিনিই জানেন। এই অবস্থায় আমাদের সেই "বিবাহ উৎসব" অভিনীত হয়। দিনুর মা সুশীলাবৌঠান নায়ক সেজেছিলেন। তিনি গান এবং অভিনয় দুইই সুন্দর করতেন। তাঁর একটি গান 'ও কেন চুরি করে যায়' তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। নায়িকাকে দেখে মোহিত হয়ে তিনি গাইতেন, 'ওই জানালার পাশে বসে আছে করতলে রাখি মাথা'। সে গানটির একাল পর্যন্ত পৌঁছবার সৌভাগ্য হয়েছে। তার উত্তরে সরলাদিদি সখা সেজে তাঁর মোহভঙ্গের উদ্দেশে যে গান করতেন 'তুমি আছ কোন্ পাড়া' সেটিও প্রাথমিক হাসির গানের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য—

তুমি আছ কোন্ পাড়া তোমার পাইনে যে সাড়া
পথের মধ্যে হাঁ করে যে রৈলে হে খাড়া।
… … …
রাঙা অধর নয়ন কালো ভরা পেটেই লাগে ভালো
এখন পেটের মধ্যে নাড়িগুলো দিয়েছে তাড়া।

এই সুরেই আবার পরে 'আঃ বেঁচেছি এখন' গানটি রচিত হয়।

বাল্মীকি প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া : পুনশ্চ

গগনদাদা খুব ভালো অভিনয় করতেন বলে দস্যু রত্নাকর যখন বাল্মীকিতে পরিণত হলেন তাঁর তখনকার মনোভাবের উপযুক্ত এক নতুন সঙ্গীর প্রবর্তন করে রবিকাকা গগনদাদাকে সেই ভূমিকা দিলেন। এখন 'এ কেমন হল মন আমার' করুণ গানটি গাইতে গাইতে দিনু গগনদাদার কাঁধে হাত দিয়ে নিজেরই ভাবে এমন অভিভূত হয়ে পড়ল যে, সেও যেমন কাঁদে গগনদাদাও তেমনি কাঁদেন। অভিনয় করতে করতে ভূমিকার সঙ্গে অভিনেতা যদি একেবারে অভিন্নহৃদয় হয়ে পড়েন তবে তো অভিনয় করা মুশকিল হয়।

আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা হিসাবে বলি, আমি ও উষাদিদি কালমৃগয়ায় বনদেবী সেজে 'সমুখেতে বহিছে তটিনী' গানটিতে এক জায়গায় বসে ডানহাতের ভঙ্গীতে সামনের দিকে কেমন তটিনী বয়ে যাচ্ছে আর দু আঙুল উপরে তুলে 'দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া' দেখাতাম, সে গল্প করে সেদিন পর্যন্ত কত মেয়েদের হাসিয়েছি। আগে কোনো ইংরিজী লেখায় বলেছি 'Either on or off the stage' আমি কখনোই ভালো অভিনয় করতে পারি নে।

রাজা ও রানী

রাজা ও রানী (প্রথম প্রকাশ ১৮৮৯) নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম অভিনয়ের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। কলকাতার সেন্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রেলের লাগাও জমিতে তখন একটি বিরাট পুকুর ছিল। তাকে লোকে বলত বিজিতলাও। তারই সামনে বর্তমান প্রেসিডেন্সি হাঁসপাতালের জমিতে বিজ্‌নিরাজার একটি পুরনো বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়ে বহুদিন ছিলুম। বাড়িটি জীর্ণ হলেও তার সঙ্গে আমাদের সেকালের অনেক সুখস্মৃতি জড়িত। তারই একতলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে প্রথম রাজা ও রানীর অভিনয় হয়। তার পাত্রপাত্রী ছিল এই রকম :

বিক্রম রবিকাকা
সুমিত্রা মা
দেবদত্ত বাবা
নারায়ণী মৃণালিনী দেবী, রবিকাকার স্ত্রী। ইত্যাদি।

মা খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন শুনতে পাই। পরদিন বঙ্গবাসী কাগজে 'ঠাকুরবাড়ির নতুন ঠাট' বলে একটি শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ বেরল। তাতে উক্ত পাত্রপাত্রীর তালিকা এবং পরস্পরের সম্পর্ক পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া ছিল। বলা বাহুল্য বাবা এসব সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মনে হয় এই অভিনয়েই "উনি" কুমার, এবং প্রতিভাদিদি ইলা সেজেছিলেন।

মায়ার খেলা

মায়ার খেলার একটি অভিনয় এই বির্জিতলার বাড়ির বারান্দাতেই হয়েছিল, তার বিশেষত্ব এই ছিল যে, মায়াকুমারীদের অভাবে রবিকাকা জ্যোতিকাকা বসন্ত ও মদন সেজে তাদের গান গেয়েছিলেন। আমি এইবার শান্তা সেজেছিলুম।

মায়ার খেলার নাম করতে গেলে অনেক কথা মনে আসে। অনেকেই জানেন যে রবিকাকা শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে সখিসমিতির সাহায্যার্থে এই গীতিনাটিকা রচনা করেন। বেথুন কলেজের প্রশস্ত আঙিনায় এর প্রথম অভিনয় হয়, আমাদের বাড়ির মেয়েরাই অভিনয় করেন। সখাদের বেশ ছিল খুব টকটকে রঙের সাটিনের পাঞ্জাবি ও ধুতি, তার সঙ্গে ঈষৎ গোঁফের রেখা। আর মায়াকুমারীদের হাতের দণ্ডের মুণ্ডে ইলেকট্রিক্ আলো জ্বলছিল আর নিবছিল, বোধ হয় বিলিতি পরীর অনুকরণে। তখন সব বিষয়ে বিলিতি অনুকরণটাই প্রবল ছিল। তার পরে মায়ার খেলা কত উপলক্ষে কত ভিন্ন দল দ্বারা অভিনীত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তবু সে প্রথমের মোহ কাটে না। এখন মনে পড়ে আমাদের ৪৯নং পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির তেতলার ঘরে রবিকাকা একটা একহারা খাটে উপুড় হয়ে পড়ে বুকে বালিশ দিয়ে স্লেটের উপর মায়ার খেলার গান লিখছেন এবং গুনগুন করে সুর দিচ্ছেন। সে সময় কিছু দিনের জন্য তিনি কাকীমা ও বেলাকে নিয়ে আমাদের ওখানে এসে ছিলেন। তখন ওঁরা দার্জিলিঙ থেকে ফিরে এসেছেন এবং আমাকে আনতে লরেটো স্কুলে যে গাড়ি যেত তাতে বেলাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন— আমি কখনও ভুলব না যে গাড়িতে উঠতে গিয়ে, সেই আপেল ফলের মতো রাঙা টুকটুকে গাল ও কোঁকড়া চুল ওয়ালা পুতুলটিকে হঠাৎ দেখে আমার কি অপ্রত্যাশিত আনন্দই না হয়েছিল। পরবর্তী কালে সরলাদিদি-সম্পাদিত ভারতীর সাহায্যার্থে রবিকাকার নির্দেশে জোড়াসাঁকোর বাড়ির লোকেরা অভিনয় করে টাকা তুলে দেন। তার মধ্যে অমিয়া বৌমা প্রমদা সেজে খুব সুন্দর অভিনয় ও গান করেন। এই প্রসঙ্গে আমার মনে হয় যে, মায়ার খেলার বিষয়বস্তুটি,— অর্থাৎ নায়ক যে শান্ত ভালবাসা প্রথম-জীবন থেকে তাঁর বাল্যসঙ্গিনীর কাছ থেকে পেয়ে এসেছেন তার মর্যাদা বুঝতে না পেরে তাঁর মানসীর সন্ধানে বেরিয়ে প'ড়ে এক হাস্যোজ্জ্বল লীলাময়ী নায়িকার রূপে মোহিত হয়ে এবং সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আবার সেই বাল্যসঙ্গিনীর আশ্রয়ে শান্তি লাভ করেন— রবিকাকা তাঁর নানা কাব্যনাটকে ব্যবহার করেছেন। কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, নলিনী, মায়ার খেলা প্রভৃতিতে এই ঘটনাই পাওয়া যায়।

আমাদের বাড়িতে এত নাটক অভিনয় হত যে বাইরে নাটক দেখতে যাবার রেওয়াজ ছিল না; কেবল একবার স্টার থিয়েটারে 'বসন্ত রায়' নামে "বৌঠাকুরানীর হাটে"র রূপান্তর দেখতে গিয়ে বুড়ো বসন্তরায়ের গান ও অভিনয়ে খুব কেঁদেছিলুম মনে পড়ে।

রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা

আগেই বলেছি আমাদের রূপসজ্জা মঞ্চসজ্জা অনেকটা বিলিতি অনুকরণে হত। হ. চ. হ.— হরিশচন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্যপটগুলি অতি নিকৃষ্ট বিলিতি অনুকরণে আঁকতেন। বাস্তবের যথাসাধ্য অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ। বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়ে দিনুর ঘোড়া নিয়ে স্টেজে ঢোকা, আর 'রিমঝিম' গানের সঙ্গে অরুদাদার টিনের নল ফুটো করে বৃষ্টি নামানোর কথা অবনদাদা তো বলেইছেন। বাইরের থিয়েটারে আমরা কম গেলেও স্টার থিয়েটারে "নল দময়ন্তী"র অভিনয়ে এক-একটা 'উইং'-এর গায়ে এক-একজন পরী গোলাপী মোজা পরে কাগজের পদ্মাসনে ত্রিভঙ্গ মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে পড়ে।

পরবর্তীকালে আমাদের চোখের সামনেই অবশ্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ বিখ্যাত নটপ্রধানগণকেও বিলিতি নকল ছেড়ে মঞ্চসজ্জায় ভারতশিল্পের প্রবর্তন করতে দেখেছি। মণিলালেরও শুনেছি সখীদের নাচের পোশাকে নতুন ঢং প্রবর্তনে অনেকটা হাত ছিল।

পূর্বেই বলেছি ঠাকুরবাড়িতেও মঞ্চসজ্জায় প্রথম দিকে বিলিতি অনুকরণই চলত। রবিকাকার বাল্মীকি সাজে পিঠের দিকে যে লম্বা জোব্বা মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে বিলিতি রাজারাজড়াদের mantleএর আভাস পাওয়া যায়। তার সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা। অবশ্য রবিকাকা যাই পরতেন তাই মানাত, সে আলাদা কথা। তিনি যখন ঐ সাজে বাল্মীকি রূপে তাঁর সেই সুকণ্ঠে তারসপ্তকে অভিনয় পূর্বক রামপ্রসাদী সুরে গাইতেন 'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা' তখন যে সেখানে কি অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হত তা যারা না দেখেছে না শুনেছে তাদের বোঝানো শক্ত।

তখনকার ডাকাতদের কাবুলিওয়ালা সাজে কেন সাজানো হত বলতে পারি নে। সম্ভবতঃ তাদের ইয়া গোঁফ এবং ইয়া পাগড়ির সমাবেশে ডাকাতের ভীতিজনক রূপ সহজেই ফুটে উঠত। তার পরে আবার মধ্যযুগে তাদের ধুতি, ফতুয়া, হয়তো মাথায় একটা ফেটি বাঁধা, এই সাধারণ বেশ পরানো হত। অবশ্য রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত একটু রং চড়িয়ে। লক্ষ্মী-সরস্বতীকে তো মামুলী পৌরাণিক রীতি অনুসারে লাল ও সাদা জরির বেশে সাজানো হত। বনদেবীদের বাড়ির মেয়েরাই সেলাইকরা জামা পরিয়ে একটি নানা রঙের শাড়ি ইচ্ছামত জড়িয়ে দিতেন। আর লতাপাতা এবং এলোচুলে ফুল ইত্যাদি দিয়ে বনদেবীদের উপযোগী সাজ করে দিতেন।

আমার ইচ্ছে করে রবিকাকার সংগীতের ধারাবাহিক বিকাশের বিবরণ যেরকম একপ্রকার বাঁধাধরা হয়ে গেছে এবং অনেক জায়গায় উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে তেমনি তাঁর নাট্যসজ্জার বিবরণও কালানুসারে উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়। একই নাটক যথা বাল্মীকি প্রতিভার আদ্য, মধ্য ও অন্ত রূপের সজ্জা দেখাতে পারলে আমার এই ইচ্ছাটি সহজেই পূরণ হয়।

নাচ

তখনকার কালে আমাদের অভিনয়ে এত নাচের চল ছিল না। নৃত্যনাট্য দূরে থাকুক অতি সামান্য

ভাবেও কোনো বিশেষ প্রচলিত নৃত্যধারাও শিক্ষা দেবার কোনোরকম কল্পনাই কারো মাথায় আসে নি। বনদেবীদের "রিমঝিম" প্রভৃতি গানের সঙ্গে নৃত্যে অতি প্রাথমিক ড্রিল-এর মতো একপ্রকার নাচ শেখানো হত, যা দেখে এখনকার নৃত্যপটীয়সীরা বোধ হয় তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবেন। ডাকাতদের 'কালী কালী বলো রে আজ'-এর সঙ্গে মাথার উপর উঁচু করে ধরে টিনের তলোয়ার দিয়ে তালে তালে ঠুকে পা ফেলে যে নাচের অনুকরণ করা হত, তাকে কোন্‌দেশী বলা যায় ঠিক জানি নে। আমার কেন জানি নে, বিলেতে কোনো পল্টনের সাহেব-মেমদের বিয়ের সময় দু পাশ থেকে তুলে ধরা যে তলোয়ারের খিলেনের তলা দিয়ে আসতে হয়, সে দৃশ্যের কথা মনে আসে। কিন্তু সম্ভবত আমাদের দেশের লাঠিখেলার সঙ্গে কিছু যোগ আছে। 'এত রঙ্গ শিখেছ' গানের সঙ্গে ঢোলক বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে রঙ্গমঞ্চে লাফানোকে কতকটা স্বাভাবিক আনন্দবিকাশের একটা ভঙ্গি মাত্র বলা যেতে পারে। তবে এইসব নাচের মধ্যেই বোধ হয় রবিকাকার পরবর্তী নৃত্যকলা-বিকাশের অঙ্কুর নিহিত। হয়তো পূর্বসংস্কারবশতই আমি অনেক সময় বলে থাকি যে, এই নৃত্যকলা অভিনয়কলার গলা টিপে মারছে। অভিনয়কলা মুখের ভাব ও কণ্ঠস্বরের উপর বেশি নির্ভর করে, আর নৃত্যকলা হয়ত স্বচ্ছন্দ নৃত্যভঙ্গির উপর বেশি নির্ভর করে। সকলেই জানেন রবিকাকা, গগনদাদা আর দিনু ঠাকুরবাড়ির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। অবনদাদারও হাস্যরসের অভিনয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল। সেজন্য আমার ভয় হয়, পাছে বর্তমানে নৃত্যকলা সেই অভিনয়ের ধারা ব্যাহত করে। অবশ্য ভাবপ্রকাশ নিয়েই কথা, এবং নৃত্যও যে কলার একটি বাহন সে কথা স্বীকার না করে আমি নিজেকে নিতান্ত সেকেলে প্রতিপন্ন করতে চাই নে।

ফাল্গুনী

নাচের কথা যখন উঠলই তখন ফাল্গুনী (প্রথম প্রকাশ ১৯১৬) সম্বন্ধে যেটুকু স্মৃতি আছে বলি। তার প্রথম অভিনয় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হয়। নদী, চাঁপাবন, বেণু প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতীকের যে মানবীয় রূপ দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে আমার ভাইঝি মঞ্জু প্রভৃতি ছোট মেয়েদের তত্ত্বাবধান করবার কিছুটা ভার আমার উপর পড়েছিল। আগেই বলেছি, নৃত্যকলার সুষ্ঠু পদ্ধতি তখনও গড়ে ওঠে নি। তার উপর আমি তো এসব বিষয়ে নিতান্তই অজ্ঞ ছিলুম। তবু রবিকাকার অনুরোধে যেটুকু পারি ছোটদের পরিচালনা ও পদচালনা করাবার চেষ্টা করেছিলুম। এ কথা উল্লেখ করছি শুধু জানাবার জন্যে যে, পরে রবিকাকা এই নাচকে, 'তোদের ডায়োসিশনের নাচ' বলে একটু খোঁটা দিয়েছিলেন। তাতে আমার গায়ে কিছু লাগে নি, কারণ আমি কোনোদিন ডায়োসিশনের ছাত্রী ছিলুম না। এখনও মনে আছে মেয়েদের মাথার মাঝখানে উঁচু ঝুঁটি করে দিয়েছিলুম, যেমন আজও করে থাকে দেখতে পাই। 'নদী আপন বেগে'র সময় মঞ্চের এক দিকে সঞ্জীব আরেক দিকে নিখিল দাঁড়িয়ে একটা নীল কাপড়কে ঢেউ খেলিয়ে নদীর বেগ প্রকাশ করছিল, তাতে সেই পুরনো বাস্তবের নকলের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর লেগেছিল, দশ বছরের ছেলে সমরেশ সিংহের ফুলের দোলনায় দুলতে দুলতে 'ওগো দখিন হাওয়া' গানটি গাওয়া ; এ দৃশ্য যারা দেখেছে শুনেছে কখনও ভুলতে পারবে না।

অবনদাদার মঞ্চসজ্জার কথাও উল্লেখযোগ্য। আগেকার কালের সেই বিসদৃশ বিদেশী নকল তুলে দিয়ে তার জায়গায় পিছনে একটি নীল পশ্চাৎপট দিয়েছিলেন, সেটি এখনও দেওয়া হয়। তার উপর

কেবলমাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটি মাত্র লাল ফুল এবং তার উপরে একটি ক্ষীণ চন্দ্ররেখা। রথী, দিনু ওঁরা নিজে টিকিট বিক্রি করে বোধ হয় দশ-বারো হাজার টাকা তুলেছিলেন, ঠিক কত আমার মনে সেই, কিন্তু তখনকার পক্ষে বেশ ভারি অঙ্ক। অভিনয়ান্তে যখন আমরা উঠোন ছেড়ে দোতলায় উঠলুম এবং দুই বাড়ির মাঝখানে নাম-সার্থক-করা সাঁকোয় দাঁড়িয়ে আছি তখন রবিকাকাকে লক্ষ্য করে বললুম যে তোলা টাকাটা যেন ঠিক হাতে গিয়ে পৌঁছয়। তার উত্তরে তিনি ফাল্গুনীর মাঝির একটি কথা উদ্ধৃত করে বললেন, 'আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।' আমাদের অভিনেতা প্রভৃতি সকলকে দোতলার বাইরের ঘরে ভোজ খাওয়ানো হল।

ডাকঘর

ডাকঘরটিও (প্রথম প্রকাশ ১৯১২) মধ্যপর্বের অন্তর্গত বলে মনে করি। এমন সুন্দর মঞ্চসজ্জা অন্তত আমাদের চোখে তার আগে কখনও পড়ে নি। তখনকার বিচিত্রাঘরের শেষে মঞ্চটি বাঁধা হয়, ঠিক একটি পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর অনুকরণ করে। সেই চালের খড় পর্যন্ত স্টেজের সামনে থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। ঐ ঘরেই ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ্যে কাছাকাছি ছয়বার এই নাটকটি অভিনীত হয়। আমার চোখে ঘরটি এত সুন্দর লেগেছিল যে মনে হয়েছিল কখনও ঘরটি না ভাঙলেই ভালো হয়। তার অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন রবিকাকা, গগনদাদা, সমরদাদা,? অবনদাদা এবং অবনদাদার ছোট মেয়ে সুরূপা। আর অমল সেজেছিলেন আশামুকুল নামে একটি শান্তিনিকেতনের ছেলে। বহুদিন পরে বিশ্বভারতী পত্রিকায় সে একটি লম্বা কবিতা লিখে অভিনেতাদের প্রত্যেকের খবর নিয়েছিল। ডাকঘরের অভিনয়ের সুন্দর ছবি তোলা আছে। অবনদাদার অপূর্ব লেখনীতে ছবির চেয়েও উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিবিধ

বশীকরণ, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, গান্ধারীর আবেদনও আমাদের কালে অভিনীত হয়েছিল মনে আছে, এবং তাদের সম্বন্ধে ছোটখাট স্মৃতিও যে ভেসে না আসে তা নয়, তবে রবিকাকার সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নেই। হয় রবিকাকা কিংবা দিনু পরিচালনা না করলে কোনো নাটক করাই আমাদের সার্থক হত না। একবার আমার বড় ভাসুরের প্ররোচনায় প্রথম মহাযুদ্ধের সাহায্যার্থে আমরা নিজেরা বাল্মীকি প্রতিভা করবার চেষ্টা করি। তবু রবিকাকাকে অন্ততঃ একবার দেখিয়ে আমাদের ভ্রম সংশোধন করবার সুযোগ লাভ করেছিলুম। সেবার বনদেবীদের সব সবুজ রঙের পোশাক ও লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে সেই পুরনো বাস্তব নকলের পরিচয়ই দিয়েছিলুম। 'সহে না সহে না' গানটিতে আমরা যেরকম ভাবে বনদেবীদের দলবদ্ধ করে মঞ্চের উপর ইতস্তত বসিয়েছিলুম, তিনি সে পরিকল্পনা বদলে বলে দিলেন, গানটি তাদের মনের আবেগ প্রকাশের উপযোগী করে চড়া করে গাইলে ভালো হয়।

এর পরে, আমি যাকে শান্তিপর্ব বলেছি, অর্থাৎ রবিকাকার শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাসকালে তাঁর যেসব নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছে তার সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তবে ১৯৪১ সালের

একবারে শেষে যখন শান্তিনিকেতনের ভাঙা হাটে স্থায়ীরূপে বাস করতে আসি তখন দুটি পুরনো গীতি-নাটিকাকে উদ্ধার করায় আমার কিছু হাত ছিল—'কাল-মৃগয়া' আর 'ভানুসিংহের পদাবলী'। ভানুসিংহের পদাবলীর যে অল্পসংখ্যক গান জানতুম, সেগুলিকে সাজিয়ে নাট্যরূপ দিয়েছিলুম। এখন এই আকারেই নাটিকাটি অভিনীত হয়। 'কাল-মৃগয়া'র গানও পুরনো 'ভারতী' থেকে আমার মেধাবী ছাত্রী সুচিত্রাকে দিয়ে লিপ্যন্তরিত করেছিলুম। দুঃখের বিষয় অনেক সাধ্যসাধনা করেও মগ্নচৈতন্য থেকে সব গানগুলির সুর উদ্ধার করতে পারি নি, তবে অধিকাংশই করেছি।

সমগ্র 'রবীন্দ্রস্মৃতি' শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সুরেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জ্যোৎস্নাদা। জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র
নতুন কাকিমা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী
হিরণদিদি। জানকীনাথ ও স্বর্ণকুমারীর জ্যেষ্ঠা কন্যা
সরলাদি। সরলা দেবী
সুশীলাদি। মহর্ষির দৌহিত্রী; শরৎকুমারীর কন্যা
প্রতিভাদি। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা, পরে আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী
অভি। হেমেন্দ্রনাথের কন্যা অভিজ্ঞা দেবী
বর্ণপিসিমা। মহর্ষির কন্যা বর্ণকুমারী
জগদীশ দাদা। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মাতুল
উষাদিদি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা
অরুদাদা। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র অরুণেন্দ্রনাথ

য়োরুবা দেশে ২ ইবাদান

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৫ই আগস্ট ১৯৫৪, বৃহস্পতিবার। Ikoyi ইকোয়ি হস্টেলে আটটার মধ্যেই প্রাতরাশ চুকিয়ে নেওয়া গেল, দুদিনের হস্টেলের প্রাপ্য দিয়ে দিলুম, ঘরের বয়কে দু শিলিং বখশিশ দিতে সে মহাখুশি হ'য়ে নিলে। ইতিমধ্যে চেলারামের ফার্মের গাড়ি এসে হাজির। শ্রীযুক্ত রূপচন্দের সৌজন্যে ব্যবস্থা হ'য়েছে যে, এই গাড়ি আমাকে লেগস্ থেকে ইবাদান নিয়ে যাবে, সেখান থেকে তার পরের দিন Ife ইফে নগরে যাবে, তার পরের দিন আবার ইফে থেকে ইবাদানে আমাকে নিয়ে ফিরে আসবে, আর ইবাদান থেকে পরে Abeokuta আবেওকুতা হ'য়ে লেগস্-এ আমাকে আবার পৌঁছে দেবে। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, আর রবি, এই চার দিনের জন্যে এঁরা গাড়ি আমাকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলেন। এঁদের এই সৌজন্যপূর্ণ আতিথ্য না হ'লে য়োরুবা দেশের ভিতরটা ঘুরে আসা আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব হ'ত। পূর্বপরিচিত ড্রাইভার উইলিয়াম গাড়ি নিয়ে হাজির— গাড়ির নম্বরটা মনে রাখবার, ৯৯৯। উইলিয়াম লোকটি আমার পথপ্রদর্শক আর দোভাষীর কাজও ক'রেছিল। বেশি বকে না, আর জিজ্ঞাসা ক'রলে যথাজ্ঞান উত্তর দেবার চেষ্টা করে, এর এই একটি গুণ ছিল। হস্টেল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে প্রথমতঃ C. M. S.-এর বইয়ের দোকানে গিয়ে আরও কতকগুলি বই কিনলুম। তার পরে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ আর নারায়ণদাস, এঁদের বাসায় গেলুম। শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ কিছু ইংরেজি টাকার বদলে ওয়েস্ট্ আফ্রিকান টাকা আমাকে দিলেন, আর নাইজিরিয়া সরকারের External Affairs বিভাগের সহকারী সচিব শ্রীযুক্ত Smith স্মিথ -এর সঙ্গে ফোনে কথা ক'য়ে জেনে নিলেন যে, আমার Kano কানো যাবার হাওয়াই জাহাজের টিকিট তিনি সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন, যথাকালে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্-এর কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আমি ফিরে এসে টিকিট নিয়ে নেবো। সাড়ে ন-টার দিকে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ আর অন্য বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলুম। কিছু জিনিস-পত্র এঁদের হেফাজতে রেখে গেলুম। গাড়িতে যাত্রী শুধু আমি একা— রাজার হালে যাত্রা শুরু হ'ল।

লেগস্ থেকে ইবাদান ১১০ মাইল দূরে। এই পথে রেল-লাইনও আছে, ইবাদান হ'য়ে আরও উত্তরে Ilorin ইলোরিন, তার পরে Jebba জেব্বা, Kaduna কাদুনা, Zaira জাইরা হ'য়ে, উত্তর-নাইজিরিয়ার প্রধান শহর কানোতে এই লাইনে যাওয়া যায়— কানোর আরও উত্তরে Nguru ঙুরু আর Gashua গাশুয়া শহর পর্যন্ত এই লাইন গিয়েছে। জেব্বার পরে বড় নদী নাইগার, নাইগারের উপর রেলের পুল আছে। এই অঞ্চলে এটি প্রধান রেল-লাইন। পূর্ব-নাইজিরিয়ায় আর একটি লাইন আছে। আমাদের মিটার-গজ মাপের লাইন, ট্রেন ধীর মন্থর গতিতেই চলে— ট্রেনে ইবাদানে যেতে গেলে অনেক সময় লাগে। এদেশে মোটর চলবার সড়ক চারদিকে ক'রেছে— রেলের তেমন প্রসার নেই, লরি বাস্ আর ঘরোয়া গাড়ি, এই-ই বেশি চলে। লেগস্ থেকে ইবাদানের পথটি বেশ প্রশস্ত,

আর মোটর চলার পক্ষে চমৎকার ভাবে তৈরি। এ অঞ্চলটা বেশ জনবহুল, তবে আমাদের দেশের মতন এত ঘিঞ্জি নয়। এখানকার জমি লাল; আর দুই-একখানা খড়ে-ঢাকা বা নারিকেল পাতায় ঢাকা বাড়ি ছাড়া, ঘর-বাড়ি বড় রাস্তার ধারে বিশেষ নেই। মাইলের পর মাইল কোনো বাড়ি চোখেই পড়ে না— অবশ্য শহর ছেড়ে একটু দেশের ভিতরে যাবার পরে। পথে এ গাড়ির একটু গোলমাল হ'ল— উইলিয়াম হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে ব'ললে যে, গাড়ির বাঁ দিককার পিছনের চাকার অক্ষনাভির ঢাকন গোল চাকতি (axle disk অক্ষ-চাকতি বা 'নাই-চাকতি') প'ড়ে গিয়েছে। আমি কিছুই টের পাই নি, কিন্তু ড্রাইভারের কানে তার আওয়াজ পৌঁচেছে। রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে' খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি ক'রলে, কিন্তু পাওয়া গেল না। পথ-চলতি অন্য গাড়ি বা বাস বা লরি সংখ্যায় বেশি নয়। বাস্‌গুলি যাত্রীতে ঠাসা, আর ছাতের উপর স্তূপাকার মালপত্র। অনেকগুলি বাসের গায়ে ইংরেজিতে ভগবানের প্রতি প্রার্থনা বা অন্য কিছু খ্রীষ্টান-ধর্ম-সম্বন্ধীয় উক্তি লেখা আছে— যেমন The Lord be with us, Thy will be done, I take refuge in the Lord, ইত্যাদি। এইসব বাসের মালিক খ্রীষ্টান য়োরুবা। আর য়োরুবাদের মধ্যে ধর্মভাবও যথেষ্ট— কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি প্রাচীন ধর্মের মানুষ। পথে এক জায়গায় লরির আর বাসের বিশ্রামস্থান। সেখানে বোতলে করে palm wine— 'তেল-সুপারি' গাছের রস, যা এখানে লোকে তাড়ি বা খেজুর-রসের মতন পান করে, তাই বিক্রি হ'চ্ছে। উইলিয়ামের মুখ দেখে মনে হ'ল, সে একটু গলা ভিজিয়ে নিতে চায়— ছয় পেনির মতন খরচ ক'রে তাকে এক বোতল খাইয়ে দিলুম, মহা খুশি হ'য়ে সে ব'ললে, it is very refreshing— দেহ-মনকে তর্ ক'রে দেয়। পথ-চলতি লোকেদের মধ্যে এই তাড়ি-জাতীয় পানীয় সেবার রীতি খুবই আছে দেখলুম। মেয়ে পসারীরা মাটির উপর চাটাই পেতে বোতলে ক'রে বিক্রি ক'রছে,মোটর-ড্রাইভার আর যাত্রী মেয়ে-পুরুষ ভিড় ক'রে তাদের কাছ থেকে কিনছে। অনেকে তাল-পাতার মতন পাতার দোনা থেকে এই তাড়ি খাচ্ছে।

একটি নদীর উপরে লোহার সাঁকো পেরিয়ে, আমরা আবেওকুতা শহর ছুঁয়ে চ'ললুম, আর শেষে বেলা পৌনে একটায় ইবাদান শহরে পৌঁছলুম।

পথে যাবার সময়ে মাঝে মাঝে গির্জাও দেখি, আর মসজিদও দেখি। কিন্তু নানা স্থানে রাস্তার ধারে প্রাচীন ধর্মের মন্দিরও দু-চারটে নজরে প'ড়ল। এই-সব মন্দির অত্যন্ত অরক্ষিত অবস্থায়, প্রায় ভগ্ন দশায় র'য়েছে। মন্দির মানে, একটা ক'রে চালা ঘর— খড়ে বা পাতায় ছাওয়া। কোনো কোনো জায়গায় এই মন্দিরের ভিতরে এদের সব দেবতার কাঠের মূর্তি আছে। একটু বড় দরের মন্দিরে খোদাই করা কাঠের থাম— খোদাই কোনো ফুল-পাতা বা অন্য গোল-চৌকা-তেকোনা-পান প্রভৃতি নকশার নয়, নানা রকমের মূর্তি। এই কাঠের থাম আর অন্য কাঠের মূর্তি হ'চ্ছে য়োরুবাদের আধুনিক কালের শিল্পের একটি লক্ষণীয় জিনিস।

ইবাদান শহরের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই শহরটি আফ্রিকা মহাদেশের, বিশেষ করে পশ্চিম-আফ্রিকার খাঁটি নিগ্রো শহর। য়োরুবারা সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ— আর আবেওকুতা, ইবাদান, Ogbomosho ওগ্‌বোমোশো, ইলোরিন প্রভৃতি বড় বড় শহর এদের মধ্যেই গ'ড়ে উঠেছে— কোনো বিদেশী এসে এ-সব শহরের পত্তন করে নি। য়োরুবা দেশের জনসংখ্যার বেশ একটা বড় অংশ এই-সব শহরেই বাস

১ ২ ৩ য়োরুবা মৃৎশিল্প
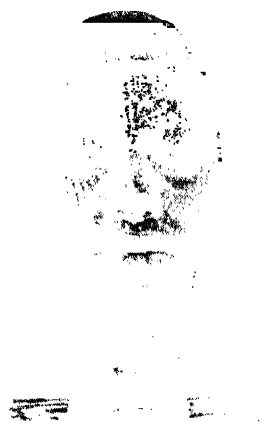
৪ ৫ য়োরুবা জাতির কাঠের কাজ

৬ জন ড্যানফোর্ড কৃত বেনিন-নগরের প্রাচীন যুগের রানী ইমোতান-এর প্রমাণ আকারের বক্ষমূর্তি

শ্রীযুক্ত ওবাফেমি আবোলোবোর গৃহে

ইবাদান। পশ্চিম-নাইজিরিয়ার রাজ্যপাল ও প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য অভ্যাগত সজ্জনের সহিত

করে। ইবাদান শহরের লোক-সংখ্যা সাড়ে চার লাখের উপর হবে; তেমনি ইলোরিন, আবেওকুতা প্রভৃতির লোকসংখ্যা তিন লাখের কাছাকাছি যাবে। এই-সব শহর যেন কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি। প্রাচীন কালে নিয়মিত রাস্তাঘাট ছিল না, আজকাল অবশ্য তা হ'য়েছে। এত লোকের বাস, শহরের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা পূর্বকালে তেমন ছিল না; তবে চার দিকে খোলা জায়গা ছিল প্রচুর। এখন অবশ্য রাস্তা-ঘাট ক'রে, হাট-বাজারের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রেখে, স্বাস্থ্যরক্ষার আধুনিক রীতি অবলম্বন ক'রে, পুরোনো গ্রামধর্মী শহরকে একেবারে বদলে' ফেলা হ'চ্ছে।

আমাদের গাড়ি এসে দাঁড়া'ল, ইবাদান শহরে চেলারামের আপিস আর দোকানের সামনে, শহরের মধ্যভাগে প্রধান বড় রাস্তার ধারে। আগে থাকতেই লেগস্ থেকে শ্রীযুক্ত রূপচন্দ্ খবর পাঠিয়েছেন, ওঁদের ওখানেই আমার থাকবার ব্যবস্থা ছিল। লেগস্ থেকে এঁদের গাড়ি আর লরি ইবাদানে প্রায়ই যাওয়া-আসা করে। এঁদের এখানকার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ঝমট্‌মল দয়ারাম আসোআনী (Jhamatmall Dayaram Aswani) আমাকে সাদরে স্বাগত ক'রলেন, আর ওঁদের আপিসের উপরে যে থাকবার ঘর আছে সেখানে আমার জন্য নির্দিষ্ট কামরা দেখিয়ে' দিলেন। শ্রীযুক্ত ঝমট্‌মল ইবাদানে প্রায় আঠারো বছর ধ'রে আছেন, ১৮৩৬ সাল থেকে। এঁর অধীনে আট দশ জন এঁদেরই সমাজের সিন্ধী যুবক আর প্রৌঢ় ব্যক্তি কাজ করে। শ্রীযুক্ত ঝমট্‌মল থেকে আরম্ভ ক'রে আর প্রায় সকলেই য়োরুবা ভাষা অনর্গল ব'লতে পারেন। দেখলুম যে এঁদের গ্রাহকদের সঙ্গে আর শহরের অন্য লোকেদের সঙ্গে খুবই একটা হৃদ্যতা আর মিত্রভাব আছে— এটা দেখে বড় আনন্দ হ'ল।

ইবাদান শহরটা মনে হ'ল এখন মুসলমান-প্রধান শহর হ'য়ে যাচ্ছে। শ্রীযুক্ত ঝমট্‌মলের অনুমান, শতকরা চল্লিশ মুসলমান চল্লিশ খ্রীষ্টান, কুড়ি Pagan অর্থাৎ প্রাচীনধর্মাবলম্বী। আর কারও-কারও মতে কিন্তু প্রাচীনধর্মাবলম্বী লোক, যারা এখনও প্রাচীন ধর্মের রীতি-নীতি আঁকড়ে ধ'রে আছে, তাদের সংখ্যা শতকরা দশের বেশি হবে না, আর মুসলমান সংখ্যায় খ্রীষ্টানদের চেয়ে কিছু বেশি হবে। কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস যে, খ্রীষ্টান আর মুসলমান কেউই এখনও প্রাচীন ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারে নি, আর মুক্ত হবার চেষ্টাও তেমন নেই। উপর-উপর নিজেদের রোমান কাথলিক বা প্রোটেস্টাণ্ট— অ্যাঙ্গলিকান বা মেথডিস্ট বা প্রেস্‌বিটেরিয়ান, অথবা মুসলমান ব'লে পরিচয় দেয়, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তারা প্রাচীন ধর্মের নানা অনুষ্ঠান পালন করে, তার পূজা-পার্বণে যোগ দেয়, তার পুরোহিতদের কাছে গিয়ে ভাগ্যগণনা করায়, ভবিষ্যতের খবর নেয়, আর তাদের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে প্রাচীন ধর্মের ভূত-প্রেত ডাইন-ডাইনি আর পিতৃপুরুষের শক্তি সম্বন্ধে অবিচলিত বিশ্বাস বিদ্যমান আছে। যাই হোক, ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা আর ধর্মপ্রচারকদের তৎপরতা বেশি দিন এই সাবেক ধরণের বিশ্বাসকে টিঁকতে দেবে না,—যদিও আফ্রিকানদের মধ্যে ইংরিজি-শিক্ষিত অনেকেই এখন আবিষ্কার ক'রছে যে, তাদের প্রাচীন ধর্ম আর চিন্তাপ্রণালীতে, তাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক জীবনের পক্ষে অনেক মূল্যবান্ জিনিস আছে। এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণাই একটা যথার্থ ঐতিহাসিক আর কার্য্যকরণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সকলের মধ্যে এনে দিচ্ছে।

ইবাদান শহর য়োরুবা জাতির রাজনৈতিক আর নাগরিক জীবনের কেন্দ্রস্থল, আর আমার পূর্বপরিচিত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত Obafemi Awolowo ওবাফেমি আয়োলোয়ো মহাশয়ের নিবাসস্থান। আমি যে তাঁর দেশে আস্‌ছি, এ খবর আগেই তাঁকে জানানো হ'য়েছিল। একটু বিশ্রামের পর, শ্রীযুক্ত ঝমট্‌মল আমাকে নিয়ে

পশ্চিম আফ্রিকা
০ ১০০ ১৫০
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা
সেনেগাল নদী
সেনেগাল
বাকেল
গাম্বিয়া
গিনি
সিয়েরা লেওনে
ফ্রিটাউন
লাইবিরিয়া
মনরোভিয়া
গজদন্ত উপকূল
পামাস অন্তরীপ
তিমবুক্তু
নাইগার নদী
নিয়ামি
উত্তর প্রদেশ
আশান্তি
কুমাসি
উপকূল
আক্রা
টোগো
দাহোমে
সোকোতো
কানো
কাদুনা
জোস
নাইজিরিয়া
জেব্বা
ইফে
ইবাদান
লোকোজা
বেনুয়ে নদী
ওনিচা
লেগস
কালাবার
কামেরুন
ফর্নান্দো পো
গিনি উপসাগর
দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগর
সাহারা
মিশর
আরব
পশ্চিম আফ্রিকা
আফ্রিকা
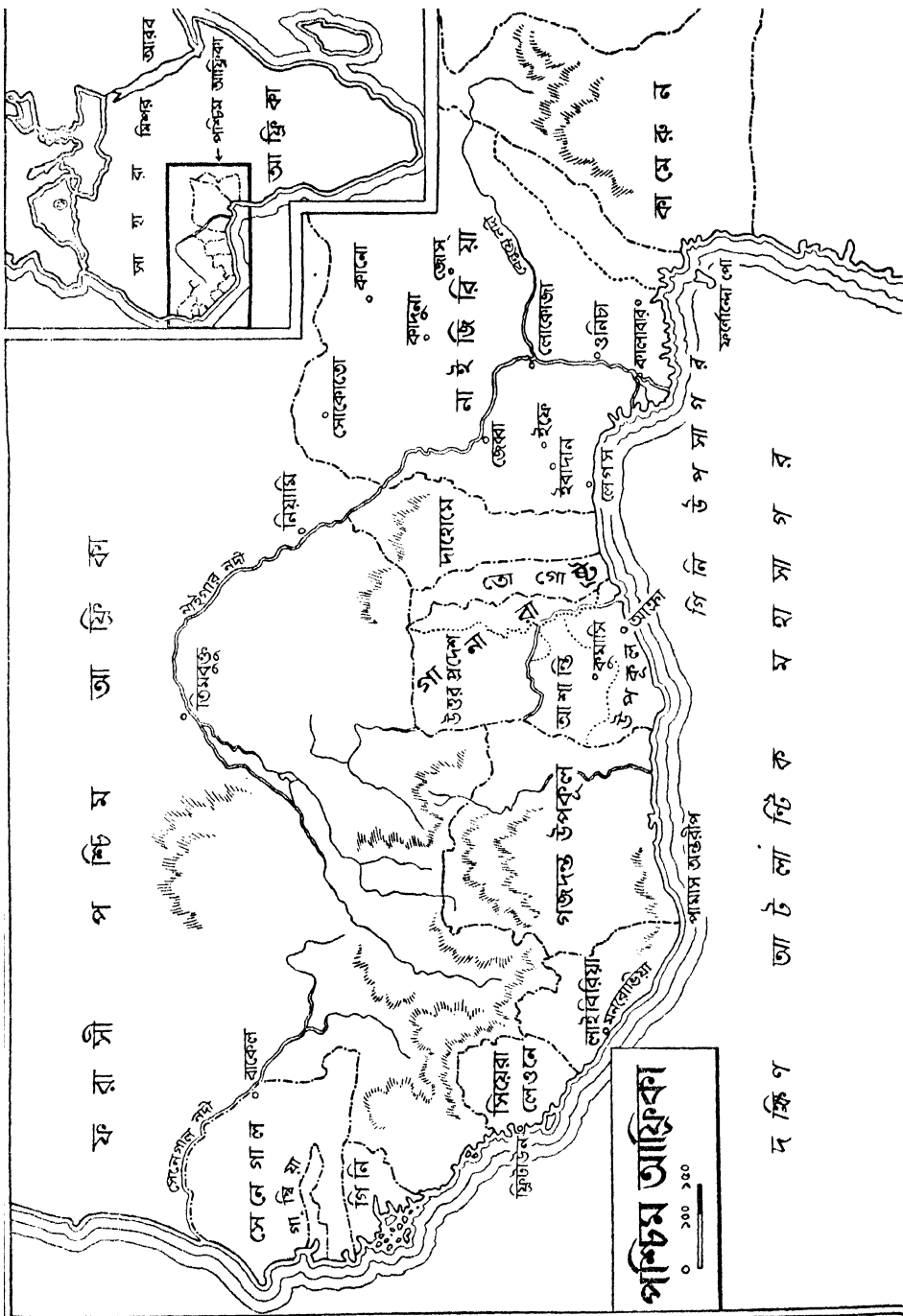
গেলেন শ্রীযুক্ত আরোলোরোর বাড়িতে। কতকটা আমাদের ভারতীয় বাড়িরই অনুরূপ। য়ুরোপীয় মতে সাজানো, তবে পর্দার কাপড় প্রভৃতি স্থানীয়। আরোলোরো আমাকে তাঁর দোতলার বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেলেন। খুব আত্মীয়তার সঙ্গে স্বাগত ক'রলেন। আরোলোরো-গৃহিণী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এঁদের পাঁচটি সন্তান, দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। আরোলোরোর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল— তবে আমার পক্ষে অসুবিধে হ'ল এই যে আমি এঁদের দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত নই, রাজনৈতিক আবহাওয়া কেমন, কতগুলি বিভিন্ন দল আছে, এদের মধ্যে মত বা কার্য্যক্রমের বিরোধ-ই বা কি কি, এসব জানা না থাকায়, নাইজিরিয়ার আধুনিক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রতে পারলুম না। তবে বেশির ভাগ কথা হ'ল, ঐ দেশের সংস্কৃতি আর শিক্ষা বিষয়ে। কথা ছিল, ওঁদের সঙ্গেই মধ্যাহ্নভোজন ক'রতে হবে, তার পরে আরোলোরো তাঁর নিজের বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন, পশ্চিম-নাইজিরিয়ার প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে তাঁর জন্য যে নতুন বাসভবন নির্ধারিত হ'য়েছে সেখানে। এই নোতুন বাড়ি শহরের বাইরে একটু পল্লী-অঞ্চলে তৈরি হ'য়েছে, আর এর আশপাশে অন্য মন্ত্রী আর বড়-বড় সরকারি কর্মচারীদের সরকারি বাসস্থান। শ্রীযুক্ত আরোলোরো এর আগে কখনও এই নোতুন বাড়িতে রাত্রি-যাপন করেন নি— আমার জন্য তাঁর এই নোতুন সরকারী বাসভবনে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হ'য়েছে, এবং তিনিও আমার সঙ্গে এসে প্রথম ওখানে রাত কাটাবেন। বিকালে তিনি তাঁর নোতুন বাড়িতে একটি চা পান সভার আয়োজন ক'রেছেন, আমার সঙ্গে স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে' দেবার জন্য। সন্ধ্যার পরে, আমি গিয়ে আমার সিন্ধী বন্ধুদের বাড়িতে সায়মাশ সেরে আসবো, আর তার পরে বাড়ি ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে একটু অন্তরঙ্গ আলোচনা হবে। শ্রীযুক্ত আরোলোরোর স্ত্রী সেইদিনই বিকালে নব্বুই মাইল দূরে আর একটি শহরে যাবেন, সেখানে তাঁর এক আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে, সন্ধ্যের দিকে তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে, এই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পরে তিনি আবার নব্বুই মাইল গাড়ি ক'রে ফিরে আস্‌বেন, বেশ রাত্রি হ'য়ে যাবে তাঁর ফিরে আস্‌তে, পরের দিন সকালে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হবে।

দুপুরে আরোলোরোর গৃহে মধ্যাহ্নভোজন চুকোতে প্রায় পৌনে তিনটে বাজ্‌ল। তিনি ইংরেজি কায়দায় খাওয়ালেন—ঘন সুপ, মনে হল তাতে প্রচুর মাখন দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু পরে শুনলুম মাখন নয়, পাম-অয়েল বা তেল-সুপারি গাছের তেল ; fish cakes বা মাছের বড়া, শালগম ও কড়াইসুঁটি সিদ্ধর সঙ্গে chicken-pie, অর্থাৎ ভিতরে মুরগির মাংস ও বাইরে ময়দার আবরণ, বড় গোল বাটির আকারে, সবটা স্নেহপদার্থ দিয়ে আধ-ভাজা ; ভাত, চিনির রসে ডোবানো পেয়ার-ফল, আর ক্রীম বা ননী। এঁরা বেশ যত্ন ক'রে খাওয়ালেন। আহারের পর শ্রীমতী আরোলোরো, গাড়ি তৈরি ছিল, চ'লে গেলেন, আর আমাকে শ্রীযুক্ত আরোলোরো তাঁর নিজের গাড়িতে ক'রে তাঁর নোতুন বাড়িতে নিয়ে এলেন।

আরোলোরো বাড়ির বাইরে এক পৃথক্‌ অংশের দুটো ঘর নিয়ে একটা কাপড়ের-দোকান রেখেছেন। এই দোকান তাঁর স্ত্রীর নিজস্ব, একরকম স্ত্রীধন। বর্মার মত য়োরুবা দেশে (আর আফ্রিকার অন্য বহু দেশে) মেয়েরা খুবই স্বাধীন, তাদের নিজেদের পৃথক্‌ সম্পত্তি রাখবার অধিকার আছে, এবং বাপের, স্বামীর বা ভাইয়ের তাঁবে না থেকে, স্বতন্ত্র ভাবে দোকান-পাট, বিকিকিনি চালাতে পারে, তাদের লাভ-লোকসানের

ঝক্কি নিজেদের নিতে হয়। এই প্রথা থাকায় য়োরুবা মেয়েরা স্বাবলম্বী, আর কারও তোয়াক্কা রাখে না, আর তাদের এই অধিকার মেয়েরা ছাড়বে-ও না। এইজন্য মুসলমান ধর্ম এ দেশে নোতুন রূপ গ্রহণ ক'রছে, এটা মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতার দেশ। মেয়েদের মধ্যে পর্দা এখানে কখনও প্রতিষ্ঠিত হবে ব'লে মনে হয় না। প্রধান-মন্ত্রীর স্ত্রী হ'য়েও দোকান চালাতে আরোলোরো-পত্নীর লজ্জা নেই, বরং গর্বের বিষয়। এ দেশে ছোট-খাট দোকান-পাট সবই মেয়েদের হাতে। একখানা কাপড়ে ক'রে পিঠের সঙ্গে কচি ছেলেকে বেঁধে, মাথায় বিক্রির জিনিসের পসরা নিয়ে' মেয়েরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, অথবা ছোট বা বড় দোকানে পসরা সাজিয়ে ব'সেছে, পিঠে কিন্তু ছেলে বা মেয়ে কাপড়ে জড়িয়ে' বাঁধা (এ দেশে শিশুদের কোলে-কাঁখে নিয়ে বেড়ায় না)—এরূপ দৃশ্য য়োরুবা দেশে এবং পশ্চিম-আফ্রিকার সর্বত্র খুবই সাধারণ।

ইংরেজরা এখন মেনে নিয়েছে যে নাইজিরিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হবে, আর নাইজিরিয়ার জনসাধারণ নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ক'রবে, নিজেদের রাজ্য নিজেরাই চালাবে। খালি ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখতে চায়, আর তারা আশা করে যে কিছুকাল পর্য্যন্ত অন্ততঃ, পিছন থেকে রাষ্ট্রপরিচালনার কলকাঠি তারাই নাড়বে। এখন থেকে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনার আর অন্য কর্ম্মচারীরা আফ্রিকান মন্ত্রীদের সম্মান দেখিয়ে' চ'লতে আরম্ভ ক'রছে, তাঁদের Sir ব'লে সম্বোধন করে। এটা এখন অভাবনীয় ব্যাপার, আর দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায় ব্যক্তিরা, যারা Apartheid অর্থাৎ সাদা আর কালোর পৃথক্-করণ নীতি কায়েমি ক'রে রাখার পক্ষে, তারা তো এই অবস্থা দেখলে ক্রোধে ক্ষোভে মূর্চ্ছা যাবে। ডক্টর আরোলোরো তাঁর গাড়ি ক'রে আমাকে তাঁর নোতুন বাড়িতে নিয়ে চ'ললেন। পথে রাস্তাটা একটু সরু ছিল, সামনে আর একখানা মোটরগাড়ি এসে প'ড়ল। তার চালক ছিল একজন ইংরেজ, গাড়ির মালিক-ই নিজে গাড়ী চালাচ্ছিল। ইংরেজের গাড়িখানা বাঁয়ে যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও ডান দিক ঘেঁষে রাস্তার মাঝখান দিয়ে আস্‌ছিল, ডাক্তার আরোলোরোর গাড়ির আফ্রিকান চালক আইন-মোতাবেক ঠিক-মতোই যাচ্ছিল। দুখানা গাড়ি সামনাসামনি হ'য়ে গেল। ইংরেজ আমাদের গাড়ির আফ্রিকান চালককে হুকুমের সুরে ব'ললে, গাড়ি পিছু হটিয়ে' নাও। নিগ্রো চালক ইংরেজিতেই ব'ললে, তোমারই দোষ, তুমি বাঁ দিক্ ঘেঁষে যাচ্ছ না কেন? ইংরেজ নিজের কোট ছাড়বে না, সে আমাদের চালককে দিয়ে আমাদের গাড়িকে পিছু হটিয়ে' নিয়ে যাওয়াবেই। ডাক্তার আরোলোরো তাঁর চালককে রোরুবা ভাষায় যা ব'ললেন, অনুমানে বুঝলুম তার মানে হ'চ্ছে, তুমি ন'ড়ো না। তার পর তিনি গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বা'র ক'রে ইংরেজের দিকে তাকিয়ে' দেখলেন। তাইতেই ইংরেজ ওঁকে পশ্চিম-নাইজিরিয়ার প্রধান-মন্ত্রী ব'লে চিনে ফেল্‌লে, আর Oh, I am very sorry, Sir ব'লে নিজের গাড়ি হটিয়ে' যথাস্থানে রাখ্‌লে, আমাদের গাড়ি ঠিক পথ দিয়ে চ'লে গেল। ঘটনাটি ছোট্ট, কিন্তু এই থেকে ইংরেজদের সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—দেশ যখন ছাড়তেই হবে, তখন খামকা মান বাড়াবার চেষ্টায় মান খোয়াবার কোনো অর্থ হয় না।

ডক্টর আরোলোরোর নোতুন বাড়িতে গিয়ে আমরা উঠলুম। বাড়িটি মাঝারি আকারের, নীচে দু-তিনটি বড়-বড় ঘর আছে, উপরের একটি ঘর আমার জন্য নির্দিষ্ট হ'য়েছে। আধুনিক সমস্ত ব্যবস্থা, জলের কল, বিজলি-বাতি, স্নানঘর ইত্যাদি। অনুরোধ হ'ল, খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রবো, তারপরে সাড়ে-

চারটেয় ঐ বাড়ির নীচের তলায় শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসবেন, আমার সঙ্গে চা খাবেন, স্থানীয় লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর বা ছোটলাট আর তাঁর স্ত্রীও আসবেন। সকালবেলা বেরিয়েছি আটটার পরে, এখন প্রায় বেলা তিনটে—ভালো ক'রে স্নান ক'রে নেওয়া গেল। গৃহকর্তা যথাকালে আমাকে নীচে নিয়ে গেলেন, অতিথিরা একে একে আসতে লাগলেন। পশ্চিম-নাইজিরিয়ার অস্থায়ী লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর শ্রীযুক্ত C. M. Shankland শ্যাঙ্ক্ল্যাণ্ড আর তাঁর স্ত্রীও এলেন, আর দুজন ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকও এলেন। আফ্রিকান লোকেদের মধ্যে জন-তিনেক অন্য মন্ত্রী, আর একজন বড় জমিদার বা সর্দার—এ দেশে এঁদের Chief বলে—তিনিও এলেন। শ্রীযুক্ত Ado Thani আদো থানি বলে একজন ইংরেজি-পোশাক-পরা ভদ্রলোক এলেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তিনি হ'লেন এখানকার Information Officer অর্থাৎ সূচনা-বিভাগের একজন প্রধান কর্মচারী। স্থানীয় ইবাদান ইউনিভার্সিটি কলেজের একজন অধ্যাপক এসেছিলেন, লোকটিকে বড় ভালো লাগ্‌ল, অর্থনীতির অধ্যাপক, বিলিতি ছাপ আছে, অল্প বয়স, অতি বুদ্ধিমান্ আর সদালাপী ব্যক্তি, শ্রীযুক্ত Ayo Ogunsheye আয়ো ওগুন্‌শেয়ে, ইনি হচ্ছেন এখানকার Extra-mural Studies, অর্থাৎ কলেজের শিক্ষার বাইরে যে-সমস্ত অধ্যাপনা করা হয় সে বিভাগের ডেপুটি-ডাইরেক্টর। ইবাদান শহরের ভারতীয় বণিক্‌দের মধ্যে জন চার-পাঁচ এই সভায় নিমন্ত্রিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঝমট্‌মলও ছিলেন।

থানির ফটোগ্রাফর-দল ফটাফট আমাদের বিস্তর ছবি তুললে। শ্রীযুক্ত Shankland একটু ভালোমানুষ গোছের লোক, আমার সঙ্গে বেশ সহজভাবে হৃদ্যতার সঙ্গে কথা ব'লতে লাগলেন। আফ্রিকার সংস্কৃতি শিল্প ধর্মজীবন প্রভৃতি বিষয়ে সুদূর ভারতের একজন অধ্যাপকের আগ্রহ দেখে একটু বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটু শ্রদ্ধার ভাবও যেন দেখলুম। বারান্দায় একটি গ্রুপ-ফোটো তোলবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। পাঁচখানা চেয়ার সাজানো হ'য়েছে। আমাদের বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। শ্রীযুক্ত Shankland মাঝের চেয়ারটাতে ব'সতে যাবেন, কিন্তু ডক্টর আরোলোরো তাঁকে ব'ললেন যে, তাঁদের সম্মানিত ভারতীয় অতিথি মাঝে ব'সবেন। শ্রীযুক্ত আরোলোরোর নির্দেশ অনুসারে আমাদের এইভাবে বসানো হ'ল—ডক্টর আরোলোরো আমাদের ডানদিকে, তার পরে Mrs. Shankland, মাঝখানে আমি, আমার বাঁ দিকে একজন আফ্রিকান মহিলা, ইনি পশ্চিম-নাইজিরিয়ার একজন মন্ত্রী, এবং শেষে শ্রীযুক্ত Shankland। আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে' ভারতীয় বণিক্‌গণ ও কতকগুলি আফ্রিকান অতিথি। আফ্রিকান ভদ্রলোকেরা কেউ-কেউ পুরো ইউরোপিয়ান পোশাকে এসেছিলেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকে য়োরুবা পোশাকে ছিলেন—সেই পোশাক ঢিলে আলখাল্লার মতন, আর পায়ে সাধারণতঃ চপ্পল জুতো। য়োরুবারা নীল রঙটা পছন্দ করে। এদের মেয়েদের কাপড়েও নীল রঙের আধিক্য। শ্রীযুক্ত আরোলোরো পরেছিলেন ঘন নীল আর ফিকে নীল আর সাদার বড় বড় চৌকো কাটা, কাপাসের কাপড়ের আলখাল্লা। আমি অধ্যাপক ওগুন্‌শেয়ে-র এবং আরও কতকগুলি অন্য আফ্রিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশি হলুম।

ছটার দিকে, তখনও কিছু আলো আছে, শ্রীযুক্ত থানি আমাকে নিয়ে গেলেন ইবাদানের পুরাতন কলেজ আর নোতুন বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে। নোতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ইমারত তখনও তৈরি হ'চ্ছে। ছাত্র আর ছাত্রীদের জন্য অতি চমৎকার প্রশস্ত বারান্দা-যুক্ত বাসগৃহ তৈরি হ'য়েছে।

এখন ছুটির সময়, নিয়মিত ছাত্রেরা কেউ নেই; তবে সমস্ত দেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ নেবার জন্যে উচ্চশ্রেণীর অনেক ছাত্র এসে আছে। এরূপ একটি extra-mural ক্লাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের বাইরে যেখানে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, সে রকম একটি ক্লাস চ'লছিল। শুনলুম, উত্তর, পশ্চিম আর পূর্ব এই তিন অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্রেরা এসে জমা হ'য়েছে। যে ক্লাসে শ্রীযুক্ত থানি আমাকে নিয়ে গেলেন, সেখানে একজন আফ্রিকান প্রোফেসর Conciliation (and not Arbitration) in Labour Disputes অর্থাৎ শ্রমিকে-ধনিকে মত-বিরোধ হলে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য-মূলক মিলন—তৃতীয় পক্ষের সালিসী নয়—এই বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, অবশ্য ইংরেজিতে। আমি ক্লাসে ঢুকে ছাত্রদের মধ্যে ব'সেই শুনতে লাগলুম, এতে ক্লাসে একটু সাড়া প'ড়ে গেলেও কাজে কোনো বাধা হ'ল না। যে অধ্যাপকটি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, বেশ সুযুক্তিপূর্ণ কথা ব'লছিলেন, বিশেষ শুদ্ধ ইংরেজিতে। অধ্যাপক ওগুন্‌শেয়ে আমাদের চায়ের পার্টি থেকে ফিরে এসে এই আলোচনা-সভায় সভাপতিত্ব ক'রছেন। অধ্যাপকের বক্তৃতা দেওয়া শেষ হ'য়ে গেলে, আমাকে এঁরা অনুরোধ ক'রলেন ছাত্রদের দু কথা ব'লতে। আমি ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের অধ্যাপক আর ছাত্রদের পক্ষ থেকে, আফ্রিকান লোকেদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি আর তাদের স্বাধীনতা-লাভের সাফল্যের জন্যে শুভ কামনা জানালুম, আর আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতার, আফ্রিকার জাতীয় আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের জানবার ইচ্ছা প্রকট ক'রলুম, ভবিষ্যতে নিজেদের সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হ'য়ে আফ্রিকার মানুষও জগতে নোতুন জিনিস যে দিতে পারবে, সে আশাও প্রকাশ ক'রলুম। শ্রীযুক্ত ওগুন্‌শেয়ে বেশ খুশি হ'য়ে ভারতবর্ষের প্রশংসা ক'রে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়-পরিদর্শনের সময়ে শ্রীযুক্ত থানির ফোটোগ্রাফররা অনেক ছবি নিলে।

তখন সন্ধ্যা নেমেছে, আমি শ্রীযুক্ত থানিকে ব'ললুম যে আমাকে শ্রীযুক্ত John Danford জন ড্যানফোর্ড-এর বাড়িতে নিয়ে চলুন। লেগস্‌-এ এঁর কথা শুনেছিলুম, ইনি ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্মচারী, ইবাদানে বাস ক'রছেন, যেমন শিল্পরসিক তেমনি উঁচুদরের শিল্পীও বটে। ইবাদান শহরটি সন্ধ্যের দিকে অতি সুন্দর লাগ্‌ল, এখানকার জমি ঢেউ-খেলানো, চারিদিকে সবুজে ভরা, নয়নাভিরাম। পথে হঠাৎ ক'লকাতায় যিনি এসেছিলেন আর আমার বাড়িতেও গিয়েছিলেন, পশ্চিম-নাইজিরিয়ার কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত Akinloye আকিন্‌লোয়ের সঙ্গে দেখা। তিনি ইবাদানে ছিলেন না, সেইদিনই ফিরেছেন, আবার তার পরের দিন চ'লে যাবেন। পথে গাড়ি থামিয়ে' আমাদের শিষ্টাচার হ'ল।

শ্রীযুক্ত ড্যান্‌ফোর্ডের বাড়িতে রাত্রি সাড়ে-আটটা পর্য্যন্ত ঘণ্টা-দেড়েক ধ'রে নানা বিষয়ে আলোচনা হ'ল। শ্রীযুক্ত ড্যান্‌ফোর্ড একটি বেশ লক্ষণীয় আফ্রিকান শিল্পের সংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছেন। আফ্রিকান জীবনকে অবলম্বন ক'রে তাঁর নিজের আঁকা অনেক ছবিও আছে, তার কিছু-কিছু আমায় সানন্দ-আগ্রহে দেখালেন। Cameroon কামেরুন দেশের পিতলের ঢালাই করা মূর্তি আর অন্য শিল্পবস্তু দেখালেন। য়োরুবা দেশের Oyo ওয়ো শহর ইবাদান থেকে তিরিশ মাইল দূরে, সেখানে calabash অর্থাৎ লাউয়ের তুম্বির উপরে অনেক রকম নক্‌শা কাটা হয়; আর পাত্র-রূপে ব্যবহৃত এই-সব তুম্বির গায়ে কখনও-কখনও রোমান অক্ষরে য়োরুবা ভাষায় প্রবাদবাক্য লেখা থাকে। দু-তিনটি প্রবাদ লিখে নিলুম; যেমন, Omo Lere : Ami Ape (ওমো লেরে : আমি আপে)—অর্থাৎ "শিশু লাভ : তথাস্তু হে"; অর্থাৎ

কিনা, মানুষের জীবনে সন্তানই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, ভগবান তাই করুন; Ori Elegam Fo: Ami (ওরি এলেগাম ফো: আমি)—"নিন্দুকের মাথা ভাঙুক: তথাস্তু।" য়োরুবাদের মধ্যে এ-রকম বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে, অতি সংক্ষেপে তারের ভাষার মতন এই-সব প্রবাদের অনেকখানি মানে করা যায়। ইবাদান থেকে অনেক দূরে বিখ্যাত Benin বেনিন শহরে, যেখানে Bini বিনি বা Edo এদো জাতির বাস, আর যেখানকার প্রাচীন ব্রঞ্জে ঢালা মূর্তি আর ফলক আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন ব'লে গণ্য, সেই বেনিন শহরে এদের এক প্রাচীন কালের বিখ্যাত রাণী Imotan ইমোতান্-এর মানবায়তনের ব্রঞ্জে-ঢালা মূর্তি জন্ ড্যান্‌ফোর্ডকে দিয়ে করিয়ে' নগরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এই মূর্তির ছবি আমাকে দেখালেন—ড্যান্‌ফোর্ডের কাছ থেকে তাঁর ফোটোগ্রাফরের ঠিকানা নিয়ে পরে লণ্ডনে গিয়ে এই মূর্তির কয়খানা ফোটো আমি সংগ্রহ করি। ড্যান্‌ফোর্ড আমায় ব'ললেন যে, ঐ রাণী, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে যিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর বংশের একজন রাজকুমারীকে আদর্শ ক'রে, তাঁকে পুরাতন অলংকারাদি পরিয়ে' এই মূর্তি তিনি তাঁকে দেখে তৈরি করেন। এটি খুবই লোকপ্রিয় হয়েছে। ড্যান্‌ফোর্ড আরও কতকগুলি য়োরুবা শিল্পীর কাজ কাঠের মূর্তি দেখালেন, এগুলি অতি সুন্দর, যদিও সমস্ত মূর্তির উদ্দেশ্য বা অর্থ বুঝতে পারলুম না। কতকগুলি এদের প্রাচীন দেবতার, কতকগুলি রাজা-রাজড়ার, আর কতকগুলি জনসাধারণের।

ড্যান্‌ফোর্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিন্ধী বন্ধুদের বাসায় গেলুম। এখানে আরও দু-তিনটি দোকান থেকে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আরও কতকগুলি সিন্ধী ভদ্রলোক এসেছিলেন। সিন্ধীদের ভোজে এঁরা আমিষ নিরামিষ অনেক পদ করেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মদ্য-পান চ'লতে থাকে, আর আড়াই-তিন ঘণ্টার কমে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ক'রতে ক'রতে আর একে-একে নানা শুখ্‌নো মাছ ও মাংসের পদ খেতে খেতে, অনেক সময় কাটিয়ে' পরে মুখ্য ভোজনে বসা গেল। এঁদের এই স্নেহ আর সৌজন্যের অত্যাচার থেকে সাড়ে-এগারোটার পর মুক্তি পেলুম, তখন রাত্রিযাপনের জন্য শ্রীযুক্ত আরোলোরোর গৃহে আমার প্রত্যাবর্তন হ'ল। তাঁর সঙ্গে যে দুদণ্ড ব'সে কথাবার্তা কইবো স্থির ছিল, এই এত রাত্রে তা আর হ'য়ে উঠ্‌ল না। তিনিও ক্লান্ত ছিলেন, আর আমারও ক্লান্তিতে আর ঘুমে চোখ জড়িয়ে' আস্‌ছিল। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল। ইবাদান শহরের মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে শ্রীযুক্ত আরোলোরোর রাজনীতিক দল Action Group-এর পরাজয় ঘটেছিল, বিরোধী দল, N. C. N. C. অর্থাৎ National Convention of Nigeria and the Comeroons -এর কাছে—তাঁর সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের নেতা Dr Nnamadi Azikiwe ন্নামাদি আজিকিরের মতানৈক্য কোথায় তা জানবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে শোনা আর হ'য়ে উঠ্‌ল না। আগামী কাল সকালেই তিনি কার্য্যান্তরে অন্য এক শহরে যাবেন; আর আমাকেও ইবাদান থেকে একদিন আর এক রাত্রের জন্যে য়োরুবা জাতির ধর্মবিষয়ক কেন্দ্র ইফে শহরে যেতে হবে।

৬ই আগস্ট ১৯৫৪, শুক্রবার। ভোরের বেলাতেই সূচনা-বিভাগের শ্রীযুক্ত থানি এসে উপস্থিত হ'লেন, আর চেলারামদের গাড়ি নিয়ে চালক উইলিয়াম্-ও এসে প'ড়্‌ল। শ্রীযুক্ত আরোলোরোর সঙ্গে প্রাতরাশ সেরে নেওয়া গেল। য়োরুবা দেশে আর পশ্চিম-আফ্রিকার অন্যত্র একটা নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে—স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে ধীরে-ধীরে ক্রমবর্ধমান পাকিস্থানী মনোভাব। সাধারণ য়োরুবা আর অন্য আফ্রিকান মুসলমান এখনও ধর্ম-বিষয়ে অনেকটা উদার আছে, খুব গোঁড়া মনোভাব দু-চার জন মোল্লা-শ্রেণীর

লোকের মধ্যে দেখা গেলেও, এরা দেশের মধ্যে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে মুসলমান রাজ্য বা মুসলমান প্রতিষ্ঠা খাড়া করবার জন্য এখনও তাদৃশ চেষ্টিত নয়। কিন্তু এদের কেউ-কেউ বাইরের থেকে প্ররোচনা পেয়ে, আর আংশিক ভাবে, জাতীয়তা-বিরোধী ব'লে ইংরাজ শাসকসম্প্রদায়ের কিছুটা সমর্থন পেয়ে, এখন নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা তুলে, একটু বেশি রকম মুসলমান সমাজকে মুসলমান-হিসাবে, য়োরুবা বা আফ্রিকান হিসেবে নয়, সচেতন ক'রে তোলবার চেষ্টায় আছে। শ্রীযুক্ত আরোলোরো আমায় ব'ললেন যে নাইজিরিয়া, বিশেষত পশ্চিম-নাইজিরিয়ার সরকার এ বিষয়ে কোনো ধর্ম বা শ্রেণীর প্রতি কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব করেন না। উত্তর-নাইজিরিয়া আর অন্য-অন্য জায়গার মুসলমানদের সরকারি শিক্ষায়তনে ভরতির জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। উত্তর-নাইজিরিয়া মুসলমান-প্রধান অঞ্চল, আর সেখানে শিক্ষা, অর্থাৎ আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার উন্নতিও হয় নি—সেইজন্য সেখানকার লোকের মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে যে, দক্ষিণের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর য়োরুবা আর ইবো জাতির লোকেরই স্বাধীন নাইজিরিয়াতে প্রতিপত্তি আরও বাড়্‌বে। (আমি অন্যত্র শুনেছিলুম যে নাইজিরিয়াতে স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন চ'লেছে, আর তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতি হিসাবে ইংরেজরা যে আন্দোলনকে মেনে নিয়েছে, উত্তর-নাইজিরিয়ার Hausa হাউসা আর অন্য মুসলমানেরা সাধারণতঃ সেই আন্দোলনে আগ্রহ দেখাচ্ছে না ; আর তারা চায় যে উত্তর-নাইজিরিয়া পৃথক্ একটি মুসলমান রাষ্ট্র হ'য়ে স্বাধীনতা লাভ করুক,—অন্যথায় তারা ইংরেজের অধীনেই থাকবে। তবে সম্প্রতি শুনেছি যে উত্তরের জন কয়েক দূরদর্শী শিক্ষিত নেতা এখন দক্ষিণ-পশ্চিম আর পূর্ব-নাইজিরিয়ার নেতাদের সঙ্গে মিলে, সমগ্র সম্মিলিত নাইজিরিয়ার জন্যই স্বাধীনতা চাচ্ছেন)। শ্রীযুক্ত আরোলোরোর মতে, উপস্থিত এ সমস্যা তেমন জটিল বা প্রবল হ'য়ে ওঠেনি, তবে ভবিষ্যতে তার সম্ভাবনা আছে। এখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা আর একতা সুদৃঢ় কর্‌বার জন্যই ব্যস্ত। দেশের শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকে চায়, উঁচু পদে বা চাকরিতে ইংরেজের বদলে যোগ্য দেশী লোকেরই নিয়োগ যাতে বেশি ক'রে হয়। আরোলোরো নিজে ধর্মে খ্রীষ্টান, এবং পরে দেখলুম যে, তিনি নিষ্ঠাবান্ খ্রীষ্টান—নিজের সম্প্রদায়ের গির্জায় প্রতি রবিবার নিয়মিত-ভাবে সপরিবারে যান। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ"—তিনি উদার-হৃদয় ব্যক্তি, সেইজন্যে ধর্মমতের গোঁড়ামি তিনি বোঝেন না আর তার বিপদের কথা নিয়ে মাথা ঘামান না। আমি তাঁকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত স্বামীজির লেখার সংগ্রহ, পরমহংসদেবের উপদেশ, Aldous Huxley-র ভূমিকা-সমেত স্বামী প্রভবানন্দের আর Christopher Isherwood ক্রিস্টোফার আইশারউড-এর অনূদিত গীতা, আর আমার কতকগুলি প্রবন্ধ তাঁকে দিলুম—তিনি আগ্রহের সঙ্গে নিলেন—Universal Prayers ব'লে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত সংস্কৃত কতকগুলি প্রার্থনার সংগ্রহ, ইংরেজি অনুবাদ সমেত, আগ্রহের সঙ্গে পাতা উলটে' দেখতে লাগলেন। শ্রীমতী আরোলোরো গত রাত্রে তাঁর আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টি থেকে ফিরে এসেছিলেন, প্রাতরাশের পর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। এঁদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে এঁদের স্বামী-স্ত্রী আর তিনটি সন্তান, যারা বাড়িতে ছিল, তাঁদের সঙ্গে আমার ছবি তোলা হ'ল। এঁদের ছেলেমেয়েদের যে ভাবে য়োরুবা ভাষায় নামকরণ হ'য়েছে, তা থেকে এঁদের সামাজিক রীতিনীতি আর ধর্ম-সম্বন্ধীয় চেতনা কতকটা বুঝ্‌তে পারা যাবে। আরোলোরো দম্পতীর ছেলেমেয়েদের নাম—

১। প্রথম সন্তান, পুত্র, তখন বয়স ১৫, নাম Olushegun (ওলুশেগুন্), অর্থ, the Lord conquers, অর্থাৎ "প্রভুরই জয়" ;

২। কন্যা, বয়স ১৩, Omotola (অমোতলা), অর্থ, C Whild (omo) as good as (to) wealth (ola), অর্থাৎ "সন্তান-ই সম্পদ্" ;

৩। পুত্র, বয়স ১১, Oluwele (ওলুয়োলে), অর্থ, the Lord enters our home, "প্রভু আমাদের গৃহে এসেছেন" ;

৪। কন্যা, বয়স ৯, Aiyodele (আইয়োদেলে), = Joy comes into the home "ঘরে আনন্দ এসেছে" ;

৫। কন্যা, Olatokumbo (অলাতোকুম্বো), = "সাগর-পার থেকে শ্রী এসেছে"— এই কন্যাটির জন্মকালে ডক্টর আরোলোয়ো ইংলাণ্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন, সেইজন্যে এই নাম।

আরোলোয়ো দম্পতীর কাছ থেকে বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে সেই সময়ের মতন বিদায় নিলুম। শ্রীযুক্ত থানি আমাকে নিয়ে গেলেন শ্রীযুক্ত আরোলোয়োর প্রতিবেশী Minister without Portfolio, অর্থাৎ বিশেষ কার্য্যভার-বিহীন মন্ত্রী Chief the Honourable Ola Alaiyeluwa Olagbegi II, Olowo of Owo, অর্থাৎ ওয়ো-প্রদেশের ওলোয়ো-উপাধিযুক্ত জমিদার বা রাজা দ্বিতীয় ওবা আলাইয়েলুয়া ওলাগ্বেগি। খবর দেওয়ায় ইনি নীচে নেমে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলেন—সুতনু দীর্ঘবপু যুবক, ঢিলে নীল রঙের য়োরুবা আলখাল্লা প'রে, মাথায় রঙিন সুতোয় সূচের কাজ করা একটি টুপি, তার উপরে একটি পালখ, আর হাতে তাঁর রাজদণ্ড-রূপে একটি সাদা চামর, সম্ভবত সিংহের কেশরে তৈরী। শুনলুম, ইনি একজন বিশেষ শিক্ষিত ও সংস্কৃতি-পূত চিত্তের মানুষ। আমার সঙ্গে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে কথাবার্তা করার এঁর আগ্রহ দেখলুম, কিন্তু দশ মিনিটের বেশি এঁর কাছে থাকা হ'ল না।

এর পরে, শ্রীযুক্ত থানি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন— ইনি এঁর সূচনা বিভাগের দুজন কর্মচারীকে আমার সঙ্গে দিলেন। এরা দুজনে আমার সঙ্গে ইফে যাবে, আর আবশ্যক-মতন ছবি তুলবে ; আর আমার ইফে-ভ্রমণের একটা রিপোর্ট সরকারকে দেবে, সূচনা-বিভাগ থেকে প্রকাশের জন্য। এরা দুজনই যুবক আর বেশ বুদ্ধিমান্ আর কৃতকর্মা। একজনের নাম Bernard Akenabor বার্ণার্ড আকেনাবর, এ জাতিতে এদো, অর্থাৎ বেনিন-নগরের অধিবাসী ; এ ফোটোগ্রাফর। দ্বিতীয় যুবকটির নাম Mac Pepple মাক পেপ্‌ল্, এ জাতিতে ইবো, আর এ হ'চ্ছে রিপোর্টার। এদের ভাষা য়োরুবা ভাষা থেকে আলাদা, তবে ইংরেজি এদের মধ্যে সাধারণ ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম— এতে কোনো অসুবিধে নেই, বরং এই ইংরেজি ভাষাই এতগুলো বিভিন্ন ভাষার মানুষকে এক ক'রে দিয়েছে। আমরা ইবাদান শহর থেকে বেরোবার পূর্বে স্থানীয় সব-চেয়ে বড় বইয়ের দোকান Oxford Book Stall-এ গেলুম— এই বইয়ের দোকান, অন্য পশ্চিম-আফ্রিকার তাবৎ শহরে যেমন, একটি মিশনারি সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত— Church Missionary Society দ্বারা। তবে Gold Coast গোল্ডকোস্ট (বা অধুনা Ghana গানা নামে পরিচিত) রাষ্ট্রে Achimota আচিমোতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বড় বইয়ের দোকান আছে, সেটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারাই পরিচালিত। এখানে আমি নাইজিরিয়া সম্বন্ধে কতকগুলি সচিত্র সাময়িক পত্র ও অন্য বই কিনলুম। শ্রীযুক্ত থানির সঙ্গে এই শেষ দেখা। ভদ্রলোকটি অতি সহৃদয়, আর যাতে আমি সব কিছু দেখতে পাই আর আমার কোনো অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে খুবই আমাকে সাহায্য করেন। ইনি বরাবর কালো কাপড়ের সুট প'রেই ছিলেন— যেমন ও দেশের সরকারি কর্মচারীরা (মন্ত্রী বা জমিদার

বা বিধান সভার সদস্য ছাড়া) প'রে থাকেন। ইনি নিজেই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ধর্মে ইনি মুসলমান, কিন্তু তিনি সব ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা করেন. আর তিনি চান যে আফ্রিকার সমস্ত ধর্মের লোকই মিলিত-ভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্যে কার্য্য করে আর নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতিকে বজায় রাখে। নিজের থেকেই শেষের দিকে ইনি নিজের পারিবারিক ধর্মের কথা আমায় জানালেন, আমি তো কথাবার্তায় বুঝতেই পারি নি যে ইনি খ্রীষ্টান, মুসলমান, কি পুরাতন য়োরুবা ধর্মের মানুষ।

এই-সব কাজে বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেল। আমরা তখন ইবাদান ছেড়ে ইফের রাস্তা ধ'রলুম। ইফেতে এই দিনটা ও এই রাত্রি কাটিয়ে' তার পরের দিন আমরা দুপুরবেলা আর-এক রাত্রির জন্য ইবাদানে ফিরে আসি। ইবাদান থেকে লেগস্‌ ফেরবার পথে আর একবার শ্রীযুক্ত আরোলোরো আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অনপেক্ষিত-ভাবে দেখা হ'য়ে যায়। ইবাদান শহরে এঁদের আতিথ্য ও সহৃদয়তা কখনও ভোলবার নয়। আরোলোরোর বয়স মাত্র ৪৫, এই বয়সেই ইনি নিজের জাতির উন্নতি এবং প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক কিছু ক'রেছেন। ভবিষ্যতে সমগ্র আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ জাতি তাঁর কাছে আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। শ্রীমতী স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী। ইনি ইংরেজিতে আমার সঙ্গে কথা কইলেন। নানা বিষয়ে এঁর সৌজন্যের পরিচয় পাই। আফ্রিকার মেয়েদের পুরাতন রীতিনীতির মধ্যে যা-কিছু ভালো তার সংরক্ষণে ইনি খুবই যত্নশীল। নিজে সর্বদা অতিশোভন য়োরুবা মেয়েদের পোশাক প'রে থাকেন— পশ্চিম-আফ্রিকার পুরানো নকশার ছাপা কাপড় একখানা লুঙ্গির মতো ক'য়ে পরা, গায়ে একটা ব্লাউজ—পোশাকের এইটুকুই বিদেশ থেকে আমদানি— আর মাথায় একটা মাদ্রাজী হাতে-বোনা কাপড়ের রুমাল পাগড়ির মতো ক'রে জড়ানো, পায়ে পাম-শুর মতন জুতো। পোশাকের রঙের মধ্যে নীলের প্রাধান্য, মাঝে মাঝে লাল, কালো ও হলদে' রঙও দেখা যায়। এদেশের মেয়েদের মসৃণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহত্বকের সঙ্গে এই-সমস্ত গাঢ় রঙের কাপড়ের যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য হয়, তা দেখে শিল্প-রসিকের চোখ জুড়িয়ে' যায়। গোল্ড-কোস্ট বা গানাতে মেয়ে-পুরুষের কাপড়ে রঙের খেলা আরও বেশি, আর সেইজন্যেই সেখানকার পরিচ্ছদ আরও মনোহর লাগে। ইবাদানে আমার দুদিনের অবস্থানের মধ্যে এক দিকে আরোলোরো পরিবারের সঙ্গে পরিচয় যেমন একটি আনন্দময় স্মৃতি হ'য়ে চিরকাল মনে থাক্‌বে, তেমনি অন্য দিকে চেলারামদের ইবাদানের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ঝমট্‌মল আসোআনী আর তাঁর অন্য সিন্ধী বন্ধুদেরও সাহায্য আর সৌজন্যের কথা কখনও ভোলবার নয়। ইফে থেকে ফিরে এসে এঁদের সঙ্গে আর এক রাত্রি কাটাতে হ'য়েছিল, তখনকার কথা লেখবার সময়ে বারান্তরে এঁদের সম্বন্ধে কিছু ব'লবো॥

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী -বর্ণিত গীতি

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

বাঙালীর লেখা পুরোনো সংগীতের বই দুর্লভ। দু-চারটে যা আছে তা এখনো পুথির আকারেই আছে এবং অপটু নকলনবিসের দোষে ভ্রমপ্রমাদও তাতে অল্প নেই। উড়িষ্যাতেও দু-একখানা পুথি আছে, সংগীতের দিক থেকে যার মূল্য যথেষ্ট। এমনি একখানা বইএর নাম গীতপ্রকাশ। এতে সেকালের গানের রকম-সকম, অনেক কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু আছে বলে শুনেছি, কিন্তু কবে সেসব উদ্ধার হবে বলা শক্ত।

সম্প্রতি নরহরি চক্রবর্তী ওরফে ঘনশ্যামদাস রচিত সংগীতসারসংগ্রহ[1] নামক গ্রন্থটি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত করে প্রকাশ করেছেন। এইরকম বই আর একখানি আছে সংগীতদামোদর, কিন্তু সেটি এখনো মুদ্রিত হয় নি। নরহরি চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই বইটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। বইটিতে আসলে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই, নানা গ্রন্থ থেকে অংশগুলি তিনি সংকলন করে বিন্যস্ত করেছেন, কিন্তু তথাপি দু-একটি বিষয়ে তৎকালীন সংগীতের উপর কথঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে, সেটি অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিশেষ করে "ক্ষুদ্রগীত" প্রসঙ্গটি আজকের দিনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা ধ্রুবপদ সম্বন্ধে যে রহস্য আজও ভেদ করা সম্ভব হয় নি, নরহরি-বর্ণিত ক্ষুদ্রগীত এবং সালগ-সূড় প্রবন্ধাদি থেকে সে সম্বন্ধে অনেকটা অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে এবং একটা সংগত অনুমান করাও সম্ভব হতে পারে।

নরহরির সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থটি তাঁর আর-একটি রচনা "ভক্তিরত্নাকর"এর পরিপূরক। একটিতে যা নেই অপরটিতে তা আছে। ভক্তিরত্নাকরে ধ্রুপদের উদাহরণ নেই, সংগীতসারসংগ্রহে তা আছে। আবার সংগীতসারসংগ্রহে ষড়ঙ্গ প্রবন্ধের উদাহরণ নেই, ভক্তিরত্নাকরে সেগুলি আছে। অতএব এই দুটি বই এক-সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করা কর্তব্য।

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে রাগ সম্বন্ধে আলোচনার পর গ্রন্থকার সে যুগের গীতরূপ সম্বন্ধে উল্লেখ করছেন। তিনি তিন রকমের গীতরূপের কথা বলছেন—

> বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।
> শুদ্ধং ছায়ালগং ক্ষুদ্রমিতি তচ্চ ত্রিধা মতম্।

নিবদ্ধ সংগীত তিন রকম—শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং ক্ষুদ্র ; শেষোক্ত ক্ষুদ্রগীত আবার সংকীর্ণ নামেও পরিচিত ছিল।

মুসলমান-যুগের প্রারম্ভে যেসব গান প্রচলিত ছিল তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সূড়, আলি এবং প্রকীর্ণক। এর মধ্যে সূড়গীতি ছিল আট রকমের—এলা করণ ঢেংকী বর্তনী ঝোম্বড়া লম্ভ রাস এবং একতালী। এই সূড় প্রবন্ধের লক্ষণ কি ? গ্রন্থকার নরহরি তাঁর ভক্তিরত্নাকরে বলেছেন—'বহুতালে গুম্ফন এ সূড় মনোহর'। এই বহুতালের মধ্যে সাধারণত ন'টি তালের প্রাধান্য ছিল—আদি, যতি, নিঃসারুক, অড্ড, ত্রিপুট, রূপক, ঝম্পক, মঠ এবং একতালী। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে ; সেটি হচ্ছে

---

১ কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৫৬

এই যে, অনেক ক্ষেত্রে গীতরূপ এবং তালের নাম এক, যেমন, নিঃসারুক মঠ একতালী প্রভৃতি। সম্ভবত এক-একটি গীতের প্রকৃতি থেকে এক-একটি তালের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই যে বিবিধ তালে বৈচিত্র্যপূর্ণ সূড় প্রবন্ধ এইটিই ছিল সেকালের শ্রেষ্ঠ গীতরূপ। তখনকার দিনে এটিকেই শুদ্ধগীতরূপ বলে ধরা হত। তথাপি এই গীতরূপকেই সম্পূর্ণ শুদ্ধ বলে স্বীকার করা হয় নি, কেননা তার আগে আরও বহুপ্রকার গান ছিল যাকে সত্যিকারের শুদ্ধগীতের মর্যাদা দেওয়া হত। উদাহরণস্বরূপ এইসব গীতগুলির নাম উল্লেখ করা যায়, যথা— জাতি কপাল কম্বল গ্রামরাগগীতি উপরাগগীতি ভাষাগীতি বিভাষাগীতি অন্তরভাষাগীতি। এইগুলিরও বিস্তারিত পরিচয় সংগীতশাস্ত্রে মেলে।

উপরোক্ত আটটি সূড়গীতি হচ্ছে শুদ্ধসূড়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি সূড় ছিল যাকে বলা হত ছায়ালগ বা সালগ-সূড়। বর্তমান সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে এই সালগ সূড়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, কেননা এই গীতরূপটিই বর্তমান ধ্রুবপদের ঐতিহ্য বহন করছে। এই দুটি প্রকারভেদ সম্বন্ধে রত্নাকর[২] বলছেন—

শুদ্ধশ্ছায়ালগশ্চেতি দ্বিবিধঃ সূড় উচ্যতে।
এলাদিঃ শুদ্ধ ইত্যুক্তো ধ্রুবাদিঃ সালগো মত।
ছায়ালগত্বমেলাদের্যদ্বথাচার্যসংমতম্।

টীকাকার কল্লিনাথ ছায়ালগ শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'ছায়ালগশ্ছায়াং শুদ্ধ সাদৃশ্যং লগতি গচ্ছতীতি তথোক্তঃ। সালগ ইতি চ্ছায়ালগশব্দস্যাপভ্রংশোঽপি লোকপ্রসিদ্ধ্যা প্রযুক্ত ইতি বেদিতব্যঃ।' আরও একটু বুঝিয়ে কল্লিনাথ বলেছেন যে, পূর্বে যেসমস্ত শুদ্ধগীতি ছিল তাদের সঙ্গে নিয়মের অতিলঙ্ঘন না হওয়ায় আটটি সূড়কে শুদ্ধ বলা যায় কিন্তু ছায়ালগের বেলায় নিয়মের অতিলঙ্ঘন হয়েছে, অতএব শুদ্ধগীতির ছায়াটুকুই এসব গানে আছে। এই হিসাবে এসব গানকে ছায়ালগ বা সালগ বলাই যুক্তিযুক্ত। সালগ হচ্ছে ছায়ালগ শব্দের অপভ্রংশ।

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি বলছেন—'বহুনাং তালানামেকত্রগুম্ফনং সূড়ং, ছায়াং লগতীত্যনেন শুদ্ধস্য যৎকিঞ্চিল্লক্ষণেনেদং ভবতীত্যুক্তম্।'

সালগ-সূড় হচ্ছে সাত প্রকার— ধ্রুব মঠ প্রতিমঠ নিঃসারুক অড্ড রাস এবং একতালী। এইটি রত্নাকরের মত। নরহরি দামোদর এবং পঞ্চমসারসংহিতা থেকে উদ্ধৃত করেছেন—

ধ্রুবকো মঠকশ্চৈব প্রতিমঠো নিঃসারুকঃ।
রাসকঃ প্রতিতালশ্চ তথাস্যা চৈকতালিকা।
যতিশ্চ ঝুমারি চেতি সালগ সূড় ইরিতঃ।

এখানে অড্ডতালের পরিবর্তে এসেছে প্রতিতাল এবং নতুন দুটি যোগ হয়েছে যাতি এবং ঝুমারি। কেউ কেউ আবার চর্চরী প্রবন্ধকেও এর মধ্যে এনে দশ রকম সালগ সূড়ের উল্লেখ করেছেন। এই ঝুমরি খুব সম্ভবতঃ শুদ্ধসালগ "ঝোম্বড়া"র পরিবর্তিত রূপ এবং পরবর্তীকালে এইটিই বোধ হয় ঝুমুর নামে পরিচিত হয়েছে। চর্চরী ছিল প্রকীর্ণক প্রবন্ধের অন্যতম। পরে এটি সালগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ থেকে এইটি বোঝা যাচ্ছে যে ক্রমেই নানারকম মিশ্রণের ফলে পূর্বের প্রকারভেদ শেষ পর্যন্ত আর কিছুই বজায় থাকে নি।

---

২ সংগীতরত্নাকর, সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী-সম্পাদিত, অ্যাডায়ার লাইব্রেরি, মাদ্রাজ

সারিন্দা বাদক

হরিপুরা পট : শ্রীনন্দলাল বসু

১৯৩৮

সালগশ্রেণীর প্রথম এবং প্রধান প্রকার হচ্ছে 'ধ্রুব'। এই সংগীতের লক্ষণ পর্যালোচনা করে এ কথা বিশ্বাস করবার বিশেষ কারণ আছে যে, এই ধ্রুব বা 'ধ্রুবক'ই হচ্ছে আমাদের বর্তমান ধ্রুবপদের আদিরূপ এবং ক্ষুদ্রগীতের ধ্রুবপদও এই সালগ-ধ্রুব থেকেই এসেছে। কেন, সেটি প্রমাণ-সহযোগে বিবৃত করি। রত্নাকর থেকেই অনুসন্ধান আরম্ভ করা যাক। রত্নাকর ধ্রুবগীতির বর্ণনা দিয়েছেন—

একধাতুর্দ্বিখণ্ডঃ স্যাদ্‌যত্রোদ্‌গ্রাহ স্ততঃ পরম্।
কিঞ্চিদুচ্চং ভবেৎখণ্ডং দ্বিরভ্যস্তমিদং ত্রয়ম্।
ততো দ্বিখণ্ড আভোগস্তস্য স্যাৎখণ্ডমাদিমম্।
এক ধাতু দ্বিখণ্ডং চ খণ্ডমুচ্চতরং পরম্।
স্তত্যনামাংকিতশ্চাসৌ কাচিদুচ্চৈকখণ্ডকঃ।
উদ্‌গ্রাহস্যাদ্যখণ্ডে চ ন্যাসঃ স ধ্রুবকো ভবেৎ।

টীকাকার সিংহভূপাল এই অংশের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর টীকারই সারমর্ম বিবৃত করি তা হলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। তার আগে বলা উচিত যে, এসব গানে তিনটি কলি— উদ্‌গ্রাহ ধ্রুব এবং আভোগই প্রধান; তাও আবার সব ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ, এই সময় থেকেই পূর্বপ্রচলিত কলিগুলির রূপান্তর ঘটতে আরম্ভ হয়েছে।

সিংহভূপালের বর্ণনা অনুসারে বোঝা যায় যে, প্রথমে অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহ অংশের দুটি খণ্ড ছিল এবং এই খণ্ড-দুটির মধ্যে তফাত বেশি ছিল না। এর পরে একটি খণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়েছে যেটি প্রথম অংশের চেয়ে উচ্চ স্বরে গাইতে হবে। এই অংশই হচ্ছে আমাদের বর্তমান "অন্তরা", সিংহভূপাল বলছেন 'ততোঽনন্তরং কিঞ্চিদুচ্চং খণ্ডমন্তরাখ্যং কর্তব্যম্'। অন্তরাখ্যং শব্দে তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে, এই খণ্ডের আখ্যা ছিল অন্তরা, এই তিনটি খণ্ডই দু বার গাওয়া হত। তার পরেই আভোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে। আভোগও উদ্‌গ্রাহের মত দুইটি খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম খণ্ডটি উদ্‌গ্রাহ অংশের মত গাইতে হবে, অর্থাৎ উচ্চ স্বরে নয়। এই অংশটিই হচ্ছে বর্তমান সঞ্চারী। আভোগের পরবর্তী খণ্ডটি আবার উচ্চ স্বরে গাইতে হবে, যেমন বর্তমানে হয়ে থাকে। তার পর উদ্‌গ্রাহ অংশ আর একবার গেয়ে তবে গীতের সমাপ্তি হবে।

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, এই "ধ্রুব"ই বর্তমান ধ্রুবপদের আদিরূপ। পরবর্তী শাস্ত্রকারদের অনেকরকম বাহাদুরি দেখা যায়, রাজা মানের সময়ও বাগ্‌বিস্তার কম হয় নি, কিন্তু রত্নাকর এবং তদীয় টীকা ভালো ভাবে বিচার করে দেখলে শিখাবন্ধনী যে কোথায় সেটা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে নরহরি ধ্রুবলক্ষণ বর্ণনা করছেন—'দ্বিধাতু দ্বিবয়বম্, প্রথমখণ্ডোপেক্ষয়া দ্বিতীয় খণ্ড উচ্চৈর্গেয়ঃ।' এতে পূর্ববর্তী বর্ণনা অপেক্ষা নতুন কিছু নেই তবে রত্নাকর যেখানে আভোগ পরিকল্পনা করেছেন সংগীতসারসংগ্রহ সেখানে ধ্রুব এই কলিটি আরোপ করেছেন। নরহরি ধ্রুবগীতির এই উদাহরণটি উদ্ধৃত করেছেন—

মল্লার রাগ আদিতাল

জয় জয় সুন্দর নন্দসুত দলিতাঞ্জন নিভ জনরঞ্জন আ!
কমলদলেক্ষণ গোকুলবল্লভ গোপসুতা-ধৃতিভঞ্জন আরে। প্রথম খণ্ড

যমুনাপুলিন-বিভূষণ রসময় বেণুবাদ্যরত নৃত্যগুরো।
মুরহর গোবর্ধনধর অব্রমুপতি-মদমর্দন তি আই আই আরে।

(এইটি উচ্চখণ্ড। দুটি খণ্ডই দুবার গাইতে হবে। প্রথম খণ্ড অপেক্ষা দ্বিতীয়টি উচ্চকণ্ঠে গেয়।—নরহরি)

মধুরানন মানদ-মুধবর্ধন মধুসূদন ভবরক্ষ বিভো।
শরণাগত-রক্ষক করকরুণাময় নরহরি ইতি গায়তি আরে।

ধ্রুব।

(এই তিনটি অংশে 'আই আই আরে আরে' এইগুলির কোনো অর্থ নেই, 'সতাল গীতলালিত্য' সম্পাদনের জন্যই গায়কগণ এইসব শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন—নরহরি)

রত্নাকর-নির্দিষ্ট অক্ষর-সংখ্যা অনুসারে ষোড়শ প্রকার ধ্রুবগীতির উল্লেখ করেছেন। চমৎকার সব নাম আছে এদের, কিন্তু বহুকাল পূর্বেই এসব গান মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। কল্লিনাথ তাঁর টীকায় স্পষ্টই বলেছেন যে, তাঁর সময়ে সেসব অক্ষর-সংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট ধ্রুব প্রচলিত ছিল না। তার পরিবর্তে বিভিন্ন পদের পরিকল্পনা হয়েছে সেই সময়ে।

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থে এর পরে মঠগীতির লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নরহরি "সংগীতসার" নামক গ্রন্থ থেকে মঠগীতির লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন যে, এতে উদ্‌গ্রাহ এবং আভোগের মাত্রাসংখ্যার চেয়ে ধ্রুবের মাত্রাসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। তিনি এই উদাহরণটি দিয়েছেন—

মল্লাররাগ আদিতাল

কৃষ্ণ কৃপাময় মংগলবিগ্রহ বিশ্বভয়াপহ দেব হরে।
গোপকুলোৎসববর্ধন মাধব গোবর্ধনধর তি আই আই আরে।

উদ্‌গ্রাহ।

শ্রীবৃন্দাবন ভূপতি আ আ।
রাধামুখ-সরসীরুহ-মধুকর নন্দতনুজ রসকন্দ তি আ রে।

ইতি সার্ধৈকগুণমাত্রো ধ্রুবঃ।

পীতাম্বর সুরবন্দ্য গদাগ্রজ সুন্দর নটবর শৌরে।
কংসরিপো মুরমর্দন মাধব ঘনশ্যাম ইতি গায়তি আয়া রে।

আভোগ।

বাহুল্যের জন্য অপরাপর সালগ-সূড়ের পরিচয় নরহরি প্রদান করেন নি। তিনি অনুসন্ধিৎসুগণকে গ্রন্থান্তর দেখবার উপদেশ প্রদান করেছেন। এইখানে আর-একটি কথা তিনি বলেছেন যে, রঞ্জকতা বৃদ্ধির জন্য খণ্ডাদির বৃদ্ধি করা যেতে পারে, তবে উদ্‌গ্রাহ অংশে সেগুলি নিবেশ করলেই ভালো হয়। উপরোক্ত উদাহরণাদি থেকে আর একটি বিষয় পরিষ্কার হয় নি, সেটি হচ্ছে "ধ্রুব" নামক কলিটি বর্তমান কোনো কলির সঙ্গে তুলনীয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে উদ্‌গ্রাহের অংশবিশেষ বর্তমান অন্তরার কার্য সম্পাদন করছে। অতএব এই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিবিধ শব্দের মত এই "ধ্রুব" শব্দটিও কোথাও এমন ভাবে বুঝিয়ে বলা হয় নি যাতে পরবর্তীযুগের পাঠকগণ এ বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারেন।

অতঃপর নরহরি "ক্ষুদ্রগীত" প্রসঙ্গে এসেছেন। এই ক্ষুদ্রগীত সংকীর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্গত। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর গীত আসলে সালগ-সূড়; তবে বহুতর মিশ্রণের ফলে এর আকৃতি কিছুটা বিভিন্ন হয়ে গেছে। তাল এবং ধাতুযুক্ত[৩] বাক্যই হল ক্ষুদ্রগীত। নরহরি বলছেন যে, বাহুল্যের জন্য তিনি আর এক্ষেত্রে ধ্রুব, মণ্ঠ প্রভৃতির লক্ষণ বিবৃত করলেন না। এই উপলক্ষ্যে ভক্তিরত্নাকরে তিনি বলছেন— 'শুদ্ধসালগের প্রায় ক্ষুদ্রগীত হয়। অন্ত্যানুপ্রাস প্রশস্ত শাস্ত্রে কয়॥' ক্ষুদ্রগীত চার প্রকার—চিত্রপদা, চিত্রকলা, ধ্রুবপদ এবং পাঞ্চালী।

চিত্রপদার বৈশিষ্ট্য হল পদবৈচিত্র্যে এবং প্রসাদগুণে। নরহরি শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক থেকে এর উদাহরণ দিয়েছেন—

রাগ গুণ্ডকিরী

কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্
পঙ্কজমিব মৃদু-মারুত-চলিতম্॥
কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা।
প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজ বাধা॥ধ্রু॥
বিনিদধতী মৃদু-মন্থর-পাদম্।
রচয়তি কুঞ্জরগতমনুবাদম্॥
জনয়তু রুদ্রগজাধিপ-মুদিতম্।
রামানন্দরায়-কবি-গদিতম্॥

আভোগ।

এর পর নরহরি "চিত্রকলা" নামক গানের উল্লেখ করেছেন। এই পর্যায়ের গীতে উদ্‌গ্রাহ এবং আভোগের মাত্রাসংখ্যা সমান এবং ধ্রুবের মাত্রা ন্যূন হবে। তিনি এই গীতের উদাহরণ স্বরূপ জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে একটি গীত উদ্ধৃত করেছেন—

রাগ গুর্জরী[৪]

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসমং[৫] সখি ভবনে।
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে॥ধ্রু॥
ইত্যাদ্যানন্তরং—শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্।[৬]
সুখয়তু সুজনজনং[৭] হরিচরিতম্॥

আভোগ।

---

৩ ধাতু অর্থে এখানে উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব এবং আভোগ এই তিনটি কলি।

৪ গীতগোবিন্দ নবম সর্গ (মুগ্ধ-মুকুন্দ)। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে এই গানটির রাগ রামকিরী এবং তাল যতি, এইরূপ উল্লিখিত আছে। পূজারীগোস্বামীর টীকাতেও তাই দেখা যায়। এই সুর এবং তালই পূর্বে নির্দিষ্ট ছিল। ক্রমে গায়কভেদে রাগের পরিবর্তন ঘটেছে।

৫ "কিমপরমধিকসুখং"—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গীতগোবিন্দ

৬ "শ্রীজয়দেব ভণিতমতিললিতম্"—উক্ত গ্রন্থ

৭ "রসিকজনং"—উক্ত গ্রন্থ

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জয়দেবের গীত পরবর্তীকালে ক্ষুদ্রগীতের অন্তর্গত হয়েছিল। জয়দেবের গীত আজ আমরা যে ভাবে দেখতে পাই তা থেকে মনে হয় এগুলি ছিল স্যূড়-প্রবন্ধের অন্তর্গত এবং খুব সম্ভবত সালগ-স্যূড় শ্রেণীর। সালগ-স্যূড়ের গীতখণ্ড যেভাবে নির্ণয় করা হয়েছে গীতগোবিন্দের গানও সেইভাবেই সাজানো হয়েছে। সালগ-স্যূড় পরবর্তীকালে যখন ক্ষুদ্রগীতে রূপান্তরিত হয় গীতগোবিন্দের গীতগুলিও তখন ধীরে ধীরে উক্ত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জয়দেবের গীতে কয়েকস্থানে "ধ্রুব" আছে যেগুলি "ধুয়া"র কাজ করে বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু "ধ্রুব" নামে যে ধাতু (অর্থাৎ গানের কলি) নির্দিষ্ট আছে সেই ধ্রুব আর এই ধুয়া এক জিনিস নয়। এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। "প্রলয়পয়োধিজলে" এই বিখ্যাত গানটির টীকায় পূজারী গোস্বামী বলছেন—'জয় জগদীশ হরে ইত্যেবধ্রুবপদং প্রতিপদমনুবর্তমানত্বাৎ। যথোক্তং—ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবাঃ প্রোক্তঃ আভোগশ্চান্তিমে মত ইতি।' গোস্বামী মহাশয় প্রতিপদের শেষে যে ধুয়া ঘুরে আসে তার সঙ্গে সংগীতশাস্ত্রবর্ণিত ধ্রুব এবং আভোগের কী সম্বন্ধ তা বুঝিয়ে বলেন নি। তিনি refrain বলতে যা বোঝায় ধ্রুব নামক প্রবন্ধাবয়বের সঙ্গে তাকে একাত্মবোধক করেছেন। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়, দুটি বিভিন্ন জিনিস। প্রবন্ধসংগীতের যে অবয়ব[৮]-পরিকল্পনা করা হয়েছিল "ধ্রুব" হচ্ছে তার তৃতীয় কলি এবং সে যুগের সংগীত-শাস্ত্রে কোথাও বলা নেই যে উক্ত "ধ্রুব" কলির ব্যবহার বর্তমান "ধুয়ার" মত হবে। এমনকি টীকাকারগণও এমন কথা বলেন নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুবকে ধুয়ার মত ব্যবহার করবার ফলে সংগীত জনপ্রিয় হয় এবং ক্রমশ ধ্রুবা বা ধুয়ার প্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু টেকনিকের দিক থেকে এটি তখন অন্য বস্তু হয়ে দাঁড়াল। আবার "ধ্রুবা" এই শব্দটি "ধ্রুব" নামক গীতকেও নির্দেশ করে। সেকালে সালগ-স্যূড় পর্যায়ের "ধ্রুব" গীতির অপর নাম ছিল "ধ্রুবক" বা "ধ্রুবা"। এই প্রসঙ্গে লোচন-বিরচিত "রাগতরঙ্গিণী"তে বিদ্যাপতির "ধ্রুবা" গীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গানগুলিও "ধ্রুব" জাতীয়। লোচন শর্মা জয়দেব এবং বিদ্যাপতি উভয়ের গানই উদ্ধৃত করেছেন। পূর্বকালের ধ্রুবগীতির আর-একটি লক্ষণ লোচন-বর্ণিত গীতে পাওয়া যাচ্ছে, সেটি হচ্ছে এই যে, মাত্রাসংখ্যা নির্দেশ করে গীতখণ্ড পরিকল্পিত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, রত্নাকর-বর্ণিত ধ্রুবগীতের যে ষোড়শ প্রকার ভেদ ছিল তা অক্ষর-সংখ্যা অনুসারে এবং তালভেদে নির্দিষ্ট হত। সালগ-স্যূড়ের অপরাপর গানও এইরকম ছন্দ-ভেদে বিভক্ত হয়েছে। লোচনও অনুরূপভাবে বিদ্যাপতি জয়দেব প্রভৃতির গানে ছন্দনির্ণয় করেছেন। সম্ভবত এ অঞ্চলে পূর্বযুগ থেকে ধ্রুবগীতির উক্ত ট্র্যাডিশন্‌টি চলে এসেছিল। পণ্ডিত লোচন বলেছেন যে, এইসব নিবন্ধ-প্রবন্ধাদির আলোচনা তিনি "রাগসংগীতসংগ্রহ" নামক গ্রন্থে করেছেন। এই গ্রন্থটি কোথাও ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে কি না জানি না—এই পুথি দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় এবিষয়ে আলোকপাত করবার সুযোগও হয়ে উঠল না। "রাগতরঙ্গিণী" গ্রন্থে লোচন রাগতত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করেছেন, সংগীতের সংগঠন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। তবে, বিদ্যাপতি যে ধ্রুব-জাতীয় গীত রচনা করেছিলেন সেটি বোঝবার জন্য লোচন শুধু এইটুকুই বলেছেন—"তদ্‌গানার্থস্তু

---

৮ প্রবন্ধের অবয়ব সাধারণত চারটি—উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ। সংগীতরত্নাকর বিশেষ ভাবে বলেছেন যে, সালগ-স্যূড় প্রবন্ধে ধ্রুব এবং আভোগের মাঝখানে "অন্তরা" নামক আর একটি কলির অস্তিত্ব ছিল। সিংহভূপাল টীকায় লিখেছেন—"অন্তরাখ্যো-ধাতুর্ন সর্বত্র প্রবন্ধেষু। কিন্তু সালগ-স্যূড় প্রবন্ধেষু এব।" সালগ প্রবন্ধে মেলাপকের অস্তিত্ব ছিল না।

বিদ্যাপতি কবিকৃতিনা কল্পিতাস্ত ধ্রুবাঃ।"[৯] এই উক্তির পূর্বে তিনি সংক্ষেপে নিবদ্ধ প্রবন্ধগীতির লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে এটিও লক্ষণীয় যে তিনি এইসব গানকে ধ্রুবপদ আখ্যা দেন নি, কেবল ধ্রুবা বলেই নির্দেশ করেছেন।

চিত্রকলা নামক ক্ষুদ্রগীতের পর নরহরি ধ্রুবপদ প্রসঙ্গে এসেছেন। ধ্রুবপদের সংজ্ঞা-নির্দেশ উপলক্ষ্যে তিনি এই উদ্ধৃতি করেছেন—

ধ্রুবং গীত্বা ভিন্নধাতুর্যত্রাভোগস্তু গীয়তে
উক্তয়োর্লক্ষণযুতা সৈকা ধ্রুবপদা মতা।
ভিন্নধাতুভিরুদ্গ্রাহধ্রুবাভোগৈঃ পরা দ্বিধা।

এর থেকে বোঝা যায় যে, ধ্রুবপদ দুই জাতীয় ছিল। একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অর্থাৎ ধ্রুব এবং আভোগ এই দুই কলিতে সীমাবদ্ধ, অপরটি উদ্গ্রাহ, ধ্রুব এবং আভোগ এই তিনটি কলিতে সম্পূর্ণ। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের উক্তি উদ্ধৃত করি—

"ধ্রুবপদা দ্বিধেতি সম্বন্ধঃ, উক্তয়োশ্চিত্রপদাচিত্রকলয়োঃ তত্রৈকা ধ্রুবেণাভোগেন চ পদদ্বয়বতী, ধ্রুবগানান্তরমেবাভোগগানমিতি তাৎপর্যং, ভিন্নধাত্বিতি ধাতুরত্র তালবিশেষ ইতি গীতপ্রকাশে। একস্মিন্ ভাগে ভঙ্গ্যা অন্যথা গানমিতি কেচিৎ।"

এখানে একটা সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে যেটি সমাধান করা শক্ত। গ্রন্থে বলা হল যে, একপ্রকার ধ্রুবপদ "ধ্রুব" এবং "আভোগ" এই দুই কলিতেই সম্পূর্ণ; এ ক্ষেত্রে অন্য কলির অর্থাৎ উদ্গ্রাহের অনুমান করা যায় না, কেননা "ধ্রুবেণাভোগেন পদদ্বয়বতী" কথাটাতে অন্য কলি সম্প্রয়োগের অবকাশ নেই। কিন্তু, উদ্গ্রাহ না গেয়ে একেবারে "ধ্রুব" কলি থেকে গীতের আরম্ভ কিভাবে সম্ভব? ধ্রুব হচ্ছে গানের তৃতীয় অবয়ব অর্থাৎ মাঝামাঝি পদ—এখান থেকে তো আর গান আরম্ভ করা যায় না, যেমন একেবারে "অন্তরা" থেকে বর্তমানে কোনো গান ধরার পরিকল্পনা কেউই করতে পারেন না। অতএব ব্যাপারটি কেমন করে সম্ভব হচ্ছে সেটি গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, নরহরি এখানে নীরব থেকে গেছেন।

ভিন্নধাতু এই শব্দটি সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা করা শক্ত। গীতপ্রকাশ-এর মতে ভিন্নধাতু বলতে তালবিশেষ বোঝাচ্ছে। সম্ভবত তালবৈচিত্র্য দ্বারা এই ভিন্নরূপটি প্রকট হত। সংগীতশাস্ত্রে একধাতু এবং ভিন্নধাতু এই দুটি শব্দের ব্যবহার আছে। সিংহভূপাল একধাতু অর্থে বলেছেন সমানং গেয়ম্ এবং ভিন্নধাতু অর্থে বলেছেন বিসদৃশং গেয়ম্। কারো কারো মতে তাল ছাড়া ভঙ্গি দ্বারাও এই সংগীতের একটি অংশ সম্পাদিত হত।

নরহরি প্রথমোক্ত ধ্রুবপদের উদাহরণ দিয়েছেন—

রাগ-মাররী[১০] তাল রূপক

সুজন বদ মধুরিপুনাম
দুষ্কৃতমপহায় যদি দুর্লভ হরিধাম। ধ্রু।
পুত্রমিত্র-বান্ধবগণমিহ ন কলয় সত্যম্
পুরুষোত্তমমিশ্র-গদিতমনুভাবয় নিত্যম্।
আভোগ।

৯ বলদেবমিশ্র সম্পাদিত রাগতরঙ্গিণী, পৃ ৩৭

১০ এটি "মায়ূরী" হওয়া অসম্ভব নয়।

এই উদাহরণটি উদ্ধৃত করে নরহরি বলছেন—'ইয়মেব পাশ্চাত্যভাষায়াং ছুটিকিলেতি বদান্তি।' অর্থাৎ এইটিই হচ্ছে সেই গান যার থেকে 'চুটকি' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। আমাদের কিন্তু ধারণা ছিল যে, "চিত্রকলা" পর্যায়ের গানই "চুটকল" বলে পরিচিত ছিল; কেননা এই দুটি শব্দে উচ্চারণগত একটা ঐক্য আছে, কিন্তু ধ্রুবপদ কি করে "ছুটিকিল" হবে সেটা বোঝা গেল না।

অতঃপর নরহরি অপরপ্রকার ত্রিধাতুক ধ্রুবপদের উদাহরণ দিয়েছেন—

কেশব কমলদলেক্ষণ কামদ কান্ত মুরান্তক কলিত সুরেশ।
নন্দ তনুজ জনরঞ্জন ভয়ভঞ্জন কঞ্জচরণ কমলেশ।
ইতি উদ্‌গ্রাহ।

জয় জয় গোপবধূ-বদনাম্বুজমত্তমধুপ মকরধ্বজভূপ।
পীতাম্বর বরনাগর রসময় মঞ্জুল ভুজ দলিতাঞ্জন রূপ।
ধ্রুব।

পরমানন্দ কন্দ মধুরাধর-মুরলীবাদ্যধুরন্ধর ধার।
নরহরিমিব মধুসূদন মাধব গোবর্ধনধর গোকুলবীর।
আভোগ।

গীতাবলী থেকে একটি উদ্ধৃতি প্রয়োগ করে নরহরি জানিয়েছেন যে, এই ধরনের আরও বহু গান আছে; আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিগণ "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থে এর বহু উদাহরণ পেতে পারেন।

সর্বশেষে পাঞ্চালীর উল্লেখ করা হয়েছে। অতিবিস্তীর্ণ পদযুক্ত গান হচ্ছে পাঞ্চালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি দুই প্রকার—সধ্রুবা এবং অধ্রুবা। এ ক্ষেত্রে ধ্রুবা অর্থে ধুয়া অনুমানই বোধ হয় সংগত। নরহরি কোনো উদাহরণ দেন নি, কেননা 'উদাহরণং সুলভম্'। আর গৌড়ে 'পাঞ্চালীতি প্রসিদ্ধিঃ'। কিন্তু এত সুলভ উদাহরণ নরহরির অল্পকাল পরেই লোপ পেয়েছিল। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের সূচনায় বলেছেন অন্নপূর্ণা ভগবতী স্বপ্নে রাজাকে 'কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস'। এতে এই বোঝা যাচ্ছে যে, আগেকার দিনে মঙ্গলকাব্য পাঁচালী প্রভৃতি যেভাবে গাওয়া হত সেটা আর রায়গুণাকরের যুগে প্রচলিত ছিল না; তাঁদের আবার নতুন করে একটি পদ্ধতি গঠন করতে হল। এই পদ্ধতি কিছুকাল চলেছিল, তার পর আবার নব্যরীতির আমদানি করলেন দাশরথি রায়।

সংগীতসারসংগ্রহ গ্রন্থটিতে আলোচিত গীতপ্রসঙ্গে একটি মস্ত অভাবের কথা উল্লেখ করতে হয়। সেটি হচ্ছে এই যে, গ্রন্থসংকলনকারী নরহরি চক্রবর্তী কোথাও কীর্তনের উল্লেখ করেন নি। যে কীর্তনের চমৎকার বর্ণনা তিনি তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দিয়েছেন সেই গ্রন্থের সংগীত-অধ্যায়েও কীর্তনের স্থান হয় নি, এই গ্রন্থটিতেও নয়। অথচ নরহরির যুগে কীর্তন বাংলার একটি বিশিষ্ট সংগীতে পরিণত হয়েছে। বেশিদিনের কথা তো নয়, নরহরি এ গ্রন্থ অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় সংকলন করেন। তখন কীর্তনের নানা ঘরোয়ানা থেকে কীর্তনের সাংগীতিক ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করবার সুযোগ নরহরির ছিল, কিন্তু কেন যে তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব হয়ে বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন সেটি বোঝা দুঃসাধ্য। এইসব কারণেই কীর্তনের সাংগীতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধীয় অনেক ব্যাপারে আলোকপাত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়েছে।

নরহরির সংকলিত গ্রন্থে আমরা আমাদের সাংগীতিক ঐতিহ্যে সালগ-সূড়ের প্রাধান্য দেখবার সুযোগ

পেয়েছি। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত "ধ্রুব" গীতি পরবর্তী "ধ্রুবপদ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটাও জানা গেল যে, জয়দেবের পদাবলী প্রথমে সালগ-সূড় এবং পরে সংকীর্ণ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে নরহরি বহুবার "গীতপ্রকাশ" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। আশা করা যায় এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে বহু সন্দেহের নিরসন হবে।

বস্তুত পূর্বপ্রচলিত গীতগুলি সম্বন্ধে আমরা তেমন অনুসন্ধান করি নি; রাগের লক্ষণ ও গঠন -তাৎপর্যই আমাদের সংগীতালোচনার প্রধান অংশ জুড়ে আছে। গীত সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন এই কারণে যে, নানা সম্প্রদায় থেকে বিভিন্ন ভাবধারা অথবা সামাজিক প্রথা থেকে এইসব গীতের সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হলে বহু বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব হবে। এই উপলক্ষ্যে এ কথাও স্মরণীয় যে, রাগের উৎপত্তিও গীত থেকে, রাগ থেকে গীতের উৎপত্তি হয় নি। সুতরাং প্রাচীন এবং মধ্যযুগের প্রচলিত গীত সম্বন্ধে অনেক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি

শ্রীভবতোষ দত্ত

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কয়টি শুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা তাদের অন্যতম। আমাদের জীর্ণ এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সম্মুখে যখন য়ুরোপীয় জীবনের প্রাণবন্ত আদর্শ এসে পড়ল, স্বভাবতই তখন চেষ্টা হয়েছিল আমাদের জীবনের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার। এই উদ্যমেই ইতিহাসচর্চা দেখা দিল এবং সেই উদ্যমেই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং ধর্মশাস্ত্রের পুনর্বিচার এবং পুনরনুসন্ধান চলেছিল। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে ইংরেজি বিদ্যার যুক্তিবাদিতা এবং তার বৈচিত্র্য আমাদের মনকেও জাগিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে আমরা যে সর্বদা রক্ষণশীলতাকে প্রশ্রয় দিই নি, এ কথা সত্য নয়— সে কথা আজ আর কারও অবিদিত নেই।

নবজাগ্রত মনের ইতিহাসচর্চার জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইতিহাস-গ্রন্থ রচনার প্রাচুর্যই চোখে পড়ে এবং সে-ইতিহাস পৃথিবীরই ইতিহাস। বহির্বিশ্বের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া অবশ্যই কল্যাণকর; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা ও অধ্যয়ন তখনও সর্বজনীন হয়ে ওঠে নি। সেই যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্ভবতঃ স্কুলে অবশ্যপাঠ্য ছিল না। এ বিষয়ে শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীরা ছিলেন অগ্রণী।[১] তাদের স্কুলে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্য ছিল। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ইংরেজিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৩১) রচনা করেছিলেন। ফেলিক্স কেরী মিলের ভারতবর্ষের ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই। শ্রীরামপুর ছাড়া অ্যাডামের রিপোর্টে কলকাতার স্কুলগুলির মধ্যে Parental Academic Institution-এ ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্য ছিল বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীরা ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা এবং অধ্যাপনায় যত উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন তেমন আর কেউ নয়। শ্রীরামপুরের প্রকাশিত দিগ্‌দর্শন পত্রিকায় ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছিল। এই ইতিহাসটির জন্যই কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি পত্রিকাটি কিনে নেয়।[৩] কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে একাধিক ইতিহাস-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই ছিল পৃথিবীর ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ সেকালে নীতি হিসাবে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শের ফলে সংঘাত এবং চাঞ্চল্যেরই যুগ বলা যায়। এই যুগে কেউই সম্ভবতঃ সচেতন ভাবে ধ্রুব আদর্শের সাধনা করেন নি। বিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে আলোচনা ও সন্ধান চলেছিল বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে কোনো একটি অভিপ্রায়ের

---

১ যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, পৃ ১০

২ Adam's Report of Education, 1835-38, Calcutta University, p. 39.

৩ ভবতোষ দত্ত, 'দিগ্‌দর্শন পত্রিকা', ইতিহাস, ভাদ্র-কার্তিক, ১৩৬১

দিকে সেকালের চিন্তা লক্ষ্যবদ্ধ হয় নি। এক দিকে রামমোহন রায়ের উদার মানবতাবোধ উপনিষদে তার-ভাষা খুঁজে পেয়েছিল, আর-এক দিকে রাধাকান্ত দেব প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সংস্কৃতির সর্বোত্তম বিকাশ দেখলেন; আবার সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির নিস্পৃহ নির্মোহ আলোচনা দেখা গেল। জ্ঞানোপার্জিকা সভার আলোচনা-পদ্ধতিতে প্রভাব পড়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রবর্তিত গবেষণারীতির। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮৪ সালে। সার উইলিয়ম জোনস, সার চার্লস উইলকিনস, এইচ. টি. কোলব্রুক প্রভৃতির চেষ্টায় এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন দিক্ নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে। এঁদের উদ্যমেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নবপরিচয় সাধনের বিস্তীর্ণ প্রয়াস দেখা দিল। বৈদেশিকদের দ্বারা প্রবর্তিত আলোচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁরা ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যে তাঁদের বিশেষ অনুরাগ ছিল এ কথা বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র পরে এঁদের কাছে অশেষ ঋণ স্বীকার করেও এঁদের যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্যরা যে দেশীয় অপেক্ষা বৈদেশিক সংস্কৃতির দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত ছিলেন, এ কথা সকলেই জানেন। এঁদের আদর্শ ছিল যুক্তিবাদিতার আদর্শ। হিন্দু কলেজের ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক সমাচারদর্পণে লিখেছিলেন, "If there be anything under heaven that either I or my friends look upon with the most abhorrence it is Hindooism. And if there be anything that we regard as the best instrument of evil it is Hindooism··[৪] হিন্দু কলেজের এই ছাত্রদের দ্বারাই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা গঠিত হয়। হিন্দুধর্মের প্রতি এঁদের বিরাগ থাকলেও ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি এঁরা বিমুখ ছিলেন না। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, গোবিন্দচন্দ্র সেন দেশের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডিরোজিও তাঁদের স্বাধীন চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণসাধনে মমত্বহীন হতে শিক্ষা দেন নি। ডিরোজিও নিজে স্বদেশভূমি এই ভারতবর্ষের অতীত গৌরবে গর্বিত ছিলেন। জন্মভূমিকে উদ্দেশ করে তিনি একটি সুন্দর সনেট রচনা করেছিলেন। স্বদেশের সংস্কার-চিন্তাতেও তিনি ছিলেন উৎসাহী। সতীদাহ নিবারণে উল্লাস প্রকাশ করেও তাঁর সনেট আছে। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ আন্দোলন করার আগে জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটরে বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয়েছিল।[৫] নব্য বঙ্গের মনস্বী যুবকদের স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে যদি স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের চিন্তা যুক্ত হয়ে থাকে, তবে তার অন্যতম কারণ ছিলেন রামমোহন-সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব। তারাচাঁদ মনুসংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন বলে প্যারীচাঁদ মিত্র উল্লেখ করেছেন।[৬] তারাচাঁদ এই নব্যবঙ্গের নেতারূপে দেখা দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তারাচাঁদ এবং চন্দ্রশেখরের মাধ্যমে জ্ঞানোপার্জিকা সভার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার

---

৪ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৩১-এ লেখা চিঠি সমাচারদর্পণে প্রকাশিত হয় ৮ই অক্টোবর, ১৮৩১

৫ The Bengal Spectator, July 1842, p. 51 এবং 15th January 1843, p. 21

৬ *A Biographical Sketch of David Hare*, 1877, p. 32.

একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল। বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায় তত্ত্ববোধিনী সভার সশ্রদ্ধ উল্লেখ এবং বিবরণও লক্ষ্য করা যায়।[৭]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শের বাণী দিয়েছিলেন প্রথমতঃ রামমোহন, দ্বিতীয়তঃ দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহন যদিও যুক্তিবিচারের পথেই চলেছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন একটি মহৎ আদর্শকে জাগিয়ে তুলতে। বেদান্তের মধ্যেই তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বমানবতাবোধ। তিনি সকল ধর্মাবলম্বীকে একটি প্রার্থনাসভায় মিলিত করতে চেয়েছিলেন— সেই সাহস এবং ভরসা তিনি লাভ করেছিলেন বেদান্ত ধর্মে। উপনিষদের ধর্ম একটি উদার সার্বভৌম উপলব্ধিতে নিয়ে যেতে পারে, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দানকে রামমোহন এই ভাবে কল্পনা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্ম পর্যালোচনা করেছিলেন এবং তারই মধ্যে বেদান্তের আশ্রয়ে সর্বজনীন সত্যে উপনীত হতে তাঁর বাধা হয় নি। রামমোহন শাস্ত্রবিচার করেছিলেন সত্য ; কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে নয়, আমাদের দেশের দুর্ধর্ষ নৈয়ায়িকের পদ্ধতিতে। সুতরাং রামমোহনের সংস্কৃতি-বিচারণায় তত্ত্ব বা চিন্তার প্রাধান্যই লক্ষ্য করা যায়। অথচ রামমোহনের মতো বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কর্মবীর বিরল। এইজন্য মনে হয় রামমোহনের আদর্শে তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনে খানিকটা অপূর্ণতা আছে ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভক্তি দিয়ে সেই অপূর্ণতাটিকে সম্পূর্ণ করলেন। দেবেন্দ্রনাথ বললেন বাস্তব জীবনের মধ্যেই ব্রহ্মকে অনুভব করতে; সুতরাং জীবনের দায়িত্বভারকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে নেওয়াই যথার্থ মনুষ্যত্ব। রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ, কেউই ঠিক ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণ করেন নি। কিন্তু তাঁরা উভয়েই প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে গিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ধর্ম যথাযথ গ্রহণ করেন নি। তিনি ছিলেন ভক্তিপথের পথিক। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনায় তিনি তৃপ্ত হন নি। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবে তিনি বেদকে অভ্রান্ত মনে না করে উপনিষদ্ থেকে নূতন করে ধর্মশাস্ত্র সংকলন করলেন। অর্থাৎ তিনি উপনিষদকে শুধু বিচারের বস্তু করলেন না ; তিনি তাকে জীবনধর্মে পরিণত করলেন। দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ছিলেন ধর্মপ্রবক্তা। তাঁর ধর্ম ছিল উপলব্ধির ধর্ম। ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি দিয়েই তাঁর মনঃপ্রকৃতি গঠিত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থে লোকধর্ম এবং দেবদেবী -বিবর্জিত উদার আত্মোপলব্ধির ধর্মসংস্কৃতির আলোচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তারই সমালোচনায় বিনয়সহকারে লিখলেন—

"তিনি বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দুধর্ম। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম কেবল তাহাই সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম— কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এমত কথা তিনি বলেন না। যে ধর্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা— সকল ধর্মের অন্তর্গত— সকলেরই সারভাগ।"[৮]

দেবেন্দ্রনাথের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ভাববীজগুলি নিয়ে পরিকল্পিত হয়েছিল, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্রও অস্বীকার করতে পারেন নি। অখণ্ড ভারতবর্ষের কল্পনাতেও দেবেন্দ্রনাথের অন্তর অনুরূপভাবেই আচ্ছন্ন ছিল। রাজনারায়ণ বসুর এই ভারতীয় জাতীয়তা বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের চিন্তা

৭ The Bengal Spectator, December 1, 1842, p. 161 এবং January 1, 1843, p. 5

৮ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বিবিধ। পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৩২৮

হলেও জাতীয় গৌরববোধের প্রাথমিক ভূমিকা রচিত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চায়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, দেবেন্দ্রনাথই ঋগ্‌বেদের অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন, রমেশচন্দ্র দত্ত সেই আরব্ধ কর্মটিকে পরের যুগে সুসম্পন্ন করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ধর্ম হলেও ধর্মের আলোচনাপ্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যরা প্রায় সকলেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি -আলোচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই এই সাধারণ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদী মনীষী। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' এবং 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার' অক্ষয়কুমারের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের 'সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করাতে আদর্শোজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি তাঁর নিবিড় অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে সাধারণ সংস্কৃত-পণ্ডিতদের মনোভাবেই সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করেন নি, যিনি তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন তিনিই সে কথা জানেন। আসলে তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজের কলহ ও মালিন্য থেকে মুক্তি খুঁজেছিলেন একটি বলিষ্ঠ উদার দীপ্ত সভ্যতার মধ্যে। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা তাঁকে সেই অবকাশ দিয়েছিল।

২

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীত সংস্কৃতি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা এবং অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি পূর্ববর্তীদের কোনো একটি পথের অনুসরণ না করে একটি সমন্বিত আদর্শ নিজের কল্পনায় সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্ম-বিচারের ব্যক্তিতান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার যুক্তিবিচারকেও গ্রহণ করলেন। এক দিকে যুক্তি ও তথ্য, অন্য দিকে একটি বলিষ্ঠ আদর্শকল্পনা— দুটিই বঙ্কিম একাধারে স্বীকার করে নিলেন। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার দুই বিপরীত আক্রমণের পথই উন্মুক্ত রাখলেন। কেউ বললেন, তিনি অধ্যাত্ম উপলব্ধিকে মূল্য না দিয়ে শুধুই যুক্তির পথে গিয়েছেন, আবার কেউ বললেন তিনি যুক্তিকেও নিজের কল্পিত আদর্শে সাজিয়ে নিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় কিন্তু আর-একটি দিকের উপরেও জোর পড়ল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিম বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন। বঙ্কিমের বঙ্গপ্রীতি বৃহত্তর ভারতচিত্ততার বিরোধী নয়, এটা তাঁর সমগ্র রচনাবলী পর্যালোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়। বঙ্কিমের বাংলাদেশ সম্বন্ধীয় রচনাগুলি পড়লে তাঁকে সংকীর্ণমনা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে বাংলা ও ভারতবর্ষ তাঁর চিন্তায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। বাংলাদেশের গৌরব যে বৃহত্তর আর্য-গৌরব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এটা তিনি জানতেন। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"আর্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান নাই—আর্যকীর্তিভূমি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা সে কীর্তি ও যশেরও উত্তরাধিকারী। সেই কীর্তিমন্ত পুরুষগণই আমাদিগের পূর্বপুরুষ। দোবে চোবে পাঁড়ে তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীন যশের ভাগী বটে।"

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ইতিহাস সন্ধানে উত্তরভারতীয় আর্যদের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির

চর্চা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি আর্যগৌরববোধও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাব্যের ক্ষেত্রে পুরাণ ইত্যাদি তো বটেই, রমেশচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, রামদাস সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীতেও অতীতচারণের সুর বেজে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করে ভারতসংস্কৃতি আলোচনার একটি পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। এই আর্যগৌরববোধের মধ্যে থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশের ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন। এটা বিভক্ত মনোভাবের দৃষ্টান্ত নয়, এটা পূর্ণ ব্যক্তিত্বেরই দৃষ্টান্ত। সেই ব্যক্তিত্ব কিভাবে গড়ে ওঠে, তার বিশদ ব্যাখ্যাও বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে আছে—

'এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। আপাতত সে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বৃত্তিকে নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ন করি না এইজন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে।'[৯]

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে যাঁর কাছে শিক্ষানবিসি করেছিলেন, চিন্তাশীল ভাবুক বলে তাঁর কোনো খ্যাতি নেই। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাঙালী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন; এই মনোভাব বঙ্কিমের তরুণ মনকে প্রভাবিত করে থাকবে। কিন্তু গভীরতর জ্ঞানসাধনায় যখন বঙ্কিমের মনীষা জেগে উঠল তখন তথ্য ও ইতিহাস-স্মৃতি দিয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম অনুধাবনে নিরত হলেন। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি ঈশ্বর গুপ্ত দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হয়ে এবং অনেকটা এরই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস কিংবা ধর্ম-দর্শনের আলোচনায় পটু ছিলেন না। তবে তিনি সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারতেন।[১০] ঈশ্বর গুপ্তের এই শক্তির একটি সুদূরপ্রসারী ফল দেখা গেল—মনীষীদের চিন্তাকে সাধারণ বাঙালীর সহজবোধ্য এবং গ্রহণীয় তিনিই করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের যে বাঙালী মনোভাবের উল্লেখ করেছেন, সেটি তাঁর কোনো মতবাদ নয়। সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় তিনি বাংলাদেশের সংবাদই যে পরিবেশন করতেন তা নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সংবাদও তিনি প্রচার করতেন এবং স্বাদেশিক অনুভূতির বশে তাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন। ঈশ্বর গুপ্তই বোধহয় প্রথম ভারত-ভূমিকে 'জননী' সম্বোধন করেছিলেন—

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে?

এই কবিতাটি তিনি পড়েছিলেন একটি সভায় বক্তৃতা করার উপলক্ষ্যে। এই বক্তৃতায় ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে—

"এই দেশ যখন স্বাধীন ছিল অর্থাৎ আমরা স্বজাতীয় রাজার অধীনে অবস্থান করিতাম তখন হিন্দু-জাতির গৌরব জগন্ময় কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, আমাদিগের রাজ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাজ্য ছিল এবং

৯ ধর্মতত্ত্ব, চতুর্বিংশতি অধ্যায়

১০ সাধারণের উপর ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব কি রকম ছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ২৩১

আমরাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যরূপে বিখ্যাত ছিলাম, প্রথমতঃ এই দেশ হইতেই বিবিধ বিদ্যার সৃষ্টি হইয়াছে জ্যোতিষ বিদ্যা, ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা, রেখাগণিত বিদ্যা এবং বিজ্ঞানবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞানবর্ধিনী বিদ্যা প্রথমেই অস্মদ্দেশীয় কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তিকে অবলম্বনপূর্বক পৃথিবীতে পদার্পণ করত হিন্দুসমাজে আদরপ্রাপ্তা হয়েন, ঐ সময়ে অবনীর অন্যান্য তাবদ্দেশ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল ...।"[১১]

ঈশ্বর গুপ্তের এই ভারতীয় দৃষ্টির সঙ্গে বাঙালী মনোভাবের কিছুমাত্র বিরোধ ঘটে নি। বঙ্কিমচন্দ্র সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠা থেকে ছাত্রাবস্থায় যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, এই যুগ্মধারা তাতে রসসিঞ্চিত করেছিল, বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য স্বভাবতঃই বৃহত্তর উৎস থেকে পুষ্টিলাভ করেছিল, অন্ততঃ বাল্যকালে তাঁর মনের পরিণতি সাধনে সংবাদ প্রভাকর বাধার সৃষ্টি না করে আনুকূল্য করেছিল, এটুকু বলা যেতে পারে।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস রচনার সচেতন উদ্দেশ্য দ্বারা যেমন চালিত হয়েছিলেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় তিনি সেভাবে ব্রতী হন নি। ভারতবর্ষ নিয়ে ইতিহাসাশ্রিত প্রবন্ধ তাঁর অন্ততঃ তিনটি আছে—ভারতকলঙ্ক (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯), ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০) এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৮০)। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-সাধনা ও মনীষার পরিচয় তিনি দিয়েছেন জ্ঞান, সাংখ্যদর্শন, হিন্দুধর্ম, বেদের দেবতা, Buddhism and the Sankhya Philosophy, Vedic Literature প্রভৃতি প্রবন্ধে। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য দিক নিয়ে তাঁর বিশেষ আলোচনা নেই। সীতারাম উপন্যাসে উড়িষ্যার শিল্পকীর্তি বর্ণনায় ভারত-সংস্কৃতির শিল্পপ্রতিভার প্রশস্তি আছে। শকুন্তলা, উত্তররামচরিত প্রভৃতি প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যযুগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষতঃ বিশেষ কিছু লেখেন নি, যদিও প্রসঙ্গতঃ অনেকবারই তিনি এর উল্লেখ করেছেন। এখানে স্মরণীয়, তাঁর উপন্যাসগুলি অধিকাংশই মধ্যযুগীয় পটভূমিতে রচিত। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধে তিনি আকবরের শাসনকালের প্রশংসা করেছেন, তা-ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খানিকটা এ যুগের মতোই ভারত-সংস্কৃতি বলতে প্রাচীন ভারতবর্ষকেই তিনি বুঝেছেন। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, সে যুগের মনস্বী ব্যক্তিদের সকলেরই ছিল এই মনোভাব। এর একটা কারণ বোধহয় এই যে, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে মধ্যযুগের চেয়ে প্রাচীন যুগের প্রতিই ঐতিহাসিকদের ঝোঁক পড়েছিল। আর-একটি কারণ অবশ্য সদ্যোবিগত মধ্যযুগের উৎপীড়নের দুঃসহ স্মৃতি। রামমোহন থেকে আরম্ভ ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর বোধহয় এমন কেউ ছিলেন না যিনি মুসলমান শাসনের চেয়ে ইংরেজ শাসনকে বরণীয়তর মনে করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার এত বড়ো উদ্গাতা হয়েও ইংরেজ রাজত্বকে চেয়েছিলেন, অনেকের কাছে এ একটা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ফলে মানুষ তৈরী হলে রাজনৈতিক অধিকার লাভের যোগ্যতা অনায়াসেই আসবে। রবীন্দ্রনাথও আত্মিক শক্তির বিকাশকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বকে অনুশীলন বা সংস্কৃতির দ্বারাই লভ্য ভেবেছিলেন, এবং তাঁর মতে এর দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ঐতিহ্যেই আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের

---

১১ সংবাদ প্রভাকর, ১ বৈশাখ ১২৫৫

ঐতিহ্য বিচার করতে গিয়ে তাঁর যুগের প্রয়োজনটাকেই বড়ো করে দেখেছেন। তাঁর পক্ষে এটা শুধু গবেষণার আনন্দই ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির মহৎ ঐশ্বর্যের সন্ধানে স্বভাবতই তিনি অধ্যাত্ম-সাধনার ধ্যানের দিকটা বাদ দিয়ে কর্ম এবং কীর্তির দিকটাই দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্যানের সত্যটিকেই বড়ো করে দেখেছিলেন। তাতেই নিহিত আছে বিশ্বাত্মীয়তার তত্ত্ব। তপোবনের যুগটি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আর-একটি যুগকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন—বৌদ্ধযুগ। উপনিষদের মন্ত্রবাণী এবং বুদ্ধবাণীকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দুই যুগের কোনোটিতেই জাতি বা সমাজ -সংগঠনের ইঙ্গিত ধ্বনিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র আকৃষ্ট হলেন আর-একটি যুগে, যখন মানুষের মহৎ মানস-সম্পদ মহৎ কর্মে প্রযুক্ত হল। বঙ্কিমের মতে সেই যুগ হচ্ছে মহাভারতের যুগ। মহাভারত থেকে তিনি কৃষ্ণচরিত্র উদ্ধার করলেন। মানবতার পূর্ণ বিকাশ যাঁকে তিনি মনে করেছিলেন, তাঁকে আমরা পাই এক প্রচণ্ড কর্মসংঘাতময় যুগে। কৃষ্ণচরিত্র ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক বলেই কৃষ্ণ-কল্পনার বিবর্তনেই জাতীয় মানসেরও বিবর্তন হয়েছে—'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্ময়কর বিশ্লেষণের সঙ্গে সেটা দেখিয়েছেন।[১২] তাঁর মতে মহাভারতে আমরা যে কর্মবীর কৃষ্ণকে পাই তিনিই হচ্ছেন মানবতার পূর্ণ আদর্শ। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ রচনায় তিনি নিজের মনোগত আদর্শ দ্বারা চালিত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের এ সমালোচনা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় তাঁর সমসাময়িক সমাজের নির্দেশ খুঁজেছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটিই তার প্রমাণ। কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যা আমাদের বোঝাতে চেয়েছিলেন, ধর্মতত্ত্বে তারই বিশদ ব্যাখ্যা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুশীলন-ধর্মকে বলেছেন, doctrine of culture। "আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম ও তাহার অভাবই অধর্ম।"[১৩] কৃষ্ণের মধ্যে তিনি এই ধর্মের পূর্ণতাকে দেখতে পেয়েছেন।[১৪]

৩

বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব-জীবনকে পরম মর্যাদা দিয়েছেন, তাই দেহপ্রকৃতিকেও তুচ্ছ করেন নি। বাস্তব-জীবনের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভাবনাটা বঙ্কিম-সাহিত্যের একটি ঋজু ও কঠিন জিজ্ঞাসা। মানুষকে বাঁচতে হলে তার দেহের পরিপুষ্টি চাই, দেহের পুষ্টির জন্য সমাজ চাই, সমাজের জন্য স্বদেশ চাই। প্রত্যেকটি স্তরের সমঞ্জসীভূত সাধনার নামই অনুশীলন-ধর্ম। অনুশীলন বলতে কর্মপ্রচেষ্টাকেই বোঝায়। কর্মশক্তির চর্চা না হলে অনুশীলন হয় না। সুতরাং বঙ্কিমের মতে জীবনের কর্মময় বিকাশেই সংস্কৃতির বিকাশ। এই-জন্যই বঙ্কিম ভারত-ইতিহাসের উপনিষদের যুগকে বরণ না করে বরণ করেছিলেন মহাভারত-পুরাণের যুগকেই। প্রাচীন ভারতের নির্জন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সত্যসাক্ষাৎকার মহাভারতের মুখর জীবনে প্রকাশমান হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর জীবনের গঠন-পর্বে স্বভাবতই সেই পৌরাণিক যুগের সাধনারই শরণ নিয়েছিলেন।

প্রশ্ন এই যে, বঙ্কিম যে অনুশীলন-ধর্মের কথা বলে গিয়েছেন, তাকে ভারতবর্ষের সভ্যতারই শ্রেষ্ঠ

---

১২ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বিবিধ। পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৩৭৫

১৩ ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়

১৪ কৃষ্ণচরিত্র, প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

সম্পদ্ রূপে গ্রহণ করা যায় কি? নবমানবধর্ম প্রচারে বঙ্কিম বরং পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কোম্‌তের কাছেই ঋণী— এ কথাই সকলে জানেন। কোম্‌তের মতবাদ উনবিংশ শতকের বাঙালী চিন্তাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছিল, সন্দেহ নেই। বঙ্কিমকেও করেছিল, কিন্তু বঙ্কিম ভারতীয় ঐতিহ্যের সমর্থন না পেলে কোম্‌ৎকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতেন কি না সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি?" অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা যে অভ্রান্ত, এ-কথা বলা যায় না। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির যে বিশ্লেষণ করে একটি উদার মানবধর্মে পৌঁচেছেন, সেটা অনেকটাই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ফল। বঙ্কিমচন্দ্র তা জানতেন। এই সংস্কৃতির যে যুগোপযোগী রূপ আছে, এই সত্যটিই বঙ্কিমের গর্বের বিষয়। পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে স্পষ্টতই মানবসংস্কৃতির সম্পদকে স্বীকার করে ভারতীয় সংস্কৃতিকে পূর্ণ রূপ দিতে চেয়েছেন। বৈদান্তিক ধর্মের সর্বব্যাপী শক্তিই আধুনিক জ্ঞান ও শিক্ষার পথে বাধা ঘটায় নি। আনন্দমঠের উপসংহারে তিনি বলেছেন, "অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।··· অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে।"

বঙ্কিমের যুগের দুজন বিভিন্নপ্রকৃতি ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর চিন্তার গতির তুলনা করে দেখা যেতে পারে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং শশধর তর্কচূড়ামণি। ভূদেব বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠ। তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তাঁর চিন্তাধারা একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যকে অবলম্বন করেই প্রবাহিত ছিল। ভূদেবের মতো যুক্তিবিশ্বাসী মনীষী কমই আছে। হিন্দু সমাজের রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠানে তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সেই বিধি-নিয়মের মূল্য যে এ যুগেও অক্ষুন্ন আছে, ভূদেবের বিশ্বাস এ বিষয়ে ছিল অটল। তাঁর সময় পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুর একান্নবর্তী পরিবার প্রথা অব্যাহত ছিল। ভূদেব যুক্তি দিয়ে এই প্রথার সুফল বুঝতে পেরেছিলেন। ভূদেবের মতো মনীষী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আদর্শকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। কিন্তু শশধর তর্কচূড়ামণি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, যদিও ভূদেবের সব মতই তিনি গ্রহণ করতেন কি না সন্দেহ। বঙ্কিম পরিবার-জীবনের আসন্ন রূপান্তর এবং তার সঙ্গে সমাজের পরিবর্তনও বুঝতে পেরেছিলেন; শুধু তাই নয়, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির মর্মবাণীটিও তিনি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শশধর তর্কচূড়ামণির উদ্যমেও তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না—

"পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।"[১৫]

বঙ্কিম ভারতীয় সংস্কৃতির সেই তত্ত্বটিকেই জানতে চেয়েছিলেন, যা জীবন্ত, যা নতুন করে বিকাশ পায়, আধুনিক য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে যার বাধা ঘটে না। তিনি বলেছেন, "হিন্দু ধর্মের সেই মর্মভাগ অমর, চিরদিন চলিবে, মনুষ্যত্বের হিতসাধন করিবে, কেননা মানব-প্রকৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধিসকল সকল ধর্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য ও পরিবর্তনীয়।"[১৬] হেষ্টির সঙ্গে বঙ্কিমের যে বাদানুবাদ হয়েছিল, তার উপসংহারেও তিনি

১৫ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বিবিধ। পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ১৮৭, পাদটীকা

১৬ ধর্মতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়

অনুরূপ উক্তি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারত-সংস্কৃতি হচ্ছে গতিশীল এবং যুগোপযোগী। এই সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি সেকালের পাশ্চাত্ত্য জীবনের প্রবল প্রতিঘাতে সংস্কৃতির যে সর্বংসহ রূপটির ব্যাখ্যা করলেন, মধ্যযুগে ইসলাম সংস্কৃতির কষ্টিপাথরে তার যাচাই করেন নি। বঙ্কিম কোনো নূতন ধর্ম প্রচার করতে চান নি, এটাও মনে রাখা দরকার। তিনি যে সমাজে মানুষ হয়েছিলেন, সেই সমাজের ভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি সংস্কৃতির চিন্তা করেছিলেন। এইজন্য তাঁর আদর্শে হিন্দুত্বের বিশিষ্ট বর্ণটি লুপ্ত হয় নি। কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতির একটি উদার মানবিক রূপই তাঁর কল্পনার বিষয় ছিল। ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যদি তাঁকে সংস্কৃতির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হত, তিনি তাঁর মত রক্ষা করতে পারতেন বলেই মনে হয়। কারণ বঙ্কিমের মতে 'মানবপ্রকৃতি'তেই এই সংস্কৃতির ভিত্তি। বিশেষতঃ ইসলাম সংস্কৃতিতেও ইহলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্যও বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের অনুকূল হত। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যধর্মে প্রাচীন ভারতীয় অধ্যাত্মদৃষ্টির সঙ্গে নবলব্ধ ইসলামিক সংস্কৃতির বাস্তব-পরায়ণতার মিলন ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করেন নি। কিন্তু তাঁর ধর্মতত্ত্বের একটি অনুক্ত দৃষ্টান্ত রূপে এই তথ্যটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ হয়তো এতেও তৃপ্ত হ'ত না। কারণ চৈতন্যধর্মের ভক্তিভাবের আতিশয্য তিনি চাইতেন না ; তিনি চাইতেন সবগুলি বৃত্তিরই সমঞ্জসীভূত রূপ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নয়, মহাভারতের কৃষ্ণই ছিলেন তাঁর আদর্শ।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর ঐতিহ্যের মধ্যে থেকেই উদার সংস্কৃতির কল্পনা করেছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নির্বিশেষ মানবতার কল্পনা তিনি করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মত সম্ভবতঃ এই যে, হিন্দুধর্মের মধ্যে যদি সত্য থেকে থাকে, তবে সে সত্য অন্যকে তিরস্কৃত করে নয় অন্যকে শ্রদ্ধায় স্বীকার করে নিয়েই সে সত্য। সেইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির ঔদার্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব। এই উদার রূপ কল্পনা করতে গিয়ে অনেক অনাবশ্যককেই তিনি পরিহার করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগের যা অপরিহার্য তারই সূত্র সন্ধান করেছেন প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন-সাধনায়। এইজন্যই ব্যক্তিতান্ত্রিক অধ্যাত্ম-সাধনায় তিনি প্রবেশ করতে চান নি। সন্ন্যাসবাদ তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য নয় ; ভোগলিপ্ত স্বার্থপর জীবনকে তিনি ধিক্‌কার দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মধ্যম পন্থাটি বিশিষ্টরূপে তাঁরই উপলব্ধি, এ কথাও যথার্থ নয়। বস্তুতঃ ত্যাগ ও ভোগের সমঞ্জস -তত্ত্বই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মর্মবাণী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মের আদর্শে এরই সূচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পিতৃদত্ত সাধনার রিক্‌থ গ্রহণ করেছিলেন ; তাঁর কাব্যসাধনা ও জীবনসাধনা এই প্রেরণারই আলোকে আলোকিত। 'ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে'— রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই ছিল ভারত-সংস্কৃতির অন্তরের কথা। এখানে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের একটি কথা উদ্ধৃতিযোগ্য—

"বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহার অনুশীলনধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর মাত্র।"[১৭]

কথাটা শোনায় বিচিত্র, কিন্তু ভিত্তিহীন নয়। নতুন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রভাবে সেকালের মনীষীদের

---

১৭ বিপিনচন্দ্র পাল, নবযুগের বাংলা, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৩৬২, পৃ ১৮৫

চিত্তক্ষেত্রে বিচিত্র ভাবের ফসল ফলেছিল ; তারা যে একই ঋতুর ফসল এটা যেন ভুলে না যাই। নব্য বঙ্গের যুবকরা আর কিছু না মানলেও সত্যকে মানতেন— Indeed, the college boy was a synonym for truth.[১৮] হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই সত্য ছিল নৈতিক। দেবেন্দ্রনাথ যে-সত্যকে আরাধ্য করেছিলেন, সে-সত্য আধ্যাত্মিক, ব্যক্তির উপলব্ধিগম্য ধ্যানের সত্য। এই সত্য জীবনকে আচ্ছন্ন করলেও এর নির্বিশেষ ভাবস্থির মহিমা জীবনের উর্ধ্বে। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে রসরূপেও অনুভব করলেন। মহর্ষির কবি-মন রবীন্দ্রনাথেও সঞ্চারিত হয়েছে। তাই তাঁর সৌন্দর্যলক্ষ্মী সত্যস্বরূপিণী। বঙ্কিমচন্দ্র নির্বিশেষ সত্যের বিশদ আলোচনা করেন নি। কিন্তু তিনি বলেছেন, "সত্য ভিন্ন অসত্যে কখনও মঙ্গল নাই। সত্যই ধর্ম, সত্যই শুভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়, সত্যমেব জয়তি।"[১৯] তথাপি এ কথা ঠিক, সত্যকে নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় সত্যের কোনো নির্বিশেষ রূপ নেই। দেশে কালে তার রূপ বিচিত্র। ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনেই সত্যকে বহুরূপে প্রকাশমান দেখতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই প্রাণবত্তাই এর গৌরব। এই পরিবর্তনশীল সত্য সাধনায় মানুষ যতই উপযোগী হয়ে উঠবে, ততই হবে মানবতার চরিতার্থতা এবং সেটাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম।

---

১৮ Thomas Edwards, Derozio (1884), pp. 67-68

১৯ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, বিবিধ। পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৩৬৫

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ (১০ ?) - ১৯৫৬

দু'বছর আগে আমরা কবি জীবনানন্দ দাশকে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আকস্মিকভাবে হারিয়েছি। আজ আবার কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকালে শোচনীয়ভাবে হারালাম। জীবনানন্দের মৃত্যু আমাদের স্তম্ভিত, বিমূঢ় করেছিল। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু এল একেবারে অন্যভাবে: জীবনের শেষ ক'বছর তিনি যেন নিজেই নিজেকে এই অনিবার্য পরিণামের দিকে ঠেলে দিচ্ছিলেন। অসহায় আত্মবন্ধুরা নীরব দর্শকের মতো তাঁর জীবনের শেষ অঙ্কের করুণ দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করেছেন। এতবড়ো সচেতন শিল্পীর কেন এ আত্মদ্রোহ, এর উত্তর তিনি আমাদের দিয়ে যান নি, তবু এর জন্য একমাত্র তাঁকেই দায়ী ক'রে আমরাও মনে এতটুকু সান্ত্বনা পাব না।

জীবনানন্দের চেয়ে বছর-দশেকের ছোটো ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্তরধর্মে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও সাহিত্যের নিজ-নিজ ক্ষেত্রে এঁদের দুজনের প্রতিভাই ছিল অসাধারণ। আবার দুজনের ভাগ্যেই ছিল আজীবন অর্থকষ্ট। জীবনানন্দের একটি অদৃশ্য রক্ষাকবচ ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানী মন, যা তাঁকে জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও শান্ত সমাহিত রেখেছে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেজী মন ছিল একেবারে অন্য ধাঁচের, যার ফলে ভিতরে-বাহিরে প্রতিকূল শক্তির প্রবল সংঘাত তাঁর সত্তাকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমাদের সাহিত্যের দুটি বিদ্রোহী প্রতিভাকে— মধুসূদন ও নজরুল। দুটি প্রতিভাই উল্কার মতো জ্বলে উঠেছিল। একটি উনিশ শতকের আকাশে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় চার দিক উদ্ভাসিত ক'রে দেখতে-দেখতে নিজের আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, অন্যটি বিশ শতকের আকাশে এক মুহূর্তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তার পর মাধ্যাকর্ষণের টানে ছিটকে এসে মাটিতে পড়ে আছে: অসাড়, নিস্পন্দ। নজরুল আজ টিকে আছেন মাত্র, তাঁর প্রতিভা বেঁচে নেই। সাধনার ক্ষেত্র ভিন্ন হলেও স্বভাবের দিক থেকে এঁদের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল ছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনটি জীবনের পরিণামই মর্মান্তিক।

অথচ কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পী যে-কোনো দেশেরই গৌরব। তাঁর রচনার মৌলিকতা অসাধারণ, তা একেবারে ভিন্ন ধরনের— যে জন্য আমাদের সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবকে অনেকটা আকস্মিক ব'লে মনে হয়। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাধনায় পুষ্ট কথাসাহিত্যের ধারায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই এক ব্যতিক্রম। তাঁর একক মানসিক গঠন তাঁর সৃষ্টিগুলিকে এক অসামান্যতা দান করেছে। উত্তর-রবীন্দ্র যুগের পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যায় 'কল্লোল'-'কলিকলম'-'প্রগতি'র তরুণ লেখকদের মনে সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন পথ সন্ধানের যে স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সেই দুঃসাহসী প্রেরণাই এক নতুন দিগ্‌বলয় আবিষ্কার করেছে। অথচ তাঁকে ঠিক 'কল্লোল'-গোত্রীয় বলা চলে না। 'কল্লোলীয়'দের সঙ্গে বাইরের দিক থেকে তাঁর খানিকটা মিল থাকলেও মনোভঙ্গিতে তিনি স্বতন্ত্র। তাঁকে 'কল্লোলোত্তর' বললে হয় তো ভুল হবে না,

কিন্তু সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে 'কল্লোলীয়'দের রোমান্টিকতাবিরোধী আন্দোলনের পিছনেও ক্রিয়া করেছে তাঁদের অন্তরের একটি সূক্ষ্মতর রোমান্টিক প্রবৃত্তি, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন ছিল যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ, দৃষ্টি ছিল ঢের বেশি বাস্তবধর্মী।

এই বাস্তব দৃষ্টি নিয়েই চার দিকের জীবন ও জগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সুদূর পদ্মাতীর থেকে শহরতলী এবং শহরতলী থেকে মহানগরী পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন হাজারো মানুষের ভিড়ে। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মন সর্বত্র সবকিছুকেই সজাগ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছে। নানা স্তরের নরনারীর মনের ভিতরে তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি, অতি সতর্কভাবে পরীক্ষা করেছেন তাদের দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিমানস, এবং লক্ষ্য করেছেন সমাজজীবনে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে আঞ্চলিক কাহিনী রচনায় শৈলজানন্দ এবং মনোবিকলনধর্মী কাহিনী রচনায় জগদীশ গুপ্ত পথিকৃৎ হলেও এই উভয় ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পকৌশলের স্বকীয়তা বিস্ময়কর। তা ছাড়া নিত্যনূতন পরিবেশে কত ভিন্ন প্রকৃতির নরনারীর অন্তর্জীবনেই না তিনি প্রবেশ করেছেন, বিজ্ঞানীর মতো সন্ধানী আলোর রঞ্জনরশ্মি ফেলেছেন তাদের অচেতনমনের গহ্বরে, ভেদ করেছেন সেখানকার অন্তর্গূঢ় রহস্যপুঞ্জ। অবশ্য দৃষ্টিসাধনায় বিজ্ঞানী হলেও সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ জীবনশিল্পী: মানুষের মগ্নচেতনায় তিনি যেসব গোপন গুহামুখের সন্ধান পেয়েছেন সেসব অজন্তাগুহার দেয়ালে-দেয়ালে যত প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী, যত জীবজন্তু সরীসৃপ, যত রহস্যময় মুখ ও মুখোশ, যত মায়ামূর্তির ছায়ানৃত্য প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের প্রত্যেকটিকে রঙে-রেখায় জীবন্ত ক'রে তুলে তাঁর গল্প-উপন্যাসের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় অতি নিপুণভাবে সাজিয়েছেন তাঁর নূতন ধরনের চিত্রশালা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন আজকের মানুষের মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজার-হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাস— একই মানুষের মনের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে ভিন্ন স্বভাবের অনেকগুলি মানুষ। আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তরে যে বহুকালের বহুপুরুষের সংস্কারজাল গিঁঠ বেঁধে জট পাকিয়ে রয়েছে তা-ই আমাদের অন্তর্জীবনকে এত রহস্যময় ও বহির্জীবনকে এত জটিল করে তুলেছে, আর ব্যক্তিজীবনের এই জটিলতা সমাজ-জীবনকে ক'রে তুলেছে জটিলতর। জীবনানন্দ যে-সত্যকে সূত্রাকারে বলেছেন— 'আমরা জটিল ঢের হয়ে গেছি— বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে'— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট চরিত্রগুলি তারই বহুবিচিত্র জীবনভাষ্য। তা ছাড়া এ যেন এক নতুন ধরনের মহাভারত, যেখানে ভীষ্ম ও শকুনি একই সঙ্গে একই দেহে জীবন ধারণ করছে, দুঃশাসনই বাইরে সেজেছে যুধিষ্ঠির।

আবার আরো একটি মারাত্মক সংকট দেখা দেয় মানুষের: তার অন্তরের এই একাধিক সত্তার মধ্যে কোন্‌টি তার সত্যিকার সত্তা তা সে নিজেই জানে না। কথাবার্তা, কাজকর্ম, আচার-আচরণে সে এক-এক সময় সজ্ঞানেই এমন-সব কাণ্ড ক'রে বসে যা তার নিজের কাছেই অসংগত ঠেকে। একটা ইচ্ছার সঙ্গে-সঙ্গেই বিপরীত ইচ্ছা, একটা চিন্তার সূত্র ধ'রেই বিপরীত চিন্তা, একটা কাজ করতে গিয়েই তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ— এর চেয়ে বিড়ম্বনা মানুষের পক্ষে আর কী হতে পারে? অন্তত সজ্ঞানমনেও তার অনুভূতি, চিন্তা এবং চেষ্টার মধ্যে একটা পারস্পরিক ও পূর্বাপর সংগতি থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে তার সমগ্রসত্তার ভগ্নাংশমাত্র। একটি নিটোল বৃত্তের মণ্ডলায়িত পূর্ণতা সে নিজের মধ্যে কোনো কালেই খুঁজে পাবে না। আবার কেন্দ্রবিন্দুটিও

চিরকাল অগোচরেই থাকবে। কাজেই সারাদিনের ব্যস্ততা ও ছুটোছুটির মধ্যে যখন সে দৈবাৎ একটিবার নিজের ভিতরটাতে দৃষ্টিপাত করে তখন সেখানে তার সত্তার কয়েক টুকরো ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ভাঙা বৃত্তচাপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তবু এই ভাঙা টুকরোগুলিকেই কোনোরকমে জুড়ে নিয়ে তাকে খাড়া করতে হয় নিজের একটা কল্পিত রূপ, আর বিশ্বাস করতে হয় এইটেই তার সত্যিকার চেহারা— অবশ্য সে-বিশ্বাসও বেশিক্ষণ তার নিজের কাছেই ধোপে টেকে না।

মানুষের মনোলোকের এই সমস্যাগুলি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় নানা দিক থেকে নানা ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, শিল্পের কাজ তত্ত্বব্যাখ্যা বা তথ্যসংগ্রহ নয়, যদিও তত্ত্ব কিংবা তথ্যকে সে নিজের প্রয়োজনে সর্বদাই ব্যবহার করতে পারে। শিল্পের প্রধান লক্ষ্য জীবনসত্যের রসোত্তীর্ণ রূপায়ণ, যা আমাদের মনে এনে দেবে শুধু প্রতীতি নয়, প্রত্যয়; অনুমান নয়, অনুভব।— যা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে আমাদের ভাবকল্পনায়। তাই মানুষের রক্তনাড়ির আদিম অন্ধ জীবনাবেগ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক ভয়াল শরীরী বিগ্রহ ধারণ করে। মানুষের মনের মধ্যে যে আদিম অরণ্যের অন্ধকার বাঁধা পড়ে আছে সেখানকার জটিল সুরঙ্গপথে আজও আনাগোনা করে বিকট হিংসার মূর্তি, ক্ষণে-ক্ষণে চমকে ওঠে শানিত চোখের দীপ্তি, বেরিয়ে আসে ধারালো দাঁত নখ। বিশ শতকের মহানগরীর রাত্রিতেও সেই আদিম অরণ্যের অনুভূতি ছমছম করে, চার দিকে ঘিরে আসে রাশি-রাশি ছায়াভয়— জান্তব, ভৌতিক— প্রাকৃতকেও অতিপ্রাকৃত ব'লে ভ্রম হতে থাকে। ঠিক এমনি সময়ে মহানগরীর অলিগলিতে, শহরতলীর ঘিঞ্জি বস্তিগুলিতে, মানুষের মনের আদিম অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে সেই 'প্রাগৈতিহাসিক' রাত, মফস্বলের মহকুমা শহরের এক প্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ডাঙায় সদ্যোনিহত বসিরের ভাঙা কুঁড়ে ঘরের ঝাঁপ ঠেলে খোঁড়া পাঁচীর হাত ধ'রে বেরিয়ে আসে বীভৎসমূর্তি ভিখু— ডাঙার ফাঁকা জায়গায় খানিকদূর একসঙ্গে হাঁটবার পর শ্রান্ত পাঁচীকে পিঠে ঝুলিয়ে নেয় সে— তার পর শুরু হয় নিরুদ্দেশ যাত্রা :

দূরে গ্রামের গাছপালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোন দিন পাইবেও না।

আবার 'সরীসৃপ' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুটিল মধ্যবিত্ত মনের উপরকার ছদ্ম আবরণ খসিয়ে দিয়ে ভিতরের ভয়ংকর চেহারাটি অনাবৃত করেছেন। কপটতার আড়ালে মানুষের অবদমিত আদিম রিপুগুলি কী ভাবে তাদের বীভৎস আহার সংগ্রহ করে, এই অদ্ভুত গল্পটি তারই জীবন্ত চিত্র। এ-শ্রেণীর মানুষ যে ভিতরে-ভিতরে জন্তুর চেয়েও হিংস্র, সাপের চেয়েও কুটিল আর বিষাক্ত হতে পারে, গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে তা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপসংহারের তীক্ষ্ণ বক্রোক্তিটি সভ্যতাভিমানী মানুষের উপর যেন বিদ্রূপের শানিত প্রহার :

ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপরে পৌছিয়া গেল, মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।

কিন্তু অবদমিত আদিম প্রবৃত্তির গোপন হিংস্রতাই আধুনিক সভ্যতার একমাত্র ব্যাধিলক্ষণ নয়। অন্য এক দিক দিয়ে এক জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি করেছে মানুষের দুর্জ্ঞেয় অন্তরপ্রকৃতি। অচেতনমনের অন্তস্তরে

কোন্ সূচীমুখ কামনা অনুবিদ্ধ হয়ে আছে তা জানতে না পেরে সবচেয়ে অসহায় বোধ করে মানুষ। তার চেতনমনের কাছে এর মূল কারণটি কিছুতেই ধরা দেয় না ব'লে শত সজ্ঞান চেষ্টাতেও সেই তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। ফলে নিজেরই মধ্যেকার এক অজ্ঞাত শক্তির সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধ চলতে থাকে তার, আর সে-দ্বন্দ্বে তিলে-তিলে সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। শেষ অবস্থায়, চরম পরাজয়ের মুখে, আসে এক দুর্বার মুহূর্ত। এমনি এক মুহূর্তে 'দিবারাত্রির কাব্যে'র ট্র্যাজিক পরিণতি আসন্ন হয়: মালতীর মেয়ে আনন্দকে তার জীবনের শেষ রাত্রে এক বিরাট ধুনি জ্বেলে হেরম্বের সামনে নাচতে হয় অদ্ভুত পরীনৃত্য:

··অকস্মাৎ আনন্দের নৃত্য থেমে গেল। আগুনের আরও নিকটে সে থমকে দাঁড়াল। আগুন এখন তার মাথা ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠেছে, আনন্দকেও মনে হচ্ছে আগুনের শিখা। পরক্ষণে আনন্দ কাত হয়ে সেই বিপুল ব্যাপক যজ্ঞানলে ঢ'লে পড়ল।

হেরম্ব নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছু করার নেই। আনন্দ অনেক আগে ম'রে গেছে। শুধু চিতায় উঠবার শক্তিটুকুই তার বজায় ছিল।

জীবনানন্দের ভাষায় এও মানুষের 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়ে'র-ই 'খেলা'। মানুষ এই অদৃশ্য শক্তির হাতে পুতুলমাত্র। মানুষের মগ্নচেতনায় এই শক্তির ক্রিয়া যতই সূক্ষ্ম তার বহির্জীবনের উপরে এর প্রতিক্রিয়া তেমনি অমোঘ, আবার নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কে গড়া সমাজজীবনের উপরেও এর প্রভাব তেমনি অপ্রতিরোধ্য। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় এই সত্যটিই অন্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

··নদীর মত নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মত যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।

একে আমরা অনেক সময় নাম দিই 'নিয়তি'— এই অদৃশ্যকেই বলি 'অদৃষ্ট'। কিন্তু এর দুর্বার শক্তি ঠেলে আসছে আমাদেরই অন্তরপ্রকৃতির নিগূঢ় অন্ধকার থেকে, আর জীবনকে অন্ধভাবে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে— কোথায় কে জানে। তাই 'দিবারাত্রির কাব্যে'র নায়িকা আনন্দকে শেষ পর্যন্ত এমনি ক'রেই আত্মাহুতি দিতে হয়; আর হেরম্ব?— কিছুদিন আগে আনন্দই তো তাকে প্রশ্ন করেছিল:

'প্রেম কদিন বাঁচে?'

হেরম্ব বলল, 'কি ক'রে বলব আনন্দ, দিন গুনে বলা যায় না। তবে··হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ ম'রে যাবে··প্রেম এত তেজী নেশা।'

অন্ধ প্রবৃত্তির তীব্র উন্মাদনার কাছে ধৃতিশক্তিহীন হেরম্বও এমনি দুর্বল, অসহায়।

সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পপ্রতিভার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হই: এক, মানবমনের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা; দুই, ঘটনা-সংস্থান ও চরিত্রচিত্রায়নে তাঁর অসাধারণ কলানৈপুণ্য ও স্বকীয়তা; এবং তিন, সংস্কারমুক্ত মনের সুস্থির বস্তুনিষ্ঠা ও নির্লিপ্ততা। এ ছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিতে ভাষার বিবর্তনও বিস্ময়কর। শুরু থেকেই এ যেন এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের গদ্যরীতি। অদ্ভুত এর বলিষ্ঠতা, তাঁর বলিষ্ঠ জীবনবোধ থেকেই এর জন্ম। বাইরের চাকচিক্য এর পক্ষে শুধু অনাবশ্যক নয়, অন্তরায়;— এমন-কি সাধারণ ব্যাকরণসম্মত বাক্যরীতিও সব সময় যথেষ্ট নয়।

কিন্তু ভাষারীতির কথা বাদ দিয়ে আপাততঃ তাঁর তৃতীয় গুণবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরো খানিকটা আলোচনা

করা প্রয়োজন। মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে সব সময় খুব কাছে থেকে অতি নিবিড়ভাবেই দেখেছেন তবু শিল্পীর দায়িত্ব নিয়ে যখনই তিনি জীবনকে রূপায়িত করতে গিয়েছেন তখনই নিজেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে নিয়ে নির্লিপ্ত দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং সেইসঙ্গে যতটা সম্ভব সংস্কারমুক্ত হতে চেষ্টা করেছেন। মানুষ কোনো অবস্থাতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ অথবা ত্রুটিশূন্য নয়, এ-সত্যকে তিনি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন, এবং দোষে-গুণে-জড়ানো দেহনিয়তি-তাড়িত মানুষের সুখদুঃখের জীবনকে এই চেতনা নিয়েই এঁকেছেন। তবে স্রষ্টার আসনে বসেও শিল্পীর একটি নৈর্ব্যক্তিক শিল্পিবিবেক জেগে থাকে, মহৎ শিল্পীকেও তার প্রভাব স্বীকার করতে হয়। সেই সূক্ষ্মতর বিবেকেরই ইঙ্গিতে তিনি একটি অনুচ্চারিত অভিনন্দন জানিয়েছেন বলিষ্ঠতা, ঋজুতা ও অকৃত্রিমতাকে— তা সে যার মধ্যেই প্রকাশ পাক, এবং সমাজের যে স্তরেই সে বাস করুক। দুর্বলতা, কুটিলতা ও কৃত্রিমতাকে তিনি পাপ ব'লেই জেনেছেন। তাঁর শিল্পিবিবেকের এইটিই মূলসূত্র ব'লে মনে হয়। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রথমোক্ত গুণগুলি মোটামুটি বেশি দেখা যায় ব'লে এদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও বেশি প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবন তাঁর রচনায় তাই এমন অসাধারণ হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য বই 'পদ্মানদীর মাঝি'। পদ্মাতীরের জেলেদেরই কাহিনী এটা— একেবারে শুরু থেকেই পদ্মাতীরের প্রাকৃত জীবনের তাজা টাটকা ঘ্রাণে ভরপুর। ভরা বর্ষায় কাহিনীর সূচনা :

পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরিবার মরশুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজ-ঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে-নৌকার আলো ও-গুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সঙ্কেতের মত সঞ্চালিত হয়। শেষরাত্রে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে-নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত শাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চক চক করে, মাছের নিস্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়।

দৃষ্টি বলে একে। তা ছাড়া কয়েকটি মাত্র কথার আঁচড়ে—প্রায় একটানে—এমন নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ পটভূমি রচনা যে-কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পীরই চিরকালের কামনা। এই কাহিনীর নায়ক কুবের ও নায়িকা কপিলা বললে কতটুকু বলা হয়? এর প্রধান নায়ক পদ্মাতীরের সুখদুঃখ-হাসিকান্নায় ভরা রহস্যময় প্রাকৃত জীবন, এর প্রধানা নায়িকা এই জীবনের একেশ্বরী ভাগ্যনিয়ন্ত্রী অঘটনঘটনপটীয়সী পদ্মা :

ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙ্গন ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জল ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোন দিন সাঙ্গ হয় না। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, অবিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতায়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

অদ্ভুত বর্ণনাভঙ্গি শিল্পীর একাগ্র তন্ময়তায় এখানে সাধুভাষার গদ্যরীতিটিও যেন পদ্মাতীরের জল-কাদায় ভূমিষ্ঠ হয়ে জন্মান্তর নিয়েছে। আর সংলাপ যেখানে খাঁটি পদ্মাতীরের, যেখানে ঘিঞ্জি জেলেপাড়ার বদ্ধ হাওয়া সব সময় 'মাছের আঁশটে গন্ধে ভরা', যেখানে মাঠের বুকে 'এক হাঁটু দগদগে দইয়ের মত কাদা'— সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা যেমন অব্যর্থ তেমনি নিরঙ্কুশ। এই পরিবেশে একমাত্র হোসেন মিয়াকে কিছুটা হেঁয়ালি মনে হয়, তার ময়নাদ্বীপের উপনিবেশ গড়ার স্বপ্নটাও অদ্ভুত। তবু কথাবার্তায়, আচার-আচরণে এখানকার সকলের সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক পাতিয়ে সেও যেন কখন আমাদের অজান্তেই

এই কাহিনীর অঙ্গ হয়ে গিয়েছে—কাহিনীর ধারার সঙ্গে তার একটা প্রাণধর্মী ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। তা ছাড়া তার ময়নাদ্বীপের স্বপ্নটাকে আমরাও তো গিয়ে এক ফাঁকে নিজেদের চোখেই দেখে আসি, সেখানকার আইনকানুনগুলো সেখানকার সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে কেটে-ছেঁটে বেশ মানানসই ক'রে নেওয়া হয়েছে। শেষের দিকে কী অনিবার্যবেগে ঐ ময়নাদ্বীপের মুখেই ছুটে চলেছে কাহিনীর ভাঁটার টান।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কাহিনীর এই প্রবল ভাঁটার টানটি অনুপস্থিত। কুবেরের সঙ্গে কপিলা এক নৌকায় ভেসে যায়, কিন্তু কুসুমের নৌকায় শশী ডাক্তারের তো ভেসে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এখানে ময়নাদ্বীপের স্বপ্নও তো অবাস্তব। কোথায় পদ্মাতীরের কেতুপুরের জেলেপাড়া আর কোথায় বাজিতপুর মহকুমার খালপারের গাওদিয়া গ্রাম। তা ছাড়া শশী যেমন কুবের নয়, কুসুমও তো কপিলা নয়। কপিলার সঙ্গে তার গোড়ার দিকে যদি-বা খানিকটা মিল ছিল, শেষ পর্যন্ত সেও কি একেবারেই বদলে যায় নি? শেষের দিকে একদিন তালবনে শশীকে কী বলেছিল কুসুম?—

'. .চিরদিন কি একরকম যায়? মানুষ কি লোহায় গড়া যে চিরকাল সে একভাবে থাকবে, বদলাবে না?'

আবার বলেছিল:

'. .লাল টকটকে ক'রে তাতানো লোহাকে ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না?. .কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে, সে ম'রে গেছে।'

অতি সত্য কথা। কিন্তু আরো সত্য শশী ডাক্তারের শতদীর্ণ মন। এই গাওদিয়া গ্রামে দিনের পর দিন বিচিত্র মানুষের সঙ্গে মিশে, আত্মীয়ের মতো তাদের সেবাযত্ন ক'রে, কতই তো দেখল শশী। সুখের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতা মিলিয়ে জীবনের এও এক স্বাদ। শহরে শিক্ষিত হলেও 'হৃদয় ও মনের গড়ন' আসলে তার 'গ্রাম্য'। কুসুম এখানে থাকতে এই গাওদিয়া গ্রামই একদিন তার হৃদয়কে পূর্ণ ক'রে রেখেছিল; আজ কুসুম নেই, তবু অন্তরে পরম রিক্ততা নিয়েও শেষ পর্যন্ত এই গ্রামটিকেই সে বুকের কাছে আঁকড়ে ধ'রে আছে। কাহিনীর সমাপ্তিটি কী সুন্দর! দিন যায়। শশীর শূন্যমনে ধীরে-ধীরে নেমে আসে এক ক্লান্ত অবসাদ। দীর্ঘ ছায়া ফেলে এক-পা এক-পা ক'রে তার দিকে এগিয়ে আসে জরা। গল্পাংশে মিল না থাকলেও এইখানে এসে কেন জানি নে মনে প'ড়ে যায় *Growth of the Soil*-এর শেষ ছবিটা। কানের কাছে কে যেন নিশ্বাস ফেলে বলে: Isak is old:

. .জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। গাছপালা ব'ড়িঘর ডোবা পুকুর জড়াইয়া গ্রামের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রূপের দিকে নয়, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যারা আছে তাদের, আর যারা ছিল। শ্রীনাথের দোকানের সামনে, বাঁধানো বকুলতলায়, কায়েতপাড়ার পথে।. .যাদবের বাড়িটা শুধু গ্রাস করিতেছে জঙ্গলে, পরানের বাড়িতেও এখনো লোক আসে নাই। তার ওপাশে তালবন। তালবনে শশী কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপরে উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।

একেবারে গোড়ার দিকে লেখা হলেও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এক হিসাবে বলা চলে তাঁর প্রথম দিকের অনেকগুলি গল্প-উপন্যাসেই নানা ভাবে এই পুতুলনাচেরই খেলা চলেছে, এমন কি পরবর্তী কালের উপন্যাস 'চতুষ্কোণে'ও তাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধনাকে মোটামুটি দুই পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে তিনি প্রধানত মনোবিকলনের পথেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখিয়েছেন। 'প্রাগৈতিহাসিক' ও 'সরীসৃপ' ছাড়া এই পর্বের আরো কয়েকটি ছোটোগল্প উল্লেখযোগ্য: 'টিকটিকি' ও 'হলুদপোড়া' গল্পে মানুষের জীবনে লৌকিক কুসংস্কারের বিকৃত প্রভাব, 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্পে নরনারীর অভিশপ্ত দাম্পত্য জীবনের এক ভয়াবহ রূপ, 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে জীবনসংগ্রামে পরাজিত মানুষের অসহায় আত্মবিলোপস্পৃহা, 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পে জীবনের অশ্রুলবণাক্ত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত দুঃখবাদ, 'আপিম' গল্পে সূক্ষ্মতর অর্থে মানুষের স্বভাবজাত নেশাপ্রবণতা, এবং 'বিবেক' গল্পে স্বার্থপর সুবিধাবাদীর একপেশে বিবেকবোধকে নিপুণ চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত ক'রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এদের বেশির ভাগ গল্পে লেখক মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়—বিশেষ ক'রে পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকে। এই সময় থেকে তাঁর জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বড়ো রকমের পরিবর্তন এল। শুধু বাইরের কারণেই নয়, সম্ভবতঃ তাঁর শিল্পপ্রেরণার দিক থেকেও একটি নতুন ধারার অনুবর্তন এই সময়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এ-পর্যন্ত মনোবিকলনের পথ ধ'রে তিনি মানুষের মনোলোকের যতই গভীরে প্রবেশ করেছিলেন ততই জটিলতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, এবং এমনও মনে হয় যে, শেষ দিকে এই শ্বাসরোধকারী অন্ধকার তাঁর শিল্পিসত্তাকেও যেন সূক্ষ্মভাবে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। এই সময়ে তাঁর মধ্যে মানুষের জীবন সম্বন্ধে এক তিক্ততা ও বৈরাগ্যের ভাব এসে গিয়েছিল—অন্তত মধ্যবিত্ত জীবন সম্বন্ধে তো বটেই। এ-পথে আর বেশিদূর এগলে কী হত বলা যায় না; তাঁর চরিত্রগুলি শেষ পর্যন্ত হয়তো ব্যক্তিত্বের ক্ষীণ ঐক্যসূত্রটুকু হারিয়ে কতকগুলি মানসিক সমস্যার প্রতীক হয়ে দাঁড়াত। এ-পর্বের শেষ দিকের কয়েকটি গল্পে তার কিছু-কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য এ-অবস্থায় এমনটি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও যে এই সম্ভাবনার কথা এর আগে একেবারেই ভাবেন নি, তা নয়। সাহিত্যজীবনের একেবারে শুরুতে ১৯৩৫ সালে 'দিবারাত্রির কাব্যে'র ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছেন:

> দিবারাত্রির কাব্য পড়তে ব'সে যদি কখনো মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক,—তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয় উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।

কাজেই মনোবিকলনের পথে কেবলি অগ্রসর হতে থাকলে এই টুকরো-টুকরো 'মানসিক অংশ'গুলি যে শেষ পর্যন্ত আরো 'খাপছাড়া', আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে, এ-কথা তাঁর মতো সচেতন শিল্পীর মোটেই অজানা ছিল না।

এই সময়ে তাঁর শিল্পচেতনাকে নতুন পথে মোড় ফেরাবার প্রেরণা দিয়েছিল মার্কস-বাদ। এ-পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন মানুষের মধ্যেকার অন্ধ জীবনাবর্তকে, এবার লক্ষ্য করলেন কালধারায় প্রসারিত জীবনের বিরাট প্রবাহকে। তাঁর চোখের সামনে তখন মহাযুদ্ধের সময়কার বাংলাদেশ— এক দিকে

নরনারীর অন্তহীন দুঃখদুর্দশা, অন্য দিকে তারই প্রতীকারের জন্য মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা। তিনি ক্রমে নিঃসন্দেহ হতে লাগলেন যে মানুষের অন্তরপ্রকৃতির গহনে যত জটিলতাই থাক, তাকে বৃহৎ ও ব্যাপক -ভাবে চালিত করছে তার অর্থ নৈতিক সমাজজীবন ; যেখানেই এর সুস্থ স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়েছে সেখানেই জেগেছে দ্বন্দ্বসংঘাত, জেগেছে বিপ্লব, যার মধ্যে দিয়ে পথ মোচন ক'রে আবার বেরিয়ে এসেছে মহাজীবনের ধারা। তাঁর বিশ্বাস হল, সমাজজীবনের সামগ্রিক অগ্রগতিই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যুগের পর যুগ, অবচেতনার প্রাগৈতিহাসিককে ক'রে তুলছে সমাজসচেতন ঐতিহাসিক মানুষ।

এই নতুন দৃষ্টি নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে পেলেন আজকের মানুষের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ তার দুস্তর অর্থ নৈতিক বাধা, যা উত্তীর্ণ হতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমাজের একটি বিরাট অংশের অবহেলিত মানুষের অর্থ নৈতিক মুক্তি। এই রোগ ও তার প্রতীকার -চিন্তাই তাঁর শেষ পর্বের লেখাগুলিকে এক নতুন রূপ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছে। অর্থ নৈতিক পরিবেশ ও তার পরিবর্তন জীবনকে কী ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৪০-৪১-এ লেখা তাঁর 'সহরতলী' উপন্যাসে, কিন্তু অর্থনৈতিক পরাধীনতায় মানুষের দুঃসহ দুঃখের ছবি আঁকা হয়েছে মন্বন্তরের পটভূমিতে 'দুঃশাসনীয়', 'নমুনা' প্রভৃতি গল্পে। 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে বর্তমান অর্থনীতির আওতায় বর্ধিত মানুষের নৈতিক অধঃপতনের একটা দিক উন্মোচিত হয়েছে।

এসব গল্পে অর্থ নৈতিক পরাধীনতায় মানুষের পরাজয়ের ছবিই আঁকা হয়েছে, লেখক এখানে মুখ্যত সমাজের রোগ নির্ণয় করছেন। এর প্রতীকার চিন্তা করতে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন, মানুষের একক চেষ্টায় তা হবার নয়, তার জন্যে চাই একতা ; আর এই একতা তখনই গ'ড়ে উঠবে যখন মানুষের সমাজ-চেতনা তাকে ক'রে তুলবে সংবেদনশীল। অবশ্য এই বিশ্বাসটিতে নিশ্চিন্তভাবে পৌঁছবার আগে তাঁর মনে কিছুকাল আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব চলেছে, এবং তাঁর এই সময়কার অনেকগুলি লেখাতেই তাঁর বিরূপ চেতনার ছায়া পড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত এই নাস্তিক্যধর্মী মনোভাবকে জয় ক'রে তিনি মানুষের মুক্তিপথের সন্ধান করেছেন মানুষেরই সংঘচেতনার মধ্যে। 'মাটি-ঘেঁষা মানুষে'র দিকে এবার এক নতুন আশা নিয়ে এগিয়ে এলেন তিনি, তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন প্রাকৃত জীবনের এক নতুন বিবর্তিত রূপ। 'বিচার', 'শিল্পী', 'কংক্রিট', 'হারাধনের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতি গল্প এই নতুন আবিষ্কারেরই ফল। 'আজ কাল পরশুর গল্প' এবং 'পরিস্থিতি'ও এই পর্যায়ে আসে। সেইসঙ্গে তাঁর 'চিহ্ন', 'সোনার চেয়ে দামী' প্রভৃতি উপন্যাসও উল্লেখযোগ্য।

বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে শুধু উপরের প্রথম কয়টি গল্পের মূল বক্তব্যটুকু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে তাঁর আগেকার লেখার তুলনায় এগুলি কতটা জাত আলাদা। 'বিচার' গল্পে দেখানো হয়েছে শহরতলীর বস্তিবাসী মজুর-মজুরনীদের মধ্যেও কী ক'রে গ'ড়ে উঠেছে সমাজচেতনা। ভালো ক'রে ভোর হবার আগেই জল নেবার জন্যে জলের কলের কাছে জড়ো হয়েছে তারা। হাইড্রান্টের কাছে স্নানার্থীরাও জুটছে এসে একে-একে। এদেরই একজন প্রবীণ মজুর মতিলালের জোয়ান ছেলেটাকে ধ'রে নিয়ে গেছে সরকার এবং জেলখানায় আটক ক'রে রেখেছে বিনা বিচারে। কলতলায় এসে এই নিয়ে শুরু হয় জটলা, যার ফলে তাদের নিজেদের গড়া সার-বেঁধে-দাঁড়ানোর সর্বসম্মত আইনটা উত্তেজনার বশে লঙ্ঘিত হয়ে যায়। কিন্তু আইন তো দশজনের ইচ্ছায় সকলেরই সুবিধার জন্যে তৈরি। সেটা ভাঙলে চলবে কেন ? তারা

নিজেরাই নিজেদের চেষ্টায় আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়— যে আগে এসেছে সে আগে দাঁড়াল, আবার পিছনের বুড়োদের, কিংবা যেসব মজুরনীর ঘরে অসুখ-বিসুখ আছে তাদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিল সামনের সমর্থ কম-বয়েসীরা। হৃদয়ে সহজ মানবতার ভাব নিয়ে, দশজনের স্বীকৃত অলিখিত আইনে এদের মধ্যে চলেছে এক সুন্দর সুশৃঙ্খল বিচার, অথচ দেশের সুসভ্য সরকারের আদালতে বাঁধা-ধরা সরকারী বিচারের সঙ্গে এর কতই তফাত।

'শিল্পী' গল্পের সঙ্গে 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পটি পাশাপাশি রাখলেই আর কিছু বলতে হয় না। মধ্যবিত্ত মনের অসংযত অর্থলালসায় দুর্নীতির পথে স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা মানুষকে কতখানি অমানুষ ক'রে তোলে, আর দরিদ্র গ্রাম্য শিল্পীর আদর্শনিষ্ঠা, আত্মমর্যাদাবোধ ও দুঃখবরণের দৃঢ়তা তাকে সেই তুলনায় কতখানি নৈতিক সম্মানের অধিকারী করে, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। সুতোর অভাবে সাত-সাতটা দিন তাঁত বন্ধ মদনের, ঘরে একসন্ধ্যা খাবার সংগতি নেই, তার উপর বৌটা তার ন' মাসের পোয়াতি। তবু সে ভুলতে পারে না সে জাত-শিল্পী, অবস্থার চাপে প'ড়ে নিজের ঐতিহ্যকে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারে না সে। বাবুদের বাড়িতে এখন তার এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির আদর না থাকলেও জীবিকার লোভে ভুবন ঘোষালের বেগার-খাটা-মজুরি নিয়ে শাদা ধুতি শাড়ি গামছা বুনে দিতে রাজি হয় না মদন। বরং দারিদ্র্যকেই আঁকড়ে থাকবে সে— তার আরো ক' ঘর জাতভায়েরই মতো— তবু আত্মমর্যাদা খুইয়ে আত্মবিক্রয় করা চলবে না কিছুতেই।

'কংক্রিট' গল্পের উপসংহারের দিকে রঘুর চরিত্রটি কি বলিষ্ঠ। কারখানার পোঁছাবাবুর গোপন চক্রান্তে রঘুকে ভুলিয়ে আনা হয়েছে রানীর ঘরে। রানী যখন বলল, 'এবার কত কাজে লাগাবে তোমাকে পোঁছাবাবু, কত টাকা কামাবে তুমি'— তখন সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে এক মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে প'ড়ে যায়, সে নিজের চোখে দেখেছে কেষ্ট বাতাপিকে কী ভাবে রোলার মেসিনে পিষে থেঁতলে মারা হয়েছে। চুপ ক'রে ব'সে থাকলে আর চলবে না। পোঁছাবাবু তাকে কাছে টেনে বেন্দার মতো ছিদামের মতো কাজে লাগাতে চায়? তা কিছুতেই হতে দেবে না সে। কারখানার শ্রমিকদের সকলকেই সে ব'লে দেবে কেষ্ট বাতাপির মৃত্যুর রহস্য:

· · আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে তার যেন প্রাণটা যাবে এমনিভাবে চট ক'রে খিল খুলে রঘু পথে নেমে যায়। হন হন ক'রে এগিয়ে যায় অন্ধকার গলি ধ'রে। নেশা তার কেটে গেছে।· ·আর ধৈর্য ধরছিল না। কতক্ষণে গিরীনের কাছে গিয়ে বলবে নিজের চোখে যা কিছু দেখেছে—রোলার মেসিনের ঘটনা। সবাই যে অস্ত্রটি খুঁজছে, নিজের কাছে অকারণে এক মুহূর্তের বেশি সেটি লুকিয়ে রাখবার কথা সে ভাবতেও পারছিল না।

'হারানের নাতজামাই' গল্পে বিদ্রোহী কৃষাণ নেতা ভুবন মণ্ডলকে সালিগঞ্জ গ্রামে গ্রেপ্তার করতে এসে মাঝরাতে পুলিশকে কী ভাবে হারানের বাড়ি থেকে বোকা ব'নে ফিরে যেতে হল তারই অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ময়নার মা'র উপস্থিতবুদ্ধিতে পরিস্থিতির সহজ সমাধান হয়ে ভালোই হল। অবশ্য তা নইলেও সমাধান হত। দু'দিন আগে এই ময়নার মা-ই গাঁয়ের মেয়ের দলকে সঙ্গে ক'রে ঝাঁটা বঁটি হাতে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁ থেকে পুলিশকে তাড়িয়ে পার ক'রে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমা। সেদিন রাত্রেও ব্যাপারটা সহজে না মিটলে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। বাইরের তে-ভাগা চাঁদের আলোয় প্রায় দেড় শ'

চাষী লাঠি-সড়কি দা-কুড়ুল হাতে দাঁড়িয়েছিল দল বেঁধে,—তাদের নেতার জন্যে পুলিশের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তারা লড়তই।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' মজুর-ধর্মঘটের পটভূমিতে রচিত একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্প। বিদ্রূপ-মেশানো একটি চাপা কৌতুক গল্পটিকে রসোজ্জ্বল করেছে। তিন জন ধর্মঘটী মজুর-নেতাকে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েক শ' মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল স্টেশনে, এবং এ নিয়ে রক্তারক্তির পরে 'ছোট বকুলপুরে' পড়েছে সেপাইয়ের ডেরা, যার ফলে সেখানকার লোকের উপর শুরু হয়েছে নিষ্ঠুর অত্যাচার। এরই মধ্যে বৌ আন্না আর একফোঁটা শিশুকে নিয়ে রাত্রিবেলা নিশ্চিন্তে গোরুর গাড়িতে চেপে সেই ভয়ংকর স্থানে আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে দেখা করতে এল কি-না 'আধা-চাষী আধা-মজুর' দিবাকর! পাহারারত অতিবুদ্ধি গুপ্তচরেরা কী ক'রে বিশ্বাস করবে এ-কথা? এখানে এরা যে ছদ্মবেশে এসেছে এবং আসলে অতি 'ডেঞ্জারাস্' লোক, তাতে আর সন্দেহ কী? বিশেষত যখন দিবাকরের পান-মোড়া ছাপান কাগজটা লণ্ঠনের আলোয় পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি' একখানা ইস্তাহার। অথচ এতটা আধিদৈবিক বিপর্যয়েও 'ভীরু মুখ্য ছোট লোক' দু'টোর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যে থেমে যায় নি, এটাই আশ্চর্য।

কিন্তু এ-আলোচনা আপাতত এইখানেই শেষ করা যাক। এক-একবার মনে হয় ঐ শহরতলীর বস্তিবাসী সুশৃঙ্খল মজুর-মজুরনী, গাঁয়ের জাত-শিল্পী মদন তাঁতি, কংক্রিটের কারখানার প্রতিরোধকামী শ্রমিকের দল, সালিগঞ্জের চাষাদের গাঁয়ের দুঃসাহসী স্ত্রী-পুরুষ, আর 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরে'র দল ও তাদের কুটুম্ব দিবাকর আর আন্না— এরা তো আমাদের সমাজের সেই স্তর থেকেই এসেছে, মুখ্যত কায়িক শ্রমেই যারা নির্ভরশীল: কেউ খাটে মাঠে, কেউ কারখানায়; কেউ ধান ভানে ঘরে, কেউ খোয়া ভাঙে রাস্তায়; এদের আপন জনেরাই তো কাজ করছে গঞ্জে হাটে বাটে, মাছ ধরছে পদ্মানদীর জলে; তবু এখানে কত দৃপ্ত, বলিষ্ঠ মনে হচ্ছে এদের; কী দৃঢ় পদক্ষেপে এরা এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে আসছে পদ্মাতীরের কেতুপুর থেকে। এদের এই অগ্রগতি, এই নতুন জীবন-চেতনা, আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধের বিবর্তনকেই সূচিত করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের কোন্ পর্বের লেখা সকল দিক বিচারে সবচেয়ে সার্থক হয়েছে, এ-প্রশ্নের উত্তরে প্রথম পর্বের কথাটাই বেশি ক'রে মনে আসে। তার একটা প্রধান কারণ দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিকের লেখাগুলিতে অনেক সময় তাঁর বিরূপ মনের ছায়া পড়েছে, আর শেষ দিকের লেখায় নতুন ধারার শুধু একটা সূচনাই হয়ে রইল, পরিণতি ঘটল না। কিন্তু মনে রাখতে হবে পর্ব দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের বিপরীত হলেও গভীরতর অর্থে পরস্পরের পরিপূরক। তাঁর প্রতিভাকে সমগ্রভাবে জানতে হলে দুটি পর্বেরই পূর্ণ পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। একই জীবনসত্যকে তিনি দুটি ভিন্ন দিক থেকে জানবার সাধনা করেছেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছ থেকে অকালে বিদায় নিয়েছেন, এ-কথা ভোলবার নয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স পঞ্চাশও পূর্ণ হয় নি। তবু এরই মধ্যে গত বাইশ বছরে তাঁর সবসুদ্ধ সাতান্নখানি বই প্রকাশিত হয়েছে, আরো রচনা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। এই অল্পকালের মধ্যে মানুষের জীবনকে তিনি কত রূপেই না দেখেছেন। নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন কাটিয়েছেন, তবু তাঁর

লেখা কখনও একেবারে বন্ধ হয় নি। আরো অবাক লাগে এই ভেবে যে সাহিত্যসাধনার শেষ পর্বে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কী আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। একে শুধু গোত্রান্তর বললে যথেষ্ট হয় না, তাঁর শিল্পিমানসের দিক থেকে এ একেবারে জন্মান্তর। এই জন্মান্তরের বেদনা হৃদয়ে বহন ক'রে তাঁর শিল্পিসত্তাকে কত-যে দুঃসহ অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুরূহ সংকট উত্তীর্ণ হতে হয়েছে তার ইতিহাস চিরকাল অলিখিত থাকবে। যে-বেদনাকে তিনি এতদিন বুকে চেপে রেখেছিলেন তাকে তিনি বুকে করেই নিয়ে গেছেন, পরবর্তীদের জন্যে রেখে গেছেন উনষাটখানি গ্রন্থে তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার বিচিত্র ফসল— মানুষের মহাজীবনের অর্ঘ্যরূপে আমরা যাকে আহরণ করব আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডারে।

শ্রীঅশোকবিজয় রাহা

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল ১৮৮৯ - ১৯৫৭

সমসাময়িক নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রালের মতো উপেক্ষিত আর কেউ নন। বিশ্বসাহিত্যে যে-সব লেখক সামান্য একটু স্থান লাভ করেছেন তাঁদের বই ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাবার এগারো বছর পরেও শ্রীমতী মিস্ত্রালের কোনো কাব্যগ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ বের হয় নি। এমন কি, স্প্যানিশ কাব্য-সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ-সঞ্চয়নগুলিতে শ্রীমতী মিস্ত্রালের কবিতা পাওয়া যায় না। ইংরেজী ভাষায় স্প্যানিশ সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা আছে তাদের মধ্যেও তাঁর উল্লেখ নেই। শ্রীমতী মিস্ত্রালের মূল রচনাবলীর কোনো প্রামাণিক সংগ্রহ এখনো প্রকাশিত হয় নি। তাঁর অনেক রচনা আজ পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। গত ১০ই জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের উপকণ্ঠে শ্রীমতী মিস্ত্রাল ক্যান্সার রোগে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ-পরিবেশনেও উপেক্ষার ভাবটা সুস্পষ্ট। অনেক কাগজ আদৌ এ সংবাদ প্রকাশ করে নি। চিলির আর এক জন কবি পাবলো নেরুদার নাম অনেকের নিকট সুপরিচিত ; অথচ নোবেল পুরস্কার পেয়েও মিস্ত্রালের কাব্য কেন উপেক্ষিত হয়ে রইল সে বিচার স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তাঁরাই করতে পারেন।

চিলির উত্তরাঞ্চলে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের ৭ই এপ্রিল গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল জন্মগ্রহণ করেন। এটা তাঁর ছদ্মনাম। আসল নাম লুসিলা গদয় আলকিয়াগা (Lucila Godoy Alcayaga)। সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মিস্ত্রালের বাবা ছিলেন গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক। শিক্ষকতা অপেক্ষা তাঁর কিন্তু বেশি আগ্রহ ছিল গান লেখার। উৎসব উপলক্ষে গ্রামে গানের প্রতিযোগিতা হত। মিস্ত্রালের বাবা বরাবরই ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগী। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে মেয়ে কাব্যপ্রতিভা লাভ করেছিলেন।

বাবা ও দিদির কাছে মিস্ত্রালের লেখাপড়া শুরু হয়। তাঁর দিদিও ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি শিক্ষকতাবৃত্তির পাঠ গ্রহণ করেন। তার পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে চাকরি আরম্ভ করেন দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়ে। কয়েক বছর যাবৎ পল্লী-অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুনীল জানা গৃহীত ফোটো
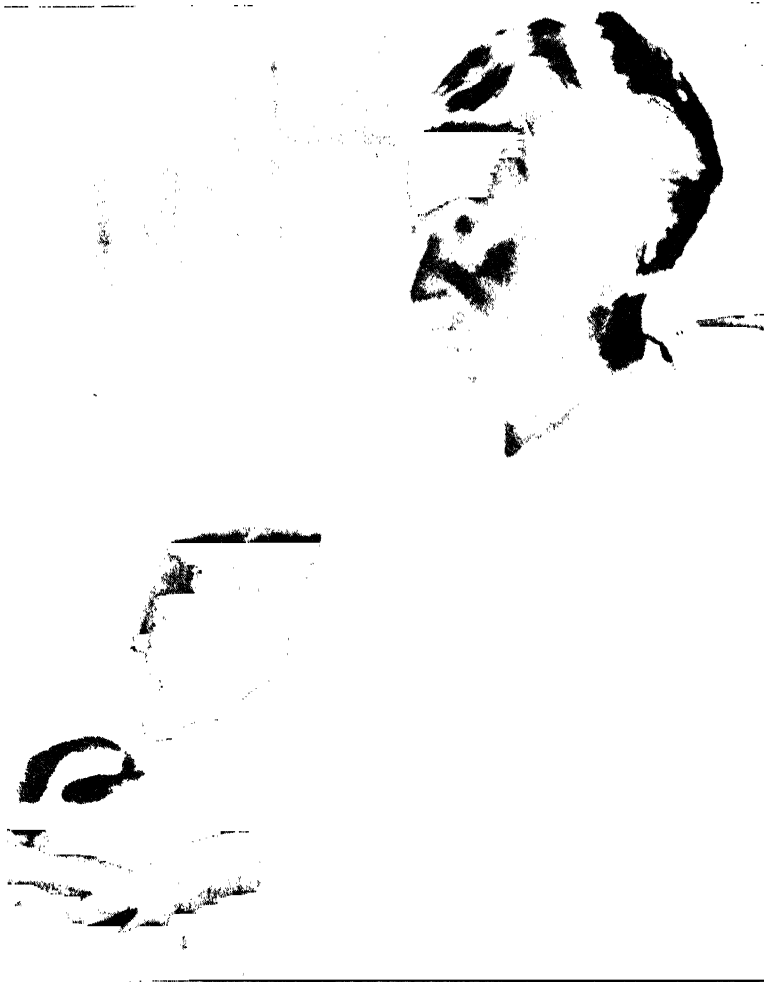
গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

তাঁকে চাকরি করতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের বেদনার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেছেন। তাঁর রচনায় এই অভিজ্ঞতার প্রভাব খুব গভীর।

শ্রীমতী মিস্ত্রাল যখন আঠারো বছরের তরুণী তখন তিনি এক মর্মন্তুদ শোকের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যে যুবককে তিনি ভালোবেসেছিলেন, যাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতেন, সে একদিন অকস্মাৎ আত্মহত্যা করল। এই বেদনা থেকেই তাঁর প্রথম কবিতার জন্ম। কিন্তু আরো ছ-সাত বছর পার না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাব্যচর্চার কথা অন্য কেউ জানতে পারে নি। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে চিলির লেখক সমিতি সান্টিয়াগোতে কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। মিস্ত্রাল প্রতিযোগী হিসাবে তিনটি সনেট পাঠালেন। সনেটগুলি মৃত্যুর উপরে রচিত। তাঁর প্রেমিকের মৃত্যু। মিস্ত্রাল গ্রামের মেয়ে। খুব লাজুক। শহরে নিজের পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ হল। ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল। তাঁর দুজন প্রিয় লেখকের নাম থেকে দুটি অংশ নিয়ে ছদ্মনামটি তৈরী করেছেন। এ দুজন লেখক হলেন ইতালীয় কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক Gabriele D'Annunzio এবং ফ্রান্সের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত কবি Frederic Mistral.

প্রতিযোগিতার ফল-ঘোষণার দিন সভায় খুব ভিড়। একদিকে প্রতিযোগী কবিদের আসন, অন্যদিকে উৎসুক জনতার সমাবেশ। মিস্ত্রাল জনতার মধ্যে আত্মগোপন করে রইলেন। তাঁর কবিতা পাঠ করে শোনাল অন্য একজন। তিনিই প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, এই ঘোষণার পরও মিস্ত্রাল সহজে নিজের পরিচয় দিতে পারেন নি।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে শ্রীমতী মিস্ত্রাল বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে পড়াতে আরম্ভ করেছেন। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তাঁর খ্যাতি বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। মেক্সিকো থেকে আমন্ত্রণ এল সেখানকার গ্রামের বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারগুলি পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করবার জন্য। এ কাজ তিনি খুব সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন।

দেশের লেখকদের রাষ্ট্রদূত হিসাবে অন্য দেশে পাঠাবার রীতি আছে চিলি সরকারের। দুবছর মেক্সিকোতে কাটাবার পর তিনি লীগ অব নেশন্সের ইন্স্টিট্যুট অব ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশানে চিলির প্রতিনিধি হয়ে আসেন। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৯৩৩ সাল থেকে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রীমতী মিস্ত্রাল চিলির রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। দীর্ঘকাল তাঁকে স্বদেশ থেকে বহু দূরে থাকতে হয়েছে। ইতিমধ্যে একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে চিলির গভর্নমেণ্টে। মিস্ত্রালের উপর সকল দলেরই সমান শ্রদ্ধা। সুতরাং সরকারের পরিবর্তন হলেও তাঁর রাষ্ট্রদূতের কর্তব্য অব্যাহত ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে মিস্ত্রাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কমিটির কাজে তিনি সহযোগিতা করেছেন।

কবিতা-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করবার পর থেকে মিস্ত্রাল বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় কয়েক বৎসর ধরে অনেক কবিতা প্রকাশ করেছেন। চিলির কাব্যরসিকদের মধ্যে সহজেই তাঁর প্রতিষ্ঠা হল। তাঁর আবৃত্তি শোনবার জন্য কাব্যপাঠের আসরে শ্রোতাদের ভিড় হত। কিন্তু তবু মিস্ত্রালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সহজে প্রকাশিত হয়নি। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্প্যানিশ সাহিত্যের অধ্যাপক

ড. ছ ওনিস ক্লাশে প্রায়ই মিস্ত্রালের কবিতা আবৃত্তি করতেন। ছাত্ররা তাঁর কাব্যসংগ্রহ পেতে চায়। কিন্তু মিস্ত্রালের কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করবার মতো সংগতি নেই। ক্লাসের ছেলেরা চাঁদা তুলল। প্রধানতঃ সেই টাকার উপর নির্ভর করে মিস্ত্রালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ Desolación ১৯২২ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর পরবর্তী বইয়ের নাম Tenura বা Tenderness। এটি বিশেষ করে ছেলেদের জন্য রচিত কবিতার সংগ্রহ। সর্বশেষ বই Tala বা Havoc প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৮ সালে। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর নির্মম আধিপত্যের পটভূমিকায় রচিত কবিতাগুলিতে লেখিকা রাজনৈতিক একনায়কত্বকে আক্রমণ করেছেন। এখন পর্যন্ত মিস্ত্রালের বহু গদ্য ও পদ্য রচনা সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে।

শ্রীমতী মিস্ত্রাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর কাব্যাদর্শকে প্রভাবান্বিত করেছে। মিস্ত্রাল নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের স্প্যানিশ অনুবাদকের অনুরোধে তিনি অনূদিত কবিতাগুলির প্রয়োজনীয় টীকা লিখে দিয়েছিলেন।

সুইডেনের কবি গুলবার্গ মিস্ত্রালের কবিতা সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নোবেল কমিটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৪৫ সালে মিস্ত্রাল নোবেল পুরস্কার পান। তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয় 'for her lyric poetry, which is inspired by powerful emotions and which has made her name a symbol of the idealistic aspirations of the entire Latin-American World.'

লাতিন-আমেরিকার সমকালীন সাহিত্যে য়ুরোপীয় লেখকদেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সাহিত্যের গতানুগতিকতার মধ্যে মিস্ত্রালের রচনা কিন্তু নিয়ে এল এক নতুন জগতের পরিচয়। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা নেই। মিস্ত্রালের কবিতায় সর্বত্র গভীর মমতাবোধ পরিস্ফুট; কিন্তু সেই মমতা চারিত্রিক দৃঢ়তাকে কোথাও ক্ষুন্ন করেনি। পাঠক কবির সরল, অকৃত্রিম ও সবল ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য অনুভব করে তৃপ্তিলাভ করেন। মিস্ত্রালের রচনার পরিধি বিস্তৃত নয়; এবং আপাত দৃষ্টিতে তাঁর রচনা বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হবে। কিন্তু ছোট একটি বাদ্যযন্ত্রে যেমন সবগুলি সুর বাঁধা থাকে তেমনি তাঁর ছোট ছোট কবিতার মধ্যেও পাওয়া যাবে হৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতির বিচিত্র সমাবেশ।

মিস্ত্রাল দুঃখের কবি। তিনি বলতেন, জীবন মধুময় বলে যাঁদের বিশ্বাস তাঁরা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। ভাবী স্বামীর আত্মহত্যার ফলে প্রথম যৌবনেই তাঁর ভালোবাসার অপমৃত্যু ঘটেছিল। বিয়ে করবার কথা তিনি আর ভাবেন নি। কিন্তু তবু সন্তান ও গৃহসুখের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে সারা জীবন তাড়না করেছে। এই আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি প্রকাশ করেছেন অসংকোচে। ব্যক্তিগত বেদনার নিরাবরণ প্রকাশকে অনেক সমালোচক বিরূপ দৃষ্টিতে দেখেছেন। তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে সন্তানহীনা রমণীর বেদনার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানেই পাওয়া যাবে মিস্ত্রালের কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। শিক্ষয়িত্রী হিসাবে তিনি দুর্ভাগ্যপীড়িত গ্রামবাসীদের, বিশেষ করে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত মমত্ববোধের সঙ্গে ব্যক্তিগত বেদনা যুক্ত হয়ে এই বিশেষ শ্রেণীর কবিতাগুলিকে মর্মস্পর্শী করেছে।

প্রেমিকের মৃত্যু ছাড়া পরিবারের একজন প্রিয়পাত্রের আত্মহত্যার শোকও মিস্ত্রালকে সইতে হয়েছে।

ফ্রাঙ্কোর অত্যাচারের ফলে যে-সব বালক-বালিকা অনাথ হয়ে পড়েছিল, চিলি তাদের আশ্রয় দিতে সম্মত না হওয়ায় তিনি গভীর বেদনা পেয়েছিলেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ Tala-র লভ্যাংশ এদের জন্যই উৎসর্গ করা হয়েছিল। সৌভাগ্যের কথা এই যে, বেদনা তাঁকে জীবনবিমুখ করতে পারে নি। বরং যারা দুঃখ পেয়েছে তাদের প্রতি মাতৃসুলভ মমতায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ। মিস্ত্রালের রচনায় মাতৃত্বের অনুভূতি প্রাধান্য লাভ করেছে।

মিস্ত্রালের কবিতার অনুবাদ বিদেশী সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় পড়েছি। ইণ্টার-আমেরিকান অ্যাফেয়ার্স কর্তৃক সংকলিত Anthology of Latin-American Poetry-তে তাঁর দুটি চমৎকার কবিতা আছে বলে মনে পড়ে। এখন সে-সব হাতের কাছে নেই। নিচে যে অনুবাদটি দেওয়া হল তা থেকে মিস্ত্রালের কাব্যপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

NIGHT

Sleep, my child ; because of you
The western skies their light efface ;
There is no glitter save the dew,
Nor any whiteness, save my face.

My little son, because you dream,
The road lies hushed, in peace unfurled,
Nothing murmurs save the stream ;
I am alone in a sleeping world.

A slow mist drowns the silent land,
A blue sigh fades in darkening skies ;
Like a gentle, soothing hand
Upon the earth a quiet lies.

Not my child alone I've sung,
Cradling him, to easy sleep ;
The earth too, as my cradle swung,
Drifted into slumber deep.

সন্তানের জন্য মায়ের অতন্দ্র স্নেহ, লেখিকার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা এবং নিদ্রিত পৃথিবীর চিত্র সার্থক রূপ লাভ করেছে। সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমন্ত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু জেগে আছে মা। মা'র স্নেহ সন্তানকে অতিক্রম করে পৃথিবীর উপর প্রসারিত হয়েছে। দোলনা ঝুলিয়ে গান করতে করতে ছেলেকে ঘুম পাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকেও মা ঘুম পাড়িয়েছে। মা'র সঙ্গে সহযোগিতা করে পৃথিবী স্বেচ্ছায় নিদ্রা বরণ করেছে, যাতে ছেলে ভালো করে ঘুমাতে পারে। প্রকৃতির

সঙ্গে এই একাত্মবোধ মিস্ত্রালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য। মৃত্যুর পরে আমরা প্রকৃতির মধ্যে মিশে যাব, কিন্তু একেবারে হারিয়ে যাব না, এ কথা তাঁর অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। 'শিশুদের প্রতি' নামক গদ্য কবিতার এই লাইন কটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য :

> Many years hence, when I am a little
> heap of silent dust, play with me, with
> the earth of my heart and of my bones!

প্রথম যৌবনে দয়িতের মৃত্যু উপলক্ষ্যে রচিত সনেটের মধ্যেও মাটির স্পর্শ থেকে সান্ত্বনা লাভের ব্যাকুলতা দেখা যায়। সেখানে শোকাবিষ্টা প্রণয়িনীর মধ্যে মায়ের রূপও দেখতে পাই :

> From that cold ledge where they have laid you by,
> I shall take down and lay you in the ground,
> Where humble and alone myself shall lie,
> Where we shall share dream-pillowings profound.
> Beside you stretching I shall show you all
> A mother's yearning for her child asleep,
> So earth shall cradle your pale body's pall,
> And sweetness smother half the sobs you weep.

চিলির সাহিত্যে আধুনিক কাব্যের প্রবর্তনের কৃতিত্ব মিস্ত্রালের। তাঁর অলংকারভারমুক্ত বেগবান ভাষা, অকৃত্রিম অনুভূতির গভীরতা এবং আন্তরিক মানবতাবোধ পরবর্তী কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। গত কয়েক বছর যাবৎ তাঁর কাব্য উপদেশমূলক বলে আধুনিক কবিরা অভিযোগ তুলেছেন। এই অভিযোগ বিশেষ করে Tala ও তার পরে প্রকাশিত কবিতার বিরুদ্ধে। ইংরেজী অনুবাদের সংকীর্ণ পরিচয় থেকে মনে হয় যে, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রাধান্যই তাঁর কাব্যপ্রচারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল -এর কবিতা

ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে

রাত্রি

ঘুমোও বাছা ঘুমোও, তোমার ঘুম আসবে বলে
পশ্চিমের ঐ আকাশ থেকে মিলিয়ে গেল আলো ;
আলোর কণা নিবলো সবি, শিশির শুধু ঝলে,
আমার মুখটি সাদা কেবল, আর সকলি কালো।

ছোট্ট খোকা, তোমার চোখে স্বপ্ন নামে, তাই
পথঘাট সব এলিয়ে আছে শান্তিতে নিঃঝুম ;
নদীর জলের আওয়াজ ছাড়া শব্দ কোথাও নাই,
একলা আমি রই জেগে, আর বিশ্বভরা ঘুম।

আস্তে নামে কুয়াশা— সে ডুবায় স্তব্ধ ধরা,
নীলাভ এক দীর্ঘনিশাস মিলায় তমিস্রায় ;
হালকা মৃদু স্নিগ্ধ হাতের আদর যেন ভরা,
শব্দবিহীন শান্তি এসে বিশ্বভুবন ছায়।

আমার গানে ঘুমিয়ে পড়ে আমার খোকনমণি,
একলা সে নয়, গানের দোলায় যেই সে ঘুমে ঢলে,
অমনি দেখি সেই দোলনে সমস্ত ধরণী
গভীর মুখের গহীন গাঙে উধাও ভেসে চলে ॥

অজিত দত্ত

ভাবী স্বামীর আত্মহত্যার পর

ঠাণ্ডা পাথরের ফাঁকে তোমাকে যে রেখে গেছে ওরা,
তোমায় সেখান থেকে তুলে নিয়ে মাটিতে শোয়াব,
মাটিতে তোমার সঙ্গে একা আমি শয়নবিভোরা,
স্বপনশিথানে র'ব পাশাপাশি গভীরনিদ্রাভ।
পাশে থেকে তোমায় দেখাব সব রহস্যের খনি,
ঘুমন্ত শিশুকে ঘিরে মায়ের বুকের যত সাধ,
ধরণী দোলাবে ওই রুগ্‌ণ শরীরের আস্তরণী,
সুখের শিহর নেবে তোমার কান্নার অবসাদ ॥

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মুকুন্দরামের দেশত্যাগকাল

শ্রীসুকুমার সেন

আমরা আজ পর্যন্ত মেনে আসছি যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মানসিংহের সুবেদারির সময়ে পিতৃভূমি দামুন্যা ছেড়ে ব্রাহ্মণভূমিতে চলে গিয়ে তার পর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। এ অনুমানের হেতু মুকুন্দরামের কথাতেই আছে। "শুন ভাই সভাজন" বলে কবি যে আত্মকাহিনী ও গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যে প্রচলিত সংস্করণে আছে এই কথা,

> ধন্য রাজা মানসিংহ কৃষ্ণপদাম্বুজ-ভৃঙ্গ
> গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ,
> সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
> রাজা হইল মহম্মদ সরিফ।

এখানে মুদ্রিত বইয়ে শেষ ছত্রের পাঠান্তর পাওয়া যায়, "ডিহিদার মামুদ সরিফ"। 'ডিহিদার' পাঠ ভ্রান্ত, মোগল শাসনের সময়ে অথবা তার পূর্বে এরকম কোন শাসক-পদ ছিল না। "শিকদার" পাঠান্তর কল্পিত হয়েছে। তাতে খানিকটা সংগতি রক্ষা হয়। কিন্তু প্রাচীন পুথিতে এখানে পাঠ পাওয়া যায় "রাজা হৈল", "উজীর হৈল", "প্রজা হৈল", "বিলাত পাইল", "খিলাত পাইল"। মামুদের পাঠান্তর মিলছে "মহম্মদ"। 'সে মানসিংহের কালে' পাঠান্তরে "রাজা মানসিংহের কালে", "রাজা মানসিংহ গেলে", "অধর্মী রাজার কালে"। দ্বিতীয় ছত্রের পাঠান্তরে— "গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে", "গৌড়বঙ্গ উৎকল মহিম", "গৌড়ধিব সকল মোহিত"। এই পাঠান্তরগুলির বিচার পরে করছি।

'সে মানসিংহের কালে' বললে অবশ্যই বোঝায় যে, মানসিংহের সময়ে প্রজারা যখন খাজনার ও সেটেলমেণ্টের দায়ে ব্যাকুল ও উদ্‌ব্যস্ত তখন মুকুন্দরাম পাঁচ-সাত পুরুষের ভিটা ও কৃষি পরিত্যাগ করে দক্ষিণ দেশে চলে যান। এখন মানসিংহের কাল বলতে কি বুঝব? মানসিংহ বিহারের "সিপাহ্-সালার" (গভর্নর) নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৫৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৫৯০ সালের এপ্রিল মাসে তিনি আফগান-দমনের জন্যে উড়িষ্যায় অভিযান করেছিলেন। ভাগলপুর থেকে তিনি বর্ধমান হয়ে আরামবাগে যান এবং বর্ষাকালে সেখানেই কাটান। তার পর কুৎলু লোহানির সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেন এবং জগন্নাথের সম্পত্তির ভার খুর্দার রাজা রামচন্দ্রকে দিয়ে ফিরে আসেন। বছরখানেক পরে আবার তাঁকে উড়িষ্যায় অভিযান করতে হয়েছিল। এবার জগন্নাথে। এবারে উড়িষ্যাবিজয়ে মানসিংহকে বেগ পেতে হয়েছিল। খুর্দার রাজার সঙ্গেও বিরোধ হয়েছিল। আকবরের ভর্ৎসনায় মানসিংহকে রামচন্দ্রের সঙ্গে মিটমাট করতে হয়েছিল। রামচন্দ্র তাঁর এক কন্যাকে মানসিংহের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। মানসিংহ বাংলা-উড়িষ্যার গভর্নর ছিলেন ১৫৯৪ থেকে ১৬০৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এর মধ্যে শুধু একবার (১৫৯৯ সালের শেষ থেকে ১৬০০ সালের শেষ পর্যন্ত) তিনি বাংলা দেশে অনুপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর এক সহকারী শাসনকার্য চালিয়েছিল।

এখন উল্লিখিত পাঠান্তরগুলি বিচার করি। "রাজা মানসিংহ গেলে" পাঠ মিলেছে ১৭১৭ সালে লেখা পুথিতে। এ পাঠ সরাসরি অগ্রাহ্য করতে হবে। আমরা পরে দেখব যে, মানসিংহের অধিকারকাল শেষ হবার আগেই মুকুন্দরামের কাব্যরচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 'অধর্মী রাজার কালে' পাঠ স্বীকার করলে বুঝতে হবে যে মানসিংহ বাংলা-উড়িষ্যার সিপাহ্‌সালার নিযুক্ত হবার আগেকার কথা মুকুন্দরাম বলছেন। তবে বেশি আগেকার কথা নয়। এই পাঠ স্বীকার করলে দ্বিতীয় ছত্রের এই পাঠ অবশ্যস্বীকার্য— "গৌড়াধিপ

উৎকল মহিম", অর্থাৎ যিনি গৌড়াধিপ হয়ে উৎকলে অভিযান করেছিলেন। এই পাঠেরই ভ্রান্ত পাঠান্তর "গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে", "গৌড়বঙ্গ উৎকল মহিম", "গৌড়ধিব সকল মোহিত" (প্রাচীনতম পুথির পাঠ)। মানসিংহ উৎকলে অভিযান করেছিলেন দুবার, ১৫৯০ আর ১৫৯১ সালে। কিন্তু তখনো তিনি ঠিক গৌড়াধিপ নন।

আত্মকাহিনীতে মুকুন্দরাম যা বলেছেন তার সারমর্ম এই। অনেক পুরুষ থেকে তাঁদের বাস দামুন্যা (বা দামিন্যা) গ্রামে। এক পূর্বপুরুষ মাধব ওঝা কোন রাজার (?) ধর্মাধিকরণিক ছিলেন। তাঁর সময় থেকে কবির বংশ দামুন্যার ঠাকুর চক্রাদিত্যের সেবক। মাধবের নয় ছেলে, কনিষ্ঠ (?) জগন্নাথ মহামিশ্র। জগন্নাথ মহাপণ্ডিত এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। মাছ-মাংস ত্যাগ করে দশাক্ষর মন্ত্রে গোপালের উপাসনা করতেন। তিনি শিবপূজাও পরিত্যাগ করেন নি। জগন্নাথের পুত্র হৃদয়। ইনিও বড় পণ্ডিত ছিলেন, উপাধি বা নামান্তর গুণরাজ-মিশ্র। তাঁর তিন ছেলে, জ্যেষ্ঠ কবিচন্দ্র, মধ্যম মুকুন্দরাম।

কবিরা ছিলেন সেলিমাবাদ শহরের গোপীনাথ নন্দীর প্রজা। গোপীনাথ ছিলেন রাজকর্মচারী অথবা জাগিরদার, পদবী নিয়োগী। বিপাকে পড়ে গোপীনাথ নন্দী বন্দী হন ; পরিত্রাণের কোনো পথ ছিল না। তখন মহম্মদ (বা মামুদ) সরিফ অধিকার পেয়েছে। (রাজা হয়ে, শিকদার হয়ে অথবা নতুন জাগীরদার হয়ে।) তার (?) উজীর (রাজস্বমন্ত্রী) হল রায়জাদা। টাকার জন্যে পীড়ন চলল। ব্যবসায়ী-মহাজন ("বেপারি-ক্ষত্রিয়") উৎখাতপ্রায়। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব খয়রাত পায় না। জমি নতুন করে জরিপ হতে লাগল। কোণাকুণি মেপে দৈর্ঘ্য ধরা হল, পনেরো কাঠায় বিঘা। প্রজাদের আবেদন নিবেদনে কেউ কান দেয় না। সরখেল (জরিপকারী কর্মচারী) সাক্ষাৎ শমন, পতিত ভূমিকে ভালো চাষের জমি বলে লেখে, কোনো কিছু না করে ঘুষ নেয়। পোতদারও যমের দোসর ভাই, টাকা ভাঙালে আড়াই আনা বাটা লাগে। কড়ি দিলে দিনমজুর মেলে না। ধান গোরু কেনবার খরিদদার নেই। খাজানার জন্যে প্রবল উৎপীড়ন। দ্বারে দ্বারে পেয়াদা, পাছে খাজানা শোধ না করে লোক পালিয়ে যায়। ধান ফুরিয়ে গেছে, ঘরদরজা গোরুবাছুর বেচা ছাড়া উপায় নেই। এদিকে এক টাকার জিনিসের দাম দশ আনার বেশি ওঠে না। মুকুন্দরামেরও সেই দায়। (মনে হয় গোপীনাথ নন্দীর তালুক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় মুকুন্দরামের সম্পত্তি বেদখল হয়েছিল।) গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে যুক্তি করা হল। তাঁদের একজন চণ্ডীবাটীর তালুকদার শ্রীমন্ত খান। তাঁদের পরামর্শ অনুসারে ভিটা ছাড়াই ঠিক হল। (তখনকার বাংলাদেশের সীমান্ত ছাড়ালে পড়ত আধুনিক মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সবডিভিজন। সেখানে ব্রাহ্মণভূমি পরগণার রাজা বাঁকুড়া রায় স্বয়ং ব্রাহ্মণ এবং বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণের পোষ্টা। তাঁর আশ্রয় গ্রহণের সংকল্প বোধ হয় গোড়া থেকেই ছিল) ।

নগদ টাকাকড়ি যা কিছু ছিল নিয়ে স্ত্রী, শিশু পুত্র, ভাই (রমানাথ বা রামানন্দ বা রামনিধি) ও তলপিদার ডামাল (বা দামোদর) নন্দীকে নিয়ে একদিন মুকুন্দরাম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন দক্ষিণ মুখে। ক্রোশ-খানেক পরেই ভেলিয়া গ্রাম পাওয়া গেল। সেখানে রূপ রায় টাকাকড়ি সব কেড়ে নিলে। (ইনি কি রাজকর্মচারী অথবা জানদার ছিলেন ?) অকস্মাৎ সম্বলহীন পথিক-পরিবারকে আশ্রয় দিলেন যদু কুণ্ড। জাতি তেলি। তিন দিন এঁর ঘরে কাটিয়ে মুকুন্দরাম আবার রাহী হলেন। পথে মুড়াই নদী পড়ল। নদী পেরিয়ে খানিকটা গিয়ে ভেঙুটিয়া গ্রাম পাওয়া গেল। এ গ্রাম ছেড়ে দ্বারিকেশ্বর পেরিয়ে মুকুন্দরাম পৌঁছলেন পাতুলি গ্রামে। (গ্রামটির নাম পাওয়া এই রকম— "পাতুলি পুরী", "মাতুল পুরী", "পাতাল পুরী", "বাতন গিরি"। শেষ পাঠ পরিত্যাজ্য। "মাতুল পুরী" পাঠ ঠিক হলে বুঝতে হবে যে পাতুল কিংবা ঐ অঞ্চলের কোন গাঁয়ে মুকুন্দরামের মামার বাড়ি ছিল।) পাতুলি গ্রাম (বা মাতুল পুরী) ছেড়ে গিয়ে আমোদর পড়ল। পরাশর ও আমোদর নৌকায় পার হতে হল। ("নারায়ণ পরাশর এড়াইলাম আমোদর"— এই পাঠ খাঁটি হলে বলতে হবে যে পাতুলির পর মুকুন্দরাম পর পর তিনটি নদী পেরিয়েছিলেন। কিন্তু নারায়ণ ও পরাশর নামে নদীর চিহ্ন থাকলেও উল্লেখ নেই— রূপনারায়ণের মধ্যে 'নারায়ণ' আছে। "না বাহে পরাশর"— এই পাঠ ঠিক হলে পরাশর নৌকা বেয়ে আমোদর পার করে দিয়েছিল। পরাশর কি তবে মাতুলবংশীয় কেউ ?) আমোদর পেরিয়ে অনেকদূর গিয়ে পড়ল গোচড়িয়া গ্রাম। তখন মুকুন্দরামদের চরম দুর্দশা। গ্রাম ছাড়িয়ে একটু দূরে মুকুন্দরাম আশ্রয় নিলেন এক পুকুরের আড়ায়। (মতান্তরে আড়া নামক পুকুরের পাড়ে। "আশ্রম পুখরি আড়া" স্থানে "রসড়া পুখরি আড়া" পাঠও আছে। এ পাঠ ঠিক হলে বুঝব রসড়া গ্রামের পুকুরের আড়ায়।) পুকুরে রুখু স্নান করে মুকুন্দরাম ঠাকুরের

পূজা করলেন শালুক ফুল দিয়ে। নৈবেদ্য দিলেন শালুকের নাড়া। ("শালুক পোড়া" অত্যন্ত প্রামাদিক পাঠ।) পুকুরের জল ছাড়া খাবার কিছু নেই। শিশু তা মানবে কেন? ভাত খাব বলে তার কান্না। "ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে" মুকুন্দরাম ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন যেন দেবী চণ্ডী তাঁর মায়ের রূপ ধরে এসে তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে তালপাতা কালি কলম জুগিয়ে দিয়ে "সঙ্গীত" লিখতে বলছেন। দেবী মন্ত্রও দিলেন নিত্য জপ করবার জন্যে। সে মন্ত্র মুকুন্দরাম কখনো শোনেন নি। চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে চাঙ্গা হয়ে তিনি আবার পথচলা শুরু করলেন। শিলাই নদী পেরলেন। অবশেষে (চন্দ্রকোণার কাছে) আরড়া গ্রামে উপনীত হলেন।[১] সেখানে ভূস্বামী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য, বীর-বাঁকুড়া রায়। মুকুন্দরাম তাঁর সভায় হাজির হয়ে কবিতা পড়ে রাজাকে সম্ভাষণ করলেন। তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁর সকল দায় স্বীকার করে নিলেন এবং তখনি দশ বারো মণ ধান দেবার হুকুম দিলেন। মুকুন্দরামকে নিযুক্ত করলেন ছেলেকে পড়াতে। ছেলে রঘুনাথ গুরুকে সানন্দে বরণ করে নিলেন।

আরড়ায় মুকুন্দরামের দিন স্বাচ্ছন্দ্যে কাটতে লাগল। ডামাল নন্দী স্বপ্নের কথা জানত। সে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেয় দেবীর "সঙ্গীত" রচনার আদেশ। রঘুনাথ রায় রাজা হলেন। তিনিও বলেন "সঙ্গীত" লিখতে। কিন্তু মুকুন্দরামের জড়তা কাটে না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হলে তাঁর চেতন হল। তিনি একমনে "সঙ্গীত" রচনার প্রবৃত্ত হলেন। "সঙ্গীত" লেখা হল, গানও হল। কবিকে রাজা প্রাচীন প্রথামত পুরস্কার দিলেন— কানে সোনার মাকড়ি, হাতে সোনার বালা, গলায় কণ্ঠমালা, হাতে হীরাবসানো আংটি, মাথায় পাগড়ি, অঙ্গে উত্তরীয় ও অধোবাস, আর চড়বার ঘোড়া। গায়নেরাও যথোপযুক্ত অলংকার পেলে।

"সঙ্গীত" যখন লেখা হয় তখন পুত্র শিবরামের জন্ম হয়েছে। ভনিতায় শিবরামের সঙ্গে আরো তিনজনের নাম আছে— চিত্রলেখা, যশোদা ও মহেশ। কবি এঁদের জন্যে দেবীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন। এঁরা কবির কন্যা-জামাতা হতে পারেন, কন্যা-পুত্র হতে পারেন, পৌত্রী-পৌত্রও হতে পারেন। একটি ভনিতার পাঠান্তর খাঁটি হলে ("রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান") বুঝতে হবে চণ্ডীমঙ্গল রচনার সময়ে কবির নাতিনাতনী হয়েছিল। ভনিতায় এক-আধ বার কবি নিজেকে "দৈবকীনন্দন" বলেছেন। দৈবকী তা হলে মায়ের নাম।

এই তো গেল মুকুন্দরামের আত্মজীবনী।

এর থেকে এই অনুমান অপরিহার্য যে কবির আরড়া পৌঁছানো ও কাব্যরচনার মধ্যে কাল-ব্যবধান বহু বৎসরের। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কত বৎসরের। এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার আছে কাব্যরচনাকালের নিম্নতম সীমা বিবেচনা করি। রঘুনাথ রায়ের রাজ্যকাল ১৪৯৫ থেকে ১৫২৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৩-১৬০৩ সাল। রঘুনাথ রায়ের পুত্র চক্রধর ১৫২৬ শকাব্দে কেশিয়াড়ীতে দেবী-প্রতিমা স্থাপন করেছিলেন। এর প্রমাণ উড়িয়া অক্ষরে খোদাই এই লিপি,[২]

> শ্রীমানসিংহ মহারাজ শুভরাজ্যে নিজকুলে কুমুদানন্দ
> শ্রীল শ্রীরঘুনাথ শর্মা ভুমিপ সুত শ্রীচক্রধর শর্মা
> প্রকাশিলে সর্বমঙ্গলা প্রতিমা স্থিতি। শকাব্দ ১৫২৬।
> কামিলা রতুপাত্র।

১ কবিকঙ্কণের যাত্রাপথের নকশা দ্রষ্টব্য।
২ শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, যুগান্তর, ২৬ শ্রাবণ ১৩৬২।

এই রঘুনাথ যে মুকুন্দরামের শিষ্য ও পোষ্টা তাতে সন্দেহ নেই। "এক সময়ে" কেশিয়াড়ীর আশেপাশে বারোটি শিব মন্দির ছিল। "এই বারোটি মন্দিরকে বারো মাড়ো বলা হত। এক সময় বিশেষ সমারোহের সঙ্গে এই বারো মাড়োতে গাজন উৎসব হত। প্রত্যেক দেবালয়ের স্বতন্ত্র প্রতীক সহ ধ্বজা থাকত, কারও সিংহ, কারও ব্যাঘ্র, কারও ভল্লুক, কারও কুমীর ইত্যাদি। সেই সব ধ্বজা উড়িয়ে প্রত্যেক মন্দির থেকে ভক্ত্যারা শোভাযাত্রা করে বেরত।"[৩] এর সঙ্গে তুলনা করুন চণ্ডীমঙ্গলের বর্ণনা,

> শঙ্কর-সদনে গৌরী গেলা সেই বেশে,
> অংশরূপে পূজা লয়্যা কলিঙ্গের দেশে।
> বিন্ধ্যের নিকটে ঠেসে যত পশুগণ,
> পথে যাইতে চণ্ডীর পাইল দরশন।
> কেশরী শার্দ্দুল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ,
> শরভ করভ গজ মহিষ দুর্জন।
> যত পশু একে একে কত নিব নাম,
> চণ্ডীর চরণে সভে করিল প্রণাম।

চণ্ডীমঙ্গল-রচনার সময়ে রঘুনাথের পুত্র জন্মায় নি। তা হলে ভনিতায় তার নিশ্চয়ই উল্লেখ থাকত। বরং ছেলে যে তখনো হয় নি তারই ইঙ্গিত আছে। কাব্যের শেষের দিকে ভনিতায় রঘুনাথের প্রসঙ্গে বারবার বলা হয়েছে "অভয়া পুর তার কাম"। এ কামনা পুত্রের জন্য বলেই মনে করি।

১৬০৪ সালে রঘুনাথের পুত্র রাজা হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স খুব কম ধরলেও বারো-তেরোর নীচে সম্ভবত নয়। তা হলে কাব্যরচনাকালের শেষ সীমা ১৫৯১-৯২ সাল হয়। মানসিংহের উল্লেখও অসংগত হয় না, যেহেতু মানসিংহের "উৎকল মহিম" ঘটেছিল ১৫৯০ ও ১৫৯১ সালে। প্রথম বারে মানসিংহ স্থলপথে গিয়েছিলেন বধমান দিয়ে দক্ষিণ মুখে এবং আরামবাগে কিছুকালের জন্যে শিবির গেড়েছিলেন। আরামবাগ থেকে আরড়ার দূরত্ব বেশি নয়। সেই সময়েই কবি মানসিংহের মহত্ত্বের ও বিষ্ণুপরায়ণতার পরিচয় পেয়েছিলেন। তবে তিনি ভুল করেছিলেন যে, মানসিংহের শাসন এদেশে চিরকাল ছিল না। তাঁর দেশত্যাগকালে যিনি রাজা ছিলেন ভ্রমক্রমে তাঁর বদলে মানসিংহের নাম করে ফেলেছেন।

মুকুন্দরাম আরড়ায় গিয়ে রঘুনাথকে পড়িয়েছিলেন। তখন রাজা "পালধি" গ্রামীণ বীর-মাধবের পুত্র বীর-বাঁকুড়া রায়। যখন কাব্য রচনা করেন তখন বাঁকুড়া রায় বেঁচে নেই, তবে দুলালসিংহের কন্যা পাটরানী রাজমাতা দনাদেবী জীবিত। রঘুনাথের রাজ্যকাল ১৫৭৩ থেকে ১৬০৩ সাল। সুতরাং মুকুন্দরামের আরড়ায় আগমন ১৫৭৩ সালের বেশ কিছু আগে। কিন্তু কত আগে?

এ প্রশ্ন বিচারের আগে একটা বিষয় ভাববার আছে। ১৮২৩ সালে রামজয় বিদ্যাসাগর মুকুন্দরামের কাব্য প্রথম প্রকাশ করেন। আজ পর্যন্ত কাব্যটির যত সংস্করণ বেরিয়েছে তার মধ্যে এটি নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। এতে কাব্যসমাপ্তি-অংশে রচনাকালজ্ঞাপক এই দু ছত্র আছে,

> শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা,
> কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা।

এই ছত্র দুটি-একটি ছাড়া কোনো পুথিতে পাওয়া যায় নি। যে পুথিতে পেয়েছি সেটির লিপিকাল

৩ শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

১৮৪৮ সাল। কিন্তু পুথিটি রামজয় বিদ্যাসাগরের ছাপা বইয়ের নকল নয়। পুথিটিতে এমন অনেক দীর্ঘ পাঠান্তর আছে যা অন্যত্র পাই নি এবং যার মধ্যে অবিসংবাদিত ভাবে প্রাচীনত্বের ঝংকার আছে। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে, রামজয় বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত পুথি ছাড়াও অন্যত্র ছত্র দুটির অস্তিত্ব আছে। কবিকঙ্কণের কাব্যরচনা-কাল নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা সকলেই ছত্র-দুটিকে প্রক্ষিপ্ত বলে উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার কারণ মানসিংহের কালের সঙ্গে কিছুতেই এই ছত্রদ্বয়নির্দিষ্ট কালের সংগতি রক্ষা করা যায় না। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দেওয়া যত সহজ মেনে নেওয়া তত সহজ নয়। প্রশ্ন উঠবে, কে প্রক্ষেপ করলে? কেন প্রক্ষেপ করলে? কোথা থেকে নিয়ে প্রক্ষেপ করলে? কবে প্রক্ষেপ করলে? প্রথম তিন প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, না সদুত্তর না কদুত্তর। শেষ প্রশ্নের জবাবে বলতে পারি যে. প্রক্ষেপ যদি হয়েই থাকে তো অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের পরে নয়। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিশাল-লোচনীর গীত'-এ ছত্র দুটি উদ্ধৃত আছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৮) লেখবার সময়ে ছত্র দুটি সম্বন্ধে আমার সংশয় ছিল। স্বীকার করতে পারি নি, সরাসরি অগ্রাহ্য করতেও মন সরে নি। তাই অর্ধজরতীয় ন্যায় অবলম্বন করে আমি দুর্ব্যাখ্যা করেছিলুম 'রস' অর্থে 'নয়' ধরে। কিন্তু এটা খেয়াল হয় নি যে, ১৪৯৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৭ সালে রঘুনাথ রাজা। তাঁর ঢের আগে কবি আরড়ায় গিয়ে বাঁকুড়া রায় কর্তৃক "সুতপাঠে-নিয়োজিত" হয়েছিলেন।

মোট কথা 'রস' শব্দের এখানে মানে 'ছয়' ছাড়া হতে পারে না। কেউ কেউ অষ্টরসের কথাও বলেছেন। যেমন পীতাম্বরদাসের 'অষ্টরসব্যাখ্যা', কিন্তু এখানে অষ্টরস বলতে অষ্ট নায়িকার ভাবরস। কোনো পুরানো বাঙালী কবি 'রস' বলতে 'ছয়' ছাড়া আর কিছু ধরেন নি। সুতরাং "শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক" মানে ("অঙ্কস্য বামা গতিঃ" ধরে) ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪-৪৫ সাল।

মুকুন্দরাম বলেছেন যে, শশাঙ্ক-বেদ-রস-রস শাকে দেবী চণ্ডী তাঁকে গান দিয়েছিলেন অর্থাৎ এই বছরে তিনি পুকুর-আড়ায় ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়েছিলেন। অতএব ১৫৪৪-৪৫ সালে তিনি পৈতৃক ভিটা ছেড়েছিলেন। এ কাল মানতে আপত্তি কি ?

আপত্তি সেই "মানসিংহের কাল"! কিন্তু আমরা দেখেছি যে, মানসিংহের কালে মুকুন্দরামের দেশত্যাগ এবং কাব্যরচনা কিছুতেই আঁটে না। ঘটনা দুটির মধ্যে বেশ কিছু সময়ের ফারাক ছিল— দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ বছরের ফারাক হতে পারে। গৃহত্যাগকালে মুকুন্দরামের সঙ্গে কটি ছেলে ছিল বলেন নি। "শিশু কান্দে ওদনের তরে"— থেকে মনে হয় একটি চার-পাঁচ বছরের মত ছেলে ছিল। "গীত না করিয়া মৈল ছাল্যা"— এই উক্তি থেকে মনে হয়, ছেলের মরণ মুকুন্দরাম নিজের অপরাধের শাস্তি বলে মেনে নিয়েছিলেন। এ ছেলে সঙ্গের শিশুটি বলেই মনে। তা হলে "বংশধর" অর্থাৎ কাব্যরচনাকালে জীবিত একমাত্র পুত্র শিবরামের জন্ম আরড়াতেই হয়েছিল। কাব্যের মধ্যে ভনিতায় একাধিকবার পৌত্রের উল্লেখ আছে ("রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান")। সুতরাং আরড়া পৌছবার অন্তত পঁচিশ বছর পরে কাব্যরচনা হয়েছিল। ঊর্ধ্ব পক্ষে চল্লিশ বছর ধরলেও হানি নেই। শুধু হানি নেই নয়, লাভ আছে। কেন তা একটু পরে বিবেচ্য।

দেশের যে অবস্থা হওয়াতে কবিকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল সে অবস্থা মানসিংহের সময়ে হয় নি,

তোড়ল মল যখন জরিপ করে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন তখনো হয় নি। সে হয়েছিল পাঠান-অধিকারের শেষ অবস্থায় আর সুরবংশীয় আফগান-অধিকারের কালে। অর্থাৎ ১৫৩৭ থেকে ১৫৬৪ সালের মধ্যে। ভাইপো ফিরোজ শাহাকে হত্যা করে গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহা গৌড়ের সুলতান হন ১৫৩৩ সালে। হোসেন শাহার পুত্র ইনি, নসরৎ শাহার ভাই। নির্বুদ্ধিতার ফলে ইনি বাংলা দেশে পাঠান-রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। শের শাহার মত প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে মামুদ শাহা সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। মুকুন্দরামের আত্মকাহিনীতে "হৈল রাজা মামুদ শরিফ" এই পাঠ খাঁটি হলে রাজা মামুদ নিশ্চয়ই গিয়াসুদ্দীন মামুদ শাহা। সমসাময়িক ইতিহাসে ইনি নির্বোধ অকর্মণ্য বলে উল্লিখিত। সুতরাং "সরিফ" বিশেষণ সার্থক। রায়জাদা নামে কোনো ব্যক্তি এঁর উজীর (রাজস্বমন্ত্রী) ছিল বলে জানা নেই। মামুদ শাহার জামাই খিজির খান তুর্ক বাংলা দেশের শাসনকর্তা ছিলেন শের শাহার আমলের গোড়ার দিক পর্যন্ত। মনে হয় মুকুন্দরাম রায়জাদা (রাজার জামাই?) বলে এঁকেই নির্দেশ করেছেন। তা হলে কি মূলে পাঠ ছিল "খিজির হল রায়জাদা"? দিল্লীর তক্তে আসীন শের শাহাকে অন্যমনস্ক মনে করে খিজির খান স্বাধীন হবার উদ্যোগ করেছিলেন। শের শাহা এসে তাঁকে দমন করলেন (১৫৪১) এবং তার পরে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা রাজ্যকে জরিপ করে বিভক্ত করলেন এবং নিজের প্রিয়পাত্রদের মধ্যে জাগীর বেঁটে দিলেন। এই সূত্রেই বোধ করি মুকুন্দরামের প্রভু গোপীনাথ নন্দী নিয়োগী বিপাকে বন্দী হয়েছিলেন এবং তাঁর তালুক অন্য লোকের অধিকারে এসেছিল। মুকুন্দরাম যে-বিপর্যয়ের মধ্যে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তা মোটেই স্থানীয় ব্যাপার নয়। সে বিপর্যয় সমস্ত দেশময়। "ব্যাপারি-ক্ষেত্রিয় খেদা" দামুন্যার সম্বন্ধে হতে পারে না। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-বিদ্বেষও তাই। পাঠান সুলতানেরা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন না। কিন্তু নূতন আফগান সুলতানের ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকবার কথা নয়। মুকুন্দরামের উল্লিখিত বিপর্যয় এই সময়ের (১৫৪১-৪৪) নিশ্চয়ই। কেননা তখন উড়িষ্যা আফগান-অধিকারের বাইরে এবং মুকুন্দরাম যেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন সে দেশ তখন গোলমালের বাইরে। মোগল-শাসনের কালে হলে আরড়ায় যাওয়া নিরর্থক হত।

আভ্যন্তরীণ বিচারেও মুকুন্দরামের দেশত্যাগের এই কাল (অর্থাৎ ১৫৪৪ সাল) সমর্থিত হয়। কবির পিতামহ জগন্নাথ মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা। এ দীক্ষা পেয়েছিলেন কোনো বৈষ্ণবের কাছে পঞ্চদশ শতকের শেষে অথবা ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে। তার পরে হলে গুরুর নাম থাকত। মুকুন্দরাম নিজেও বৈষ্ণব ছিলেন। ভনিতায় পুনঃ-পুনঃ দেবীর কাছে "গোবিন্দ ভকতি" মেগেছেন। কাব্যারম্ভে চৈতন্য-বন্দনা আছে, নবদ্বীপের ও নীলাচলের ভক্ত অনুচরদের নাম আছে। রূপ-সনাতনের নাম নেই। অর্থাৎ বৃন্দাবনে গোস্বামীদের কার্য তাঁর জানা ছিল বলে বোধ হয় না। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রায় তাঁকে নবদ্বীপে চৈতন্যচরণে প্রণাম করিয়েছেন। কবি পিতা হৃদয় মিশ্রকে সাধারণত গুণরাজ মিশ্র বলেই উল্লেখ করেছেন। 'গুণরাজ (বা গুণিরাজ)' ইত্যাকার উপাধি পাঠান সুলতানদের আমলেই দেওয়া হত। ধনপতির সমুদ্রযাত্রা-প্রসঙ্গে কবি পোতুগীজ জলদস্যুর অধিকার নির্দেশ করেছেন,

> ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে,
> রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে।

হার্মাদের এ আমল সাতগাঁ-হুগলীতে নয়, বাংলার উপকূলে হিজলীতেও নয়, এ আমল ভুবনেশ্বর-পুরী ছাড়িয়ে। উড়িষ্যা-গঞ্জাম উপকূলে ফিরিঙ্গির দৌরাত্ম্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু হয়েছিল।

এইভাবে সব দিক বিবেচনা করে দেখলে কবিকঙ্কণের দেশত্যাগ ও স্বপ্নাদেশপ্রাপ্তিকাল ১৪৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৪ সাল সংগত বলে মানতে হয়।
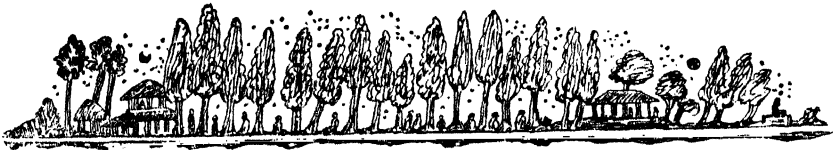
বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

এ কথা বহুবিদিত যে বাংলার অনেক মুসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিতা রচনা করিয়াছেন। ধর্মের ভাব বা সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক হইতে বিচার করিলে যে এই কবিতা বা গানগুলি সর্বত্রই উল্লেখযোগ্য তাহা বলা যায় না। কয়েকটি গান ব্যতীত অন্যত্র আমরা খানিকটা একটা প্রথাবদ্ধপথে বিচরণ, খানিকটা অনুকরণ বা অনুসরণ, খানিকটা পূর্বতন আকারপ্রকারের উপর স্থূল-সূক্ষ্ম হস্তাবলেপন লক্ষ্য করিতে পারিব। সুতরাং সেই দিক হইতে বিচার করিলে আমরা এই গানগুলির হয়ত যথেষ্ট মূল্য দিতে স্বীকৃত নাও হইতে পারি; কিন্তু আমাদের বাঙালী জাতীয় মনের ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করিতে এই গানগুলির একটি বিশেষ মূল্য রহিয়াছে।

যে-সকল মুসলমান কবি রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া প্রেম-কবিতা রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-কবি বা বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবি ছিলেন এ-কথা আমরা স্বীকার করি না—যেমন করিয়া স্বীকার করি না এই কথা যে হিন্দু কবিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ সকল রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-কবিতা রচনাকারী কবিই বৈষ্ণব ছিলেন। দেখা যায় কোনও কোনও ধর্মের ভাবধারা তাহার ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা তাহার সাম্প্রদায়িক একটি ধর্মের রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাতির একটি চিত্তপ্রবণতা রূপে একটি সাংস্কৃতিক রূপ পরিগ্রহ করে। কোনও একটি বিশেষ-জাতীয় সাহিত্যও যখন এইরূপ ব্যাপক ও গভীর প্রসারের দ্বারা জাতীয় চিত্তপ্রবণতারই নিয়ন্ত্রক হইয়া দাঁড়ায় তখনই সাহিত্য সংস্কৃতির গভীররূপ ধারণ করে। সাংস্কৃতিক রূপে পরিণত এই জাতীয় ধর্ম ও সাহিত্যকে জাতি অনেক সময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একটা সামাজিক উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করিতে থাকে।

বাংলাদেশের কয়েকটি ধর্মমত এবং তদাশ্রিত সাহিত্য এইরূপ একটা সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রূপে বৃহৎ বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছে যে সমাজ তাহার সম্বন্ধে এই কথাটি স্পষ্ট মনে রাখিতে হইবে যে তাহা একটা বড় 'বাঙালী সমাজ'; তাহা 'বাঙালী সমাজ' এই জন্য যে সেই সমাজের অন্তভুক্ত জনগণ তাহাদিগকে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান রূপে অত্যন্তভাবে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লয় নাই; অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস রূপে যে সম্প্রদায় যে মতই গ্রহণ করিয়া থাকুক না কেন সাংস্কৃতিক জীবনে আভ্যন্তরীণ চিত্ত-প্রবণতার বিচারে তাহাদের একটা অখণ্ড 'বাঙালী' পরিচয় ছিল। বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৈষ্ণব-ধর্ম ও সাহিত্য, নাথ-ধর্ম ও সাহিত্য ও বিভিন্ন সহজিয়া-ধর্ম ও সাহিত্য এইরূপে বাংলার সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের উপরেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; তাহার ফলে বৃহৎ বাঙালী সমাজ যখন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান আদি রূপে নিজেদের ধর্মের ক্ষেত্রে পৃথক্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল তখনও তাহার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে কেহই পরিত্যাগ করিল না তাহার সেই সংস্কৃতিপ্রভাবিত চিত্তপ্রবণতাকে পৃথক পৃথক ধর্মের ক্ষেত্রেও সক্রিয় করিয়া লইল। সেই কারণে দেখিতে পাই বাংলাদেশের হিন্দুও যেমন 'বাঙালী হিন্দু', বাংলাদেশের মুসলমানও তেমনই 'বাঙালী মুসলমান,' বাংলাদেশের বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানগণেরও তাই একটা বিশেষ বাঙালী পরিচয় আছে।

ষোড়শ শতকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে একটি 'কৃষ্ণচৈতন্য' রূপে, অর্থাৎ একটি বিশেষ ভগবৎ-চৈতন্যের মূর্তবিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইলেন বাঙালীর সমগ্র জাতীয় জীবনের ইতিহাসেই তাহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে বলিয়া মনে হয়। তৎপ্রবর্তিত ধর্মের মূল কথা হইল এই যে, ধর্মকে স্পষ্ট সিদ্ধান্তহীন ন্যায়ের তর্কজালের মধ্যে আবৃত এবং বন্ধ্যা করিয়া রাখিলে চলিবে না, শ্রুতিস্মৃতি-নির্ধারিত আচার বিচার, যাগযজ্ঞাদির কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা বিশেষ ক্রিয়াবিধিতে পরিণতি করিয়া রাখিলেও চলিবে না; ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এমন একটি ভগবৎ-চৈতন্যের উপরে যাহা সহজভাবে জীব ও ভগবানের ভিতরকার একটি প্রেম-সম্বন্ধ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্য করিয়া তোলে। চৈতন্যদেবের জীবন ও বাক্যকে অবলম্বন করিয়াও শাস্ত্র গড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্মের মূল কথা যেটি তাহা সমগ্র বাংলা দেশে ছড়াইয়া পড়িল অসংখ্য গানে গানে। তাই তাহার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব সক্রিয় হইয়া উঠিল সর্বস্তরের বাঙালী জাতিরই মননের উপরে— অনেকখানি জাতিধর্মনিরপেক্ষ ভাবে।

বাঙালী-চিত্তের উপরে বৈষ্ণব সাহিত্যের যে প্রভাব তাহারও জাতিধর্মনিরপেক্ষ ভাবে একটি সামগ্রিক রূপ আছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও তাহার প্রকাশভঙ্গি আমাদিগকে এমন ভাবেই পাইয়া বসিয়াছিল যে মনে হয়, দীর্ঘ চারি-পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া একটি সমগ্রজাতি তাহার মনের যত প্রেমের কথা তাহা ঐ রাধাকৃষ্ণের বাঁধুনিতে এবং সেই ব্রজলীলার ছন্দে ভাষায়ই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভাবের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গির দিক হইতেও জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সর্বস্তরের বাঙালী কবিগণকেই কতখানি প্রভাবিত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি দৌলত কাজির 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের কিছু কিছু বর্ণনার মধ্যে। যেমন—

আয় ধনী কুজনী কি মোক শুনাওসি
বেদ উকতি নহে পাঠং।
লাখ উপায়ে মিটাতে কে পারয়
যো বিধি লিখিল ললাটং॥
না বোল না বোল, ধাই, অনুচিত বাণী।
ধরম না চাহসি তেজি সতীত্ব মতি
লোর-প্রেমে করাওসি হানি॥
মোহর সুনায়ক গুণের পালক
মধুর মুরতি মুখ ভেশং।
সো মধু তেজিয়ে করাওসি বিষ-পান
ভাল, ধাই, কহ উপদেশং॥···
দুরন্ত দুর্মতি দূতি দূতীপনা দূর করি
চিন্তহ মোর কল্যাণং।
কাজি দৌলতে ভণে, দাতা মনোভব মনে
শ্রীযুক্ত আশরফ খানং॥[১]

১ 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী' কাব্যের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল কর্তৃক লিখিত ভূমিকা, সাহিত্য-প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী), ১৮-১৯ পৃ।

জয়দেব কবির 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত পদও দেখিতে পাওয়া যায় এই কাব্যের মধ্যে। যেমন—

ভাদ্রমাসে চন্দ্রমুখী সুচরিতা একাকিনী
বসতি তিমির অতি ঘোরং।
অধর মধুরৌ তাম্বুল বিনা ধূসরৌ
নিচল চকোর আঁখি ঝোরং॥
রাণী লো ময়নাবতী, তেজ নিজ মান পরিখেদং।
দুরন্ত বিরহানল দহতি তব অন্তর
তথাপি ন চেতন ময়না চেতং॥
বকফুল মঞ্জরী কিমিতি অতি সীদতি
মলিন অঞ্জন মুখ ভেশং।
বিষাদিত বিলপসি সকল দিন যামিনী
অবিরত বিকল বিশেষং॥ ইত্যাদি।[২]

উদ্ধৃত পদগুলির কাব্যমূল্যের কোনও কথা বর্তমান প্রসঙ্গে উঠিতেছে না, অনুকরণ হিসাবেও এগুলি হয়ত অসার্থক; কিন্তু অন্য একটি দিক হইতে ইহারা সার্থক, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতার প্রভাব কিরূপ সর্বাতিশয়ী ছিল তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রূপে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় 'বাঙ্গলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি' নাম দিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাতে এই জাতীয় ১০২ জন মুসলমান কবি লিখিত ১০২টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদোদ্ধৃতির পরে তিনি এই সকল মুসলমান কবিগণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখিতে পাইতেছি যে এই কবিগণের মধ্যে দুই-চারিজন কবি কিছু প্রাচীন হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশই হইলেন উনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। এই সময়ের মধ্যে ধর্মমননের ক্ষেত্রে কতগুলি ভাব বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে। উচ্চ কোটির বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিশেষ চিন্তা-পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও কতগুলি ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে সর্বজাতীয় জনমনের ভিতরে একটা আশ্চর্য ঐক্যমত পরিলক্ষিত হয়। এই ভাব-চিন্তাগুলির প্রকাশের ক্ষেত্রেও কতগুলি বহুস্বীকৃত পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেই ভাবৈক্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গির সমতা কিভাবে এই মুসলমান কবিগণ লিখিত রাধাকৃষ্ণ-কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে সেই কথাটাই আমরা লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিব।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাংলার মুসলমান কবিগণ রাধাকৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা কোনও বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় রচিত নহে। ফলে দেখা যায় বাংলাদেশে যে জনপ্রিয় ভক্তিধর্ম বাংলার মুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল রাধাকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াও সেই ভক্তিধর্মই প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইহাতে এই মুসলমান কবিগণরচিত রাধাকৃষ্ণলীলা প্রচলিত

২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ২১-২২।

রাধাকৃষ্ণের লীলা হইতে অনেকখানি পৃথক্ হইয়া দেখা দিয়াছে। আমরা জানি, বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ অবলম্বনে যে প্রেমলীলার অসংখ্য কবিতা বা গান রচিত হইয়াছে সেই গানে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, এখানকার যত প্রেমলীলা তাহার ভিতরে মানুষের কোনও স্থান নাই। লীলা হইতেছে নিত্যকাল অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে (স্বরূপ-ধামে) কৃষ্ণ এবং তাঁহার হ্লাদিন্যাত্মক স্বরূপশক্তি রাধার সঙ্গে; জীব সেখানে লীলা-পরিকরভূত সাক্ষী মাত্র, সে দূর হইতে লীলা দর্শন ও আস্বাদন করে এবং কথায় সুরে সেই লীলার কীর্তন করে। শ্রীরাধা এবং স্বরূপভূত নিত্যসিদ্ধ গোপগোপীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলার কোনও অধিকার নাই; শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-বাসনাও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। সুতরাং আমরা সাধারণভাবে ভক্তিধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক হইয়া মিলিবার আকাঙ্ক্ষা করি ইহা আমাদের হৃদয়সম্মত হইলেও বৈষ্ণবশাস্ত্রসম্মত নহে। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যের আলবারভক্তগণ যেরূপ নিজেদের নায়িকাভাবে পরিভাবিত করিয়া পরমদয়িত ভগবানের প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়াছেন এবং মধুররসাশ্রিত সাধনাকে অবলম্বন করিয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে কোথাও তাহার আভাস মিলিবে না। হিন্দীর ভক্তকবি মীরা যেমন করিয়া নিশিদিন প্রেমবিহ্বলা হইয়া তাঁহার পরম 'প্রীতম' গিরিধারীলালের মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, অথবা হিন্দীর অষ্টছাপের কবিগণও স্থানে স্থানে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার অংশীদার হইবার ব্যাকুল বাসনা জানাইয়াছেন বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় তাহার কোথাও আভাস নাই, থাকিবারও কথা নহে। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনা হইল সখীর সখী যে মঞ্জরীগণ তাঁহাদেরই 'অনুগা'ভাবে; সখীগণেরই কখনও কৃষ্ণের সহিত মিলন নাই, সে ক্ষেত্রে মঞ্জরীর 'অনুগা'-গণের কৃষ্ণ-মিলনের তো কোনও কথাই উঠিতে পারে না।

বৈষ্ণব ধর্মের 'সাধ্য' ও 'সাধন' সম্বন্ধে এইসব তত্ত্ব বাংলাদেশে অবশ্য ষোড়শ শতকে গড়িয়া উঠিয়াছে বৃন্দাবনস্থিত গোস্বামিগণের ধ্যান মননে; কিন্তু আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি যে বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই ভাবদৃষ্টিটি চলিয়া আসিয়াছে দ্বাদশ শতকের বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে। জয়দেব তাঁহার সমগ্র 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে লীলা-কীর্তন করিয়া শুধু লীলার জয়-জয়কারই ঘোষণা করিলেন, নিজে কোথাও সেই লীলার অংশীদার হইতে চাহিলেন না। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও আমরা সেই একই সত্য লাভ করিতে পারি। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কবিগণের তো কথাই নাই। কবিগণ কোনও ধার্মিক বা দার্শনিক সচেতনতা লইয়াই যে এইভাবে রাধাকৃষ্ণের গান রচনা করিয়াছেন তাহা নহে, এইটাই দেখা দিয়াছে বাংলাদেশের চলতি ভঙ্গিরূপে। হয়ত এই চলতি ভঙ্গিই প্রভাবিত করিয়াছে বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্ম এবং দর্শনকেও।

কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে ইহাই বাংলার কবিগণের চলতি ভঙ্গি বটে, বৈষ্ণব ধার্মিক এবং দার্শনিকগণেরও ইহাই তত্ত্বসম্মত আদর্শ এবং সাধন-প্রণালী বটে; কিন্তু বাংলার বৃহৎ জনসমাজে রাধাকৃষ্ণ-লীলার ফলশ্রুতি কি? কোনও আসরে যখন একটি বিশেষ লীলা-সম্বলিত কীর্তনপদাবলী গীত হয় তখন নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সাধক যিনি তিনি নিজেকে একজন বৃন্দাবনের পরিকররূপে পরিভাবিত করিয়া লইবেন এবং লীলাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে আত্মানন্দ-অনুভবের যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সম্ভাবনাকেই কি করিয়া তিনি আস্বাদন করিতেছেন তাহা স্মরণ-মননের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বৃহৎ জনসাধারণের মধ্যে এই লীলা-কীর্তনের ফলশ্রুতি দেখা দেয় ভিন্নভাবে। শ্রোতা যেখানে আদৌ

ধর্মবাসিতচিত্ত নহেন, সেখানে ফলশ্রুতি সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহার কথা ছাড়িয়া দিতেছি। যেখানে ধর্মপ্রবণতা আছে সেখানে রাধার সকল প্রেমের আর্তি কৃষ্ণৈকচিত্ত পরমভক্তের হৃদয়-আর্তি বলিয়াই গৃহীত হইবে; রাধার সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সকল বিঘ্নবাধাকে অতিক্রম করিয়া যে কৃষ্ণমিলনাকাঙ্ক্ষা তাহা প্রেমের পথের পথিক সাধকের প্রেমসাধনার প্রতিচ্ছবিতেই গৃহীত হইবে। ব্যক্তিজীবনের ক্ষেত্রে এই ফলশ্রুতি হয়ত নিজেকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রেমের জন্য সর্বস্বত্যাগিনী রাধার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবার প্রেরণায় পর্যবসিত হইবে।

বাঙালী হিন্দুগণের মধ্যে যত বৈষ্ণব কবিই হইয়াছেন তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণবদর্শনসম্মত বৈষ্ণব হোন বা না হোন, একই ঐতিহ্যধারা দ্বারা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে প্রভাবিত হইয়া তাঁহারা মোটামুটিভাবে সেই মুখ্য ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু অন্যরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে; কারণ তাঁহারা চৈতন্যপ্রবর্তিত একটা সাধারণ প্রেমধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিলেন, একটা সাহিত্যিক বিষয়-বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকারসূত্রেই পাইলেন, কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে কোনও স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাংলার জনসমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল এই সকল কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন।

বাংলাদেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সূফীপন্থী। সূফীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরমস্বরূপের বহুরূপে লীলা, ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। জীব হইল এই 'একে'র সৃষ্টি-লীলার প্রধান শরিক—লীলা-দোসর। কিন্তু লীলার পাকে পড়িয়াও 'এক' তাঁহার সেই পরম প্রেমস্বরূপতাকে কখনও ভুলিয়া যান নাই— কিন্তু জীব তাহার প্রেম-স্বরূপতাকে ভুলিয়া গিয়াছে। জীবকে তাহার আপাতপৃথক্ সত্যকে ভুলিয়া যাইতে হইবে— ইহাই তাহার বড় সাধনা। যিনি মূল প্রেম-স্বরূপ তিনিই ত হইলেন পরম দয়িত— সেই পরম দয়িতের 'প্রেম-দিওয়ানী' হইয়া উঠিতে হইবে জীবকে। প্রেম-সমাধিতে ('ফানা') যে আত্মস্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি তাহাই সুগম করিয়া দেয় অনন্তের সঙ্গে নিত্য মিলনের পথ।

বাংলার যে সূফীধর্ম— শুধু বাংলার নয়, ভারতবর্ষেরই যে সূফীধর্ম— ইহা একটি মিশ্রধর্ম; ইহার ভিতরে পারস্যের প্রেমধর্মের সহিত ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের প্রেমধর্মের কাহিনী-উপাখ্যানও সূফীধর্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। সূফী প্রেমধর্ম এবং বাংলার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয়জাত প্রেমধর্মের আদর্শের সহিত রাধাকৃষ্ণকে অনেক স্থলে মিশাইয়া লইয়াছেন। ফলে রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেমসাধকগণের পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদক-রূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তের আর্তিকেও মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি হইতে বঙ্গীয় মুসলমান কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেক স্থানে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহাদের পদের ভণিতায়; এই ভণিতাচ্ছলে বৈষ্ণব কবিগণ নিজেদের কিছু কিছু মন্তব্যাদি যোগ করিয়া দিয়াছেন— তাহার মধ্যেই

তাঁহাদের ভাবদৃষ্টির ইঙ্গিত রহিয়াছে। আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধীয় পদগুলির ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টিরও ইঙ্গিত পাইব। আমরা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে পদ-সংগ্রহের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার ভিতরে প্রথমেই দেখিতে পাই কৃষ্ণকে বলা হইতেছে—

তোমার কঠিন হিয়া, ভজ নানা নারী লৈয়া,
কোথা গেলা বসি রৈনু আমি।
পালঙ্ক সাজাই নারী, জাগিয়া কান্দিয়া পুড়ি,
নিশি গেল না আসিলা তুমি।
কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে, প্রভু ভাব রাত্রিদিনে,
মায়াজালে না করিও হেলা।
আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা। ৩ সংখ্যক

ইহার ভিতরে প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি, যাঁহার জন্য পালঙ্ক সাজাইয়া রাখিয়া জাগিয়া কাঁদিয়া পুড়িতে হইয়াছে তিনি কিছু পরেই এক সার্বজনীন 'প্রভু'রূপ ধারণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের এই 'প্রভু'টির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। বৈষ্ণবগণের 'কৃষ্ণ', সাধারণ হিন্দুগণের 'হরি', মুসলমানগণের 'খোদা' এবং খ্রীস্টানগণের 'গড্' ভাঙিয়া বাংলাদেশের এই সার্বজনীন 'প্রভু'র উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ-কথা কহিতে কহিতে আসিয়া এই 'প্রভু ভাব রাত্রিদিনে' কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য আছে— অর্থাৎ কৃষ্ণকে এখানে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবতার গণ্ডী হইতে লইয়া আসিয়া বাংলার জনমানসের সাধারণ পরমদয়িতের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইল ; এই যুক্তির ফলে রাধাও ব্রজকুঞ্জ-নিকুঞ্জ হইতে মুক্তি পাইয়া সকল 'প্রেম-দিয়ানী' সাধকের সহিত একাত্মা হইয়া গেল ; তখন আর এই রাধার স্থান কবির নিজের গ্রহণ করিতে কোনও বাধা রহিল না, তখন কবি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—

আমারে অনাথ করি, তুমি যাও মধুপুরী,
আর কি পাইব তব মেলা।

কবি আকবর আলীর পূর্বরাগের (স্বপ্নদর্শন) যে পদটি রহিয়াছে সেখানেও লক্ষ্য করিতে পারি এই একই সত্য—

একা ঘরে শুইয়া থাকি, হুতিলে স্বপন দেখি।
ও আমার কর্মদোষে না পাইলাম জাগিয়া।
ছারাল আকবর আলী বলে, পিরিতে মর অঙ্গ জলে।
ও বন্দে প্রাণে মাইল স্বপ্নে দেখা দিয়া। ৫ সং

এখানেও বলা যাইতে পারে, 'ছারাল' আকবর আলী অতি সহজভাবেই কৃষ্ণ-লীলায় শ্রীরাধার স্থান দখল করিয়া লইয়াছেন, অথবা বলিতে পারি নিজেকে রাধা-স্থানীয় করিয়া লইয়াছেন। কবির নিজেকে এই রাধা-স্থানীয় করিয়া লইবার দৃষ্টান্ত বহু কবিতার মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। নিজেকে রাধার ন্যায় প্রেম-দিয়ানী মনে করিয়াই কবি প্রশ্ন করিয়াছেন এই প্রেমপথের পরম-অভিজ্ঞা রাধাকে—

তোরে মিনষ করি, চরণ ধ'রি, বৈলা দে গো রাই ;
হৃদয়ের ধন রতনমণি, কোথায় গেলে পাই।

যুগে যুগে দেশে দেশের সকল 'প্রেম-পাগলিনী'গণের সঙ্গে রাধার যে একটি সাজাত্য রহিয়াছে, অথবা রাধা যে নিখিল-প্রেমপাগলিনীর প্রতীক এই সত্যের ব্যঞ্জনা অনেক পদের মধ্যেই লাভ করি; এই ব্যঞ্জনাকে অবলম্বন করিয়া এই পদগুলিতে রাধা ও পদকর্তা মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। নিম্নে যে কবিগণের ভণিতাসহ পদাংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার প্রত্যেকটির মধ্যেই এই সত্য লক্ষণীয়।

যে যাইব জলের ঘাটে নতুন যৌবন লইয়া।
ঐ বন্দের চরণে দিব কুলমান সঁপিয়া॥
আবুল হুছনে বলে সে রূপ না পাইয়া।
নয়ানের পলক বাদী, দেখিলাম ভাবিয়া॥ ১১ সং

দেখা দিয়া না দেয় দেখা একি বিসম জ্বালা।
ঘরের বৈরি যৌবন পতি বাইরে চিকণ কালা॥
অধম আসরফে বলে কি বুঝ মন পাখী।
বন্ধুয়ার চরণ বিনে উপায় নাই দেখি॥ ১৮ সং

কালার পিরিতে ডুবি লুটাইয়াছি কুলমান।
প্রেমের পোড়া, আঙ্গার কালা, কালা গো কালাম।
চউকের পুতুলা কালা আর যে আছমান।
উদাসীয়ার অঙ্গ কালা না পাইয়া তোমার নিশান॥ ২২ সং

যখনে পিরিতি কৈলা, দিবারাত্রি আইলা গেলা,
ভিন্নভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপন কাজ, কুলেতে রাখিলা লাজ,
ফিরিয়া না চাহ আঁখি কোণে॥
তুই বন্ধের কঠিন হিয়া আনলেতে তৃণ দিয়া,
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া?
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল সে আনলে,
নিবাও লো প্রেমরস দিয়া॥ ৩০ সং

চাঁদকাজী বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি॥ ৪০ সং

মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে
জীবন-মরণ ভরি॥ ৭০ সং

আরকুম রচিত একটি পদে দেখিতে পাই, খণ্ডিতাভাবের পদের ভিতরে রাধার বাম্যতার স্থলে মিনতি দেখা দিয়াছে।

আজ নিশাকালে রে সাম, আজ নিশাকালে
আমারে ছাড়িয়া কালা কার কুঞ্জে রহিলে।
মমের বাতি, সারা রাত্রি, জুড় পালঙ্গে জ্বলে,
দয়া গুণে প্রাণ বন্ধু আইস রাধার কুলে।

কিন্তু এই পদটির শেষেই যখন দেখিতে পাই—

পাগল আরকুম বলে, শিশুকালে, প্রেম না করিলে,
না আসিব প্রাণবন্ধু রাত্রি নিশাকালে।

তখন এই ভণিতা ও মন্তব্য সমস্ত পদটিরই পারিপার্শ্বিকতা এবং অধ্যাত্মব্যঞ্জনা বদলাইয়া দিল। শিশুকালে প্রেম না করিলে রাত্রিনিশাকালে প্রাণবন্ধুকে পাওয়া যায় না কথার ইঙ্গিত কোন্ দিকে? জীবনের প্রভাত হইতে প্রেমের পথে না চলিলে, প্রেম-সাধনাকে সমগ্র জীবনব্যাপী না করিয়া লইলে, জীবননিশাতে কখনও সেই প্রাণবন্ধুর দেখা মেলে না। এই অর্থের আলোতে দেখিতে পাইব, রাধার যে 'আজ নিশাকালে' তাহার জীবনকুঞ্জে শ্যামকে আহ্বান ইহার সুরের মিল বৈষ্ণব কবিতার বাসক-সজ্জা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতির পদের সাধারণ সুরের সঙ্গে নহে।

বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণলীলার যত বিস্তার ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে নৌকা-লীলা বা নৌকা-বিলাসের লীলা-বিস্তারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে যতদূর আমাদের জানা আছে তাহাতে এ-জাতীয় লীলা বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যেই পাওয়া যায়, অন্য সাহিত্যে পাওয়া যায় না, পুরাণাদিতেও বিশেষ পাওয়া যায় না। আমাদের বিশ্বাস নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেই বাংলাদেশের কবিমানসে ইহার উৎপত্তি ও বিস্তার। নিষ্ঠাবান্ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৃষ্টিতে ইহা রাধা-কৃষ্ণের অনন্ত অপ্রাকৃত লীলাবৈচিত্র্যের একটি প্রকারভেদ মাত্র—ভক্ত সাধককে ইহাকেও লীলা-পরিকরভাবে দূর হইতে দর্শন ও আস্বাদন করিতে হইবে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, এই যে প্রভাতবেলা ওপার হইতে এপারে আসিয়া সারাদিন বিষয়কর্মে রত থাকিয়া বেলা শেষে আবার ওপারে যাইবার জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষায় 'পাড়ী'র জন্য খেয়াঘাটে বসিয়া থাকা—এই ঘটনাটি বহুদিন পূর্ব হইতে বাঙালীর কবিচিত্তে এক উদাস অধ্যাত্মভাব উদ্রিক্ত করিয়া আসিয়াছে; পাড়ের জন্য অপেক্ষা বাঙালীচিত্তে ভবপারের ব্যাকুলতা, পরপারের অজ্ঞাত রহস্য এবং অজানা 'পাড়ী'র কাছে আত্মসমর্পণের ভাবকেই উদ্রিক্ত করিয়াছে। 'উম্মর' কবি রচিত একটি পদে দেখি—

আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার।
প্রেম সাগরে ধইলাম গো পাড়ি না জানি সাতার।...
উম্মর পাগলে কয় সুনছি তুমি দয়াময় গো।
এগো দিয়া তরি শীঘ্র করি এখন মরে কর পার।
আমি তোমার লাগি হইলাম ঘরের বার। ২৩ সং

পদটি নৌকা-বিলাসের ভিতরেই বাঙালীর সেই স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। স্থিরবদ্ধ অধ্যাত্মভাব বলিতেছি এইজন্য পদকর্তাগণ যেভাব অবলম্বন করিয়াই পদ-রচনা করিয়া থাকুন না কেন,

কীর্তন-পদাবলীর শ্রোতাগণকে পদগুলি সেই অধ্যাত্মব্যঞ্জনাতেই মুগ্ধ করে। কীর্তনীয়াগণ যখন আখরের দ্বারা পদগুলির ভাব-সম্প্রসারণ করিতে থাকেন তখন তাঁহারাও এই আধ্যাত্মিকভাবেই পদগুলির অর্থের বিস্তার করিতে থাকেন। কৃষ্ণ রাধার নিকট যখন পাড়ের কড়ি চায় রাধা তখন এক আনা দু আনা করিয়া দর কষাকষি করিতে থাকে; গায়ক তখন নিজেই শুধু রাধা নয়, আসরস্থ সকলের প্রতি উপদেশ দিয়া সুরে বলেন, 'ষোল আনাই ঢেলে দাও—গোবিন্দায় নমঃ বলে ষোল আনাই ঢেলে দাও'। আসরের শ্রোতৃমণ্ডলীও এই উপদেশ পাইয়াই সুখী। সমস্ত জিনিসটি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় কীর্তন-আসরেও নৌকা-বিলাসের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত কোন্ দিকে। এই প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ পদকর্তা জ্ঞানদাসেরও একটি পদ উদ্ধার করা যাইতে পারে; তিনিও নৌকা-বিলাস লীলা-গানের মধ্যে যে ইঙ্গিতটি দিয়া গিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পদটি এই—

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকুল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ।...
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি স্থির হৈয়া থাক দেখি।
এখনি না ভাবহ বিষাদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের চট্টগ্রামবাসী আলিরাজা (ওরফে কানু ফকির) প্রেম ও যোগধর্ম মিশ্রিত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার 'জ্ঞান-সাগর' গ্রন্থখানিতে জনপ্রিয় হিন্দুধর্ম ও জনপ্রিয় মুসলমান ধর্মের ভাবধারার একটি চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করিতে পারি। এই আলিরাজার একটি পদ আছে—

শুন সখি সার কথা মোর।
কুলবধূ প্রাণি হরে সে কেমন চোর।
সে নাগর চিত্তচোরা কালা যার নাম।
জিতা রাখি প্রাণি হরে বড় চৌর্য কাম।
মোর জিউ সে কি মতে লই গেল হরি।
শূন্ত ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি।
গুরুপদে আলিরাজা গাহে প্রেম ধরে।
প্রেম খেলে নানারূপে প্রতি ঘরে ঘরে।

এখানে লক্ষ্য করিতে পারি, ব্রজের নাগর 'কালা'র যে 'কুলবধূ প্রাণি' হরণ করা লীলা তাহা যে পরব্যোমের ওপারে কোন অপ্রাকৃত বৃন্দাবনেই সংঘটিত হইতেছে তাহা নহে, প্রতি ঘরে ঘরে— অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই চলিতেছে 'নাগর কালা'র এই প্রেমলীলা, গুরুপদ আশ্রয় করিয়া চিত্তবিশুদ্ধির সাধনায় অগ্রসর হইলেই এই সত্য উপলব্ধি করা যাইবে। এই সত্যই প্রকাশ পাইয়াছে ইরপান কবির একটি পদেও—

ছারাল সা ইরপানে কইন বন্ধু আমার বংশীধারী।
ওরে বাজাইয়া মোহন বাঁশী আমার প্রাণী কৈল চুরি। ২০ সং

আলিরাজার পূর্বোক্ত পদটিতে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে মুন্সী বিলায়েত হোসেনের (ইনি কালীপ্রসন্ন ভণিতায় শ্যামাসংগীত ও বৈষ্ণবসংগীত রচনা করিতেন) একটি পদেও সেই তত্ত্বের সন্ধান পাই।—

প্রেম কি গাছের ফল পাড়িবে করিয়া বল।
দেহ প্রাণ করিলে নাশ মিলে সে চিকণ কালা।
কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে
চলিতেছে কালে কালে সকলি তাঁর লীলাখেলা।

কৃষ্ণের মায়ার লীলাখেলা স্বর্গ-মর্ত্য-ভূমণ্ডলে চলিতেছে বৈষ্ণব দার্শনিকগণ সে কথা স্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার প্রেমের লীলাখেলাও স্বর্গ মর্ত্য ভূমণ্ডলে চলিতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এ কথা স্বীকার করিবেন না (সহজিয়াগণ ব্যতীত)। কিন্তু গৌড়ীয় মুসলমান কবিগণের সে কথা বলিতে কোনই দ্বিধা ছিল না,— কারণ—

মনরে ছৈয়দ নিয়ামতে কয় আমি না দেখি উপায়।
সঙ্কটতারণ আমার মুর্শিদ শ্যামরায়। ৫৫ সং

শ্যামরায় যে শুধু অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের লীলা-নাগর নয়— সে যে ব্যক্তিজীবনের 'মুর্শিদ'। মুর্শিদ-ভজনেও শ্যামরায়কে পাওয়া যায়, আবার পরম মুর্শিদও হইল শ্যামরায়। মনুঅর কবি বলিয়াছেন—

নআনে লাগিল রূপ আসি আচম্বিত।
জাগিতে হারায়িলুঁ হরি শোকে দহে চিত।
কি দেখিলুঁ কি হইল পলক অন্তর।
ভজ গুরু পাইবে পুনি কহে মনুঅর। ৭২ সং

মিয়াধনের একটি গানে রাধাভাবে ভাবিত কবির বিরহ-আর্তি সুন্দর প্রকাশ লাভ করিয়াছেন—

প্রাণ ললিতা ত্বরা যাও গো বন্ধুরে আনিয়া দাও তরা।
আমি দাসী চির দোষী শ্যাম পিরিতের মরা।
বন্ধুরে আনিয়া দাও তরা। ৭৫ সং

শিতালং ফকির তাঁহার একটি গানে প্রেমপাগল সাধক ভক্তকে প্রেমপাগলিনী রাধার প্রতিচ্ছবিতে বর্ণনা করিয়াছেন। নব 'পিরীতে'র চিহ্নই হইল এই, সে 'সদায় থাকে উদাসিনী'— আর এই উদাসিনীর মলিন ভাবেই তাহার 'দিবানিশি বেকরার'—দিবানিশিই তাহার অসীম ব্যাকুলতা।

ক্ষুধা নিদ্রা নাই তার মনে জলধারা দুই নয়নে গো
এগো ছির ঘুরে প্রেমধুন্ধে
দিবানিশি ইন্তিজার।
হাসি খুসি নাই তার মনে সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো
এগো লাজভয় নাই তার
কলঙ্ক তার অলঙ্কার। ৮৮ সং

আমরা বৈষ্ণবগণের রাধার এই বর্ণনা পাইয়াছি, আর পাইয়াছি শ্রীচৈতন্যদেবের এইরূপ বর্ণনা; সূফী কবিগণের মধ্যে 'প্রেম দিওয়ানী'র এই বর্ণনা অনেক পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় বাংলার বাউল কবিগণের বর্ণনাতেও। এখানে বাউল বর্ণনার সহিত বৈষ্ণবের রং লাগিয়াছে।

বাংলাদেশের সহজ প্রেম সাধনার উপরে যোগতন্ত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। সে প্রভাব সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া দেখা গিয়াছে একটি সাধারণ বিশ্বাসে যে পরম সত্যরূপ যে পরম দয়িত সে শুধু বাহিরে নয়—সে 'ঘরের মধ্যেই রহিয়াছে, আমাদের দেহই হইল সেই 'ঘর'। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের গানগুলির মধ্যেই আমরা এই ভাবটির প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি, তাঁহারা বার বার বলিয়াছেন, 'দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণই'—'এই দেহেই বাস করিতেছেন বুদ্ধ— পণ্ডিতেরা সে কথা জানেন না'। তাঁহারা বলিয়াছেন—

অসরীর কোই সরীরহি লুক্কো।
যে তহি জানই সো তহি মুক্কো।

'অশরীরী একজন আছে এই শরীরের ভিতরেই লুকাইয়া, যে তাহাকে জানে সে-ই হয় মুক্ত।'

আবার—

ঘরেঁ অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেক্‌খই পড়িবেসী পুচ্ছই।

'সে আছে (দেহ) ঘরে—তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ বাহিরে! পতি দেখিতেছ, (তাহার কথা) জিজ্ঞাসা করিতেছ প্রতিবেশিগণের নিকটে।'

বৈষ্ণব সহজিয়াগণেরও মূলসুর ছিল—'বস্তু আছে দেহ বর্তমানে'— সব বস্তু বা তত্ত্বই আছে দেহের মধ্যে। ভারতবর্ষীয় সুফী সাধকগণও এই সত্যটি গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙলার বাউলরা ত দেহকেই দেউল করিয়া লইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া বাংলার মুসলমান কবিগণও এই ভাবটির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই কবিগণ বলিয়াছেন যে রাধা-কৃষ্ণ অভেদতত্ত্ব—দুই-ই এক—ঘর-ঘরিণী রূপে দুইয়ের লীলা,—কে ঘর কে ঘরিণী বলা শক্ত; রাধা যদি ঘর হয়, কৃষ্ণ হইবে গৃহী, আর কৃষ্ণ যদি ঘর হয়—রাধা তবে ঘরিণী। মোটামুটি ভাবে একই অদ্বয়তত্ত্বের ঘর-ঘরিণী রূপে লীলা।

রাধা কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন্।
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্র দিন।
কানু রাধা এক ঘরে সদায় করে বাস।
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।

ইহার পরেই কবি বলিতেছেন—

রাধা কেবা কানু কেবা চিনিবারে চাও।
তনে মনে রুজু হইয়া মুরশিদ বাড়ী যাও।

এই যে দেহ-দেহী—মূর্ত ও অমূর্তের—সীমা ও অসীমের লীলা ইহা যদি বুঝিতে হয় তবে সদ্‌গুরুর আশ্রয় ছাড়া অন্য উপায় নাই। অনেক কবি বলিয়াছেন, নিজের দেহই হইল রাধা—তাহার মধ্যে যিনি 'রমণ' তিনিই ত হইলেন কৃষ্ণ। বাহিরের এই রূপ হইল রাধা—তাহার ভিতরকার স্বরূপই ত কৃষ্ণ। রূপ চায় সেই স্বরূপের প্রেমের মধ্যে আপন সার্থকতা, তাইত রাধার কৃষ্ণান্বেষণ। ঘরের মালিককেই যদি খুঁজিয়া বাহির করা না গেল তবে শূন্য ঘরের আর কি সার্থকতা! আবার এরূপ ভাবও দেখিতে পাই যে, দেহ হইল ঘর, এই ঘরের মধ্যে জীব হইল রাধা, আর পরমাত্মাই হইল কৃষ্ণ। সেই ইঙ্গিত রহিয়াছে ওহাবের একটি গানে—

বন্ধুরে হায় কঠিন বন্ধু, কঠিন তোমার মন রে,
রাখ প্রাণী দরশন দিয়া।
আমি নারী তুমি রে পতি একই গৃহেতে বসতি,
ঘরের গৃহী না পাই ধুড়িয়া। ২৬ সং

এই ভাবটিও যেমন পাওয়া যায়, তেমনই এ-ভাবটিও পাওয়া যায় যে দেহ-খাঁচায় কৃষ্ণই হইল সেই বাউলদের বর্ণিত খাঁচার ভিতরকার 'অচিন পাখি'। মন-পবনই হইল সেই অচিন পাখির পিঞ্জর। খলিল কবি বলিয়াছেন, যতই প্রেম করিতে চেষ্টা করি, 'চঞ্চল কানুরায়'; কখন যে পাখি কোথায় ছুটিয়া পালাইবে ঠিক নাই।—

সখী গো অধম খলিলে বলে পিরিত করি ঠেকিও না,
মন পবন পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে ধরা দিবে না। ৩৪ সং

বদিয়ুদ্দিন বলিয়াছেন,—

তোমার কৃপার ফলে, মোহর ভাগ্যের বলে,
আসিয়াছ অবলা মন্দিরে।
এই ঘর আন্ধার করি, একদিন যাইবা ছাড়ি,
কেনে দেখা না দেও রাধারে।
তনুর অন্তরে পশি, মনুরা রহিছে বসি,
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদিয়ুদ্দিনে, গুরুর আদেশ বিনে,
দেখিবারে আর লক্ষ্য নাই। ৬৪নং

এখানে 'অবলা মন্দির' বা রাধার মন্দির হইল দেহ, এই 'তনুর অন্তরে' রহিয়াছে 'মনুরা'—রূপের অন্তরে স্বরূপ। হুছন কবির গানেও দেখি, এই সত্যের প্রতিধ্বনি—'দেহার মাঝে কালাচান্দ তারে চিন না।' সিরতাজ কবির গানে দেখি, এই 'ঘরের সোআমী'র (স্বামীর) যে সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, সে যে অন্তরের মধ্যে দেখা দিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছে না, ইহাই ত চরম বেদনা।

সই সই কি মোর নিশি কি মোর দিশি
কি মোর এ রবি শশী।
ঘরের সোআমী হাসিয়া ন বোলাএ
মুঞি অপরাধী দুখী।
সই সই ন জানি কি দোষে পিআ মোরে রোষে
নিদআ হৃদএ পিউ।
কহে সিরতাজে সোআমী উদ্দেশে
সহজে তেজিমু জীউ। ৯৩ সং

প্রেমধর্মের সঙ্গে যোগধর্মের মিশ্রণের কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। শুধু বাংলাদেশে নয়—সমগ্র ভারতবর্ষেই এই জিনিসটি লক্ষ্য করিতে পারি। পূর্বে বলিয়াছি, সুফীরাও প্রেমসাধনার সঙ্গে যোগসাধনা যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই যোগসাধনা হইল মুখ্যতঃ দেহবিশুদ্ধি ও চিত্তবিশুদ্ধির জন্য। এই বিশুদ্ধি

সাধনের দ্বারা প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সহিত যুক্ত করিয়া লইতে হয়; বৈষ্ণবরাও বলিয়াছেন,— 'প্রাণ মন ঐক্য ক'রে ডাক যশোদা-কুমারে।' এই প্রাণপ্রবাহকে মনঃপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্যই হইল প্রেমসাধনায় যোগসাধনার প্রয়োজন। মুসলমান কবিগণের রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার গানের মধ্যে অনেক সময় যোগ-সাধনার বিভিন্ন কথা নানাভাবে ছড়াইয়া আছে। গোলাম হুছনের একটি গানে আছে—

আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নাওখানি যবুনার মাঝ।
কাঞ্চাকুরা কালা নিশান সুধু রাধার সাজ।
আখির মাঝে আখি গুলি রাই নিরখিয়া চাও।
নায়ের মাঝে আছে হরি চরণে নেপুর দিও।
কর্ণের মাঝে কর্ণ দিয়া রাই নাসিকায় দাঁড় বাইও।
মুখের মাঝে মুখ দিয়া রাই হরির মধু খাইও।
গলইর মধ্যে নায়ের পন্থ রাই সর্গমুখে যায়।
সুপন্থে চলিলে রাধা হরির লাগ পায়। ৩৮ সং

এখানে 'নাওখানি' হইল দেহ নাওখানি, যমুনা এখানে কাল-প্রবাহ। 'আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নাও' অর্থাৎ বাজে কাঠের নাও হইল যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হয় নাই এমন দেহ (অপক্ব দেহ)— সুতরাং তাহার 'কুরা' অর্থাৎ নৌকা ঠেলিবার লগিও 'কাঞ্চা'— অর্থাৎ কাঁচা বাঁশের (অমজবুত); কালো নিশানও সেই অবিশুদ্ধিরই প্রতীক; মোটের উপরে দেহমনের কোনও বিশুদ্ধি লাভ ঘটে নাই, বাহিরে শুধু 'রাধার সাজ'। 'আখির মাঝে আখি গুলি'র ইঙ্গিত 'আবৃতচক্ষুঃ' হইবার দিকে, 'কর্ণের মাঝে কর্ণ' প্রভৃতির ইঙ্গিতও এই ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তর্মুখীনতার দিকে; 'নায়ের মাঝে আছে হরি' কথার তাৎপর্য দেহের মধ্যে পরম দয়িতকে আবিষ্কার করা এবং উপলব্ধি করা। 'নাসিকায় দাঁড় বাইও' কথার ইঙ্গিত শ্বাসে শ্বাসে জপের প্রতি। 'মুখের মাঝে মুখ দিয়া' কথার ইঙ্গিত একেবারে তাদাত্ম্যের দিকে। 'গলইর মধ্যে নায়ের পন্থ' দেহমধ্যস্থ নাড়ী-চক্র-সাধনার ইঙ্গিত করিতেছে; আর 'সর্গমুখে ধায়' কথাটি সাধকগণের উল্টা-সাধনা বা ঊর্ধ্বসাধনার ব্যঞ্জনা দিতেছে। এই কবিরই অপর গান আছে—

আবের পত্তন ঘর খাকের বন্দন।
তার মাঝে করে খেলা সাম নিরঞ্জন।
পবনে চালাইয়া দাগ আতসের পানি।
রসের ঠিকুনি ঘর মমের গাহুনি।…
দুই মুখে ফুটে ফুল ঘরে দিপ যলে।
প্রেম নিরখিয়া দেখ গোলাম হুছন বলে। ৩৯ সং

পদটির ভিতরকার সকল ইঙ্গিত স্পষ্ট করিয়া ধরা যায় না (অনেক সময় পদকর্তার মনেও হয়ত সব কথা স্পষ্ট নয়)— তবে কিছু কিছু ইঙ্গিত গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'আবের (জলের) পত্তন (পত্তন, ভিত্তি) ঘর খাকের (মাটির) বন্দন (বন্ধন)' হইল পঞ্চভূতাত্মক দেহ; 'পবনে চালাইয়া দাগ' প্রভৃতির ইঙ্গিত শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা যোগসাধনার প্রতি; 'রসের ঠিকুনি ঘর' সম্ভবতঃ মস্তকস্থিত চক্র; দুইমুখী ফুল বোধহয় সহস্রারস্থিত 'বিশ্বপদ্মে'র (উভয়মুখী পদ্ম) পরিকল্পনার ইঙ্গিত করিতেছে; 'দিপ (দীপ) যলে (জলে)' দিব্যজ্যোতি বা 'নূরে'র সন্ধান দিতেছে।

ছৈয়দ আলীর একটি গানে দেখি—

এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন।...
রূপের ঘরে রূপ জ্বল্‌তেছে বিনা চক্ষে দরশন।
কহিল ফকির ছৈয়দ আলী জিতে না হইল মরণ।
আঠার মোকাম ধুড়ি ত্রিপুন্নিতে দরশন। ৪৩ সং

'রূপের ঘরে রূপ'ই হইল স্বরূপ, তাহাকে 'বিনা চক্ষে দরশন',— ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই স্বরূপ— শুধু বিশুদ্ধচিত্তে সংবেদ্য। জীয়ন্তে মরা না হইলে, অর্থাৎ বাহিরের দেহধর্ম সম্পূর্ণ নিরস্ত না হইলে এই সাধনা হয় না; দেহস্থ ত্রিনাড়ীর (ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না=গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী) সংগম যেখানে সেখানেই ত্রিধারা মিশিয়া উর্ধ্বস্রোতা একধারা হইয়া যায়— সেই ত্রিবেণীতেই ত বেণীমাধব কৃষ্ণের দর্শন মিলে।

যোগসাধনার মধ্যে নাদ-সাধন মধ্যযুগের অনেক প্রেমসাধক সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। নাদ সাধনের মধ্যে অনাহত-ধ্বনিতত্ত্ব একটি প্রধানতত্ত্ব। কোন কোন মুসলমান কবি শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সহিত এই অনাহত নাদতত্ত্বকে মিলাইয়া লইয়াছেন, জালালউদ্দীনের গানে সেই তত্ত্বের আভাস পাই।—

আয় না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপধ্বনি
ঝঙ্কারে বাজিছে দিনরজনী।
কে বাজায় কোথায় বসে চলো যাই তার উদ্দেশে
মন কাহাইয়া সেই দেশে তারে চিন নি। ৪৪ সং

রহিমুদ্দিনও বলিয়াছেন—

ত্রিপুন্নিয়ার (=ত্রিবেণীর) ঘাটে বসি কালাচান্দে বাজায় বাঁশী গো
এগো বাঁশীর স্বরে প্রাণী হরে করিল মোরে উদাসিনী।...
দমে নামে মিলন করি বাঁশীর উপর ধ্যান করি গো
এগো দেখ চাইয়া তোর লা মোকামে (= দেহে) বিরাজ করে নীলমণি। ৮৩ সং

আমরা আলোচনার আরম্ভেই বলিয়াছি, বাংলাদেশের মুসলমান কবিগণ কর্তৃক রচিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা বিষয়ক এই পদগুলির সাহিত্যিক মূল্য হয়ত খুব বেশি নয়; কিন্তু বৈষ্ণব ভাবদৃষ্টি মুসলমান কবিগণের ভিতরে গিয়া কি রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহা সত্যই আমাদের লক্ষণীয়। বাংলার সামগ্রিক ধ্যান-মননের পরিচয়ে এই পদগুলির মূল্য অবশ্যস্বীকার্য।

সাতবাহন নরপতি হালের গাথা-সপ্তশতী। শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। মূল্য দশ টাকা।

খৃস্টীয় সালের প্রারম্ভ সময়ে অন্ধ্রদেশে সাতবাহনবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশীয়েরা ২৪০-৩০ খৃস্টপূর্বাব্দ থেকে ২২০-৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন ব'লে অনুমিত হয়েছে। এই বংশেরই সপ্তদশ নরপতি হাল সাতশ' প্রাকৃত কবিতা বাছাই ক'রে 'সত্তসঈ' বা 'সপ্তশতী' নামে একখানি কোশগ্রন্থ বা কাব্য-সংকলন গ্রথিত করেছিলেন ব'লে লোকপ্রসিদ্ধি আছে। সাতবাহনবংশীয় কোনও রাজার দ্বারা সংগৃহীত একখানি কাব্য-কোশের উল্লেখ বাণভট্টের হর্ষচরিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য নানারূপ প্রমাণ বা বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখাদি থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে 'সত্তসঈ' গ্রন্থের সংকলয়িতা হাল সাতবাহন বা শালিবাহন বংশে আবির্ভূত হয়ে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ধ্রদেশে রাজত্ব করেছিলেন, ইনি স্বয়ং কবি ছিলেন এবং 'কবি-বৎসল'এঁর উপাধি ছিল। ইনি কুন্তল-জনপদের প্রভু ছিলেন এবং এঁর রাজধানীর নাম ছিল প্রতিষ্ঠানপুর। হাল বলেছেন, সালঙ্কার কোটি গাথার থেকে তিনি মাত্র সাতশ' বেছে নিয়েছেন। এর থেকে অনুমান করা চলে যে আজ থেকে দু' হাজার বছর আগে দক্ষিণ-ভারতে (এবং সম্ভবত অন্যত্রও) বহুজনবোধ্য প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লেখার খুব প্রচলন হয়েছিল এবং তা সংস্কৃত কবিতার চেয়ে কম সমাদর পেত না। সপ্তশতীতে সংগৃহীত একটি কবিতায় একজন অজ্ঞাতনামা কবি বলেছেন,

অমিঅং পাউঅ-কব্বং পটিউং সোউং অ জে ণ আণন্তি।
কামস্‌স তত্ত-তন্তিং কুণন্তি তে কঁহ্ ণ লজ্জন্তি ॥১ ২

'যারা অমৃত-সদৃশ প্রকৃত কবিতা পড়তে বা শুনতে জানে না, প্রেমের তত্ত্ব চিন্তা করতে তারা লজ্জিত হয় না কেন ?'

বস্তুত, এখনকার মতো তখনও অধিকাংশ লোক নিজেদের মুখের ভাষায় লেখা কবিতার প্রতিই বেশি আকর্ষণ বোধ করত, এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। নতুবা একজন রাজা সংস্কৃতে কবিতা রচনা না ক'রে প্রাকৃত ভাষায় কবিতা লিখতে উৎসাহিত হতেন কি না সন্দেহ। এবং তিনি কোটি কোটি গাথা থেকেও তাঁর নির্বাচন সংকলিত করবার সুযোগ পেতেন না।

হালের সংকলিত গাথাগুলির থেকে অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত তাৎকালিক বহু রীতিনীতির যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সে-সময়কার অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের ভৌগোলিক সীমানারও একটা ইঙ্গিত মেলে। 'সপ্তশতী'র কবিতাগুলির মধ্যে উত্তরাপথের হিমালয় পর্বত বা গঙ্গা প্রভৃতি নদীর নাম একেবারেই পাওয়া যায় না ; কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত, গোদা বা গোদাবরী, নর্মদা বা রেবা এবং তাপ্তী নদীর নাম বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই 'সত্তসঈর' অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি আঞ্চলিক কবিদের লেখা বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর ভাষা মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, কবিতাগুলিতে বর্ণিত সমাজ-চিত্রও কৃষ্ণা-গোদাবরীর মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভূভাগের সমাজ থেকে আহরিত। কবিতাগুলিতে বর্ণিত পরিবেশ ও

পাত্রপাত্রীদের থেকে এরূপ অনুমান হওয়া স্বাভাবিক যে তখনও কাব্যের উপকরণ নাগরিক জীবনের বৈদগ্ধ্য-বিলাসে সীমায়িত হয় নি।

গাথা-সপ্তশতীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল কবিতারই নায়ক-নায়িকা গ্রামবাসী যুবক-যুবতী অথবা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। কবিতাগুলির মধ্যে যে-সমাজের ছবি পাওয়া যায়, তা কৃষিপ্রধান পল্লীসমাজ। চরিত্রগুলির অধিকাংশই পামর-পামরী (চাষী-পরিবার), হালিক ও গ্রামণী (মোড়ল)। পল্লীবাসী সাধারণ গৃহস্থেরও উল্লেখ আছে। দক্ষিণ-ভারতের গ্রাম, ক্ষেত, পথঘাট, দেবদেবী, আচার-ব্যবহার, গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবন, তাদের আত্মীয়-কুটুম্ব, ধর্মবুদ্ধি, চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে বহু বর্ণনা এবং উল্লেখ 'সপ্তশতী'তে থাকলেও সমুদ্র, নগর, নাগরিক জীবন, বর্ণাশ্রম অথবা ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি প্রভাবিত আচার-ব্যবহার ও নিষ্ঠা-নিয়মের বর্ণনা এখানে একেবারেই পাওয়া যায় না। মনে হয়, তখনও দক্ষিণ-ভারতে নাগরিক সভ্যতা তেমনভাবে গড়ে ওঠে নি, এবং রাজধানী নগরে অধিষ্ঠিত থাকলেও নাগরিক সভ্যতা এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর নিয়ম ও আচার জনসাধারণের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

হালের কাব্যসংকলন 'সত্তসঈ' যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিল, এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হালের গ্রন্থের অনুকরণেই গোবর্ধনাচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' সংকলিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এ ভিন্ন 'অমরু-শতক' ও পরবর্তী কালে রচিত 'বিহারী সত্তসঈ'তে হালের সংগৃহীত প্রাকৃত কাব্যের ঢংটি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী অনেক কাব্যও হালকে অনুসরণ করে রচিত বা গ্রথিত হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করে থাকেন।

'সত্তসঈ'র কবিতাগুলি আর্যা ছন্দে লিখিত। এ-ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে বারো মাত্রা, দ্বিতীয়ে অষ্টাদশ ও চতুর্থে পঞ্চদশ মাত্রা থাকে। দুটি মাত্র পংক্তিতে আর্যাগুলি সুসম্বদ্ধ। প্রাকৃতে এই আর্যাকে গাথা বলা হয়। গাথার স্বল্পপরিসরে তৎকালীন কবিরা কিরূপ সুন্দর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ও ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনার সাহায্যে কিরূপ রসসৃষ্টি করতে পেরেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর।

'সপ্তশতী'র প্রায় সমস্ত কবিতাই ঘোরতর আদি-রসাত্মক। যুবক-যুবতী থেকে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া সকলেরই প্রেমের কথা কবিতাগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। নানারূপ অভিসার-সংকেত, প্রেমাবেগ, মিলন ও বিরহ বর্ণনা, অপূর্ণ প্রণয়ের দুঃখ ও সম্ভোগের আনন্দ, অবৈধ প্রণয়ের ছলা-কলা, এই সবই কবিতাগুলির প্রধান বিষয়। সংস্কৃত কবিতা প্রায়শ নারীদেহ ও প্রেমসম্ভোগ বর্ণনায় নির্লজ্জরূপে প্রগল্‌ভ। 'সত্তসঈ'র গাথাগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

এক হিসেবে প্রাকৃত কবিতাকে সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে তুলনায় জনসাধারণের কাব্য বলে বর্ণনা করা যায়। সংস্কৃত কাব্য যখন নগরে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় বহু অলঙ্কার ও শিল্পচাতুর্যে বিভূষিত হয়ে উচ্চশিক্ষিত নাগরিক ও বিদগ্ধ অভিজাতবর্গের মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত ছিল, তখন পল্লী ও জনপদবাসী কবিরা প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃতজনের জন্য তাদেরই জীবন ও মনের কথা সহজ সুরে লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন। সংস্কৃতের দীর্ঘ সর্গবদ্ধ কাব্যের তুলনায় এই ছোট ছোট গীতিধর্মী প্রাকৃত কবিতাগুলি আধুনিক যুগে জনসাধারণের চিত্তকে যে বেশি আকর্ষণ করবে এটাও স্বাভাবিক। কাজেই বর্তমান সময়ে প্রাকৃত কবিতার চর্চা হলে এবং তা পঠন-পাঠনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলে এ-কবিতাগুলির সহজ সৌন্দর্য কাব্যরসিক পাঠক সমাজে খুবই সমাদর লাভ করবার সম্ভাবনা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণ ভারতীয় পাঠকের পক্ষে এ সুযোগ কমই আছে। যদিও প্রাচীনকালে প্রাকৃত কবিতার বহু সংকলন নানা সময়ে গ্রথিত হয়েছে, তবু এতদিন পর্যন্ত তার কোনোটিরই প্রাদেশিক ভাষায় কোনো অনুবাদ হয় নি। প্রাকৃত কবিতার প্রথম সংকলনগ্রন্থ 'গাথা-সপ্তশতী'র খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত হলেও এযাবৎকাল কৌতূহলী কাব্যপাঠকের পক্ষে এর রসাস্বাদন করবার কোনো উপায় ছিল না। সুবিখ্যাত জর্মাণ পণ্ডিত ৱেবর (Weber) 'সত্তসঈ'র একটি জর্মান সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেটি সাধারণ ভারতীয় পাঠকের অধিগম্য ছিল না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের 'নির্ণয় সাগর প্রেস' থেকে গঙ্গাধর ভট্টের টীকা সমন্বিত 'সত্তসঈ'র একটি ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটি সম্পাদনা করেছিলেন কেদারনাথ ও বাসুদেব শর্মা। এঁরা জয়পুর থেকে সংগৃহীত টীকা ও সংস্কৃত ছায়া সমন্বিত দু'টি পুঁথি, আলোয়ারের একটি পুঁথি ও কোটার একটি পুঁথি, এই চারটি পুঁথির থেকে তাঁদের গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এই পুঁথিগুলির কোনোটাই অতিশুদ্ধ ছিল না, এ-কথা সম্পাদকেরা স্বীকার করেছেন। তবু, যথাসাধ্য শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় ক'রে এবং গঙ্গাধর ভট্টের টীকা ও গাথাগুলির সংস্কৃত অনুবাদ ও মন্তব্যাদি সন্নিবেশিত ক'রে সম্পাদকেরা এই গ্রন্থটিকে সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণের অধিগম্য করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে ওই 'নির্ণয়-সাগর প্রেস' থেকেই জয়পুরের ভট্ট মথুরানাথ শাস্ত্রীর একটি দীর্ঘ সংস্কৃত ভূমিকা এবং তাঁর স্বরচিত 'ব্যঙ্গ্য-সর্বঙ্কষা' ব্যাখ্যা সংবলিত, 'গাথা সপ্তশতী'র আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় এ-সংস্করণটিরও ব্যাখ্যা ও ছায়া সংস্কৃতেই রচিত বলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন অন্যের পক্ষে এর মধ্য দিয়ে 'সত্তসঈ'র রসাস্বাদন করা সম্ভব ছিল না। 'ব্যঙ্গ্য-সর্বঙ্কষা' নামে একটি আধুনিক টীকা রচনায় মথুরানাথ শাস্ত্রী অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, তবু ইনিও গঙ্গাধর ভট্টকে অনুসরণ করেছিলেন বলেই মনে হয়।

মথুরানাথ শাস্ত্রীর নিজস্ব টীকা বাদ দিলে 'গাথা সপ্তশতী'র আরো আঠারোখানা টীকার সন্ধান পাওয়া যায়। কেদারনাথ ও বাসুদেব শর্মা তাঁদের চারখানি আদর্শ পুঁথির একটিতে কুলবালদেবের টীকা পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে টীকা তাঁরা প্রধানভাবে গ্রহণ করেন নি। এর পর লাহোরে হরিতাম্র-পীতাম্বরের 'গাথা-সপ্তশতী প্রকাশিকা' নামে একটি এযাবৎ অপ্রকাশিত টীকা আবিষ্কৃত হয়, এবং জগদীশলাল শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও একটি ইংরেজী ভূমিকা সংবলিত হয়ে ১৯৪২ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় পীতাম্বরের এই নবাবিষ্কৃত টীকার পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গিয়েছিল। চতুর্থ শতকের শেষ পনেরটি, পঞ্চম শতক সম্পূর্ণ, ষষ্ঠ শতকের ৫৫টি এবং সপ্তম শতকের ৯৮টি মাত্র গাথার টীকা এই পাণ্ডুলিপিটিতে ছিল। কাজেই এতাবৎ কাল প্রধানত গঙ্গাধরের টীকাই প্রচলিত আছে, এবং অন্যান্য টীকার মধ্যে কতকগুলি গোপীনাথ কবিরাজের মতে "really good and useful" হলেও আধুনিক ব্যাখ্যাতারা কেউই সে সব টীকা গ্রহণ করেন নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ৱেবরের জর্মান্ সংস্করণ বাদ দিলে আধুনিককালে প্রকাশিত 'গাথা-সপ্তশতী'র দুখানি সংস্করণই সংস্কৃতে রচিত। অতএব জর্মান্ বা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন না হলে এই উপাদেয় কোশ-গ্রন্থের রসাস্বাদন করা কোনো ভারতীয়ের পক্ষেই এতকাল সম্ভব ছিল না। এ-গ্রন্থের কোনো ইংরেজী সংস্করণও এতদিন প্রকাশিত হয় নি। একারণে সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের সংস্কৃত ছায়া এবং বাংলা টীকা ও গদ্যানুবাদ সমন্বিত গাথা-সপ্তশতীর সংস্করণটি বাঙালী

কাব্যোৎসাহীদের কাছে প্রাচীন সাহিত্যের একটি সরস ও অপরিচিত অংশের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে দিল। অধ্যাপক বসাক তাঁর সংস্করণটিতে পূর্ববর্তী সম্পাদকদের অনেক ভ্রান্তি সংশোধন করেছেন। এই ভুল প্রধানত কবিগণের নামকরণেই ছিল। এ ভিন্ন একটি তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ অবতরণিকায় অধ্যাপক বসাক হাল-সপ্তশতী-বর্ণিত দেশের অবস্থান; এর কাল; এতদন্তর্গত গাথাগুলির থেকে প্রাপ্ত নানা ভৌগোলিক, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যবহারিক তথ্য; সামাজিক ও অর্থশাস্ত্রবিষয়ক নানা রীতিনীতি; সপ্তশতীর সমকালীন বা তৎপূর্ববর্তী কালের দাক্ষিণাত্য ও মহারাষ্ট্রে প্রচলিত ধর্ম, দর্শন ও দেবদেবী পূজাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য এবং আরো অনেক কৌতূহলপ্রদ ও জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করে গ্রন্থটিকে ছাত্র, পণ্ডিত ও সাধারণ পাঠক সকলেরই শিক্ষণীয় ও মনোরঞ্জকরূপে গঠিত করেছেন।

অধ্যাপক বসাকের গ্রন্থের সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য কথা এই যে অতি-প্রাচীন প্রাকৃত কাব্যকোশ 'গাথা-সপ্তশতী'র এইটিই প্রথম প্রাদেশিক ভাষার সংস্করণ। কাব্যপ্রিয় বাঙালী পাঠকের কাছে এই অমূল্য গাথা কোশখানির রস অনুধাবনযোগ্য ক'রে দিয়ে অধ্যাপক বসাক বাঙালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

বইখানিতে বসাক মহাশয় প্রথমে বাংলা হরফে মূল প্রাকৃত গাথাটি, তৎপর ছন্দোবন্ধে সংস্কৃত অনুবাদ, অতঃপর গদ্যে বাংলা অনুবাদ এবং পরিশেষে টীকা সন্নিবেশিত করে সংস্কৃত বা প্রাকৃতে অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষেও দুর্বোধ্যতার কোনো অবকাশ রাখেন নি। সাধারণ পাঠকের পক্ষে সংস্কৃত ও বাংলা ছায়াই রসোপভোগের সহায়ক হতে পারে, টীকার প্রয়োজন তার কাছে সামান্যই। বিশেষ ক'রে সর্বক্ষেত্রেই যখন বক্তব্য, ভাব বা ইঙ্গিত সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয় না। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হাল তাঁর নির্বাচনে যে-আদর্শ বা নীতিই গ্রহণ ক'রে থাকুন না কেন, পরবর্তী পণ্ডিত ও টীকাকারেরা মনে করতেন যে এর প্রায় সবগুলি কবিতাই প্রণয়ের (প্রধানত অবৈধ) অস্পষ্ট বা অনতিস্পষ্ট ইঙ্গিত অথবা সঙ্কেতদ্যোতক। টীকাকারগণ তাই আপাত-সহজ কবিতাগুলিরও অন্তরালে গূঢ় ও সরস কোনো প্রণয়ব্যঞ্জনা আবিষ্কার ক'রে, তাই পরিবেশন করতে অগ্রসর হয়েছেন। যত সহজ কথার মধ্যে যত গূঢ় সংকেত তাঁরা আবিষ্কার করেছেন, ততই যেন তাঁরা অধিক কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যের প্রাচীন টীকাকারগণের আদিরসের দিকে এই আত্যন্তিক ঝোঁক আধুনিক বিচারে রুচিসংগত বা প্রীতিপ্রদ মনে হয় না, বরং বহু ক্ষেত্রে মূল কাব্যের সহজ সৌন্দর্যকে ক্ষুন্ন করে বলেই মনে হয়। যেমন, নিম্নলিখিত কবিতাটি একটি সুন্দর উপমার মধ্য দিয়ে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা বলেই পাঠকের পক্ষে গ্রহণ করা স্বাভাবিক।

বোদিস-রচিত কবিতাটি এই:

> উঅ ণিচ্চল-ণিপ্পন্দা ভিসিণী পত্তম্মি রেহই বলাআ।
> ণিম্মল-মরগঅ-ভাঅণ-পরিট্‌ঠিআ সংখ-সুত্তিব্ব ॥

যার পদ্যানুবাদ করা চলে—

> দেখো নিশ্চল বক বসে আছে পদ্মপত্র 'পরে।
> যেন মরকত থালায় শুভ্র শঙ্খ বিরাজ করে ॥১।৩

এই কবিতাটি ব্যাখ্যা করে টীকাকার বলেছেন: "সংকেতস্থান পদ্মপুলিনে নায়কের অনাগমন লক্ষ্য করিয়া

নায়িকার উক্তি।" সম্ভবত এ-জাতীয় টীকার উপর ভিত্তি ক'রেই মম্মটভট্ট তাঁর "কাব্যপ্রকাশে" ধ্বনি-পরম্পরার দৃষ্টান্ত হিসাবে এই কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর মতে নিশ্চল-নিস্পন্দরূপে বকের অবস্থান দ্বারা নির্জনতা, এবং তদ্দ্বারা স্থানটির অভিসারযোগ্যতা সূচিত হয়ে কবিতাটিতে অভিসার-সংকেত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক পাঠকের মনে হতে পারে যে, কবিতাটিকে স্বভাবোক্তি অলংকারের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হিসাবে নিতেই বা বাধা কি ?

এ-প্রসঙ্গে আরো একটি গাথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নীচের গাথাটি উদ্ধৃত করেছেন :

কইঅব-রহিঅং পেম্মং নহি হোই মানুষে লোএ।
জই হোই কস্স বিরহো হোন্তম্মি কো জিঅই ॥
ছলনা-চাতুরি বিরহিত প্রেম পৃথিবীতে নেই সে তো।
থাকলে বিরহ হত না নতুবা বিরহে জীবন যেত ॥২।২৪

—রাম ॥

এই গাথাটি সপ্তশতীর দ্বিতীয় শতকে সামান্য পরিবর্তিত আকারে (প্রথম পংক্তিতে 'মামি' সম্বোধন যুক্ত রূপে) পাওয়া যায়। এর ব্যাখ্যায় টীকাকার বলেছেন, "পতির প্রেম সম্ভবত কৃত্রিম এই আশঙ্কা করিয়া প্রোষিত-ভর্তৃকা রমণী স্বামীর আগমনে বিলম্ববশতঃ মাতুলানীর নিকট মনঃকষ্ট নিবেদন করিতেছে।" এখন, এই কবিতাটির উপভোগের জন্য ঐরূপ ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন আছে ? বরং প্রেম সম্বন্ধে একটি সাধারণ মর্মস্পর্শী উক্তিকে বিশেষ ঘটনা বা উপলক্ষে সীমায়িত ক'রে এর রসকে খণ্ডিত করা হয়েছে বলেই তো সাধারণ পাঠকের ধারণা হবে। চৈতন্য-চরিতামৃতকারও এই উক্তিটিকে সাধারণ ও ব্যাপক অর্থেই নিয়েছেন এবং বলেছেন—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বূনদ হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।

যাই হোক, পাঠক-সাধারণের বিচারের জন্য, এবং কিরূপ সুন্দর সুন্দর কবিতা এই গাথা-কোশটিতে ছড়িয়ে আছে তার উদাহরণস্বরূপ আরো কয়েকটি গাথা উদ্ধৃত করা গেল—

জেণ্ তিঅ-মত্তং তীরই নিব্বোঢং দেসু ত্তেত্তিঅং পণঅং।
ণ অণো বিণিঅত্ত-পসঅ-দুক্‌খ-সহণ-কখমো সব্বো ॥
নিঃশেষভাবে যতটুক প্রেম বহা যায় শুধু সেটুকু দিয়ো।
প্রেম-বিরতির বেদনা বহিতে সকল লোকেই পারে না প্রিয় ॥১।৭১

—মুগ্ধশীল ॥

উঅ পোম্মরাঅ-মরগঅ সংবলিআ ণহ-অলাওঁ ও-অরই।
ণহ-সিরি-কণ্ঠ-বভট্ঠব্ব কণ্ঠিআ কীর-রিচ্ছোলী ॥
আকাশের থেকে উড়ে নেমে এল এক ঝাঁক টিয়াপাখি।
নভোলক্ষ্মীর গলা থেকে খসা মরকতমালা নাকি ॥১।৭৫

—নাম অজ্ঞাত ॥

সো ণাম সংভরিজ্জই পব্ভসিও জো খণং পি হিঅআই।
সংভরিঅব্বং চ কঅং গ অং চ পেম্মং নিরালম্বং ॥
হৃদয় থেকে যে কখনো হারায় কথা ওঠে তারে মনে রাখার।
প্রেম হয় যবে স্মরণযোগ্য অবলম্বন হারায় তার ॥১।৯৫

—বাপ (বপ্প ?) ইরাঅ ॥

হসি এহিঁ উবালম্ভা অচ্চুপচারেহিঁ খিজ্জিঅব্বাইং।
অংসূহিঁ মণ্ডণাইং এসো মগ্গো সুমহিলাণং ॥
হাসি দিয়ে ভর্ৎসনা, ব্যথা পেয়ে দেখানো অধিক প্রীতি।
অশ্রুভূষণ রচনা, মানিনী কুল-ললনার রীতি ॥৬।১৩

—নাম অজ্ঞাত ॥

হসিঅং অদিট্ঠ-দন্তং ভমিঅমণিক্কন্ত-দেহলী-দেসং।
দিট্ঠমণুক্খিত্ত-মূহং এসো মগ্গো কুল-বহূণং ॥
হাসিতে দন্ত হবে না প্রকাশ, ভ্রমণে দেহলী হবে না পার।
দর্শন-কালে মুখ নীচু রবে, কুলবধূদের এই আচার ॥৬।২৫

—নাম অজ্ঞাত ॥

বাআই কিং ভণিজ্জউ কেত্তিঅং-মেত্তং ব লিক্খএ লেহে।
তুহ বিরহে জং দুক্খং তস্স তুমং চেঅ গহিঅখো ॥
কথা ব'লে আর চিঠি লিখে লিখে কেমনে বোঝাব কী যে।
তুমি ছাড়া কত দুঃখ আমার যদি তা না বোঝো নিজে ॥৬।৭১

—নাম অজ্ঞাত ॥

জেণ বিণা ণ জিবিজ্জই অণুণিজ্জই সো কআবরাহোবি।
পত্তে বি ণঅরদাহে ভণ কস্সো ণ বল্লহো অগ্গী ॥
যারে বিনা এই জীবন বিফল সব দোষ ক্ষমি তার।
আগুনেরে বলো কে না ভালোবাসে, হোক গ্রাম ছারখার ॥২।৬৩

—রোহা ॥

এহিসিং তুমং ত্তি ণিমিসং ব জগ্গিঅং জামিনীঅ পঢমদ্ধং।
সেসং সংতাব-পরকসাই বরিসং ব বোলীণং ॥
অর্ধরাত্রি জেগে কেটে গেল নিমেষে প্রিয়ের প্রতীক্ষায়।
এলো না সে তাই বাকি অর্ধেক জাগরণে কাটে বর্ষপ্রায় ॥৪।৮৫

—অল্ল ॥

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে আশা করি একথা স্পষ্ট হবে যে 'গাথা-সপ্তশতী'র সমস্ত কবিতাই অতিমাত্রায় প্রেম-প্রগল্‌ভ নয়। তবে, টীকাকারগণ সম্ভবত তৎকালীন রীতি অনুযায়ী প্রায় প্রত্যেকটি গাথার মধ্যেই প্রেম-ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করায়, এবং দেহজ প্রেম-সম্ভোগের কথাই বেশি ক'রে পরিস্ফুট করতে সচেষ্ট হওয়ার ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে কবিতাগুলি অতিমাত্রায় erotic ব'লে ধারণা জন্মাতে পারে। অধ্যাপক বসাক তাঁর অনুবাদ ও ছায়া-রচনায় গঙ্গাধর ভট্টকেই অনুসরণ করেছেন, তাঁর ব্যাখ্যা বা টীকার যুক্তিযুক্ততায় অল্প ক্ষেত্রেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো স্থলে তিনি কুলবালদেবের টীকা ও পীতাম্বরের টীকা উল্লেখ করেছেন সত্য, কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা করেন নি। অধ্যাপক বসাকের গভীর পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। তিনি যদি সেই পাণ্ডিত্যের প্রয়োগে এ-টীকা ও ব্যাখ্যাগুলিকে বিচার করতেন, অথবা অন্যান্য টীকার সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ করে নিতে পারতেন, তবে আমাদের মতো বহু অপণ্ডিত রস-সন্ধানী পাঠক আরো অধিক পরিমাণে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হত। এ-প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা চলে যে, মূল গাথাগুলি রচিত হওয়ার অনেক কাল পরে আবির্ভূত হয়ে টীকাকারগণ সর্বক্ষেত্রেই যে রচয়িতার উদ্দিষ্ট অর্থ হৃদয়ংগম করতে পেরেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তা ছাড়া, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এই পরবর্তী টীকাকারেরা প্রাচীন মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকের মতো দক্ষ ছিলেন কি না কোনো কোনো স্থলে এ সন্দেহেরও অবকাশ থাকে। কাজেই অধ্যাপক বসাক গাথা-সপ্তশতীর ভাষার দিকটা নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করলে এই সংস্করণটি আরো মূল্যবান্‌ হত বলে মনে করি।

'গাথা-সপ্তশতী'র সংকলয়িতা বা রচয়িতা হালের সম্বন্ধেও আরো বিস্তৃততর আলোচনার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয়। সপ্তম শতকের শেষ গাথাতে 'হালেন বিরইআইং' (হালের দ্বারা রচিত) এই কথাগুলি পাওয়া যায়। জর্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌ লুডার্স্‌ ও জ্যাকোবি (Luders and Jacobi) দেখিয়েছেন যে এই সাত শ গাথার মধ্যে মাত্র চার শ ত্রিশটি গাথা সকলগুলি সংশোধিত সংস্করণে পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক recension-এ ৭০০ ক'রে গাথা থাকলেও এর মধ্যে ৪৩০টি হচ্ছে সাধারণ, অর্থাৎ সকল পাণ্ডুলিপিতেই আছে। এর থেকে 'গাথা-সপ্তশতী'র বর্তমান আকারের মধ্যে বহু প্রক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে অনুমান করা চলে। কীথ্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করেছেন যে, খুব সম্ভব প্রথমে যা কবি হালের রচনারই একটি সংকলনমাত্র ছিল পরে তাতে অন্যান্য কবির কবিতা সংযোজিত হয়ে বহু কবির রচিত সপ্তশত গাথার একটি কোশগ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, প্রথমত, বইয়ের শেষ কবিতাটিতে হাল এ-গ্রন্থটি তাঁরই রচিত বলে উল্লেখ করেছেন; দ্বিতীয়ত, সাত শ গাথার মধ্যে ৩৯৮টি মাত্র গাথার রচয়িতার নাম পাওয়া গেছে, যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক (চুয়াল্লিশটি) গাথাই হালের রচনা; এবং ৭০০-র মধ্যে ৪৩০টি গাথাই মাত্র সাধারণভাবে সকল পাণ্ডুলিপিতে (recension-এ) পাওয়া গেছে, অতএব অন্যগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সংযোজিত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া চলে। লুডার্স ও জ্যাকোবি-র কথা সম্পূর্ণ মেনে না নিলেও এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মূল গ্রন্থ রচিত বা সংকলিত হবার অনেকদিন পরেও এই কোশে বহু পরবর্তী গাথা সংযোজিত হয়েছিল।

এ-ছাড়া গাথা 'সপ্তশতী'র ভাষা এবং যে আকারে এখন গ্রন্থটি পাওয়া যায় তার কাল সম্বন্ধেও বিস্তৃততর

আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল। 'সপ্তশতী'তে যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ব্যবহার হয়েছে, তাকে ভাষাতত্ত্ববিদেরা অতি প্রাচীন বলে মনে করেন না। সমসাময়িক কালে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত শিলালিপিগুলির ভাষায় সঙ্গে তুলনা করলে সপ্তশতীর প্রাকৃত অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে মনে হয়। অধ্যাপক বসাক এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "প্রাচীন মহারাষ্ট্রদেশের নানাঘাট ও নাসিকাদির গুহামন্দিরসমূহে প্রাপ্ত খোদিত শিলালিপির প্রাকৃত ভাষা ও হালসঙ্কলিত সপ্তশতীর মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার মধ্যে যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়, তাহার কারণ সম্বন্ধে আমাদের এই মত যে, একই সময়ে জনসাধারণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে শিলালিপিসমূহের প্রাকৃত গদ্য-রচনাতে প্রাচীন রীতির (অর্থাৎ প্রায় পালিভাষা সদৃশ) ভাষাই ব্যবহৃত হইত, এবং পণ্ডিত সমাজে ব্যবহর্তব্য গীতি ও অন্যান্য গদ্যময় রসকাব্যের রচনাতে ব্যাকরণসংগত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত। এই জন্যই হাল-নরপালের সমসাময়িক এবং তাঁহার কিছু পূর্ববর্তী ও কিছু পরবর্তী শতাব্দীসমূহের শিলালিপির প্রাকৃত ভাষা সপ্তশতীর প্রাকৃত ভাষা হইতে এতটা বিভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হয়।" কিন্তু অধ্যাপক বসাকের এ-যুক্তি পণ্ডিতেরা সম্পূর্ণ মেনে নেবেন কি না সন্দেহ। কেননা, 'সপ্তশতী'তে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের যে রূপটি পাওয়া যায় তা পরবর্তীকালের শিলালিপির ভাষার চেয়ে অর্বাচীন বলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। সকল দিক বিচার করে লুডার্স ও জ্যাকোবি মনে করেন যে ২০০ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'সপ্তশতী' তার বর্তমান আকার লাভ করেছিল।

এ-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রতি শতকের শেষ গাথাটিতে 'সিরি-হাল' (শ্রীহাল), 'কই বচ্ছল' (কবি-বৎসল), প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়, কিন্তু নরপতি হাল ব'লে কবি কোথাও ভণিতা দেন নি। 'কবি-বৎসল' প্রমুখ সুকবিদের দ্বারা এই গাথাকোশ নির্মিত হয়েছিল, গ্রন্থ থেকে এ কথাই মাত্র জানা যায়। 'সপ্তশতী'র একটি দ্ব্যর্থবোধক গাথাতে (৫।৬৭) আপন্ন কুলের উন্নতিবিধায়ক এক সাতবাহন বা শালিবাহন -বংশীয় রাজার (সালাহণ-ণরিন্দো) প্রশস্তি আছে বটে, কিন্তু তাঁর নাম যে হাল ছিল, কিংবা তিনিই যে গাথাকোশের সংকলয়িতা এমন উল্লেখ নেই। সাতবাহন বংশের এক রাজার নাম হাল ছিল এ কথা সত্য হলেও, তিনি এবং গাথা-রচয়িতা কবি-বৎসল হাল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কি না, তা পণ্ডিতদের বিচার্য। তবে হাল নরপতির আবির্ভাবকাল ও গাথা-সপ্তশতীর ভাষা বিচার করে হাল-নরপতির মূল গ্রন্থ পরবর্তীকালে বহু সংযোগ ও প্রক্ষেপাদির দ্বারা পুষ্ট হয়ে বর্তমান আকার লাভ করেছিল বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

যাই হোক, অধ্যাপক বসাক তাঁর গ্রন্থের অবতরণিকায় যে প্রচুর তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন, তার দ্বারাই বর্তমানে এ-জাতীয় বহু প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ ঘটেছে। এই অতি প্রাচীন প্রাকৃত কাব্য-সংকলনের প্রথম প্রাদেশিক সংস্করণের সম্পাদক হিসাবে অধ্যাপক বসাক যে অত্যুচ্চ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা ভাজন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহু পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের দ্বারা যে রত্নভাণ্ডার তিনি আমাদের কাছে উন্মুক্ত করেছেন, পরবর্তী সংস্করণে আরো তথ্যপ্রমাণ ও আলোচনাদি যোগ করে তাকে সম্পূর্ণতর আকারে তিনি উপস্থিত করবেন বলে আশা করি।

প্রকাশকের প্রতি নিবেদন এই যে, বইটির ছাপা ও কাগজ আশানুরূপ উৎকৃষ্ট হয় নি, এবং ছাপা নির্ভুলও নয়। এ-জাতীয় গ্রন্থে ছাপার ভুল থাকা অবাঞ্ছনীয়। এ-ভিন্ন, প্রতি পৃষ্ঠায় গাথা-শতকের

উল্লেখ না থাকাতে প্রয়োজনীয় গাথা খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে এ-সকল ত্রুটি সংশোধিত হলে বইটির মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

অজিত দত্ত

পিছু ডাকে। জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শাস্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা ৯। মূল্য তিন টাকা।

'পিছু ডাকে' বইখানার কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে অনেক কাল পরে দেখা হইলে যেমন মাঝখানকার সময়টা হঠাৎ লোপ পায় তেমনি ঘটিল। বইখানা আরো মন দিয়া পড়িবার জন্য যখন তৈয়ারি হইয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম যে কখন পুঁথির উপান্তে আসিয়া উপস্থিত। শেষ পাতা ক-খানার ছত্রগুলি শম্বুকগতিতে পড়িয়া চলিলাম, পাছে শেষ হইয়া যায়। এত মন্থরতা সত্ত্বেও অবশেষে শেষ হইয়া গেল। একটি আয়ুশেষের দীর্ঘশ্বাস পড়িল— ইতিমধ্যেই শেষ! তখনই আবার সান্ত্বনা পাইলাম— আবার পড়িলেই চলিবে। পিছু ডাকে বার বার পড়িবার মতো বই। এমন কথা কখানা বই সম্বন্ধে বলা চলে ?

বই তো শেষ হইল, কিন্তু এখানা কোন্ শ্রেণীর বই ? উপন্যাস গল্প নিশ্চয় নয়, কাহিনীর ধারাবাহিকতা নাই ; প্রবন্ধ বা ইতিহাস নয় ; ভঙ্গীসর্বস্ব ক্ষীণবক্তব্য রম্যরচনা নয়। তবে কি ? বইখানাকে কোনো শ্রেণীতে যদি ফেলিতেই হয় তবে ইহাকে এক শ্রেণীর পুরাণ বলা চলে : পল্লীবঙ্গের পুরাণ। সংস্কৃত পুরাণগুলিতে কি নাই ? গল্প কিম্বদন্তী ইতিহাস ভূগোল গভীর জ্ঞানের কথা ও নিতান্ত ছেলেমানুষি বিষয় সবই আছে— অথচ কোনোটাই আলাদা হইয়া নাই, সবস্থদ্ধ মিলিয়া একটি বিশিষ্টরূপের আধারে আছে। পিছু ডাকে বইখানাতে পুরাণের এই গুণ বা ধর্ম থাকাতে তাহাকে পুরাণ বলিলাম।

দেশবিভাগের পরে ছেড়ে-আসা গ্রামগুলিকে অবলম্বন করিয়া অল্পদিনের মধ্যে একটি বৃহৎ পিছু-ডাকা সাহিত্যশাখা গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলিও পুরাণশ্রেণীর রচনা। তন্মধ্যে ভালো মন্দ মাঝারি সব রকম গ্রন্থই আছে। বর্তমান গ্রন্থও তাহাদের অন্যতম। তবে প্রভেদ এই যে, পিছু ডাকের প্রেরণার মূলে দেশবিভাগজনিত ইতিহাসের বেদনা নয়। যে-বালক ঘটনাচক্রে শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে তাহারই স্মৃতিবেদনায় বইখানার সৃষ্টি-প্রেরণা। তাই এ বইটিতে রাজনৈতিক চাপা তর্জন একেবারেই নাই। সেদিনের বালক-কিশোর যাহা দেখিয়াছে আজকার দিনে পঞ্চাশোত্তীর্ণ প্রৌঢ় তাহা বলিতে বসিয়াছে। যে ছিল দর্শক সে হইয়াছে কথক। সে নায়ক নয়। নায়ক নীলানদী-তীরবর্তী ধানসোনা গ্রাম।

পিছু ডাকের প্রকৃত নায়ক নীলানদীর তীরবর্তী ধানসোনা গ্রাম, কিম্বা আরও বিস্তারিতভাবে বলিলে ধানসোনার সর্বজন— বইখানির নায়ক। নায়ক ধানসোনার সর্বজন। দ্রষ্টা ও বক্তা আনন্দ মণ্ডলের শিষ্য একটি বালক-কিশোর। তাহার দর্শনের ও অনুভূতির সূত্রে সর্বজনের জীবনকাহিনী তোড়াবদ্ধ হইয়া একটি অখণ্ড শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই বইখানার কাঠামো ও নকশা। কাজেই ইহাকে পুরাণ পর্যায়ে ফেলিতে হয়— গতানুগতিক অর্থে গল্প বা উপন্যাস বলা চলে না।

কিন্তু তাই বলিয়া বইখানার আকর্ষণ কম নয়— দুরন্ত পাহাড়ি নদীর স্রোতের তোড়ে পাঠককে দ্রুত পরিণামের মুখে লইয়া যায়। একটির পরে একটি অধ্যায়ে চিত্রের পরে চিত্র, কাহিনীর পরে কাহিনী আসে, সর্বজনের জীবনযাত্রার সুখদুঃখস্রোতের উপরে ফেনার মতো ভাসিয়া ওঠে, হাসি-অশ্রুর ঔজ্জ্বল্যে ক্ষণকালের জন্য চোখ ধাঁধাইয়া দিয়া পরবর্তী ফেনস্তবকের জন্য আসর ছাড়িয়া দেয়।

দিদিবুড়ি, কেষ্টসর্দার কর্তৃক 'সুদির দুধে' মৃত দিদিবুড়ির পা ধোয়াইয়া দেওয়া; দিদিবুড়ির তান্ত্রিক পুত্র ভীমচন্দ্র ও তস্য প্রকৃতি হিমি, গেনু চক্রবর্তী, ফতুর জমিদারের জমিদারি অভিনয়, শিবচরণ ভট্টাচার্য ও তাহার কন্যা বাসু, বাসুর কবলভুক্ত গোপাল ও শম্ভু, দেবনাথ সর্দার ও সাঁওতালগণ, শ্যামচাঁদ বৈরাগী ও তাহার দুই পত্নী, রাধা ও রাধাকান্ত; মধু চৌধুরীর বেশ্যাবাহিনী ও অপূর্ব রণকৌশল, তারানাথ কবিরাজের পারদ বন্ধন— আর সর্বশেষে বালক কিশোরের informal গুরু আনন্দ মণ্ডল। কোনো একখানি পুস্তকে এতগুলি সজীব চিত্তাকর্ষক নরনারীর সমাবেশ নিতান্ত বিরল। কোনো বিশেষ অধ্যায়কে চিহ্নিত করিতে হইলে বালক-কিশোরের উলুখড়ের মরীচিকা-দর্শন, সাঁওতালপল্লীর উৎসব ও হাবার মানসকুসুমদর্শন অধ্যায়গুলির উল্লেখ করিতে হয়। অধ্যায়গুলি কল্পনা ও কবিত্বের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। লেখকের কলমের জাদুতে ধানসোনা গ্রামের মুখে পল্লী-বাংলার হাজার হাজার গ্রাম কথা বলিয়া উঠিয়াছে— সে কথা দুঃখের, সে কথা সুখের, সে কথা বাঙালীর অন্তরের, সে কথা বাংলার একান্ত নিজস্ব। এমন যিনি লিখিতে পারেন তিনি আগে আর লেখেন নাই, এবং পরেও আর লিখিবেন না, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বিজ্ঞানের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড: প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে রোমক সভ্যতা পর্যন্ত। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান এম সি সরকার অ্যাণ্ড সনস্, কলিকাতা ১২। মূল্য সাড়ে দশ টাকা।

উদ্‌যোগী ও তরুণ লেখক শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৪৭-৪৯ সালে ইউনেস্কোর দপ্তরে যখন 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব ও সম্পর্ক' সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে ও প্রচারকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এইরূপ একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনা করেন। চৈনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিশ্বকোষ রচয়িতা ডক্টর নীডহ্যাম এবং বাংলার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই এই সুকঠিন সাধু প্রয়াসে লেখককে উৎসাহ ও সুযোগ দিয়াছেন। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গীয় সরকার প্রকাশনে অর্থসাহায্য করার ফলে বইখানি শতাধিক রেখাচিত্র ও হাফটোন ব্লকে সমৃদ্ধ হইলেও দুর্মূল্য হয় নাই।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞার্থ সম্বন্ধে নানারূপ মত দেখা যায়। লেখকের মতে অধ্যাপক ক্রাউথারের সংজ্ঞাটি বিশেষ সন্তোষজনক; বিজ্ঞান এমন-এক ধরনের তৎপরতা যাহার সাহায্যে মানুষ প্রতিবেশের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে। এইরূপ ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞানচর্চা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইয়াছে বলা যায়। বস্তুতঃ, প্রাগৈতিহাসিক অতীতে আদিম মানবের কর্মতৎপরতা ক্রমশঃ কি ভাবে দেশ

ও কাল -পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞানের রূপ ধারণ করিল, তাহারই সম্যক্ আলোচনা সমগ্র গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে খ্রীস্টীয় শতাব্দীর আরম্ভকালীন রোমক সভ্যতার যুগ পর্যন্ত প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

আদিযুগ বা প্রস্তরযুগ প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়, পুরা প্রস্তরযুগ ও নব্য প্রস্তরযুগ। পুরা প্রস্তর-যুগে লক্ষাধিক বর্ষব্যাপী অনির্দেশ্য কাল মানুষ কেবল শিকারের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিত, এবং তদুদ্দেশ্যে পাথরের টুকরা হইতে নিকৃষ্ট ধরনের অস্ত্রাদি বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত করিত। দশ হইতে বারো হাজার বৎসর পূর্বে নব্য প্রস্তরযুগের আরম্ভে এইসকল অস্ত্রের নির্মাণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রথম দেখা যায়, এবং ক্রমশঃ মানুষ কৃষি পশুপালন মৃৎশিল্প ও বয়নবিদ্যা আয়ত্ত করে। এইভাবে খাদ্যসমস্যার আশু সমাধান হওয়ায় তখন মানুষ অন্য দিকে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়।

প্রথমে ধাতুর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণ তাম্র কাঁসা ও পিতল ব্যবহৃত হয় পাঁচ হইতে সাত হাজার বৎসর পূর্বে। স্বর্ণ আদি হইতেই স্ত্রীদেহে অলংকারের স্থান অধিকার করিয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। কাচের আবিষ্কারও সুপ্রাচীন। লৌহযুগের আরম্ভ আনুমানিক তিন হাজার বৎসরের মধ্যে। চাকার প্রচলন, শ্রমসহায়তায় পশুশক্তির ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রিত নদীপ্রবাহের দ্বারা সেচব্যবস্থা এই যুগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

নব্য প্রস্তরযুগের শেষে আনুমানিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে নীলনদ তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস এবং সিন্ধুনদের উপত্যকায় যে তিনটি বৃহৎ তৎপরতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাই বস্তুতঃ আধুনিক সভ্যতার আদিরূপ। তখন আর মানবপ্রচেষ্টা দুই-পাঁচ কাঠা জমিসম্বলিত গোষ্ঠিতৎপরতার মধ্যে নিবদ্ধ নয়, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও পরস্পর গ্রথিত হইয়া কর্ম করিতেছে। এই সভ্যতার প্রধান ভারতীয় নিদর্শনগুলি মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত হইলেও বস্তুতঃ ঐ সভ্যতা উত্তরপশ্চিম ভারত ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় বহুদূর বিস্তৃত ছিল।

পুরাযুগে লিপিলিখন একপ্রকার চিত্রাঙ্কন ছিল মাত্র। সিন্ধুতট-সভ্যতার লিপিকেও আংশিক চিত্র-লিপি বলিতে হয়। দুই-তিন হাজার বৎসর পূর্বে পশ্চিম-এশিয়ার কোনো অঞ্চলে প্রথম বর্ণমালার লিপি উদ্ভাবিত হয়। পূর্ণবিকাশ ঘটিতে প্রায় সহস্রবর্ষ লাগে। ভারতীয় আর্যসভ্যতার আদিলিপি ব্রাহ্মী-বর্ণমালা। স্বকীয়তা ও উচ্চারণসৌকর্যে এরূপ সুন্দর বর্ণমালা জগতে বিরল।

বৈজ্ঞানিক তৎপরতার শুরু হইতেই মানবজাতির মধ্যে একটি সর্বজনীনতা লক্ষিত হয়। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান বহুলাংশে ইউরোপীয় সফলপ্রয়াস, তথাপি এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত চার হাজার বর্ষাধিক কাল বিজ্ঞানচর্চা ইউরোপে ও এশিয়ায় প্রায় সমভাবে চলিয়াছে, কখনও মিশর রোম বা গ্রীসে, কখনও আরব পারস্য বা ভারতে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে এই ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়, তখন প্রাচ্য মহাদেশ বর্তমান হারাইয়া অতীতকে সম্বল করে এবং ইউরোপ দ্রুতবেগে উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হয়।

গণিতের প্রবর্তন হয় কৃষিনির্ভর মানুষের কাল ও ঋতু নির্ণয়ের প্রয়োজনবোধ হইতে। গণনার মধ্যে শূন্যের প্রবর্তন হিন্দুদিগের আবিষ্কার। গ্রীক প্রতিভার স্পর্শে জ্যামিতি অপূর্ব উন্নত হয়। মিশরীয়েরা গ্রীকদের প্রধান শিক্ষক, সম্ভবত তাহারাই গণিতের জন্মদাতা। হিন্দুদের গণনাপদ্ধতি মিশরীয়দের ন্যায়

দশমিক এবং সবিশেষ উন্নত ছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ বেদী নির্মাণের পরিকল্পনার জন্য বীজগণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ ও উৎকর্ষ ঘটে।

জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার আদি ইতিহাসেও ব্যাবিলন মিশর ও ভারতবর্ষের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদিক চিকিৎসাপদ্ধতি একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শল্যবিদ্যায় ভারতীয় চিকিৎসকগণ অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। চৈনিক চিকিৎসকদের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। অবশ্য পরবর্তী গ্রীকবিজ্ঞানের উন্মেষ ও উন্নতি এইসকল প্রাচীন অবদানকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয়।

বর্তমান বাঙালী জাতির ন্যায় প্রাচীন গ্রীক জাতি এক মিশ্র জাতি ছিল। তাহাদের নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেবদেবীর স্তুতির পরিবর্তে মানবের ও মানবতার জয়গানে তাহাদের পক্ষপাত। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই গ্রীকদের বিজ্ঞানসন্ধিৎসা জন্মলাভ করিয়া থাকিবে। তথ্যের পাহাড় সৃষ্টি না করিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে অনুধাবন করার চেষ্টা এই জ্ঞানোন্মেষের বৈশিষ্ট্য ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বর্ষকাল এই গ্রীকজাতি অপূর্ব উদ্দীপনার সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে— গণিত ও পূর্তবিদ্যায় থ্যালেস, ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যায় অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার, জ্যামিতিতে পিথাগোরাস, অণুতত্ত্বে লিউসিপ্পাস ও ডিমোক্রিটাস, চিকিৎসাবিজ্ঞানে হিপোক্রেটিস ইত্যাদি। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ আজিও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও চিন্তানায়কদের মধ্যে গণ্য।

আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর গ্রীকসাম্রাজ্যে গৃহবিবাদ দেখা দেয়, ফলে বিজ্ঞানভারতী ক্রমশঃ পুণ্য গ্রীকভূমি ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্রতিষ্ঠিতা হন। এই গ্রীক-প্রতিষ্ঠিত নূতন পরিবেশে, বিশেষতঃ টলেমী-রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক বিজ্ঞান পুনর্জীবন লাভ করে, এবং ইউক্লিড আর্কিমিডিস হিপার্কাস ইরাটোস্থেনিস ক্লডিয়াস প্রভৃতি মনীষিগণ বিজ্ঞানের নব সৌধ গড়িয়া তোলেন। আলেকজান্দ্রীয় গ্রীকরাই সম্ভবতঃ প্রথম স্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে, একই ব্যক্তির সর্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত হইতে চেষ্টা করার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞের পৃথক্‌ প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের অধিকতর অগ্রগতি সম্ভবপর।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রতি আদি গ্রীকদের একপ্রকার আত্মম্ভরি বিমুখতা ছিল। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের যুগে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে, তথাপি ফলিতবিজ্ঞানকে তাহারা উচ্চ স্থান দেয় নাই। এই বিষয়ে পরবর্তী রোমক সভ্যতা ইহার বিপরীত। বিজ্ঞানের যে বিভাগেরই কিছু ব্যবহারিক সার্থকতা আছে, সেই দিকেই রোমকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলে দেখা যায় গণিতে ও জ্যোতিষে উদাসীন হইলেও তাহারা যন্ত্রবিদ্যা স্থাপত্য ও পূর্তবিদ্যায় তৎপর, এবং জীববিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৃতী না হইলেও জনস্বাস্থ্য হাসপাতাল ইত্যাদির পরিকল্পনায় প্রাচীন জাতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সহস্রবর্ষব্যাপী গ্রীক, আলেকজান্দ্রীয় ও রোমক বিজ্ঞানের ধারাবাহিক প্রগতি অপেক্ষাকৃত সবিস্তারে আলোচনা করিয়া লেখক প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। এই বর্ষসহস্র বিজ্ঞানের অপাবরণের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভবিষ্যৎ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নব্যবিজ্ঞানের অভ্যুদয় ইহারই দূরেক্ষিত অনুবর্তন। মধ্যে সহস্রবর্ষব্যাপী ইউরোপের অন্ধকারময় যুগের ব্যবধান। এই যুগ অশেষ রাজনৈতিক অশান্তি, অচল সামাজিক রীতি ও ব্যবস্থা, অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও ক্রীতদাস-প্রথার কলঙ্কে মসীলিপ্ত।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের বিবর্তন লক্ষ্য করিলে একটি নিগূঢ় সত্য হৃদয়সংগম হয়, বিজ্ঞান্ সর্বমানবিক সম্পদ্, সকল মানুষের কল্যাণে বাধাহীন পরিপূর্ণ নিয়োগে তাহার প্রধান উৎকর্ষ। যখনই এই অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞান বঞ্চিত হইয়াছে, তখনই তাহার অগ্রগতি মন্দ হইয়াছে, কখনও বা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আশা করা যায় আণবিক বোমার সভ্যতার যুগেও ইহা সত্য। সত্যের বিনাশ নাই।

জগন্নাথ গুপ্ত

বিশ্বভারতী পত্রিকা ত্রয়োদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৪

গান[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কী ধ্বনি বাজে
গহনচেতনা-মাঝে !

কী আনন্দে উচ্ছ্বসিল
মম তনুবীণা
গহনচেতনা-মাঝে !

মনপ্রাণহরা
সুধা-ঝরা
পরশে ভাবনা উদাসীনা ॥

১ নিম্নমুদ্রিত হিন্দি বৈঠকী গানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ আনুমানিক ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে বাংলা গানটি রচনা করিয়া শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্যেই গানের কথা ও সুর পাওয়া গিয়াছে। হিন্দি গানও তাঁহার কাছে পাওয়া; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই গানটির স্বরলিপি বর্তমান সংখ্যাতেই অন্যত্র মুদ্রিত হইল।—

পূরবী। আড়াঠেকা

এ ধনি ধনি চরণ পরসত
এ আনন্দ সুখ ভয়ো মেরে তন মন।
সুলতান জরা জরি জরা
বকত নিজামুদ্দিনলিয়া ॥

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

ছেলেবেলা থেকেই আমরা গানবাজনার আবহাওয়াতে মানুষ— দেশী বিলিতী দু রকমেরই। ঠাকুর-বংশে দেখতে পাই পুরুষানুক্রমে এই দুই ধারাই অল্পবিস্তর চলে আসছে। যাঁরা বাংলা দেশের সেকালের সংগীত-ইতিহাসের খোঁজ রাখেন, তাঁদের এই সূত্রে স্বভাবতই পাথুরেঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম মনে পড়বে। তাঁর ছেলে প্রমোদকুমার ঠাকুরের রচিত কতকগুলি বিলিতী স্বরলিপিতে লিখিত ও বিলিতী স্বরসন্ধিযুক্ত (harmony) দেশী রাগরাগিণীর ছোট গৎ আমার কাছে এখনও আছে। শৌরীন্দ্রমোহন বা ছোটরাজার গুরুদাস নামে এক নাতিও সেকালের কলকাতার রঙ্গমঞ্চে কোনো বৈদিক স্তোত্রের স্বরসন্ধি করে গান গাওয়াবার পরীক্ষা করেছিলেন।

আমার বিলিতী সংগীতপ্রীতি অবশ্য লরেটো কন্‌ভেণ্টের শিক্ষাজনিত। সেখানে সেণ্ট্‌ পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রালের অর্গানিস্ট্‌ মিঃ স্লেটারের কাছে পিয়ানো, এবং মান্‌জাটো নামক একটি ইতালীয় বেহালা-শিক্ষকের কাছে বেহালা শেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখনকার কালে কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ অব্‌ মিউজিক থেকে গানের ঔপপত্তিক প্রশ্ন এদেশে পাঠানো হত। তার ইণ্টারমিডিয়েট পর্ব পর্যন্ত আমি পাস করেছিলুম।

রবীন্দ্রস্মৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বিলিতী সংগীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যতটা আশ্চর্য মনে হতে পারে বস্তুত তা নয়। কারণ তাঁর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সজ্ঞানে আমাদের ভাইবোনের প্রথম পরিচয় হয় বিলাতপ্রবাসে। সেখানে আমরা মায়ের সঙ্গে অনুমান ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে গিয়ে পৌঁছই, পরে বাবা ও রবিকাকা ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আসেন। সেই সময় থেকেই বিলিতী সংগীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা, জোরালো তারসপ্তকের চড়া গলা যাকে ওদেশে বলে "টেনর্‌"— শুনে ওরা মুগ্ধ হত। সে বয়সে অবশ্য এর সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে,

"Won't you tell me, Molly darling."
"Darling, you are growing old."
"Good-bye sweetheart, good-bye."

প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন। আইরিশ কবি টমাস মূরের Irish Melodies তখন খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল। তার মধ্যে "The Last Rose of Summer" নামে একটি গান আমি ফিরতি-বেলায় জাহাজের কাপ্তেনকে গেয়ে শুনিয়েছিলুম, একটু একটু মনে পড়ে।

রবিকাকা দেশে ফিরে আসার অনতিকাল পরেই কালমৃগয়া গীতিনাটিকা রচনা করেন। তাতে আর বাল্মীকি প্রতিভাতে কতকগুলি গানের সুরে তাই বিলেতপ্রবাসের প্রভাব লক্ষিত হয়। কতকগুলি গানে ধুয়া বা কোরাসের প্রবর্তনকে বিলিতী গানের পরোক্ষ প্রভাব বলা যেতে পারে। যেমন "জনগনমন অধিনায়কে"র "জয় হে জয় হে"; "মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গনে"র "জয় জয় নরোত্তম পুরুষসত্তম"; "ভালোবেসে যদি সুখ নাহি"র "তবে কেন তবে কেন" অংশ; "মম যৌবন-নিকুঞ্জে"র "সখি জাগো জাগো জাগো" আর "যদি

তোঁর ডাক শুনে কেউ না আসে"র "একলা চল রে"। বাবার "মিলে সবে ভারতসন্তান" গানে "হোক ভারতের জয়" ইত্যাদি যে ধুয়া আছে, জানিনে রবিকাকা তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন কি না।

পরবর্তী জীবনে আমি অবশ্য রবিকাকার অনেক বিলিতী গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়েছি, সে-সব এখনও সেদিনের মূক সাক্ষীস্বরূপ আমার গানের বাঁধানো বইয়ে পড়ে আছে, যথা— "In the gloaming," "Then you'll remember me," "Good night, good night, beloved", সুইনবার্নের "If" etc.। এ ছাড়া বেন্ জন্সনের বিখ্যাত গান "Drink to me only with thine eyes" ভেঙে লিখেছিলেন "কতবার ভেবেছিনু।" প্রসঙ্গক্রমে অনেক বছর ডিঙিয়ে এখানে বলছি যে, সম্প্রতি ১৯৫৬ সালে বহুকাল পর বাকে-দম্পতি শান্তিনিকেতনে এলে আমি তাঁদের এই ভাঙা গানের কথা বলি। বাকে সাহেব আমাকে দিয়ে গানটি গাইয়ে তৎক্ষণাৎ টেপ্ রেকর্ডারে তুলে নিলেন। আর একটি গান, রোমান ক্যাথলিকদের বিখ্যাত স্তব "আভে মারিয়া", রবিকাকা পিয়ানো ও বেহালার যুগল সংগতে গাইতেন, সেটি আমার বড় ভালো লাগত। ইদানীং কত চেষ্টা করেছি এই বেহালা সংযুক্ত গানটির স্বরলিপি সংগ্রহ করতে, কিন্তু এখনও কৃতকার্য হইনি। তবুও আশা ছাড়িনি। ওদের সংগতের বিশেষত্ব এই যে, তা আমাদের মত কেবল মূল সুরকে অনুসরণ করে না, কিন্তু ভিন্ন পথে চ'লেও সংযোগ রক্ষা করে, তাতে একটি অতিরিক্ত মাধুর্যের সঞ্চার হয়। আমি অবশ্য উক্ত সংগীতরসে বঞ্চিত শ্রোতাদের কথা বলছিনে, কারণ তাঁদের কানে এটা বেসুরা লাগতে পারে— সেরকম মন্তব্যও আমি শুনেছি। এখানে অবান্তর হলেও বলবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে যে, আমাদের যন্ত্রসংগীতে এই নিয়ে পরীক্ষা করবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে আছে। কোন একটি গৎ বহু শ্রোতার শ্রুতিগোচর করতে হলে কেবলমাত্র যন্ত্রের সংখ্যা বাড়ানো বই অন্য কোনো বৈচিত্র্য সাধনের চেষ্টা আমাদের মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত হয়নি। এখন অবশ্য শুনতে পাই সিনেমা, রঙ্গমঞ্চ ও বেতারে যন্ত্রসংগীতে নানাপ্রকার ধ্বনিবৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সব সময় সেগুলি খুব শ্রুতিমধুর ও শাস্ত্রসম্মত হয় কিনা সন্দেহ।

আমার অনেক সময় আশ্চর্য বোধ হয় যে, রবিকাকা কখনো কোনো যন্ত্র বাজানোর দিকে মনোযোগ করেন নি। যদিও পিয়ানোয় বসে বসে এক আঙুল দিয়ে ঠুকে গানে সুর বসানোর চেষ্টার কথা মনে পড়ে। তবে তিনি সব-কিছু নতুন ও সুন্দর জিনিসকে সমাদর করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। আমি অন্য কোথাও লিখেছি যে, তিনি তাঁর পরিবারের ছেলেমেয়েদের এ বিষয়ে অপটু প্রচেষ্টাকেও কোনোদিন নিরুৎসাহ করেন নি। মনে আছে আমাকে, আমার দাদা সুরেনকে আর সরলাদিদিকে রবিকাকা একবার "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতাটির উপর একটি স্বরসন্ধিযুক্ত পিয়ানোর গৎ রচনা করতে বলেছিলেন। কথা ছিল যার সবচেয়ে ভালো হবে, তিনি তাকে পুরস্কার দেবেন। আমাদের মধ্যে একমাত্র সুরেনই উৎসাহ এবং পরিশ্রম করে এই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন এবং আমার পুরনো খাতার পাতায় তার সাক্ষী এখনো বর্তমান। তাঁর জীবিতকালে কেউ যদি দেশী সুরে স্বরসন্ধি-সংযোগে কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি নিজেই সর্বাগ্রে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন।

রবিকাকা ছোট ছেলে স্বভাবতই ভালোবাসতেন— আমাদের ভাইবোনকে দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর হাতে খড়ি হয়। বিলেতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে সেই যে তাঁর ভাব হয়ে গিয়েছিল, সেটা শেষজীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। ছেলেদের মন ভোলানোর তাঁর একটি উপায় ছিল, নানারকম মজা করে গান গাওয়া।

যেমন "আজু মোরণ বন বোলে" গানটি মধ্যলয়ে আরম্ভ করে দ্রুত হতে দ্রুততর লয়ে গেয়ে যখন "তুম সন হম হলমল কর রমকে রমকে ঝোলে" গাইতেন তখন শেষকালে তাঁর ঠোঁটদুটি যেন কেবল কাঁপত, আর আমরা হেসে কুটি কুটি হতুম। "Darling, you are growing old" প্রভৃতি ইংরিজি গানের সুরও মজা করে টেনে টেনে গাইতেন, কিন্তু সে সুর স্বরলিপিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। জেঠামশাই আবার আফ্রিকার প্রদেশ নামগুলিতে সুর বসিয়েছিলেন, যথা —

না র্সা -া র্সা | ধা পা গা মা | ণা -ধা -া না | র্সা -া -া -া I
ই জি প্‌ট্‌ ম্যু | বি আ আ বি | সি ০ ০ নি | য়া ০ ০ ০

রবিকাকা আবার রেলওয়ে লাইনের অক্ষরেও সুর বসিয়েছিলেন, যথা—

গা | পা পা -া I হ্মা পা -া | ধা পা -া I গা রা -গা |
E | I. R. -০ I G. I. -০ | P. R. -০ I D. M. -০ |

রা সা -া I -া -া সা | রা সা -া I ন্‌া -সা -া | রা -গা -া I
S. R. -০ I ০ ০ S. | E Ex. ০ I ten ০ ০ | sion ০ ০ I

তখনকার কালে আমাদের মধ্যে অন্যান্য পাশ্চাত্য প্রভাবের মধ্যে হারমোনিয়ম ও পিয়ানোযন্ত্রের খুব চল ছিল। আগেই বলেছি রবিকাকা কখনো যন্ত্র বাজানোয় মন দেননি; কিন্তু অবনদাদা এসরাজ বাজাতেন এবং ভাইদের মধ্যে অরুণেন্দ্রনাথ আর আমার দাদা সুরেন্দ্রনাথ কিছুদিন একেবারে নাড়া বেঁধে গয়ার বিখ্যাত এসরাজী ঢেঁড়ীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। জ্যোতিকাকা মহাশয়ের পিয়ানো বাজনার সঙ্গে রবিকাকার গান রচনার কথা তো সকলেই জানেন। সেকালে আদি ব্রাহ্মসমাজে দুই থাকের একটি সুন্দর অর্গ্যান যন্ত্র ছিল। তার উপরের থাক পিয়ানোর মত, আর নীচের থাকটা হারমোনিয়মের মত বাজত। একসময় আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রতিমাসেই উপাসনা হত। সেই মাসিক সমাজে রবিকাকার গানের সঙ্গে আমি হারমনিয়ম বাজাতাম মনে আছে। "ভোরের বেলায় কখন এসে", "ভবকোলাহল ছাড়িয়ে", "তবে কি ফিরিব ম্লানমুখে", "দাও হে হৃদয় ভরে দাও", প্রভৃতি গানগুলি কত ভালো লাগত।

তখনকার দিনে রবিকাকার জনপ্রিয় গানগুলির পরিচয় তাঁর ১২৯৯ সালে প্রকাশিত গানের বহি ও বাল্মীকি-প্রতিভা দেখলেই পাওয়া যাবে। রবিকাকা দু-একটি হিন্দী গানও সখ করে গাইতেন— যেমন "ক্যায়সে কাটোঙ্গি রয়ন সো পিয়া বিনে" (বেহাগ), "জন ছুঁয়া মোরি বঁইয়া নগরওয়া" (রামকেলী)— এই গানটি থেকেই "আঁখিজল মুছাইলে জননী" ভাঙা, এবং "মন কি কমল দল খোলিয়াঁ" (বাহার) ভেঙে "এই যে হেরি গো দেবী" রচিত। আর একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল— "লাইরি মোরি শ্যাম ইঁদোরিয়া" গানটির সুর পূরবী এবং এর কিছু আভাস নিয়ে বহুদিন পরে "সমুখে শান্তিপারাবার" গানটির সুর দেন। তাঁর একটি খাতায় "সমুখে শান্তিপারাবারের" কথা আর সেই পাতার কোণে "লাইরি" শব্দটি লেখা দেখে তাঁর সংগীতগবেষকরা এই ইঙ্গিতের মর্ম বুঝতে পারেননি। আমাকে সেই কথা বলায় আমি তাঁদের এই সমস্যার সমাধান করে দিলুম। কতকগুলি নিধুবাবুর টপ্পাও গাইতেন, "যে যাতনা যতনে"— এর সঙ্গে "থাম্ থাম্ কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ" গানটির সুরের মিল লক্ষণীয়। আর দুটি গানও গাইতেন, "মনে রইল সই মনের বেদনা" ও "ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে"; শেষ গানটি শ্রীধর কথকের।

অনেকে তাঁর প্রথম-বয়সের গান বেশি পছন্দ করেন, তার ভাষা ও ভাব সরল ও মর্মস্পর্শী ব'লে। তিনি

নিজে আমাকে বলেছেন, "আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকারগুলি ইস্থেটিক্।" এর সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় মায়ার খেলার দুটি-একটি গানের সেকালের ও একালের রূপের তুলনা করলে। যেমন সেকালের— "আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে" (বেহাগ। এর সঙ্গে অক্ষয় চৌধুরীর "কেনই বা ভুলিব তোমায়" গানটির কিছু মিল আছে) গানটির একালের পরিবর্তিত রূপ "যে ছিল আমার স্বপনচারিণী"। এইখানে বলে রাখি কারওয়ারে আমাদের সঙ্গে থাকাকালীন কতকগুলি কানাড়ী গান ভেঙে বাংলা গান রচনা করেছিলেন। রবিকাকা প্রয়োজনানুসারে নানা পুরনো গানের সুরে অন্য কথা বসিয়ে অদলবদল করে নিয়েছেন। যথা, চিত্রাঙ্গদার "ক্ষমা কর আমায়, আমায়" গানটির সুর নেওয়া হয়েছে— "জয় জয় ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ" নামক অতি পুরনো ব্রহ্মসংগীত থেকে। বাল্মীকি প্রতিভার "অহো আস্পর্ধা একি তোদের" গানটির সুর "চরাচর সকলি মিছে মায়া" গান থেকে নেওয়া। শ্যামার "হায় একি সমাপন" গানটির সুর বাল্মীকি প্রতিভার "হা কি দশা হল আমার" থেকে নেওয়া। এই সুরটির মূল আবার কর্তাদাদামশায়ের মুখে শোনা একটি ফার্সী গান— "হালমে রবে রবা"। বাল্মীকি প্রতিভার "আয় মা আমার সাথে" গানের সুর বিবাহোৎসব নাটিকায় তাঁর পুরনো গান "মা একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন" গানটির অনুরূপ। কালমৃগয়ার "কে জানে কোথা সে" তাঁর আর-একটি পুরনো গান "সহে না যাতনা"র সুরে বসানো। শ্যামার আরেকটি গান "কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা"র সুর পুরনো ব্রহ্মসংগীতের "জাগিতে হবে রে" (শঙ্করা) থেকে নেওয়া। মায়ার খেলার "কী হল তোমার বুঝি বা সখী", তাঁর একটি পুরনো গান "কী হল আমার বুঝি বা সখী"র কেবল "আমার" টুকু পরিবর্তন করে "তোমার" বসানো হয়েছে। বাল্মীকি প্রতিভার "জীবনের কিছু হল না" গানের মূল ওঁরই একটি পুরনো গান "প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন"। বাল্মীকি প্রতিভার "মরি ও কাহার বাছা", মায়ার খেলার "আহা আজি এ বসন্তে", এবং কালমৃগয়ার "মানা না মানিলি"র সুর "Go where glory" নামে একই আইরিশ মেলডি থেকে ভাঙা।

তেলেনা গানের অর্থহীন শব্দগুলি নিয়ে, যথা "ওদেরৃতানা দিতাহুম তাহুম দেরে না" কেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ ক'রে রবিকাকা গাইতেন মনে পড়ে— উপরোক্ত শব্দগুলি একবার খুব উত্তেজনাপূর্ণ ভাবে গেয়ে বীররস, আবার টেনে টেনে কোমলভাবে গেয়ে করুণরস প্রকাশ করতেন।

আমাদের সংগীতশাস্ত্রে বাহার রাগিণীটিকে বসন্তকালের নববিকাশ প্রকাশের উপযোগী বলে মনে করা হয়। কিন্তু রবিকাকা এই বাহার রাগিণীকে অনেক গানে মনের আবেগ প্রকাশের বাহনরূপে নতুন রূপ দিয়েছেন। যেমন "গেল গেল নিয়ে গেল", "রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু" প্রভৃতি। সিন্ধুর মতো করুণ কোমল রাগকেও কেমন উদ্দীপনা প্রকাশের কাজে লাগিয়েছেন, সেটা "আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না" গানে লক্ষণীয়। অবশ্য লয় ও গায়কী দ্বারা গায়কেরও সে ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমার মনে হয় এ-সকল ক্ষেত্রে নাট্যরস নামক একটি নবতর রসের অবতারণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আমাদের সংগীতে উদ্দীপনার অভাব রবিকাকা নানারকমে পূরণ করেছেন, তাঁর সংগীতভক্তগণ চেষ্টা করলে আরও এমন দৃষ্টান্ত মনে আনতে পারবেন।

বাবার কাছে বোম্বাই থাকাকালীন সাহেবদের মহলে এক সময় মায়ার খেলার গানের খুব আদর হয়েছিল এবং উচ্চারণ করতে না পারলেও তারা "ভালোবেসে যদি সুখ নাহি" গানে "টোবে কেন, টোবে

কেন" বলে ধুয়োর অংশে যোগ দিত। এর থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, কতকগুলি সুর সার্বজনীন অর্থাৎ কোনো বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ নয়। আমি যখন বলি আমাদের দেশের সংগীতও স্বরসন্ধির ব্যবহারের একবারে অযোগ্য নয়, বরং এতে তার ঐশ্বর্য বাড়বার সম্ভাবনা— যা নিয়ে অনেক সময় সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে মতভেদ হয়— তখন এই ধরনের সার্বজনীন সুরের কথাই আমার মাথায় থাকে।

বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে কয়েকটি গান রচিত হয়েছে। যেমন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে "বাংলার মাটি বাংলার জল", এবং আরো অনেক গান; স্যার তারকনাথ পালিতের বাড়ি নিমন্ত্রণে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন যাঁরা, তাঁদের প্রতি ভর্ৎসনা হিসেবে "আমায় বোলোনা গাহিতে বোলো না"। কয়েকটি বিয়ের গানের ইতিহাসও এখানে উল্লেখযোগ্য, যথা— "সুখে থাক আর সুখী কর" গানটি শ্রীমতী স্নেহলতা সেনের বিবাহোপলক্ষ্যে এবং "নবজীবনের যাত্রাপথে", "দুজনের মিলনের সত্যসাক্ষী যিনি" ও "সুমঙ্গলী বধূ" গান ক'টি শ্রীমতী নন্দিনী দেবীর বিবাহোপলক্ষ্যে রচিত। "ওহে নবীন অতিথি" গানটি কোনো বন্ধুকন্যার অন্নপ্রাশনের জন্য রচিত। একবার মনে আছে আদি নববিধান সাধারণ, এই তিন সমাজের মিলিত উৎসব উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ধর্মসভা হয়। সেই সভার জন্য রবিকাকা "পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান" গানটি রচনা করেন।

ছেলেবেলার গানের স্মৃতির সঙ্গে গানের সাথীও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমার দিশী বিলিতী সংগীতের সর্বদা সঙ্গের সাথী ছিলেন সরলাদিদি। আমরা যা-কিছু শিখেছি, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে শিখেছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি দাক্ষিণাত্য থেকে অনেক সুন্দর সুর সংগ্রহ করেছেন, নিজেও বহু সংগীত রচনা করেছেন। আমার সেজকাকা হেমেন্দ্রনাথও খুব নিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁর ঘরে দিশী বিলিতী সংগীতের যুগল স্রোত অবিরাম বয়ে চলেছিল। তাঁর বড় মেয়ে প্রতিভাদিদিকে তিনি সর্ববিদ্যাপারদর্শিনী করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর চতুর্থ কন্যা মনীষা "তমীশ্বরাণাং" বেদমন্ত্রে এবং রবিকাকার কতকগুলি গানে, যথা "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে" প্রভৃতিতে পিয়ানোর সংগত বসিয়েছিলেন। সেগুলি তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করেনি। তাঁর সেজ মেয়ে অভিজ্ঞা রবিকাকার প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। তার সুন্দর গলা ও অভিনয়ের ক্ষমতার কথা তাঁর রচনায় উল্লিখিত আছে। সেজকাকার পরিবারের ছেলেরাও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তীকালে তার নাতবৌ অমিয়াদেবী সুকণ্ঠ ও শিক্ষাগুণে রবীন্দ্রসংগীতে নাম করেছিলেন। সেজকাকার নাতনী শ্রীমতী বাণী চট্টোপাধ্যায় এখন পর্যন্ত বংশের ধারা রক্ষা করে চলেছেন।

জ্যেঠামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘরে সেরকমভাবে ওস্তাদ রেখে গান শেখাবার পদ্ধতি না থাকলেও, হারমোনিয়ম বাজিয়ে দুএকখানা গান না করতে পারে এমন ছেলে তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিল না বললেই হয়। তাঁর মেজ ছেলে অরুদাদার রীতিমত এসরাজ শেখবার কথা আগেই বলেছি। তাঁর বড় মেয়ে সরোজদিদির যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি মিষ্টি গলা ছিল। ছোট মেয়ে উষাও দলের সঙ্গে গাইতেন। নাতিদের মধ্যে সৌম্যেন্দ্রনাথ এখনো বংশের ধারা বহন করে চলেছেন। তবে দিনেন্দ্রনাথই একাধারে যেমন তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ নাতি, যাঁর খ্যাতি শান্তিপর্ব পর্যন্ত চলে এসেছে। দিনু তিন বছর বয়স থেকেই যে-সব গান গেয়ে বেড়াত ছোটমুখে বড় কথা হিসেবে তা শুনে আমাদের হাসি পেত—যেমন "নিবারো নিবারো প্রাণের ক্রন্দন, কাটো হে কাটো হে এ মায়াবন্ধন।" আর

রবীন্দ্রনাথ । সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীইন্দিরা দেবী সহ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছুদিন পরে নাকি জ্যেঠামশায় পাশের ঘর থেকে শুনেছেন, দিনু গাইছে—গানটি জ্যেঠামশায়েরই রচিত— "শয়ন ভিজিল নয়নজলে, ওলো সজনি।" অমনি তাকে ডেকেছেন, "দিনু, এদিকে এস।" দিনু এসে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল। "এ গান তুমি কার কাছে শিখলে?" দিনু নতমস্তকে নিরুত্তর। "খবরদার, এ গান আর গাবে না।" যবনিকা পতন। দিনুর সঙ্গে রবিকাকার গানের সুর সম্বন্ধে আমার তর্ক হলে এই একটি চুক্তি ছিল যে, নতুন গানের সুর সম্বন্ধে তার কথা মানব, কিন্তু পুরনো গানের বেলায় নয়।

আমি রবিকাকার কাছে আলাদা ক'রে বসে কখনো গান শিখেছি বলে মনে পড়ে না। কেবল বাড়িময় হাওয়ায় হাওয়ায় যে গান ভেসে বেড়াত, তাই শুনে শুনে শিখেছি। পরবর্তীকালে বরং আমার বালিগঞ্জের কমলালয় বাড়িতে পিয়ানোর কাছে বসে তিনি আমাকে দুএকটা গান শেখাতে চেয়েছেন বলে মনে পড়ে, যেমন, "কে গো অন্তরতর সে" প্রভৃতি। আর আমার গান শিখতে দেরি হয় বলে মন্তব্য করায় আমি একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। দিনু এবং খুকু (অমিতা সেন) যেরকম তাড়াতাড়ি গান শিখত শুনেছি, তার তুলনায় আমাদের যে ঢিমে তেতালা মনে হবে তার আর আশ্চর্য কি। খুকুর স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ হয়নি, তবে কলকাতায় কোনো সূত্রে তার গান শোনবার সুযোগ হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদ্ নামক একটি সভা উপলক্ষ্যে আমি আহূত হয়ে সেখানে একটি ছোটো প্রবন্ধ পড়ি। রবিকাকাও নিমন্ত্রিত হয়ে খুকুকে সঙ্গে করে আসেন এবং খুকু তাঁর পাশে বসে শুধু গলায় "আমার মল্লিকাবনে" গানটি সুন্দর গায়। তার অনেকদিন পরে শান্তিনিকেতনে দুদিনের জন্য এসে উত্তরায়ণের সামনে টেনিসকোর্টে বসে দেখেছি খুকু চার-পাঁচ বার ক্রমাগত শ্যামলীতে রবিকাকার কাছে যাতায়াত করছে। পরে শুনেছি যে, সেই সময় রবিকাকা তাঁর বড় বড় কবিতায় সুর দেওয়ার নতুন রীতি প্রবর্তন করছিলেন, সেই গান শেখবার জন্যই এত ছোটাছুটি।

যতদূর জানি সংস্কৃত স্তোত্রে সুর রবিকাকাই প্রথম দিতে আরম্ভ করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত একরকম নিয়মই হয়ে গেছে যে, মাঘোৎসব আরম্ভ হবে একটি বেদগান দিয়ে। তার পরে তাঁর পরিবারের দুএকজন তাঁকে অনুসরণ করে সংস্কৃত স্তোত্রে সুর বসিয়েছেন। যথা, বিখ্যাত "ত্বমাদিদেব পুরুষপুরাণ" স্তোত্রটিকে প্রতিভাদিদি কেদারা রাগিণীতে সুর বসান। "সংগচ্ছধ্বম্" স্তোত্রের সুর "আনন্দলোকে"র সুরেরই রূপান্তর; এই সুরটি সরলাদিদি মহীশূর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। পরে বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি সেটি মহীশূরের জাতীয় সংগীতের সুর। সংস্কৃত স্তোত্রের দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণের রীতিরক্ষার প্রতি রবিকাকা খুবই সতর্ক ছিলেন। প্রতিভাদিদির সুর দেওয়া গীতাস্তোত্রটি মাঘোৎসবে গাওয়া হবে বলে জোড়াসাঁকোর উঠানে মহড়া চলছে। রবিকাকা অসুস্থ হয়ে তেতলার ঘরে শুয়ে শুয়ে শুনছিলেন। মনে আছে তিনি আমাকে উপরে ডেকে পাঠিয়ে এক জায়গার সুরটা ঠিক করে দীর্ঘ হ্রস্ব উচ্চারণের সঙ্গে মিলিয়ে বসাতে বলে দিলেন।

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সংগীতচর্চার কথা বাদ দিলে বাইরের বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে অক্ষয় চৌধুরী এবং বিহারী চক্রবর্তীর কথা। শেষোক্তের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। পরে অবশ্য তাঁর ছেলেদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। লোকে বলে যে, তাঁর রচনার প্রভাব রবিকাকার কবিতায় লক্ষিত হয়, বিশেষত বাল্মীকি প্রতিভায় সরস্বতী-বন্দনাদিতে। সম্ভবত রবিকাকার কাছেই তাঁর

কতকগুলো গান শুনে শুনে শিখেছিলুম, যা আমার গানের খাতায় লেখা আছে। সপরিবার অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকে অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর রচিত কতকগুলি গান সশরীরে রবিকাকার গীতিনাট্যে স্থান পেয়েছে—যেমন, "রাঙা পদপদ্মযুগে" ও "এত রঙ্গ শিখেছ কোথা"। যেমন বিহারী চক্রবর্তীর "নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার," তেমনি অক্ষয় চৌধুরীরও একটি প্রেমের গান "কেন গো ভুলিব তোমায়" সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল।

গায়ক বন্ধুদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আর অতুলপ্রসাদ সেন স্বনামধন্য। তাঁদের কাছে তাঁদের নিজের গান শেখবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। এইখানে কৃষ্ণনগরের একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলে নিই। অনেকেই শুনেছেন যে রবিকাকা এবং সত্যদাদা যখন দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রা করেন, তখন মাঝপথে মান্দ্রাজ থেকেই ফিরে আসেন। এ যাত্রা এক হিসেবে নিষ্ফল হলেও, আর-এক দিক থেকে আমাদের পরিবারের পক্ষে সুফলপ্রদ হয়েছিল। কারণ এই জাহাজেই শুনেছি আমার বড় ভাসুর আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে রবিকাকার প্রথম ঘনিষ্ঠতা হয়। তখন থেকেই রবিকাকা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হবার কল্পনা মনে পোষণ করেন। পরে প্রতিভাদিদির সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রবিকাকা কৃষ্ণনগরে ওঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন। কৃষ্ণনগরে তখন রামতনু লাহিড়ীর ছেলে সত্য লাহিড়ীকে কেন্দ্র করে একটি উচ্চাঙ্গ গানের আসর ছিল, আমার স্বামীও তাতে যোগ দিতেন। পরে তাঁর কাছেই শুনেছি যে, সেই আসরে রবিকাকাকে গান গাইতে বলায় তিনি "বাঁশরী বাজাতে চাহি বাঁশরী বাজিল কই" গানটি গেয়েছিলেন। এবং সেইসব উচ্চাঙ্গসংগীতপ্রিয় শ্রোতাদের কাছ থেকে নাকি অনেক বাক্যবাণ তাঁর উপরে বর্ষিত হয়েছিল, যেমন, "হ্যাঁ, বাঁশরী অনেকেই বাজাতে চায়, কিন্তু বাঁশরী বাজাতে চাইলেই কি বাঁশরী বাজে। বাঁশরী বাজাতে হলে শিক্ষা চাই" ইত্যাদি। কারণ সে সরল সুরের ভিতর তাঁদের অভ্যস্ত তানকর্তব তাঁরা খুঁজে পাননি।

বাইরের মেয়েদের ভিতর গায়িকা হিসেবে অমলা দাসকে আগে মনে পড়ে। এখনও গ্রামোফোনে তাঁর সুন্দর চড়া গলায় "একি আকুলতা ভুবনে" এবং "চিরসখা হে" শুনে লোকে শিক্ষা ও আনন্দ দুই পায়। তাঁর একটি হিন্দী গান "সৈঁয়া যাও যাও" ভেঙে "পিপাসা হায় নাহি মিটিল" গানটি রচিত। বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনীর "যমুনারি জলে মোরে" এবং "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী" গান দুটি তিনি খুব গাইতেন। কলকাতার কোনো এক কংগ্রেসে অমলা দশ হাজার লোকের সভায় একলা "বন্দেমাতরম্" গানটি বিনা মাইকে শুনিয়েছিলেন। তাঁর গলা যেমন মিষ্টি তেমনি সতেজ ছিল। এদিকে গৃহস্থালীতেও তিনি সুপটু ছিলেন। নাটোরের মহারাজার সংসারে যখন মহারানীর সহচরী হিসেবে ছিলেন, তখন রাজবাড়ির নেমন্তন্নে তাঁর রান্না খেয়ে কত তৃপ্তি লাভ করেছি।

ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি পরিবারের সঙ্গে রবিকাকার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যেমন চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবার, স্যার কে. জি. গুপ্তের পরিবার, ডাঃ নীলরতন সরকারের পরিবার ইত্যাদি। এঁদের সকলেরই ঘরে সুগায়িকা ছিলেন, যাঁরা রবিকাকার কাছেই তাঁর গান শেখবার সুযোগ পেয়েছেন। যেমন ডাঃ নীলরতনের বড় কন্যা নলিনী, তাঁর অপর এক কন্যা অরুন্ধতী, সুকুমার রায়ের স্ত্রী সুপ্রভা, কনক দাস, সাহানা বসু। ডাঃ নীলরতন সরকারের মেয়েরা এখনো পর্যন্ত দেশী-বিলেতী সংগীতের একসঙ্গে চর্চা রেখেছেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির পিছনের বাগানে প্রথম যে বর্ষামঙ্গল হয় তাতে বড় ঝুনু সাহানা বসু ও ছোট

ঝুমু চিত্রলেখা সিদ্ধান্তের দুটি গান "বাদল-মেঘে মাদল বাজে" আর "ঐ যে ঝড়ের মেঘের কোলে" কী অপূর্ব সুন্দর লেগেছিল— যেন মধুঢালা।

এ পর্যন্ত রবিকাকার শান্তিনিকেতনবাসের পূর্বেকার সংগীতস্মৃতির কথা বলেছি। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জায়গার সঙ্গে রবিকাকার তখনকার কালের গান রচনার স্মৃতি জড়িত আছে। একবার দার্জিলিঙ বেড়াতে গিয়ে এক ঝাঁক গান নিয়ে এলেন, "বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে" ইত্যাদি ; আবার শিলাইদহের বোটে বসে হয়তো আরেক ঝাঁক রচনা করেছেন। কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাবার পরে যে গান রচনা আরম্ভ করলেন সে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে নয়, যেন ধারাবাহিক স্রোতের মতো বইতে লাগল। সে স্রোত প্রায় জীবনের শেষ পর্যন্ত বয়ে চলেছে।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপনের পরেও রবিকাকা কয়েক বছর কলকাতায় ঘনঘন যাতায়াত করতেন। তাই সেখানকার রবীন্দ্রভক্তরা তাঁর নব নব সংগীত ও সাহিত্যরস উপভোগে বঞ্চিত হত না। এই মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মনে পড়ে প্রতিভাদিদির স্থাপিত "সংগীতসংঘে" রবিকাকা তাঁর 'সংগীতের মুক্তি' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধটি পড়েছিলেন। উদাহরণগুলি নিজেই গেয়েছিলেন। এখনকার বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের বাড়িতে "বিচিত্রা" আসরের কথাও অনেকের জানা আছে। তাতে তিনি সকলকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার দিয়েছিলেন। তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী পুত্রবধূ প্রতিমাকে একটি জরির ফিতে দিয়েছিলেন— আসরের বন্ধুদের যাতে সৌজন্য আর প্রীতির ডোরে বেঁধে রাখতে পারেন, তারই প্রতীকস্বরূপ। এক আসরে একবার মনে আছে সৌম্যেন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী রবিকাকার "হৃদয় আমার নাচে রে" আবৃত্তির সঙ্গে নিজস্ব আঙ্গিকে রচিত একটি নাচ দেখিয়েছিলেন। আর-একবার রবিকাকা বিলেতে বাজনার সঙ্গে কবিতা আবৃত্তির পদ্ধতি শুনে এসেছিলেন, সে পরীক্ষা এখানেও করেন। আজকাল সেতারের গতের সঙ্গে গান করবার যে ধারা প্রচলিত হয়েছে তারও বোধ হয় প্রথম নমুনা আমরা বিচিত্রার আসরে শুনিয়েছিলুম "মধুর মধুর ধ্বনি বাজে" গানটির সঙ্গে একটি ভূপালীর গৎ জুড়ে।

প্রিয়দর্শী অশোক

প্রবোধচন্দ্র সেন

ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভার বর্ণনা উপলক্ষে কালিদাস মগধেশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন—

কামং নৃপাঃ সন্তু সহস্রশোঽন্যে
রাজন্বতীমাহুরনেন ভূমিম্‌।
নক্ষত্রতারাগ্রহসংকুলাপি
জ্যোতিষ্মতী চন্দ্রমসৈব রাত্রিঃ ॥—রঘুবংশ ৬।২২

সত্য বটে পৃথিবীতে হাজার হাজার নৃপতি আছেন, কিন্তু একমাত্র মগধেশ্বরের দ্বারাই ধরণী রাজন্বতী হয়েছে, যেমন অজস্র নক্ষত্র তারা এবং গ্রহ থাকা সত্ত্বেও রাত্রি জ্যোতিষ্মতী হয় একমাত্র চন্দ্রের দ্বারাই। পৃথিবীর ইতিহাসগগনের একমাত্র চন্দ্রমা মগধরাজ প্রিয়দর্শী (ভাব্রুলিপি) অশোক সম্বন্ধেও এইচ. জি. ওয়েলস সাহেব অনুরূপ উক্তি করেছেন—

Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history··· the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star.

—*The Outline of History* 24/4

ভারতবর্ষের রাজকীয় ইতিহাসের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হচ্ছেন অশোক, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে অশোক সম্বন্ধে যে গুরুতর মতভেদ দেখা যায় তা বিস্ময়কর। শুধু মতভেদ নয়, মতবিরোধ। এই বিরুদ্ধতার ফলে অশোকের স্মৃতি পর্যন্ত কালক্রমে ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাঁর মহত্ত্বের দীপ্তি এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল ও যাঁর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বগৌরব আধুনিক কালেও সমগ্র বিশ্বে পুনঃস্বীকৃত ও অভিবন্দিত হয়েছে তাঁর স্মৃতি ও প্রভাব ভারতীয় ইতিহাস থেকে লুপ্ত হতে বহু যুগ লেগেছিল, এ অনুমান অসংগত নয়। আমি অন্যত্র (ধর্মবিজয়ী অশোক, ভূমিকা পৃ ১৭-২২) দেখিয়েছি যে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে অশোকের স্মৃতি ও আদর্শ ভারতীয় মনে জাগরূক ছিল এবং যুগে যুগেই ভারতীয় জীবনে ধর্মপ্রাণতার প্রেরণা জোগাচ্ছিল। ভারতীয় ইতিহাসে অশোকের প্রভাব সম্পর্কে এখানে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

২

অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত নাগার্জুনিকোণ্ড নামক স্থানে প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের একটি উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে যে, দান প্রভৃতি পুণ্যকর্মের ফল ঐহিক ও পারত্রিক উভয়প্রকার কল্যাণ-প্রদ (উভয়লোক-হিতসুখাবহন) হয়। এই লিপির ভাষা ও বক্তব্য অতি সহজেই কোনো কোনো অশোকলিপির (যথা, পঞ্চম ও একাদশ শৈললিপি) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১]

১ নলিনাক্ষ দত্ত, *Early Monastic Buddhism*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৪৫), পৃ ১০৬

সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিএন (৪০৫-১১) তৎকালীন ভারতবর্ষের যে বিবরণ লিখে গিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায়, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকেও ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে অশোকের প্রভাব কতখানি সক্রিয় ও ফলপ্রসূ ছিল। পাটলিপুত্র নগরে অশোকের শিলাময় বিপুল রাজপ্রাসাদ তখনও বিরাজমান ছিল। এই প্রাসাদের বিশালতা দেখে ফা-হিএন এত বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি এটিকে মানুষের তৈরি বলেই বিশ্বাস করতে পারেননি। মগধবাসীদের ধর্মপ্রাণতা দেখেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। মগধে পান্থশালা প্রভৃতি অনেক কল্যাণপ্রতিষ্ঠান ছিল। এসবের মধ্যে পাটলিপুত্রের চমৎকার ভেষজসত্রটি ফা-হিএনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। এটি পরিচালিত হত বিত্তশালী উদার নাগরিকদের অর্থানুকূল্যে। নানা স্থান থেকে দরিদ্র রোগীরা এখানে এসে অভিজ্ঞ বৈদ্যের দ্বারা চিকিৎসিত হত। শুধু তাই নয়, আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত তারা ওই সত্রে বাস করত এবং ঔষধ ও পথ্য দু-ই পেত বিনামূল্যে। এই সব দানপ্রতিষ্ঠানের মূলে ছিল সম্রাট্ অশোকেরই প্রেরণা। ছয় সাত শো বছরের ব্যবধানেও সে প্রেরণা যে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাটলিপুত্রের এই ভেষজসত্রটি। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের অভিমত উদ্‌ধৃতিযোগ্য।—

It may be doubted if any equally efficient foundation was to be seen elsewhere in the world at that date; and its existence, anticipating the deeds of modern Christian charity, speaks well both for the character of the citizens who endowed it, and for the genius of *the great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit many centuries after his decease.*

—*The Early History of India*, চতুর্থ সংস্করণ (১৯২৪), পৃ ৩১২-১৩। বক্রলিপি লেখকের।

অতঃপর সপ্তম শতকে সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৪৮) কার্যকলাপেও ধর্মাশোকের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনিও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অশোকের ন্যায় পথিকদের জন্য ধর্মশালা ও রোগীদের জন্য ভেষজসত্র প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। এই সব কারণেই ঐতিহাসিক স্মিথ হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে বলেছেন—

He obviously set himself to imitate Asoka, so that the narrative of the doings in the latter years of Harsha's reign reads like a copy of the history of the great Maurya.—ঐ, পৃ ৩৫৭

উৎকীর্ণলিপির প্রমাণেও এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। বাঁশখেরা ও মধুবন-নামক স্থানে প্রাপ্ত দুটি তাম্রশাসনেই (৬২৮ এবং ৬৩১) সম্রাটের স্বনামের ভণিতাযুক্ত এই শ্লোকটি পাওয়া গিয়েছে—

কর্মণা মনসা বাচা কর্তব্যং প্রাণিভির্হিতম্।
হর্ষেণৈতৎ সমাখ্যাতং ধর্মার্জনমনুত্তমম্॥

অর্থাৎ হর্ষের মতে কায়মনোবাক্যে সর্বপ্রাণীর হিতসাধনই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই শ্লোকটিকে অশোকের বহু উক্তির সারসংকলন বলে গণ্য করা যায়। বস্তুতঃ এটিকে 'নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎপা' (ষষ্ঠ শৈলানুশাসন) অর্থাৎ সর্বলোকের হিতসাধন অপেক্ষা মহত্তর কর্ম নাই, বিশেষ করে এই অশোকবাণীটির প্রতিধ্বনির মতো শোনায়।

হর্ষবর্ধনের সময়ে অর্থাৎ সপ্তম শতকেও যে অশোকের স্মৃতি এদেশের মনে সমুজ্জ্বল ছিল তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্থসাঙএর ভারতবিবরণ। ওই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ষষ্ঠ শতকের শেষদিকেও মগধরাজ পূর্ণবর্মা অশোকের বংশধর বলে আত্মপরিচয় দিতেন। তা ছাড়া হিউএন্থসাঙ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বপ্রান্তেই অশোকের স্মৃতিবিজড়িত কত স্তূপস্তম্ভাদি দেখেছিলেন আর কত কাহিনী শুনেছিলেন তা তাঁর ভারতবিবরণের বিভিন্ন অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সপ্তম শতকের উত্তরার্ধে আর-এক জন চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন (৬৭৩-৮৫)। তিনি শুনেছিলেন বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের এক শত বৎসর পরে (এটা ভুল, আসলে সম্ভবতঃ ২১৮ বৎসর পরে) অশোক সমগ্র জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হয়েছিলেন। তা ছাড়া ই-ৎসিঙ অশোকের একটি ভিক্ষুবেশী মূর্তিও দেখেছিলেন বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় অশোকের স্মৃতি ও আদর্শ দেশের জনচিত্তে তখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি।

একাদশ শতকে আরও একজন চৈনিক পরিব্রাজক চিআঙ হ্‌সিআ-পিআস (Chiang Hsia-Pias) বুদ্ধগয়াতে এসে (১০২১) কতখানি শ্রদ্ধার সহিত মহারাজ অশোককে স্মরণ করেছিলেন তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই প্রশস্তিটিতে—

The Fragrance of his fame has travelled afar ;
He lived in wonderful perception of the Truth.[২]

তাঁর রচিত এই পংক্তি-দুটি থেকেই বোঝা যায়, একাদশ শতকে অশোকের খ্যাতিসৌরভ ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে দূরদূরান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

দ্বাদশ শতকেও যে অশোকের স্মৃতি ভারতবাসীর মনে সজীব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কাশ্মীরী কবি কল্‌হণের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে (১১৪৯-৫০) এবং গাহড়বালবংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সারনাথলিপিতে। রাজতরঙ্গিণীতে মৌর্যবংশ তথা চন্দ্রগুপ্ত কিংবা বিন্দুসারের উল্লেখমাত্রও নেই, কিন্তু পরমধার্মিক ও সত্যসন্ধ রাজা অশোক সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।[৩] কল্‌হণ তাঁকে জিনশাসনাশ্রিত অর্থাৎ বৌদ্ধ-

---

২ চৈনিক রচনার ইংরেজি অনুবাদ। বেণীমাধব বড়ুয়া, *Gaya and Buddha-Gaya*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৩৪), পৃ ৩৭, ৪০ ; *Asoka and His Inscriptions* (১৯৪৬), পৃ xxx, ২, ৩০১। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের ভুল ধারণা ছিল যে, বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি অশোকের নির্মিত।

৩ রাজতরঙ্গিণী ১।১৭-২০, ১।১০১-০৭, ৮।৩৩৯১

…অথাবহদশোকাখ্যঃ সত্যসন্ধো বসুন্ধরাম্‌।
যঃ শান্তবৃজিনো রাজা প্রপন্নো জিনশাসনম্‌।…
স ষণ্ণবত্যা গেহানাং লক্ষৈর্লক্ষ্মীসমুজ্জ্বলৈঃ
গরীয়সীং পুরীং শ্রীমাংশ্চক্রে শ্রীনগরীং নৃপঃ।
জীর্ণং শ্রীবিজয়েশস্য বিনিবার্য সুধাময়ম্‌।
নিষ্কল্মষেণাশ্মময়ঃ প্রাকারো যেন কারিতঃ॥
সভায়াং বিজয়েশস্য সমীপে চ বিনির্মমে।
শান্তাবসাদঃ প্রাসাদাবশোকেশ্বরসংজ্ঞিতৌ॥

—রাজতরঙ্গিণী ১।১০১-০২, ১০৪-০৬

ধর্মাবলম্বী কাশ্মীরাধিপতি এবং প্রাসাদময়ী রাজধানী শ্রীনগরী ও বহু বৌদ্ধ চৈত্যবিহারাদির নির্মাতা বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, কল্‌হণের মতে অশোক কয়েকটি দেবমন্দিরও নির্মাণ ও পুনঃসংস্কার করিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধভক্ত হওয়া সত্ত্বেও অশোক যে অন্য ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার ছিলেন না এ ধারণা কাশ্মীরে দ্বাদশ শতকেও বিলীন হয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে নিজে শৈব হওয়া সত্ত্বেও কল্‌হণ যে বৌদ্ধনৃপতি অশোকের প্রশস্তি রচনায় কুণ্ঠিত হননি, তাতে তাঁরও উদারতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যে এরকম দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আছে বলে মনে হয় না।

রাজতরঙ্গিণী রচনার প্রায় সমকালেই গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সারনাথলিপি রচিত হয়। ওই লিপি থেকে জানা যায়, বাংলার রাজা রামপালের (আনুমানিক ১০৭৮–১১২০) মাতুলপৌত্রী কুমারদেবী ছিলেন গোবিন্দচন্দ্রের (১১১৪-৫৪) অন্যতমা মহিষী। এই কুমারদেবী ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বিনী এবং তিনি ধর্মাশোক-নরাধিপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারনাথে একটি বৌদ্ধবিহার ও ধর্মচক্রপ্রবর্তনরত বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। এর থেকে অনুমান করা যায়, পালবংশীয় বৌদ্ধরাজাদের আমলে (৭৫০–১১৫০) বাংলাদেশেও ধর্মাশোকের আদর্শ নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। অতএব দেখা গেল সম্রাট্ অশোকের তিরোধানের প্রায় দেড় হাজার বছর পরে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকেও তাঁর স্মৃতি ও আদর্শের পুণ্যপ্রভাব বাংলাদেশ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সমগ্র উত্তরভারতেই দেশবাসীর চিত্তে সজীব ও সক্রিয় ছিল।

অশোকের সাম্রাজ্য ও ধর্মবিজয়ের প্রভাব যে সুদূর দক্ষিণভারতেও বিস্তার লাভ করেছিল তার প্রমাণ আছে তাঁর শৈলানুশাসনগুলিতেই। সে প্রভাব যে বহুশতবৎসরস্থায়ী হয়েছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের চালুক্য ও যাদব রাজবংশের কতকগুলি ক্ষোদিতলিপিতে।[৪] আর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ ভাষ্যকার ধম্মপালের রচনায়; তাঁর রচনা থেকে জানা যায় যে, অশোকের মৃত্যুর বহুকাল পরেও দক্ষিণভারতে নেগাপটম-নামক স্থানে ধর্মাশোক-মহারাজ-বিহার[৫] নামে একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারটি কোন্ সময়ে নির্মিত হয়েছিল এবং কতদিন অবস্থিত ছিল তা জানা যায় না।

ধর্মাশোক-বিহার প্রতিষ্ঠার কীর্তি কখন বিলুপ্ত হয়েছিল জানা না গেলেও মহারাজ ধর্মাশোকের স্মৃতি যে ভারত-ইতিহাসে তুরুষ্ক-আবির্ভাবের পরেও বিলুপ্ত হয়নি তার প্রমাণ আছে। কিছুকাল পূর্বে আর্য-মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামে একটি অদ্ভুত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (১৯২০–২৫)। এই গ্রন্থে বহু বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক পারম্পর্য রক্ষিত না হলেও সে সব তথ্য একেবারে মূল্যহীন বা উপেক্ষণীয় নয়। ও গ্রন্থে এক দিকে যেমন ক্রোধসিদ্ধ মন্ত্রী চাণক্য, সত্যসন্ধ চন্দ্রগুপ্ত, ধীমান্ বিন্দুসার, বিখ্যাত পার্থিব অশোক প্রভৃতি বহু প্রাচীন ব্যক্তির নাম প্রাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি তুরুষ্ক[৬] ও মহাতুরুষ্ক নামের উল্লেখও পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থখানির শেষ সংকলন-কাল হচ্ছে ঊর্ধ্বপক্ষে দ্বাদশ শতকের শেষ বা ত্রয়োদশ শতকের প্রথম অংশ, এ অনুমান অসংগত নয়। অশোক সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে—

৪ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, *Political History of Ancient India*, ২য় সং (১৯২৭), পৃ ২২৩

৫ বেণীমাধব বড়ুয়া, *Asoka and His Inscriptions*, পৃ ৩৫২ পাদটীকা

৬ তুরুষ্কনামা বৈ রাজা উত্তরাপথমাশৃত।—আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প (গণপতি শাস্ত্রী -সম্পাদিত), পৃ ৬২২

তস্মিং কালে মহাঘোরে কুসুসাহ্বে নগরে তদা।
অশোকো নাম বিখ্যাতঃ পার্থিবো ভুবি পালকঃ ॥ ··
জম্বুদ্বীপ ইমং কৃৎস্নং স্তুপালংকৃতভূষণম্।
কারয়ন্ত ভবন্তো বৈ ধাতুগর্ভাং বসুন্ধরাম্ ॥···
অনেকস্তম্ভসহস্রাণি রোপয়ামাস তে তদা।

—আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প, তৃতীয় খণ্ড (১৯২৫), পৃ ৬০৬-০৭

এই গ্রন্থেরই অন্যত্র (পৃ ৬১০) আছে—

রাজ্ঞে সৌ শোকমুখস্য পৃষ্ঠতে ত ভবে নৃপঃ।
বিশোক ইতি বিখ্যাতো লোকে ধর্মানুচারিণঃ ॥

এই অংশটুকুর পাঠ স্পষ্টতঃই বিশুদ্ধ নয়, সুতরাং তার অর্থও অনিশ্চিত। তথাপি মনে হয় (অ)শোকমুখ্য ও বিশোক নামের দ্বারা সম্ভবতঃ অশোক মৌর্যকেই বোঝানো হয়েছে। বিখ্যাত এবং ধর্মানুচারী, বিশেষণ-দুটির দ্বারা এই অনুমানই সমর্থিত হয়। এই গ্রন্থে অশোকের সংশয়াতীত উল্লেখও আছে (পৃ ৬০৮)—

শোভনে মেদিনীং কৃৎস্নাং জিনধাতুধরৈস্তদা।
প্রণিধিং চক্রিরে রাজা ধর্মাশোকো মহাত্মবান্ ॥

অর্থাৎ মহাত্মা রাজা ধর্মাশোক বুদ্ধের দেহাবশেষধারী (জিনধাতুধর) স্তূপের দ্বারা মেদিনীকে শোভিত করেছিলেন। এর পরের শ্লোকেই আছে 'মহাত্মাসৌ ধর্মাশোকো নরাধিপঃ'। পূর্বোক্ত সারনাথলিপিতেও 'ধর্মাশোক-নরাধিপ' কথাটি আছে। অতএব কোনো সন্দেহ নেই যে, উত্তরভারতে তুরুষ্ক-আবির্ভাবের পরেও অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকেও কোনো কোনো ভারতীয় মহলে, বিশেষতঃ বৌদ্ধ মহলে, অশোকের সশ্রদ্ধ স্মৃতি জাগরূক ছিল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রধানতঃ বৌদ্ধরাই অশোকের স্মৃতিকে শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষা করছিল ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত। এর থেকেই অনুমান করা যায়, তৎকালে অবৌদ্ধ মহলেও অশোকের নাম একেবারে অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়; তবে সম্ভবতঃ শ্রদ্ধার অভাববশতঃই অবৌদ্ধ সাহিত্যে অশোকের ন্যায় কালজয়ী পুরুষেরও উল্লেখ পাওয়া যায় না; কল্হণের রাজতরঙ্গিণীই তার একমাত্র প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম একথা পূর্বেই বলেছি।

৩

দ্বাদশ শতকের পরেই ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব অতি দ্রুতগতিতে লোপ পেয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে রাজা অশোকের স্মৃতিও ভারতীয় মন থেকে মুছে যায়। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব কিভাবে নিঃশেষ হয়ে গেল সে বিষয়ে বহু আলোচনা হয়েছে; এস্থলে সে প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রাণ মহানৃপতি অশোকের স্মৃতিও কেন ও কিভাবে লোকচিত্ত থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করবার আবশ্যকতা আছে।

একথা প্রথমেই স্বীকার্য যে, ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে অশোকের স্মৃতি লুপ্ত হবার প্রথম ও প্রধান কারণ তাঁর বৌদ্ধত্ব। তিনি যে একজন বৌদ্ধনৃপতি, একথা ভারতবর্ষ কখনই এবং কিছুতেই ভুলতে পারেনি।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে তাঁর নৃপতিত্বের চেয়ে তাঁর বৌদ্ধত্বই প্রাধান্য পেয়েছিল। তাই ভারতীয় চিত্তে তাঁর যথার্থ মহত্ত্ব কখনও স্বীকৃতিলাভের সুযোগ পায়নি। কেননা, একথা মানতেই হবে যে, অশোকের জীবন-ইতিহাসে তাঁর বৌদ্ধত্বের চেয়ে তাঁর নৃপতিত্বই বড় কথা; কিন্তু তার চেয়েও বড় তাঁর মহৎ মনুষ্যত্বের কথা। মানুষ অশোকই রাজা অশোককে বড় করেছে এবং তাতেই বৌদ্ধ অশোকের মহিমা-বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিহাসে অশোকের অদৃষ্টে তাঁর জীবনবিবর্তনের ইতিহাসকে পড়া হয়েছে উলটো দিক্ থেকে। ফলে তাঁর বৌদ্ধত্বই দেখা দিয়েছে সব চেয়ে বড় হয়ে, তাঁর রাজকীয় মহিমা ওই বৌদ্ধত্বের কাছে খুবই ম্লান হয়ে গিয়েছে, আর তাঁর মনুষ্যত্বের গৌরব একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ওই মহিমাহানির ফলে।

বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু, তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।

কবির এই উক্তি অশোকের জীবনবৃত্তান্ত তথা তাঁর ভারতজোড়া লিপিমালার পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য। ওই লিপিমালা হচ্ছে বস্তুতঃ অশোকের স্বরচিত জীবনবৃত্তান্ত। এই সত্য উপলব্ধি করেই ঐতিহাসিক স্মিথ বলেছেন—

His imperishable records constitute in large measure his autobiography written in terms manifestly dictated by himself.

—*Oxford History of India* (১৯২০), পৃ ৯৪

প্রাচীন ভারতে আর কেউ এমন অক্ষয় রেখায় আত্মচরিত রেখে যাবার কল্পনাও করতে পারেননি। সুতরাং অশোকজীবনের গুরুত্ব বুঝতে হলে তাঁর অনুশাসনগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করা চাই। শুধু অশোকজীবনের নয়, ভারতবর্ষের সত্যকে উপলব্ধি করতে হলেও এই লিপিমালার আশ্রয় নিতে হবে। কেন না, ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষতঃই অশোকলিপিসমাকীর্ণ, অশোকলিপির গৈরিক নামাবলী অঙ্গে ধারণ করেই ভারতবর্ষ বিশ্ব-ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বিশ্বের ইতিহাসেও এমন আশ্চর্য লিপিমালা আর কোথাও নেই। তাই অশোকের এই লিপিগুলি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিনা দ্বিধায় বলেছেন—

His numerous and wonderful inscriptions…may be fairly considered the most remarkable set of inscriptions in the world.

—*Oxford History of India* (১৯২০), পৃ ৯৪

বিশ্বের কাছে ভারতবর্ষের যে পরিচয় ও তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে তার উপনিষদে গীতায় ও ধম্মপদে, তারই আর-এক প্রকাশ ঘটেছে অশোকলিপিমালায়। উপনিষদে গীতায় ও ধম্মপদে যার প্রকাশ তত্ত্ব ও নীতিরূপে তারই প্রয়োগসাধনার দিক্‌টি ভাষা পেয়েছে অশোকের অনুশাসনমালায়। সুতরাং অশোককে তথা ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে এই অনুশাসনগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা চাই।

নেপাল থেকে কর্ণাট (মহিসুর) এবং গন্ধার (পেশবার) থেকে কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), এই চতুঃসীমার মধ্যে ভারতবর্ষের একত্রিশটি বিভিন্ন স্থানে বত্রিশটি অশোকানুশাসনের অন্ততঃ ১৫৭টি স্বতন্ত্র পাঠ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। আধুনিক কালে অশোকলিপির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ১৭৫৬ সালে,[৭]

৭ শ্রীনিবাস মূর্তি ও কৃষ্ণ আয়াঙ্গার, *Edicts of Asoka*, দ্বিতীয় সং (১৯৫১), পৃ xvi

আর শেষ আবিষ্কার হয়েছে ১৯৫৬ সালে।[৮] ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন আরও আবিষ্কারের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়া, অনেকগুলি লিপি যে ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাও জানা গিয়েছে। সুতরাং এক কালে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই অশোকলিপি ছড়ানো ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অশোকের রাজত্বকাল (খ্রি-পূ ২৭২-৩২) থেকে প্রায় বাইশ শো বছর যাবৎ এগুলি কালের আক্রমণ সয়েও টিঁকে রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম কয়েক শত বৎসর যে এই অনুশাসনসমূহের লিপি ও ভাষা শিক্ষিত জনসাধারণের বোধগম্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সময়েও অশোকের অনুশাসনগুলির তাৎপর্য তাঁর স্বদেশবাসীরা যে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি, যথাস্থানে তা দেখাতে চেষ্টা করব। কালক্রমে এগুলির লিপি ও ভাষা উত্তরোত্তর দুর্বোধ্য হয়ে একেবারেই বিস্মৃত হয়ে গেল। বহু শতাব্দীর বিস্মৃতির অবসানে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে এগুলি পুনরায় শিক্ষিতজনের দৃষ্টিগোচর হতে লাগল, কিন্তু বোধগোচর হতে আরও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হল। বহু সাধকের বহু প্রয়াসের পরে অবশেষে ১৮৩৭ সালে জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ্ অশোকলিপির পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হন। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সপাদ শতাব্দীকাল ধরে নূতন নূতন অশোকলিপির আবিষ্কার, তার যথার্থ পাঠনির্ণয় ও অর্থনিরূপণ এই ত্রিবিধ কাজের ধারা চলেছে অবিশ্রান্ত গতিতে। এই উপলক্ষে কত যে গবেষণা এবং প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে, তার ইয়ত্তা নেই।[৯] তথাপি এখনও অশোকানুশাসনের যথার্থ তাৎপর্য নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয়নি; কতকগুলি ছোটখাট বিষয়ের অর্থনির্ণয়ে সংশয় তো আছেই, কয়েকটি প্রধান বিষয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়।

মতভেদের মুখ্য বিষয় দুটি, অশোকের ধর্মনীতি ও অহিংসানীতি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আধুনিক কালের মতো প্রাচীনকালেও মতভেদ দেখা দিয়েছিল মুখ্যতঃ এই দুটি বিষয়কে আশ্রয় করেই। প্রথমে আধুনিক মতভেদের একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

৪

আধুনিক যুগের অনেক ঐতিহাসিক অশোককে একান্তভাবে অহিংসাপরায়ণ বৌদ্ধনৃপতিরূপেই দেখেন; কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে প্রধানতঃ এই দৃষ্টিতেই দেখা হত। ১৯০১ সালে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্ অশোকের যে জীবনবৃত্তান্তখানি প্রকাশ করেন তার নাম Asoka, the *Buddhist* Emperor of India। এই নামেই প্রকাশ যে, অশোকের বৌদ্ধত্বই তাঁর দৃষ্টিতে প্রাধান্য পেয়েছে। অতঃপর ১৯২২ সালে প্রকাশিত *Cambridge History of India* গ্রন্থে ডক্টর টমাস বলেন, "The degree of Asoka's appreciation of Buddhism is not very easily definable" (প্রথম খণ্ড, অধ্যায় ২০, পৃ ৫০৪)। তাঁর এই মন্তব্যের অন্যতম প্রধান কারণ অশোকলিপিতে চার আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গমার্গ, নির্বাণ প্রভৃতি বিশেষভাবে বৌদ্ধত্বসূচক ভাষার লেশমাত্র প্রয়োগও দেখা যায় না। এই প্রসঙ্গে রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার বলেন—

---

৮ অমূল্যচন্দ্র সেন, *Asoka's Edicts* (১৯৫৬), পৃ ১, ৬৩

৯ বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত M. A. Mehendale প্রণীত *Asokan Inscriptions in India*-নামক গ্রন্থে (১৯৪৮) অশোকবিষয়ক রচনার একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া আছে। তাতে ১৮৩৪ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ৪৪৫টি প্রবন্ধ ও গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই তালিকাও অসম্পূর্ণ।

This might lead one to conclude that Asoka could not be correctly described as a Buddhist. But that would be an extreme view and go against other evidences.…It is undeniable that he became and remained a Buddhist but of a tolerant and unexclusive type.

—শ্রীনিবাস মূর্তি ও কৃষ্ণ আয়াঙ্গার-প্রণীত *Edicts of Asoka*, ভূমিকা, পৃ xxx

অথচ অশোকপ্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—

The idea that it was a special Buddhist term *Dhamma* and stood both in its substantive and adjectival forms only for the idea peculiar to Buddhism is incorrect. Asoka's *Dharma* is in fact only the Brahmanic concept in its wide range of application.

—ঐ, পৃ xxiv-xxv

দেখা যাচ্ছে অধ্যাপক রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার অশোককে বৌদ্ধ অথচ তাঁর প্রচারিত ধর্মকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। এই জন্যই টমাস সাহেব অশোকের বৌদ্ধত্বের স্বরূপ সহজনির্ণেয় (easily definable) নয় বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

খ্যাতনামা বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ পরলোকগত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের অভিমতও এস্থলে উদ্‌ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন—

'অশোক যে বৌদ্ধধর্মের দিকে খুব ঝুঁকে পড়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অশোকাবদানের কাহিনী বিশ্বাস করলে স্বীকার করতে হয় যে তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বেশ বাড়াবাড়িই করেছিলেন।… তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকলেও কিছু অন্যায় করেন নি।…তাঁর চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম অগ্রগতিসম্পন্ন হয়ে অল্পকালের মধ্যেই একটি মহামানবীয় সভ্যতায় পর্যবসিত হয় এবং সমস্ত এশিয়াকে উদ্‌বুদ্ধ করে।' —বিশ্বভারতী পত্রিকা, নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৭), পৃ ২০০-২০১

অধ্যাপক বাগচী স্পষ্টতঃই অশোকলিপির চেয়ে বৌদ্ধসাহিত্যের (প্রধানতঃ অশোকাবদানের) উপরে অধিকতর আস্থা স্থাপন করেছেন ; ফলে তিনি অশোকের নৃপতিত্বের চেয়ে তাঁর বৌদ্ধত্বকেই বড় করে দেখেছেন। তাঁর মতে অশোক রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে চেষ্টিত হয়েছিলেন এবং 'তাঁর চেষ্টাতেই' বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হতে পেরেছিল। রাজোচিত নিরপেক্ষতা রক্ষা না করে অশোক যে বৌদ্ধধর্মের দিকে 'খুব ঝুঁকে পড়েছিলেন' অর্থাৎ ওই ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন সেটা কিছু 'অন্যায়' হয়নি। কেননা তাতে মহামানবীয় সভ্যতার সহায়তা হয়েছিল। এক কথায় অধ্যাপক বাগচীর মতে অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্মই রাজধর্মের (state religion-এর) স্থান অধিকার করেছিল।

এবার আর-এক জন বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের, পরলোকগত অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়ার, অভিমত উদ্‌ধৃত করা যাক—

Buddhism was not made a state religion by Asoka. It was Asoka's personal-religion, and he publicly stated that it was so. But the principles of the

Dharma that he had advocated were *neither propounded nor promulgated in the name of the Good Faith or any other religion.*

—*Asoka and His Inscriptions* (১৯৪৬), পৃ ৩২৫। বক্রলিপি লেখকের।

Good Faith মানে সদ্ধর্ম, আর সদ্ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের নামান্তর। বৌদ্ধরা নিজধর্মকে বলত সদ্ধর্ম, অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকেই বৌদ্ধধর্ম বলে অভিহিত করত। যা হক, দেখা যাচ্ছে অধ্যাপক বড়ুয়ার মতে অশোক বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্মরূপে প্রয়োগ করেন নি এবং স্বদেশে কিংবা বিদেশে তিনি যে ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন তা সদ্ধর্ম নয় কিংবা অন্য কোনো বিশেষ ধর্মও নয়। অর্থাৎ সর্বধর্মের সার চিরন্তন (পোরাণা পকিতী) ও বিশ্বজনীন মানবধর্মই অশোকের অনুশাসনাবলীর লক্ষ্য। তবে অধ্যাপক বড়ুয়ার মতে ব্যক্তিগতভাবে অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, যদিও রাজা হিসাবে তিনি সে ধর্ম প্রচার করেননি। অশোকের প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি আরও স্পষ্ট করেই বলেছেন—

It is *non-credal* in its stress and *non-sectarian* in sprit···non-sectarian in the sense that it nowhere intends thrusting any man's views and beliefs upon another.

—ঐ, পৃ ২৭১

আরও একজন বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ ঐতিহাসিকের অভিমত উদ্‌ধৃত করা যাক। অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত বলেন—

That Asoka was an out and out radicalist and a rationalist is clearly revealed in his edicts. He cared neither for the Brahmanical rituals and traditions nor for the Jaina or Buddhist forms of ceremonies and observances.··· He had *his own ideal of religion* an ideal *that would not bear a sectarian name.*

—*Early Monastic Buddhism*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৪৫), পৃ ২৫৮-৫৯। বক্রলিপি লেখকের।

বোঝা যাচ্ছে অধ্যাপক দত্তের মতেও অশোকের ধর্মমতকে কোনো সাম্প্রদায়িক নামেই অভিহিত করা চলে না, সুতরাং তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন একথার কোনো সার্থকতাই থাকতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশোকের মনোভাব সম্পর্কে অধ্যাপক বড়ুয়া ও অধ্যাপক দত্তের অভিমত প্রায় একই প্রকার।—

Asoka as the emperor showed toleration to all religions, although he had *a personal fancy for Buddhism* and very probably he became a Buddhist *upasaka.*

—ঐ, পৃ ২৬৩

ব্যক্তিগতভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলেও অশোক ওই ধর্মকে নির্বিচারে ও সর্বতোভাবে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতো radicalist ও rationalist-এর পক্ষে কোনো কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দত্তের আর-একটি উক্তি (ঐ, পৃ ২৫৮-৫৯) উদ্‌ধৃত করা প্রয়োজন।—

There are ample evidences to show that Asoka had *a great, if not the highest, regard for Buddha* and his teachings.···In forming the conception

of his ideal he was undoubtedly *influenced by the Buddhist* and Jaina *teachings,* but he was not enamoured of the Buddhist or Jaina ideal of retirement from worldly life.

সুতরাং এই মতে অশোক নির্বিচারে ও সর্বতোভাবেই বৌদ্ধধর্মকে মেনে নিয়েছিলেন, একথা বলা চলে না। অর্থাৎ অশোকস্বীকৃত ধর্মে বৌদ্ধ প্রভাব ছিল একথা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে ধর্মকে একান্তভাবে বৌদ্ধ আখ্যা দেওয়া চলে না। এই যে সম্প্রদায়নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ, এ হচ্ছে আধুনিক যুগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এ হিসাবে বলা যায়, অশোক ছিলেন তদানীন্তন যুগের অনেক অগ্রবর্তী।

যা হোক, দেখা গেল অশোকের বৌদ্ধত্ব সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রবল মতভেদ রয়েছে। যথাস্থানে দেখাতে চেষ্টা করব, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে এ বিষয়ে আরও গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছিল।

৫

এবার দেখা যাক অশোকের অহিংসানীতি সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অভিমত কি। সাধারণ ও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, অশোক একান্তভাবেই অহিংসানীতিকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু অশোকের অনুশাসনগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান, শুধু প্রতীয়মান কেন, প্রমাণিত হয় যে, এই প্রচলিত ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন। এ বিষয়ে আমি 'ধর্মবিজয়ী অশোক' গ্রন্থে বিস্তৃত অলোচনা করেছি। ওই গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে পরলোকগত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলেন—

'আমার বিশ্বাস অশোক সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধবিরোধী নীতি ও অহিংসানীতি অবলম্বন করেছিলেন।'

—বিশ্বভারতী পত্রিকা, নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৭), পৃ ২০০

এই মতভেদের প্রধান উপলক্ষ অশোকের ত্রয়োদশ শৈলানুশাসনের ব্যাখ্যা। অধ্যাপক বাগচী বলেন, 'প্রবোধবাবু ত্রয়োদশ শৈললিপির যে অর্থ নির্ধারণ করেছেন তা সর্ববাদীসম্মত নয়'। ওই লিপির একটি অংশ এই—

'যো পি চ অপকরেয় তি ক্ষমিতবিয়মতে ব দেবনংপ্রিয়স যং শকো ক্ষমনয়ে। য পি চ অটবিয়ো দেবনংপ্রিয়স বিজিতে ভোতি ত পি অনুনেতি অনুনিঝপেতি, অনুতপে পি চ প্রভবে দেবনংপ্রিয়স বুচতি তেষ কিতি অবত্রপেয়ু, ন চ হংঞেয়সু।'

আমি এর প্রথম বাক্যটির মর্মার্থ দিয়েছিলাম এভাবে, "যদি কেউ আমার অপকার করে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা চলে ততক্ষণই আমি তাকে ক্ষমা করব"। এর তাৎপর্য এই যে, ওই অপকারেচ্ছুদের লক্ষ্য করে অশোক বলছেন যে, 'তাঁরও ধৈর্য এবং ক্ষমার একটা সীমা আছে, ওই সীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি অস্ত্রধারণ করে তাঁদের শাস্তিবিধান করতে কুণ্ঠিত হবেন না'। উদ্‌ধৃত অংশের দ্বিতীয় বাক্যের মানে এই যে, 'অশোক তাঁর সাম্রাজ্যান্তর্গত অটবীরাজ্যের অধিবাসীদের জানাচ্ছেন যে, কলিঙ্গযুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হলেও তিনি শক্তিহীন নন, তাদের কৃতকার্যের জন্য তারা যদি লজ্জা প্রকাশ না করে তবে তাদের হনন করা হবে' (ধর্মবিজয়ী অশোক, পৃ ৩৯-৪০)। অধ্যাপক বাগচীর মতে প্রথম বাক্যটির আমার কৃত 'অর্থনির্ধারণ' 'সর্ববাদীসম্মত নয়' এবং ওই অর্থ থেকে আমি যে 'অনুমান' করেছি তাও 'চলে না'। আর দ্বিতীয় বাক্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন—

'কৃতকার্যের জন্য অটবিরাজ্যের লোকেরা অনুতপ্ত না হলে অশোক তাদের 'হনন করবেন' এ-রকম কথা ওখানে বলা হয়নি। অশোকের উক্তির ও-রকম অর্থ করলে তাঁর ত্রয়োদশ শৈললিপির সমস্ত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়।' —বিশ্বভারতী পত্রিকা, ঐ, পৃ ২০১

কেননা তাঁর 'বিশ্বাস' অশোক 'সম্পূর্ণরূপে'ই যুদ্ধবিরোধী ও অহিংসা নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর মতে ওই বাক্যটির অর্থ এই—

'দেবানাং-প্রিয় অটবির অধিবাসীকেও জয় করেছেন ও (নিজের ধর্মমতের) অনুগামী করেছেন। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অনুতপ্ত হওয়াই প্রধান (নীতি), সুতরাং তারা যেন অনুতপ্ত হয় ও (জীবদের অথবা নিজেদের) হনন না করে।'

এরকম অর্থ করা অশোক সম্বন্ধে সুচিরপোষিত বিশ্বাসের অনুকূল বটে; কিন্তু অশোকের ভাষার এই অনুবাদ একেবারেই অসম্ভব, কষ্টকল্পনার আশ্রয় না নিয়ে,—একথা স্বীকার করতেই হবে। বন্ধনীধৃত কথাগুলিই কষ্টকল্পনার নিঃসংশয় পরিচয়। অশোকের ভাষার সহজ ও স্বাভাবিক অনুবাদের পথে না গিয়ে প্রচলিত বিশ্বাসের অনুকূল করে অনুবাদ করবার ফলে 'ন চ হংঞেয়সু' অংশের কর্মবাচ্যটি কর্তৃবাচ্যে পরিণত হয়েছে। ন হংঞেয়সু মানে ন হন্যেরন্ (হত না হয়), ন হন্যুঃ (হনন না করে) নয়। ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রমুখ সব ঐতিহাসিকই এই ক্রিয়াপদটিকে কর্মবাচ্যেই গ্রহণ করেছেন। আর আধুনিক বিশেষজ্ঞরা সবাই অশোকের এই উক্তিটির তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন ভাষার স্বাভাবিক অর্থের পথ ধরে, প্রচলিত বিশ্বাসের পথ ধরে নয়। ভাণ্ডারকর এবং বড়ুয়া-প্রমুখ ঐতিহাসিকরা কেউই এই অংশের ব্যাখ্যায় প্রচলিত বিশ্বাসের পথে চলেননি এবং ফলে অশোককে সম্পূর্ণরূপে অহিংসাপন্থী বলে মনে করেননি। অশোকানুশাসনের আধুনিকতম ব্যাখ্যাকার অমূল্যচন্দ্র সেনও করেননি। উদ্ধৃত অংশটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন—

'যদিও তিনি কলিঙ্গযুদ্ধের ফলে অনুতপ্ত হইয়াছেন তথাপি তাঁহার এমন প্রভাব (শক্তি) আছে যে, তিনি ইচ্ছা করিলে বিরুদ্ধাচারীদিগকে দমন করিতে পারেন।··· ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজন হইলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত বলপ্রয়োগ অশোক সম্পূর্ণ বিসর্জন করেন নাই।' —অশোকলিপি (১৯৫৩), পৃ ৮৮

অধ্যাপক বড়ুয়াও ত্রয়োদশ শৈললিপি তথা দ্বিতীয় কলিঙ্গলিপি সম্পর্কে অনুরূপ কথাই বলেছেন—

There is a veiled threat in Asoka's solicitude for the Antas as well as the Atavis.··· Asoka not only did not preclude but clearly anticipated circumstances under which his descendants and successors might have recourse to armed conquest or resistance. All that he insisted on was that even as belligerents, they should avoid excesses as for as practicable in acts of reprisal. —*Inscriptions of Asoka*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৪৩), পৃ ৩২০-২১

অর্থাৎ, অশোক নিজে প্রত্যন্তবাসীদের তথা সাম্রাজ্যভুক্ত আটবিকদের সংযত থাকবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, অন্যথায় তাদের দণ্ডবিধানের ভয়(threat)-ও দেখিয়েছিলেন। তা ছাড়া, নিজের রাজত্বকালে না হোক, তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময়ে যুদ্ধের সম্ভাবনার কথাও তিনি ভোলেননি; তাই তিনি তাঁদের যুদ্ধ থেকে সর্বতোভাবে নিরস্ত হবার উপদেশ না দিয়ে বিজিতদের প্রতি নৃশংসতা-

পরিহার ও লঘুদণ্ডবিধানেরই উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং অশোককে সর্বতোভাবেই যুদ্ধবিরোধী বলে বর্ণনা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বড়ুয়ার আর-একটি উক্তি এই—

There is not the slightest hint in the edicts and legends of Asoka that he either disbanded the army or was not fully prepared to cope with the menace to the security of life and property of the citizens arising from the mischievous action of the Atavis (RE XIII) or to his territory arising from the inimical action of the independent neighbours (SRE II).

—*Asoka and His Inscriptions* (১৯৪৬), পৃ ২৮৫-৮৬

পক্ষান্তরে কাশীপ্রসাদ জায়সবাল এবং অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর ন্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকরা মনে করেন অশোক একান্তভাবেই যুদ্ধপরিহারের নীতি গ্রহণ করেন এবং ফলে বিশাল মৌর্যসাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি দুর্বল হয় ও তার আশুবিনাশের পথ রচিত হয়। এই মত অধ্যাপক বাগচীর সিদ্ধান্তের অনুকূল। কিন্তু অধ্যাপক রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার-প্রমুখ ঐতিহাসিকরা অধ্যাপক বড়ুয়ার মতেরই পক্ষপাতী। অধ্যাপক আয়াঙ্গারের মতে অশোকের রাজত্বকালেও বিখ্যাত মৌর্য সৈন্যবাহিনী ও তাঁর সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণই ছিল।—

The great army, the largest of the time and created by Candragupta, apparently continued to be maintained. Peace and pacific intentions do not imply disarmament. The experience of Macedonian invasion and of the invasion of Seleucus as well as the Kalinga episode must have made the retention of the vast army necessary.

—মুদি ও আয়াঙ্গার -প্রণীত *Edicts of Asoka,* ভূমিকা, পৃ xxxiv

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের অভিমতও এস্থলে উদ্ধৃতিযোগ্য।—

'অনেকে মনে করেন যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অশোক অস্ত্রব্যবহার, বলপ্রয়োগ প্রভৃতিও সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া ধর্মপ্রচারের ভাবপ্রবণতায় ভাসিয়া নিজেও দুর্বল অহিংস 'বৈষ্ণব' হইয়াছিলেন, রাজশাসনও বলহীন ও বিশৃঙ্খল করিয়াছিলেন। তাহা ঠিক নয়, কারণ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি, দুর্দান্ত অবাধ্য দুর্নীতিপরায়ণগণকে সশস্ত্র বলপ্রয়োগে দমন, প্রয়োজন হইলে বিনাশ পর্যন্ত— সবই তাঁহার শাসননীতিতে পরিরক্ষিত হইয়াছিল।'

—অশোকলিপি (১৯৫৩), পৃ ৪০-৪১

দেখা গেল অশোকের অহিংসা এবং যুদ্ধপরিহারনীতি সম্বন্ধেও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুস্তর মতভেদ আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন কালেও এ বিষয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছিল বলে মনে করবার হেতু আছে।

৬

এবার প্রাচীনকালে অশোক সম্বন্ধে দেশব্যাপী মতভেদের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক মতভেদের সঙ্গে প্রাচীন মতভেদের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, যদিও বিষয়গত পার্থক্য নেই। মতভেদের প্রধান বিষয় দুটি, অশোকের ধর্ম ও অহিংসা-নীতি।

এখানে অশোকের ধর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক। অশোক পুরোপুরি বৌদ্ধ ছিলেন কিনা, আধুনিক মতভেদের বিষয় হচ্ছে তাই। কারও মতে অশোক ছিলেন পুরোপুরিই বৌদ্ধ, কারও মতে তিনি ছিলেন অংশতঃ বৌদ্ধ, কারও মতে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু কোনো পক্ষেই অশোকের মহত্ত্বে সংশয় ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব নেই। আর সকলেরই আলোচনার একমাত্র না হোক, প্রধান অবলম্বন অশোকের লিপিমালা। পক্ষান্তরে প্রাচীনকালে অশোকের বৌদ্ধত্ব সম্বন্ধে কোনো পক্ষেই কোনো সংশয় ছিল না; সংশয় দেখা দিয়েছিল তাঁর মহত্ত্ব সম্বন্ধে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ সম্বন্ধে। আর তখনকার আলোচনা ও মতভেদের অবলম্বন ছিল জনশ্রুতি। অন্ততঃ অশোকের লিপিমালা যে তখনকার অবলম্বন ছিল এমন মনে করবার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, বরং ভারতজোড়া সে লিপিমালার অর্থ যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ও বুঝতে পারেনি এমন মনে করবার হেতু আছে।

আধুনিক যুগের একজন মনস্বী বৌদ্ধ, অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া, অশোকের লিপিমালা অবলম্বনে তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা এই—

The Maurya emperor welcomed the lofty teachings of Buddha,…because its underlying principles and spirit were found *accidentally* to be in harmony with his own perception as to the nature of human good and *his own original* vision as to the nature and course of human progress. Whatever good thing Asoka had learnt from the exponents of Buddhism and *other men of religion* he made it his own. —*Asoka and His Inscriptions*, পৃ ৩২৯-৩০ বক্রলিপি লেখকের।

এই অভিমতের সঙ্গে অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্তের পূর্বোদ্ধৃত অভিমতের অনেকাংশে মিল আছে। অশোকের দ্বাদশ শৈলানুশাসন থেকে জানা যায় তিনি সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং সব সম্প্রদায়েরই যাতে 'সারবৃদ্ধি' হয় সে বিষয়ে তিনি যত্নবান্ ছিলেন। অকারণে নিজধর্মের প্রশংসা ও পরধর্মের নিন্দায় রত না হয়ে সব ধর্মের লোকেরা যাতে সমবেত হয়ে পরস্পরের ধর্মমত শ্রদ্ধাসহকারে শুনে ও আলোচনা করে 'বহুশ্রুত' (অর্থাৎ বহুশাস্ত্রজ্ঞ) হয়, এই অভিপ্রায়ে অশোক ধর্মমহামাত্র প্রভৃতি রাজপুরুষদের নিয়োগ করেছিলেন। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায় অশোক নিজেও বৌদ্ধ প্রভৃতি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের অতিপ্রশংসা না করে সব ধর্মমতই অবগত হয়ে বাহুশ্রুত্য[১০] লাভ করেছিলেন। আর তাঁর মত বহুশ্রুত পুরুষ যে নিজেকে কোনো বিশেষ ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্ব ধর্মের 'সার' অবলম্বনে স্বমত গঠন করবেন, তা আশ্চর্যের বিষয় নয়। এই কথাই প্রকাশ পেয়েছে, অধ্যাপক বড়ুয়ার উপরে-উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে। আর এইজন্যই অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত বলেছেন অশোকের ধর্মমত তাঁরই স্বকীয় মত, তাকে কোনো সাম্প্রদায়িক নাম দেওয়া যায় না (that *would not bear a sectarian name*)।

কিন্তু প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য কোনো সম্প্রদায়ই অশোককে এই দৃষ্টিতে দেখেনি; তারা হয় অশোকের দ্বাদশ শৈললিপির অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি, না-হয় সে অনুশাসনটিকে তারা উপেক্ষা বা

---

১০ দ্রষ্টব্য মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৬৭।৫

প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে কোনো পক্ষই অশোককে নিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক বলে মনে করতে পারেনি, উভয় পক্ষই তাঁকে পরম বৌদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিল। তার কারণ তাঁর রাজত্বকালেই বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভের সুযোগ পেয়েছিল সব চেয়ে বেশি। প্রথমতঃ, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধনীতির প্রতি অশোকের অনুরাগ ছিল অতি গভীর, একথা তখনকার দিনেও সুবিদিত ছিল। তাতেও প্রজাসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের আনুকূল্য হয়েছিল সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্রদেশব্যাপী শান্তি এবং বৈদেশিক রাজ্যের সঙ্গে সখ্যপ্রতিষ্ঠাও বৌদ্ধধর্মের বিস্তারপ্রবণতার সহায়তা করেছিল, একথাও সহজেই অনুমান করা যায়। অধ্যাপক নলিনাক্ষ দত্ত বলেন—

It was on account of the peaceful state brought about by Asoka's rule that it was possible for Buddhism to reach all the parts of India and to become a dominant force in the history of religions in India.

—*Early Monastic Buddhism*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২৭৪

তৃতীয়তঃ, অশোকের নিরপেক্ষতা এবং সমদর্শিতাও সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মকে ব্রাহ্মণ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে মুক্ত করে অবাধে বিস্তারলাভের সুযোগ দিয়েছিল। তাই পরবর্তী কালে বৌদ্ধরা অশোককেই তাদের ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। অপর দিকে ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতেও তিনি সত্যরূপে প্রতিভাত হতে পারেননি। রাজার সমদর্শিতা বা নিরপেক্ষতা নয়, তাঁর ঐকান্তিক পক্ষপাত ও অসপত্ন অনুগ্রহলাভই ছিল ব্রাহ্মণসমাজের বিশেষ দাবি। রাজা হবেন বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষক এবং বিশেষ করে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রতিপালক (এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, পরবর্তী কালে শিবাজী 'গোব্রাহ্মণপ্রতিপালক' উপাধি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন), এই হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অলঙ্ঘনীয় বিধান। কিন্তু অশোক এ বিধান পালন তো করেনই নি, পক্ষান্তরে তিনি যে অপক্ষপাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সমাজেরই প্রতিপালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে তাঁর অনুশাসনগুলিতে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বড়ুয়া বলেন—

There is nothing in the edicts to indicate that Asoka intended to be the upholder of the Brahmanical system as such.

—*Asoka and His Inscriptions*, পৃ ২৩৭

সুতরাং অশোক যে তৎকালীন ব্রাহ্মণসমাজের দৃষ্টিতে রাজধর্মলঙ্ঘনকারী অধার্মিক রাজা বলে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন, তা কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাই তাঁরা অশোকের নিরপেক্ষতাকে অনাদর করে তাঁকে বৌদ্ধপক্ষভুক্ত বলেই গণ্য করলেন। এইভাবে অশোক বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় পক্ষের দৃষ্টিতেই বৌদ্ধনৃপতি বলেই পরিগণিত হলেন। বলা বাহুল্য কোনো পক্ষের দৃষ্টিই অনাবিল ছিল না; উভয় পক্ষই অশোককে ভুল বুঝল এবং তাঁর যথার্থ স্বরূপ অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাতই রয়ে গেল।

অশোক বৌদ্ধ, এবিষয়ে দুই পক্ষই একমত। কিন্তু মতবিরোধ বাধল তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে। এই মতবিরোধের মূলে ছিল ধর্মবিরোধ। বৌদ্ধরা অশোকের মহত্ত্বকে অতিরঞ্জিত করে তাঁর সত্যস্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দিল। তাদের মতে অশোকের সমস্ত মহত্ত্বের মূলেই রয়েছে বৌদ্ধধর্ম। এই বিশ্বাসকে সত্য প্রতিপন্ন করবার প্রবল আগ্রহে তারা একদিকে অশোকের পূর্বজীবনকে অতিকলঙ্কিত এবং অপরদিকে তাঁর উত্তর-জীবনকে অতিপ্রাকৃত করে অঙ্কিত করতে লাগল। তারা ভুলে গেল যে, বৌদ্ধধর্মই অশোককে মহৎ

করেনি, তিনি মহৎ ছিলেন বলেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর মহৎ হৃদয়ের প্রসন্নতা লাভ করবার ফলেই বৌদ্ধধর্ম জগদ্‌ব্যাপী প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পেয়েছিল। যা হোক, একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যে, বৌদ্ধসমাজের এই উভয়বিধ অতিকৃতির মিথ্যাবরণ অপসারণ করে অশোককে সত্যের মুক্ত আলোকে প্রকাশ করা আজও সম্পূর্ণ সম্ভব হয়নি। আর এই সত্যপ্রকাশের একমাত্র অবলম্বন অশোকের অনুশাসনাবলী।

অপর দিকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতেও অশোকচরিত্রের মহত্ত্ব অবলুপ্তির দিকে অগ্রসর হল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য সমাজের অবজ্ঞা ও বিরুদ্ধতার কথা সুবিদিত, তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, মধ্যযুগে চৈতন্যপ্রভাবের কালেও সে বিরুদ্ধতার তীব্রতা কিছুমাত্র কমেনি। সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের (ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) একটি উক্তি এই—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক,
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক।

—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণ্য সমাজের দৃষ্টিতে অশোক ছিলেন বৌদ্ধ, সুতরাং বৌদ্ধদের প্রতি তাদের চিরন্তন বিরুদ্ধতার অবমাননা থেকে তিনিও নিষ্কৃতি পাননি। অশোকের প্রতি ব্রাহ্মণ্য সমাজের বিরাগ ও বিমুখতা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা করবার বিশেষ সার্থকতা আছে। তৎপূর্বে একথা বলা প্রয়োজন যে, এক দিকে বৌদ্ধ সমাজের অতিকৃতি, এবং অপর দিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজের অবজ্ঞা, এই দুই বিরুদ্ধ ও অসত্য দৃষ্টির ফলে অশোকচরিত্রের যে বিকৃতি ও করুণ পরিণতি ঘটেছে তাই হচ্ছে ভারত-ইতিহাসের শোচনীয়তম ট্র্যাজেডি। বৌদ্ধব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধের নিদারুণতম বলি হলেন ভারতবর্ষের নৃপতিসত্তম প্রিয়দর্শী অশোক। এই বলির সুদূরপ্রসারী কুপ্রভাব থেকে ভারতীয় ইতিহাস আজও সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি।

৭

বৌদ্ধব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধের ফলে এই যে অশোকের জীবনসত্য দীর্ঘকাল ধরে বিকৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকল, মনে হয় তাঁর বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল যেন তাকেই নিরস্ত করে ভাবী কালের কানে নিজের জীবনবাণীকে পৌঁছে দেওয়া। 'কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী' এই কথা স্মরণে রেখে এবং 'সত্যমেব জয়তে' এই ভারতবাণীকে আশ্রয় করে তিনি তাঁর জীবনধর্মের বাণীকে খোদাই করিয়ে রাখলেন অক্ষয় শৈলপৃষ্ঠে ও শিলাস্তম্ভের গাত্রে, অকূল কালসমুদ্রের অজানা তীরের প্রতি লক্ষ্য রেখে বারবার বললেন, 'চিরস্থিতিক হোক' এ বাণী। সত্যসন্ধ শান্তাবসাদ মহানুপতির অক্লান্ত জীবনসাধনা পূর্ণ হয়েছে, তাঁর ভারতব্যাপী মূক শিলালিপিমালা বহু শতাব্দীর মৌন পরিহার করে আজ সহসা মুখরিত হয়ে আমাদের হৃদয়ের কাছে ধ্বনিত করে তুলেছে তাঁর জীবনবাণীকে। দীর্ঘ নিশীথের সুপ্তি অবসানে আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে প্রিয়দর্শী অশোককে আশ্রয় করে মূর্ত হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের সেই রূপ যাকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন 'রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস', যার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব॥

প্রাচীন ভারতের বাণীময় রূপ দুইবার দুই ব্যক্তিপুরুষকে আশ্রয় করে জীবনসত্যে বিকশিত হয়ে উঠেছিল; একবার আশ্রয় করেছিল গৌতম সিদ্ধার্থকে, দ্বিতীয় বার প্রিয়দর্শী অশোককে। এই দুই ব্যক্তিসত্তার অমিতপ্রভাতেই ভারতবর্ষ জগৎ-ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে বিরাজ করছে। প্রাচীন ভারতের কাছে কবির অন্তরের প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে অবিস্মরণীয় ভাষায়—

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব ॥

ভারতবর্ষের যে মুক্ত মহাজীবন ভগবান্ বুদ্ধের তপস্যায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল মগধকোশলাদি জনপদের বেণুবন আম্রবন জেতবন প্রভৃতি তপোবনে, প্রিয়দর্শী অশোকের সাধনায় তাই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজসিংহাসনে। এই রাজতপস্বীর জীবনসাধনার কথা অক্ষয় শিলারেখায় বিধৃত হয়ে থাকলেও তা বহুকালব্যাপী মূঢ়তার ঘনান্ধকারে আবৃত হয়ে ছিল। সুদীর্ঘ মোহরজনীর অবসানে ইতিহাসসূর্যের অরুণ-কিরণসম্পাতে সেই মহাজীবনের অপূর্ব রূপ আজ আবার ভাস্বর রেখায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে নবীন ভারতের সম্মুখে রাজর্ষি অশোকের মোহন মূর্তিতে। তাই আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই রাজমূর্তিকে কবির ভাষায় সম্বোধন করে বলতে পারি—

হে রাজতপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন ॥

ঋতুসংহার

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

ঋতুসংহার কি কালিদাসের রচনা ?

ঋতুসংহার কাব্যটি সত্যই কালিদাসের রচনা কি না, এই প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে আজও পর্যন্ত বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। তবে, মোটামুটিভাবে, ইহা কালিদাসেরই নবীন বয়সের রচনা, ইহাই প্রচলিত সিদ্ধান্ত। যাঁহারা ঋতুসংহারকে কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহাদের কয়েকটি যুক্তি উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, মল্লিনাথ তাঁহার রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এই দুইটি মহাকাব্যের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে অবতরণিকা শ্লোকে বলিয়াছেন—

ভারতী কালিদাসস্য দুর্ব্যাখ্যাবিষমূর্চ্ছিতা।
এষা সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা তামদ্যোজ্জীবয়িষ্যতি ॥

কালিদাসের বাণী আজ দুর্ব্যাখ্যারূপ বিষক্রিয়ায় মূর্চ্ছাগ্রস্ত ; আমার এই 'সঞ্জীবনী' ব্যাখ্যাই তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—

মল্লিনাথকবিঃ সোঽয়ং মন্দাত্মানুজিঘৃক্ষয়া।
ব্যাচষ্টে কালিদাসীয়ং কাব্যত্রয়মনাকুলম্ ॥

মল্লিনাথকবি জড়বুদ্ধি পাঠকগণের অনুগ্রহের জন্য কালিদাসের 'কাব্যত্রয়' নির্মলভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সুতরাং মল্লিনাথ নিজেই স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, তিনি কালিদাসের 'কাব্যত্রয়ে'র উপরই সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত— এই তিনখানি কাব্যই মল্লিনাথ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং ঐগুলি যে কালিদাসের রচনা সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই। ঋতুসংহারের উপর মল্লিনাথের কোনও টীকা নাই— সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে এই অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয় যে, মল্লিনাথের মতে ঋতুসংহার কালিদাসের রচনা নহে।[১] কিন্তু এই যুক্তির ভিত্তি খুব দৃঢ় নহে। মল্লিনাথ কালিদাসের সেই তিনখানি কাব্যেরই টীকা রচনা করিয়াছিলেন, যেগুলি 'দুর্ব্যাখ্যা-বিষের দ্বারা মূর্চ্ছিত' হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ঋতুসংহারের ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন ছিল না, তাই মল্লিনাথের টীকা রচনারও কোনও আবশ্যকতা ছিল না— এইরূপ অনুমানই অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হয়।

বিরোধী পক্ষের দ্বিতীয় যুক্তিটিও সমর্থনযোগ্য মনে হয় না। কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের তুলনায় ঋতুসংহারের রচনাশৈলী দুর্বল, কবিত্বশক্তির ন্যূনতা ও অপরিপক্ক অবস্থাও বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তাই বলিয়া

---

১ তুলনীয় "In a MS. taken to China at some comparatively early date, and written, according to Dr. Nobel, about 1200 A.D., the scribe has copied out the beginnings of the *Kumārasambhava,* the *Meghadūta* and the *Raghuvaṃśa* and adds some obscure Akṣaras which may possibly be read as *traya kāvyaḥ viśeṣa traya kāvyam.* Hence it is deduced that the scribe desired to give the beginning of the Kāvyas of Kālidāsa and knew only three. The argument is really too preposterous to need refutation."—A. Berriedale Keith : *The Authenticity of the Ṛtusaṁhāra* in *JRAS,* 1912, pp. 1066 ff.

ঋতুসংহারকে কালিদাসের কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যাইবে না কেন? ঋতুসংহার কবির নবীন বয়সের রচনা, দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রে যেমন মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক। অতএব বয়সের নবীনতাই ভাষা ও ভাবের অপরিণত অবস্থার একমাত্র সংগত কারণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। ইহা ছাড়া, কালিদাসের অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে যেসকল বৈশিষ্ট্য ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি ঋতুসংহার কাব্যখানির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। প্রকৃতিপ্রীতি কালিদাসের প্রতিভার একটি বিশেষ ধর্ম— ঋতুসংহারের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত তাহাই মূল সুর। কালিদাস তাঁহার পরিণত রচনাবলীর বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন— কালিদাসের দৃষ্টিতে এই মর্ত্য ভুবন যেন একটি সুবিস্তীর্ণ 'ঋতুরঙ্গশালা'। ঋতুসংহারে তাঁহার পরিণত কবিমানসের সেই বিশিষ্ট দৃগ্‌ভঙ্গীরই যেন পূর্বাভাষ আমরা পাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—

"In *Meghadūta* he describes the rainy season, in *Sakuntalā* the summer, in *Vikramorvaśī* the winter, again, in *Kumārasambhava* the untimely spring, in *Mālavikāgnimitra* the spring in a royal garden and in *Raghuvaṃśa* almost all the seasons. He describes the summer in the 16th, the rains in the 12th, the autumn in the 4th, and the spring in the 9th Canto. But the germs of all these magnificent descriptions are to be found in the *Ṛtusaṁhāra*. There cannot be the least shadow of a doubt that all the seven poems are by the same great poet and it is a matter of congratulation that with a careful and deep study of his works the number of those who held that all the books were not by one man is diminishing rapidly."[২]

এমন কি, ম্যাক্‌ডোনেল্ সাহেব তাঁহার 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' নিবন্ধে ঋতুসংহার সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে—

"Perhaps no other work of *Kālidāsa's* manifests so strikingly the poet's deep sympathy with nature, his keen powers of observation, and his skill in depicting an Indian landscape in vivid colours."[৩]

ঋতুসংহার কাব্যখানি এতদূর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত না হইলেও কালিদাসের রচনার মূল লক্ষণগুলি যে ইহাতে অপরিণত অবস্থায় বিরাজমান, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমনই সারবান্ তেমনই সার্থক—

"In the absence of external evidence, which is in itself of little value unless received from definite and contemporary or almost contemporary sources, the test of personality is all important . . . . In the *Seasons,* Kālidāsa's personality is distinctly perceived as well as his main characteristics, his force of vision, his architecture of style, his pervading sensuousness, the peculiar temperament of his similes, his characteristic strokes of thought and imagination, his individual and inimitable cast of description. Much of it is as yet in a half-developed state, crude consistence, not yet fashioned with the masterly touch he soon

---

২ *Kālidāsa : Chronology of his Works and Learning,* Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. II, Pt. II, p. 184.

৩ *Sanskrit Literature,* p. 317.

manifested, but Kālidāsa is there quite as evidently as Shakespeare in his earlier works, the *Venus and Adonis* or *Lucrece*."[8]

অন্যান্য যুক্তিগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অলংকার নিবন্ধসমূহে ঋতুবর্ণনের উদাহরণ প্রসঙ্গে ঋতুসংহার হইতে কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হয় নাই, ইহা সত্য বটে; কিন্তু একই কবির পরিণত রচনা হইতে উদাহরণ উদ্ধার করিয়া দেখানো যেখানে সম্ভব, সেখানে তাঁহার অপরিণত বয়সের রচনার অনুল্লেখ কি অযৌক্তিক?[৫] তাহার দ্বারা ঋতুসংহার কালিদাসের রচনা নয়— ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করা যায় না।

ঋতুসংহারের কাব্যবস্তু

'ঋতুসংহার' নামটিই বিষয়বস্তুর পরিচায়ক। কবি এই স্বল্পপরিসর খণ্ডকাব্যে ছয়টি প্রধান ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন—গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত। কবি নিদাঘতপ্তা বিশুষ্কশোভা প্রকৃতির বর্ণনা দিয়া তাঁহার কাব্য শুরু করিয়াছেন, যেন বসন্তপুষ্পাভরণা প্রকৃতিরাণীকে কাব্যের অবসানে পাঠকের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্যই।[৬] প্রচণ্ডসূর্য, স্পৃহণীয়চন্দ্রমা নিদাঘকাল উপস্থিত হইয়াছে; বারিবিহারনিরত তরুণ-তরুণীগণের বাহুসঞ্চালনে সরোবরের বিশুষ্কপ্রায় জলরাশি সর্বদাই আন্দোলিত হইতেছে।

এই নিদাঘের দিবসাবসান কিন্তু বড়ই রমণীয়। বসন্তের কামোন্মত্ততা প্রশান্তপ্রায়। এইভাবে কবি নিদাঘের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন—

---

৪ *Kālidāsa*, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, Second Edition, 1950, pp. 29-30.

'ঋতুসংহারে'র বর্ষাপ্রকৃতির বর্ণনার সহিত তুলনায় 'মেঘদূতে'র বর্ষাবর্ণনা অনেক পরিণত। কিন্তু 'ঋতুসংহার' তাই বলিয়া কালিদাসের রচনা নহে, এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা কবিত্বশক্তির অভিব্যক্তির সম্ভাবনাই মূলতঃ অস্বীকার করেন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে ডাঃ কীথের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—"The difference between the *Eclogues* and *Georgics* of Vergil are much more marked, and yet their ascription to Vergil is in both cases beyond all doubt. Again, the poems of Catullus show a variety much greater than that found in the case of Kālidāsa's poems."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 1912, p. 1069, footnote 3.

৫ তুলনীয় 'ঋতুবর্ণনম্—রঘুবংশ-হরিবংশ-শিশুপালবধাদৌ'—অলঙ্কারতিলক, পৃ ১৬। অপিচ—'তত্র ঋতুবর্ণনে শরদ্-বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাদি-বর্ণনানি সেতুবন্ধ-হরিবিজয়-রঘুবংশ-হরিবংশাদৌ'—অলংকারচূড়ামণি, পৃ ১৬।

৬ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিন্তু বলেন: "He begins with the summer because in Northern India the astronomers always began their year with the vernal equinox ushering in the hot season." —*JBORS*, Vol. II. 1916. পৃ ১৭৯. রাজশেখর তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'র 'কালবিভাগ' শীর্ষক অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'বর্ষাঋতু' হইতেই বর্ষগণনা লোকব্যবহারসিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—"ষণ্ণামৃতূনাং পরিবর্তঃ সংবৎসরঃ। স চ চৈত্রাদিরিতি দৈবজ্ঞাঃ, শ্রাবণাদিরিতি লোকযাত্রাবিদঃ। তত্র নভা নভস্যশ্চ বর্ষাঃ..."—কাব্যমীমাংসা, পৃ. ৯৮-৯৯ (Gaekwad Oriental Series Edn.) 'কাব্যমীমাংসা'র উল্লিখিত-অধ্যায়ে ঋতুবর্ণনবিষয়ক অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, এবং 'ঋতুসংহারে'র সহিত সেগুলির ভাষা, ভাব ও বর্ণনপদ্ধতির দিক্ দিয়াও বেশ সাম্য আছে। ঋতুবর্ণন যে সংস্কৃত কবিগণের একটি বিশেষ প্রিয় বিষয় ছিল তাহা রাজশেখরের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি হইতেই বুঝিতে পারা যায়—

"এক-দ্বি-ত্র্যাদিভেদেন সামস্ত্যেনাথবা ঋতূন্।

প্রবন্ধেষু নিবধ্নীয়াৎ ক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ বা।"—ঐ. পৃ. ১১২

প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়-চন্দ্রমাঃ
সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো
নিদাঘকালোঽয়মুপাগতঃ প্রিয়ে।

কামিগণ নিদাঘের সুখোপসেব্য নিশীথকালে সুবাসিত প্রাসাদপৃষ্ঠে গীতোৎসবে মগ্ন; প্রিয়ার সুগন্ধবাসিত মধুপানে তাহারা মত্ত হইয়াছে। কামিনীগণের দেহযষ্টিও আজ স্বল্প আভরণে ভূষিত। স্তনদ্বয় চন্দনপঙ্কচর্চিত, নিতম্বদেশে হেমমেখলা ও উন্নতবক্ষোদেশে চীনাংশুকের তনু আবরণ—

সমুদ্গতস্বেদচিতাঙ্গসন্ধয়ো
বিমুচ্য বাসাংসি গুরূণি সাম্প্রতম্।
স্তনেষু তন্বংশুকমুন্নতস্তনা
নিবেশয়ন্তি প্রমদাঃ সযৌবনাঃ।

কবি এইভাবে যেমন একদিকে অন্তঃপুরে প্রমোদোৎসবের বর্ণনা দিয়াছেন, অপরদিকে নিদাঘতপ্ত ধূসর দিবাভাগের রুক্ষ মূর্তির চিত্রও আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। রবিকরতপ্ত ফণী আজ শত্রুতা ভুলিয়া ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; মৃগপতিও আজ হতোদ্যম, অদূরস্থিত গজযূথকে উপেক্ষা করিয়া সে অলস মধ্যাহ্নে বিলোলজিহ্ব হইয়া অবস্থান করিতেছে; বরাহযূথ উত্তাপ-প্রশমনের উদ্দেশ্যে মুখাগ্রভাগ দ্বারা প্রোথিত কর্দমশয্যায় লুন্ঠিত হইতেছে; মহিষকুলও তৃষার্ত হইয়া অদ্রিকন্দরনিঃসৃত জলধারার দিকে ধাবিত হইতেছে। দাবাগ্নিদগ্ধ বনভূমির শ্যামলতা শুষ্কপ্রায়; দাবদাহভীত বিহগকুল পর্ণশূন্য বৃক্ষের অগ্রভাগে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে; কপিকুল অদ্রিনিকুঞ্জে আশ্রয়গ্রহণে উদ্যত; গবয়যূথ জলান্বেষণে ইতস্ততঃ প্রধাবিত। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে দাবাগ্নির বর্ণনা যারপর নাই বাস্তব—

জ্বলতি পবনবৃদ্ধঃ পর্বতানাং দরীষু
স্ফুটতি পটুনিনাদৈঃ শুষ্কবংশস্থলীষু।
প্রসরতি তৃণমধ্যে লব্ধবৃদ্ধিঃ ক্ষণেন
গ্লপয়তি মৃগবর্গং প্রান্তলগ্নো দবাগ্নিঃ।
বহুতর ইব জাতঃ শাল্মলীনাং বনেষু
স্ফুরতি কনকগৌরঃ কোটরেষু দ্রুমাণাম্।
পরিণতদলশাখানুৎপতৎপ্রাংশুবৃক্ষান্
ভ্রমতি পবনধূতঃ সর্বতোঽগ্নির্বনান্তে।

শ্রীঅরবিন্দের মতে ঋতুসংহারের ছয়টি সর্গে কবি যে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রথম সর্গে বর্ণিত নিদাঘবর্ণনাই শ্রেষ্ঠ। কালিদাসের উদ্ভিদ্যমান কবিপ্রতিভার পূর্ণ সৌরভ যেন এই সর্গেই আমরা পাই—

"In the poem on Summer we are at once seized by the marvellous force of imagination, by the unsurpassed closeness and clear strenuousness of his gaze on the object; in the expression there is a grand and concentrated precision which is our first example of the great Kālidāsian manner, and an imperial power, stateliness and brevity of speech which

is our first instance of the high classical diction. But this Canto stands on a higher level than the rest of the poem."[৭]

দ্বিতীয় সর্গের বর্ষাবর্ণনের প্রারম্ভিক শ্লোকটিও বড় মধুর—

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরঃ
তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতধ্বনি-
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে॥

বর্ষাঋতু যেন রাজসমারোহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—ঘনকৃষ্ণ মেঘরাজি যেন গজসৈন্য, ইতস্ততঃ স্ফুরিত তড়িল্লেখাসমূহ যেন পতাকার মত শোভা পাইতেছে, বজ্রঘোষ যেন মৃদঙ্গধ্বনি। বর্ষার আড়ম্বর বর্ণনার মধ্য দিয়াই বেশ সূচিত হইয়াছে।[৮] আজ তৃষ্ণার্ত চাতককুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবী আজ বররত্নভূষিতা বরাঙ্গনার মত শোভা পাইতেছে—চতুর্দিকে নবোদ্‌গত তৃণাঙ্কুরের শ্যামল সমারোহ পৃথিবীতলকে যেন বৈদূর্যমণিভূষিত করিয়াছে; ইন্দ্রগোপকীটসমূহ রক্তবর্ণ প্রবালখণ্ডের মত সেই শ্যামশোভাকে আরও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। নিদাঘের খরতাপে শীর্ণ তটিনীসমূহও আজ স্ফীতকায়া, বিভ্রমবিলাসিনী রমণীগণের মত যেন তাহারা মত্তবেগে সমুদ্র-নায়কের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছে—

নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্
প্রবৃদ্ধবেগাঃ সলিলৈরনির্মলৈঃ।
স্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্টা ইব জাতবিভ্রমাঃ
প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্॥

ঘনান্ধকারাবৃত বর্ষারজনীতে মেঘের গর্জন উপেক্ষা করিয়া অভিসারিকাগণ কিন্তু প্রিয়গৃহ অভিমুখে অভিসারে চলিয়াছে—

সুতীক্ষ্ণমুচ্চৈ রসতাং পয়োমুচাং
ঘনান্ধকারাবৃতশর্বরীষ্বপি।
তড়িৎপ্রভাদর্শিতমার্গভূময়ঃ
প্রযান্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

বর্ষার নববারি গিরিগাত্র বিধৌত করিয়া সর্পিলগতিতে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে— নানাবিধ বন্যকীট, ধূলিকণা ও তৃণখণ্ডে সেই জলধারা আবিল, এবং ভেককুল ত্রস্তভাবে সেই খরস্রোতা নির্ঝরিণীর দিকে চাহিয়া আছে। কামিনীগণও আজ বর্ষার অনুরূপ বেশভূষায় তাহাদের দেহ সুসজ্জিত করিয়াছে— তাহাদের কেশদামে কদম্ব, নবকেশর ও কেতকীর মাল্য, কর্ণান্তরে কুটজকুসুমের মঞ্জরী। কালাগুরু ও চন্দনের অনুলেপনে তাহাদের অঙ্গ চর্চিত— এইরূপ দৃষ্টিবিমোহন ভূষায় প্রসাধিত হইয়া তাহারা বর্ষাপ্রদোষ অতীত হইতে না হইতেই গুরুগৃহ ত্যাগ করিয়া প্রিয়সংগমকাতর হইয়া শয্যাগৃহে প্রবেশের জন্য উন্মুখ হইয়াছে। নিম্নের শ্লোকটিতেও তরুণ কবির নারীর দেহশোভাবর্ণনার অভিনবভঙ্গীটি বেশ লক্ষণীয়—

---

৭ *Kālidāsa,* pp. 36-37.

৮ "In all eight varieties of metre are used in the six cantos of *Ṛtusaṃhāra.* And some of the meaning is in the sound."—R. S. Pandit.

দধতি কুচযুগাগ্রৈরুন্নতৈর্হারযষ্টিং
প্রতনু-সিতদুকূলান্যায়তৈঃ শ্রোণিবিম্বৈঃ।
নবজলকণসেকাদুন্নতাং রোমরাজীং
ত্রিবলিবলিতশোভাং মধ্যদেশৈশ্চ নার্যঃ॥

এতদিন পরে দাবদগ্ধ বিন্ধ্যপর্বতের শৃঙ্গরাজি বর্ষার ধারাসারের স্নিগ্ধ সম্পর্ক লাভ করিয়া যেন শান্তিলাভ করিল—

জলভরনমিতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈ-
রয়মিতি জল সেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ
সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্॥

বর্ষাপগমে শরদ্বর্ণনাও মনোজ্ঞ। শরৎপ্রকৃতি আজ নববধূর ন্যায় অভিনব সজ্জায় সজ্জিত—

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদ-হংসরুত-নূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিললিতানতগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রম্যরূপা॥

আকাশ আজ শ্রান্তবর্ষণ লঘু শুভ্র মেঘপংক্তির দ্বারা সমাচ্ছন্ন— শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি যেন ঋতুরাজ শরতের রাজচিহ্ন চামরশতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। নদীবক্ষে কারণ্ডবকুল সানন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তীরভাগ কাদম্ব ও সারসপংক্তির দ্বারা সমাকুল, এবং চতুর্দিক্ হইতেই হংসের সুমধুর নিনাদ দর্শকের শ্রোত্রসুখ বিধান করিতেছে। কুসুমশোভা কদম্ব-কুটজ-অর্জুন-সর্জ-নীপতরুরাজিকে পরিত্যাগ করতঃ স্নিগ্ধচ্ছায় সপ্তচ্ছদবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছে। উপবনপ্রদেশ শেফালিকা কুসুমের গন্ধে সুরভিত, তরুশাখা-নিষণ্ণ পক্ষিসঙ্ঘের সুমধুর কাকলীগানে মুখরিত। কুসুমভারাবনতা শ্যামালতা সুন্দরী রমণীর বিভূষণভূষিত পেলব বাহুর শোভা ধারণ করিয়াছে। কামিনীগণের শারদ প্রসাধনও লক্ষণীয়—

কেশান্নিতান্তঘননীল বিকুঞ্চিতাগ্রান্
আপূরয়ন্তি বনিতা নবমালতীভিঃ।
কর্ণেষু চ প্রচলকাঞ্চনকুণ্ডলেষু
নীলোৎপলানি বিবিধানি নিবেশয়ন্তে॥
হারৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডলানি
শ্রোণীতটং সুবিপুলং রসনাকলাপৈঃ।
পাদাম্বুজং কনকনূপুরশেখরৈশ্চ
নার্যঃ প্রহৃষ্টমনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি॥

ঋতুসংহারে প্রত্যেক সর্গে কবির দৃষ্টি মুখ্যতঃ দুই দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়— প্রথমতঃ, সেই ঋতুর উপযোগী প্রকৃতির বর্ণনা ও কামিনীগণের শরীরশোভা ও প্রসাধন বর্ণনা। প্রকৃতি ও নারী—কবির দৃষ্টিতে যেন এ দুইটি অবিচ্ছেদ্য।[১] তরুণ কবি নারীদেহ ও নারীর কামবিলাস—কোনটির

---

১ দ্রষ্টব্য "One thing is certain. The one great peculiarity of Kālidāsa's early poetry is that he admires nature more ardently than the fair sex."—Haraprasad Sastri, *JBORS*. Vol. II. 1916, p. 180.

বর্ণনাতেই কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত রণজিৎ পণ্ডিতের 'ঋতুসংহারে'র ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধার করিতেছি—

The poet depicts the woman's world, her love-life and the sphere of the eternal feminine. The detailed description of her dress and decoration, jewellery and flowers, beauty aids and toilet accessories, the make up of eyes, face and lips, the use of subtle perfumes and cosmetics sound familiar and modern and the centuries are obliterated. . . . Some women are portrayed in dishabille, stretched in the mild winter sun like a kitten, and others in bedroom scenes. The description is 'near the bone' and leaves nothing ambiguous as far as frankness goes; it is sometimes startling in detail, and in its casual implications. No painter can paint a portrait with his eyes half-closed. Yet the Eve portrayed in these lyrics can remain naked and the beholder is not compelled to lower his eyelids [১০]

'ঋতুসংহারে'র হেমন্ত ও শিশির ঋতুদ্বয়ের বর্ণনা পাঠ করিলে স্বর্গত পণ্ডিতের উপরি উদ্ধৃত মন্তব্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গ কামিনীগণের দেহপ্রসাধন ও শৃঙ্গারকেলির আবরণলেশহীন বর্ণনায় ভরপুর। কালিদাস যে সত্যই শৃঙ্গারী কবিগণের মূর্দ্ধাভিষিক্ত ছিলেন, তাহা ঋতুসংহারে এই দুইটি সর্গ পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবে কবির দৃষ্টি সর্বদাই উন্মুক্ত, উদার, সংকোচলেশশূন্য—প্রকৃতির শোভাবর্ণনাতে যেমন কোনও সংকোচ নাই, নারীর দেহশোভা ও শৃঙ্গারচেষ্টা-বর্ণনেও তেমনই কোনও গোপনীয়তার হেতু নাই। সেইজন্য 'ঋতুসংহার'কে সাধারণ pornography'র সহিত তুলনা করা সমীচীন হইবে না—'ঋতুসংহার' কামপ্রধান বটে, কিন্তু এই কাম সদ্য-উদ্ভিন্ন তারুণ্যের উচ্ছলিত প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ডি. এইচ্. লরেন্সের কথায় বলিতে পারা যায়—"What is pornography to one man is the laughter of genius to another."[১১]

ষষ্ঠ সর্গে বাসন্তী প্রকৃতির বর্ণনাও বেশ মনোজ্ঞ। বসন্তাগমে বনভূমি যেন রক্তাংশুকসজ্জিতা নববধূর ন্যায় শোভা পাইতেছে—

> আদীপ্তবহ্নিসদৃশৈরপি পারিজাতৈঃ
> সর্বত্র কিংশুকবনৈঃ কুসুমাবনম্রৈঃ।
> সদ্যো বসন্তসময়ে সমুপাগতে চ
> রক্তাংশুকা নববধূরিব ভাতি ভূমিঃ।

কিংশুকবনরাজি কুসুমভারাবনত, দীপ্তবহ্নিশিখাসদৃশ কুসুমকোরকে পারিজাত-বৃক্ষরাজি পরিব্যাপ্ত; মনে হইতেছে যেন বসন্তনায়কের অতর্কিত আবির্ভাবে আজ পৃথিবী রক্তাংশুকশোভিতা নববধূরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।[১২]

---

১০ *Ritusamhāra or The Pageant of Seasons.* Translated from the Original Sanskrit lyrics of Kālidāsa. By R. S. Pandit. Bombay, 1947. p. 18.

১১ এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের উক্তিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; "His (Kālidāsa's) sensuousness is not coupled with weak self-indulgence, but is rather a bold and royal spirit seizing the beauty and delight of earth to itself and compelling all the senses to minister to the enjoyments of the spirit rather than enslaving the spirit to do the will of the senses."—*Kālidāsa,* p. 35.

১২ তুলনীয় বালেন্দুবক্রাণ্যবিকাশভাবাদ্বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্। —কুমারসম্ভব ৩০

তির্যক্ প্রাণিজগতের মধ্যেও বসন্তের প্রভাব সুস্পষ্ট—

পুংস্কোকিলশ্চূতরসেন মত্তঃ
প্রিয়ামুখং চুম্বতি সাদরোঽয়ম্।
গুঞ্জদ্দ্বিরেফোঽপ্যয়মম্বুজস্থঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ প্রকরোতি চাটুম্।

চূতরসমত্ত পুংস্কোকিল সাদরে প্রিয়ার মুখ চুম্বন করিতেছে; ভ্রমরও পদ্মকোরকমধ্যে অবস্থান করতঃ মধুর গুঞ্জনধ্বনি করিয়া যেন প্রিয়ার চাটুরচনায় তৎপর হইয়াছে।[১৩]

ঋতুসংহার ও মন্দশোর শিলালেখ

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থলে বৎসরের বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা লক্ষিত হইয়া থাকে। ঋগ্‌বেদের নানা সূক্তে বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তবে 'রামায়ণে' মহাকবি বাল্মীকির নিপুণ লেখনীতে বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত প্রভৃতি ঋতুর যে জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, খুব সম্ভব কালিদাসের 'ঋতুসংহার' প্রণয়নে তাহাই মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—

A perusal of Mandasore inscriptions shows that description of seasons was a fashion among the poets in that part of the country. The inscription of 404 A.D. describes the rainy season; the inscription of 423 describes the autumn; the inscription of 437 describes the winter; the inscriptions of 473 and 533 describe the spring. So in early youth Kālidāsa caught the fancy of describing all the seasons and in no other part of India are the traditional six seasons so well defined and so well marked as in Western Malwa.

শাস্ত্রিমহাশয়ের মতে কালিদাস ছিলেন পশ্চিম মালবের অন্তর্গত দশপুরের অধিবাসী, এবং দশপুরের প্রাচীন শিলালেখসমূহে ঋতুবর্ণনের যে প্রথা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহাই উদীয়মান কবিকে 'ঋতুসংহার' রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল।[১৪] এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতবিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিশারদ অধ্যাপক কীল্‌হর্নের মতেরও কতটা মিল আছে—যদিও তাঁহার মতে কালিদাসই উত্তমর্ণ, তাঁহারই প্রভাবে দশপুরের শিলালেখ-সমূহে ঋতুবর্ণন প্রথার সূত্রপাত। বস্তুতঃ, 'ঋতুসংহারে'র পঞ্চম সর্গে শিশিরবর্ণনের অন্তর্গত—

---

১৩ তুলনীয় মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥ কুমার ৩

'ঋতুসংহারে' বসন্তবর্ণনার সহিত 'কুমারসম্ভবে'র তৃতীয় সর্গে অকালবসন্তের আবির্ভাব-বর্ণনার বিশেষ সাজাত্য দেখা যায়। 'আমূলতো বিদ্রুমরাগতাম্রাঃ সপল্লবং পুষ্পচয়ং দধানাঃ। কুর্বন্ত্যশোকা হৃদয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্॥'—ঋতুসংহারের এই শ্লোকটির সহিত কুমারসম্ভবের—'অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি'—এই শ্লোকাংশটি তুলনীয়।

১৪ *'Kālidāsa: Chronology of his Works and his Learning'* শীর্ষক প্রবন্ধেও শাস্ত্রিমহাশয় লিখিয়াছেন—"Kālidāsa passed his novitiat in writing the *Ṛtusaṃhāra*. He was indeed induced to write on the seasons, because he found all round the country he inhabited, descriptions of seasons almost in every inscription. He thought perhaps it would be doing a service to his country, if he could describe all the seasons together. So he undertook to write the *Ṛtusaṃhāra*"—*JBORS*. Vol. II. 1916, p. 179.

নিরুদ্ধবাতায়নমন্দিরোদরং
হুতাশনো ভানুমতো গভস্তয়ঃ।
গুরূণি বাসাংস্যবলাঃ সযৌবনাঃ
প্রয়ান্তি কালেঽত্র জনস্য সেব্যতাম্।
ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং
ন হর্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্মলম্।
ন বায়বঃ সান্দ্র-তুষার-শীতলা
জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্।

এই দুইটি শ্লোকের সহিত বৎসভট্টির মন্দশপুর প্রশস্তির অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলির বিশেষ সাজাত্য আছে—

রামাসনাথভবনোদর[১৫]-ভাস্করাংশু-
বহ্নিপ্রতাপসুভগে জললীনমীনে।
চন্দ্রাংশুহর্ম্যতলচন্দনতালবৃন্ত-
হারোপভোগরহিতে হিমদগ্ধপদ্মে।
রোধ্র-প্রিয়ঙ্গুতরু-কুন্দলতা-বিকোশ-
পুষ্পাসব-প্রমুদিতালিকলাভিরামে।
কালে তুষারকণকর্কশশীতবাত-
বেগপ্রবৃত্তলবলীনগনৈকশাখে।
স্মরবশগতরুণজনবল্লভাঙ্গনা-বিপুলকান্তপীনোরু—
স্তনজঘনঘনালিঙ্গন-নির্ভৎ সিততুহিনহিমপাতে॥

অধ্যাপক কীলহর্নের মতে বৎসভট্টি প্রশস্তিতে শিশিরবর্ণনা ঋতুসংহারের শিশিরবর্ণনার দ্বারা অনুপ্রাণিত।[১৬] কালিদাসের কালনির্ণয় এখনও সন্দেহগ্রস্ত; অতএব কালিদাসই যে 'মন্দশোর'-প্রশস্তির নিকট ঋণী—এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর। তবে কালিদাসের মৌলিকতা সম্বন্ধে একথা অবশ্যই বলা চলিতে পারে যে, রামায়ণ-মহাভারতে অথবা বিভিন্ন শিলালেখে ঋতুবর্ণনের যে সকল নিদর্শন আমরা পাই, সেগুলি বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত। কালিদাস ছয়টি বিভিন্ন ঋতুকে কামাকুলচিত্ত তরুণের এক অভিন্ন নবীন দৃষ্টিকোণ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলে, কালিদাসের এই খণ্ডকাব্যে একটি

---

১৫ ফ্লীটের 'গুপ্তলেখমালা' (*Gupta Inscriptions*) নিবন্ধে 'রামাসনাথ-রচনে দর—' এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু অধ্যাপক কীলহর্ন কর্তৃক সংশোধিত সংস্করণে 'রামা-সনাথ-ভবনোদর—' এইরূপ পাঠই প্রস্তাবিত হইয়াছে। দ্রষ্টব্য: Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität des Götingen, 1890.

১৬ "Prof. Kielhorn's point is, that the composer of the inscription must have had these verses running in his mind; and consequently that the *Ṛtusaṁhāra* must have been composed before A.D. 472. This seems likely enough. And we know already, from the Aihole Mêguṭi inscription that the fame of Kālidāsa, as also of Bhāravi, was well established far to the South of Mandasôr, before A.D. 634."—Notes and Queries: *Indian Antiquity*, Vol. XIX. p. 285.

বিশেষ অভিপ্রায় ছয়টি সর্গকে এক সংহতিসূত্রে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে।[১৭] প্রকৃতিবর্ণনা এই ক্ষুদ্র কাব্যটিতে আপাতদৃষ্টিতে মুখ্য বলিয়া মনে হইলেও, বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র দৃশ্যরাজির দ্বারা উদ্বুদ্ধ কামিজনের চিত্তবৃত্তির নিপুণ প্রতিফলনই যেন তরুণ কবির গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়।[১৮] রবীন্দ্রনাথ 'ঋতুসংহারে'র এই মূল বার্তাটিই তাঁহার 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত চতুর্দশপদী কবিতাটিতে অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন—

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসে আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য-সিংহাসন-'পরে।
মরকত পাদপীঠ বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণরাজছত্র ঊর্ধ্বে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের 'পরে। ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি ;
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে। ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসরভবন।
নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী—
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।

ঋতুসংহারের কাব্যোৎকর্ষ

স্বর্গত রণজিৎ পণ্ডিত তাঁহার 'ঋতুসংহারে'র ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় সত্যই বলিয়াছেন—

Kālidāsa is both a painter and a poet; the painter to whom the world is a pageant and the poet for whom the world is a song.

কালিদাস তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়া এই শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় পৃথিবীর মাধুর্য অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার সেই অনুভূতি সংগীতের ন্যায় বিমোহিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। জড় ও চেতন জগতের উপর কোন্ ঋতুর কেমন প্রভাব, ইহা তিনি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। তবে 'মেঘদূতে' প্রকৃতিবর্ণনায় কালিদাস অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিকও বটে। কেননা, 'মেঘদূত' কালিদাসের পরিণত রচনা। 'ঋতুসংহারে' কবি যেন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তিনি যেন একজন সুনিপুণ অথচ উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র—যেমন যেমন দৃশ্য দেখিতেছেন, তেমনই তিনি প্রিয়ার

---

১৭ তুলনীয় ছটা ঋতু পূর্ণ ক'রে ঘটত মিলন স্তরে স্তরে
ছটি সর্গে বার্তা তাহার রইত কাব্যে গাঁথা।—'সেকাল' : রবীন্দ্রনাথ

১৮ তুলনীয় "The title is perhaps a little misleading, as the description is not objective, but deals with the feelings awakened by each season in a pair of young lovers. Indeed, the poem might be called a Lover's Calendar."—A. W. Ryder: *Kālidāsa* (Translations of Shakuntala and other Works. Everyman's Library), p. 211.

নিকট তাহার হুবহু বর্ণনা দিয়া চলিয়াছেন; কবি তাঁহার নিজের সত্তা এখনও প্রকৃতিসত্তায় লীন করিয়া দিতে পারেন নাই। কিন্তু 'মেঘদূতে' পূর্বমেঘে প্রকৃতির যে জীবন্ত বর্ণনা পাই তাহা পড়িয়া মনে হয়, যেন কবি প্রকৃতির সহিত নিজেকে অভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। "কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু" —ইহা শুধু কামোন্মত্ত যক্ষের মুখের কথা নহে; উহা যেন কালিদাসের পরিণত কবিমানসের একটি বিশিষ্ট পরিচয় বহন করিতেছে। 'মেঘদূতে', 'রঘুবংশে' বা 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে কবি সত্যই জড় ও চেতনের মধ্যে বিভেদ যেন বিস্মৃত হইয়াছেন। একজন খ্যাতনামা পাশ্চাত্য সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—

It is hardly true to say that he (Kālidāsa) personifies rivers and mountains and trees; to him they have a conscious individuality as truly and as certainly as animals or men or gods. Fully to appreciate Kālidāsa's poetry one must have spent some weeks at least among wild mountains and forests untouched by man; there the conviction grows that trees and flowers are indeed individuals, fully conscious of a personal life and happy in that life. [১১]

আর-এক দিক্‌ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, 'ঋতুসংহার' কালিদাসের কবিপ্রতিভার অপরিণত অবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। কালিদাস শৃঙ্গারী কবিগণের মূর্ধন্য—ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাঁহার পরিণত রচনায় বৈষ্ণব ভক্ত ও পদকারগণের মত, কাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য সুনিপুণভাবে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। 'শকুন্তলা'য় যৌনরতির এই দুইটি রূপ যেমন ভাবে কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আর কোনও কাব্যে ততখানি সুন্দরভাবে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'মেঘদূত'—এই দুইটি রচনাকে বাদ দিলে, কালিদাস যে কাম ও প্রেমের পরস্পর বিভেদ সম্পর্কে অতিশয় জাগরূক ছিলেন, ইহা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 'ঋতুসংহারে' কামই প্রধান, রূপতৃষ্ণা ও ভোগস্পৃহাই নায়কের চিত্তের আর সব বৃত্তিকে যেন ছাপাইয়া উঠিয়াছে; প্রেমের উচ্চতর আদর্শ, সন্তানলাভে যাহার পরিপূর্ণতা, সে বিষয়ে কবি যেন এখনও সচেতন হইয়া উঠেন নাই। 'ঋতুসংহারে' কাম এখনও পার্থিব ভোগলালসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ— উহা এখনও অপার্থিব প্রেমের স্তরে উন্নীত হয় নাই।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ঋতুসংহারে কবিপ্রতিভার আর একটি বিশেষ ন্যূনতা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা হইতেছে, ঋতুসংহারের মূল লক্ষ্যের সহিত কাব্যবস্তুর অসংগতি। প্রকৃতির উপর ঋতুচক্রের দৃশ্যমান প্রভাবের বর্ণনাই কবির মূল লক্ষ্য। কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নারী ও প্রকৃতি কালিদাসের কবিদৃষ্টিতে মিশিয়া গিয়াছে। 'ঋতুসংহারে'ও তাই দুইয়েরই বর্ণনা আছে। প্রথম তিনটি সর্গে গ্রীষ্ম বর্ষা এবং শরতের বর্ণনায় নারীও প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে একটি সুসঙ্গত ভারসাম্য আছে; কিন্তু পরবর্তী সর্গদ্বয়ে হেমন্ত ও শীত ঋতুদ্বয়ের বর্ণনায় নারীর শরীরশোভার ও বিলাসলীলার বর্ণনাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে কবি যেন আর নবীনতার সন্ধান পাইতেছেন না। তরুণ কবিকে যেন হেমন্ত ও শীতের প্রসুপ্তকল্প মন্থর প্রকৃতি আর প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছে না, তাই তাঁহার দৃষ্টি নারীর দেহসুষমার দিকে নিবদ্ধ। সুতরাং গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির সচেতনতা সমান তীব্রতা ও নবীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই, তাহা যেন ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, এবং অন্তিম

১১ A. W. Ryder: *Kālidāsa,* Introduction, p. xix.

সর্গে বসন্ত বর্ণনে আসিয়া তাহা যেন আপনার সমস্ত গতিবেগ ও সঞ্জীবতা নিঃশেষে ব্যয়িত করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীঅরবিন্দের মতে—

The closing canto should have been the crown of the poem. But the poet's sin pursues him and, though we see a distinct effort to recover the old pure fervour, it is an effort that fails to sustain itself . . . . The poem on Spring which should have been the finest, is the most disappointing in the whole series.

কিন্তু 'ঋতুসংহারে'র সকল ন্যূনতা সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই স্বল্পপরিসর খণ্ডকাব্যে এমন একটি নূতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতি সম্বন্ধে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্য কোনও কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না এবং যাহা কেবল কালিদাসেরই পরবর্তী পরিণত রচনাবলীতে আমাদের অনুভবগোচর হইয়া থাকে— যদিও সে সুর এবং সে দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ অধিকতর পরিশুদ্ধি ও গভীরতা অর্জন করিয়াছে।

য়োরুবা দেশে ৩ ইফে

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৬ই আগস্ট ১৯৫৪, শুক্রবার। ইবাদান শহর থেকে বেরোতে বেলা সাড়ে-দশটা বেজে গেল। আমাদের যাত্রা হ'ল অতি সুন্দর সবুজে-ভরা উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলানো দেশের মধ্য দিয়ে। মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম পেলুম। মাথায় নীল চৌকো-কাটা কাপড়ের শিরস্ত্রাণ বেঁধে, নীল লুঙ্গি-মতন কাপড় প'রে, গায়ে সাদা কনুই পর্য্যন্ত ঢিলে হাতার জামা, খালি পা— য়োরুবা মেয়েরা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত দেখলুম। চারি দিকে উলঙ্গ শিশুর মেলা। এদের প্রায় সকলেরই ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দেহত্বক্ স্বাস্থ্যের আভায় উজ্জ্বল। পথে Abeokuta আবেওকুতা শহর ছুঁয়ে গেলুম। এইভাবে বেলা ১২টার সময় আমরা ইফে শহরে পৌছলুম। চার দিকে গাছপালায় ঢাকা সুন্দর দেশের মধ্যে দিয়ে দুপুর বেলার এই যাত্রা মোটেই কষ্টকর হয় নি।

আমরা Afin-oni আফিন-ওনি অর্থাৎ স্থানীয় রাজা, যাঁর পদবী হচ্ছে Oni ওনি, তাঁর প্রাসাদে এসে পৌছলুম। আমার সঙ্গে যে দুজন আফ্রিকান যুবক ফোটোগ্রাফার আর রিপোর্টার ছিল, তারা ওনির কর্মচারীদের সঙ্গে কথা কইলে। আমি যে আস্‌বো সে খবর আগেই পাঠানো হয়েছিল, আমাকে এরা খাতির ক'রে দোতলার একটি ঘরে নিয়ে বসালে। আমাকে ব'ললে যে, ওনি এখন তাঁর রাজ্য-সংক্রান্ত একটি কাজে নিযুক্ত, এখনই আসবেন। ওনির বাড়ি আধুনিক য়ুরোপীয় রুচিতে তৈরী— এইরকম বাড়ি য়োরুবা দেশে স্থানীয় জলবায়ু আর লোকেদের সুখ-সুবিধা আর রুচি অনুসারে একটু বৈশিষ্ট্য পাচ্ছে। ভারতে য়ুরোপীয় রুচিতে তৈরী বাড়ি, তার বাইরের দু-একটা অলংকরণ বা রেখাসমাবেশে একটা ভারতীয় ছাপ গ্রহণ ক'রছে,— আধুনিক ভারতীয় বাস্তুরীতিরই পর্য্যায়ে এইসব বাড়ি এসে যাচ্ছে। পোর্তুগীজ, ফরাসী আর ইংরেজদের দ্বারা আনীত য়ুরোপীয় বাড়ি-তৈরীর পদ্ধতি তেমনি য়োরুবা দেশে একটা নিজস্ব প্রকৃতি গড়ে' তুলছে, এইজন্য অনেকে এইসব বাড়িকে "আধুনিক য়োরুবা বাস্তুরীতি"র পর্য্যায়ে ফেলেছে। লেগস্ শহরের আর অন্য নানা শহরের আর গ্রামের এইসব নোতুন বাড়ি নিয়ে সচিত্র প্রবন্ধে আলোচনা দেখেছি, ও দেশে প্রকাশিত ইংরেজী পত্র-পত্রিকায়। এইসব বাড়ি গরম আর বর্ষার দেশের উপযোগী ক'রে তৈরী। দু-একটা কংক্রীটের জালীতে সেকেলে আফ্রিকান নকশার নকল দেখা যায়, আর একটু অভিজাত শ্রেণীর লোকের বাড়িতে বহু য়ুরোপীয় টুকিটাকি curio বা মণিহারি জিনিসের সঙ্গে দু-চারটে খাস আফ্রিকার শিল্পের নিদর্শনও থাকে— যেমন কাঠখোদাই, হাতির দাঁতের মূর্তি, লাউয়ের উপর কাটা নকশা, কোথাও বা দু-একটা পিতলের মূর্তি, পুরোনো আফ্রিকান রীতির কাষ্ঠাসন, আফ্রিকান রঙিন ছাপা কাপড়, ইত্যাদি। যে বসবার ঘরে আমাকে নিয়ে বসানো হ'ল সে ঘরটি কিন্তু পুরো য়ুরোপীয় ধরণে চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো। দেয়ালে নানা ফোটোগ্রাফ।

Sir Adesole Aderemi স্যর আদেসোলে আদেরেমি পরে তাঁর কতকগুলি অনুচরের সঙ্গে ঘরে এসে আমায় দেখা দিলেন। দেখে মনে হ'ল, বছর ষাট বয়স হবে, বেশ দীর্ঘকায় চেহারা, হাত বাড়িয়ে' আমার সঙ্গে করমর্দন ক'রে স্বাগত ক'রলেন। ইনি য়োরুবা দেশের একজন বিশিষ্ট জননেতা।

সরদার বা রাজা হিসাবে এঁর প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য নানা প্রতিষ্ঠা বা সম্মান এঁর আছে। ইনি সুশিক্ষিত, য়ুরোপে অনেকবার গিয়েছেন, আর স্থানীয় রক্ষণশীল-প্রকৃতির উদারনৈতিক নেতা রূপেও এঁর সম্মান আছে। ইংরেজ সরকারের কাছেও ইনি সম্মানিত, এবং অনেক বিষয়ে এঁর পরামর্শ সরকার নেন। এখন ইনি নাইজিরিয়ার— সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের— একজন সদস্য। ইনি বাইরে মেথডিস্ট মতের খ্রীষ্টান ব'লে পরিচিত হ'লেও য়োরুবাদের প্রাচীন ধর্মের একজন গুরু এবং নেতা। এইরকম অদ্ভুত ব্যাপার এদেশে খুবই সাধারণ, পরে এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা-লব্ধ আরও দু-একটি কথা ব'ল্‌বো।

ওনি খুব চমৎকার ইংরেজি বলেন। ইনি য়োরুবাদের মধ্যে প্রচলিত আফ্রিকান পোশাক প'রেই ছিলেন— একটা নীল সাদা ডোরা ঢিলা আলখাল্লা তার মধ্যে প্রধান, মাথায় একটি গোল কাপড়ের টুপি, পায়ে চপ্পল। এঁর একটি শিক্ষিতা মেয়ে এদেশের অভিজাত সমাজে সুপরিচিত। মেয়েটিকে নিয়ে বছর-কয়েক আগে ইনি য়ুরোপে যান, আর লণ্ডনে এই আফ্রিকান রাজকন্যার রঙচঙে' আফ্রিকান পোশাক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই মেয়েটি এখন বিবাহিত এবং স্বামিগৃহে চ'লে গিয়েছে। লণ্ডনের সচিত্র পত্র-পত্রিকায় কন্যার সহিত ওনির ছবি দেখেছিলুম, সে কথা ওনিকে বলায় তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে এই খবর তিনিই দিলেন। আমি ওনির সঙ্গে আলাপ আরম্ভ ক'রলুম— ব'ললুম যে আমি এসেছি ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম-আফ্রিকার প্রাচীন ধর্ম আর তার শিল্প-সংস্কৃতি আর তার জনসাধারণের জীবনযাত্রা একটু— অল্প কয়দিনে যতটুকু পারা যায়— ভাসা-ভাসা অবলোকন ক'রতে। ওনি হ'চ্ছেন য়োরুবা সমাজের আর ধর্মের একজন নেতা— বংশানুক্রমে তাঁরা সমাজগত ধর্মের পরিপোষক আর পরিচালক। তিনি নিজের জাতির ইতিহাস আর ঐতিহাসিক মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন। তাঁর পুরোনো প্রাসাদ নোতুন ক'রে তৈরী করবার জন্যে খুঁড়তে খুঁড়তে অনেকগুলি ব্রঞ্জের নৃমুণ্ড পাওয়া গিয়েছে— সেগুলির বিশেষ-ভাবে আলোচনা ইংরেজী কাগজে ও বইয়ে আমি পড়েছি, সেগুলোর সৌন্দর্য্য পৃথিবীর সর্বত্র কলারসিক সমাজকে মুগ্ধ ক'রেছে। তা ছাড়া সেগুলির নৃতত্ত্ববিষয়ক মূল্যও অসাধারণ। ওনি এই ব্রঞ্জমূর্তিগুলি আর অন্য পশ্চিম-আফ্রিকার শিল্পের নিদর্শন একটি সংগ্রহশালা তৈরী করে রক্ষা ক'রছেন, তাও পড়েছি। সেইসব বিশেষ ক'রে দেখবার জন্যে আমি ইফেতে এসেছি।

ওনি বেশ হাসিমুখে আমার কথা শুনছিলেন। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের ব্রিটিশ District Officer বা জেলা-শাসক Col. G. D. A. Brett কর্নেল ব্রেট্ ব'লে একজন ভদ্রলোক এসে প'ড়লেন। আমি আস্‌বার সঙ্গে-সঙ্গেই এঁকে টেলিফোন ক'রে খবর দেওয়া হয়। বোধ হয়, ভারতবর্ষ থেকে আগত এই অধ্যাপকের সঙ্গে স্থানীয় জননেতা ও রাজা ওনির প্রথম আলাপ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল; আর তা ছাড়া, ইফেতে বিদেশী ভদ্রলোকের থাক্‌বার মতো কোনো হোটেল নেই, সেইজন্য আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা ওনির প্রাসাদে না হ'য়ে কর্নেল ব্রেটের গৃহেই হয়েছিল। কর্নেল ব্রেট্ দেখলুম চমৎকার মানুষ। বেশ লম্বাচওড়া চেহারা, বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর হবে। ইনি ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত— ভারত স্বাধীন হবার কিছুকাল পর পর্য্যন্ত ভারতের সেনাবিভাগে অফিসার ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি একটা মনের টান অনুভব করেন বুঝতে পারা গেল, যদিও আর বহু বহু ইংরেজের মতন আমাদের স্বাধীনতা-লাভের পরে ভবিষ্যতে ইংরেজের কী অবস্থা হবে, সে বিষয়ে সংশয়ে বা দোটানায় প'ড়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন ক'রে এদেশে এসে চাকরি নিয়েছেন। ইনি 18th Royal Garhwal

Rifles নামে ভারতীয় পদাতিক সৈনিক-দলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। এই রেজিমেণ্টের গাড়োয়ালী সেপাইদের বীরত্ব প্রথম মহাযুদ্ধে বিশেষভাবে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর গাড়োয়ালী সেপাইদের শৌর্য্যের খ্যাতি এত দৃঢ়ভাবে প্রসারিত হয় যে, এটিকে একটি spear-head regiment অর্থাৎ আক্রমণ-কালে বর্ষার ফলার মতো শত্রুব্যূহ-ভেদকারী পদাতিকদল ব'লে এর নাম হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে অন্যতম ভারতীয় V. C. বা ভিক্টোরিয়া-ক্রস-প্রাপ্ত সিপাহিদের মধ্যে ছিলেন এই রেজিমেণ্টের Dharwan Singh Negi ধর্‌ওয়ান সিং নেগি। এই রেজিমেণ্ট তখন 39th Garhwal Rifles নামে পরিচিত ছিল, পরে Royal শব্দ যোগ ক'রে এর সম্মান বাড়িয়ে' দেওয়া হয় আর নোতুন নাম দেওয়া হয় 18th Royal Garhwal Rifles. পরে কথাপ্রসঙ্গে এঁর এই রেজিমেণ্টের নাম শুনতে, আমি ওঁকে জানিয়ে' দিই যে আমার এক শ্যালক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ওই 18th Garhwal Rifles-এর অফিসার ছিল। তখন ছিল লেফ্‌টেন্যাণ্ট, এখন মেজর করুণাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়; উত্তর-আফ্রিকা, সিসিলি-দ্বীপ ও ইতালীতে এই রেজিমেণ্টের সঙ্গে তাকে বরাবরই যুদ্ধকার্য্যে অংশগ্রহণ ক'রতে হ'য়েছিল। Lieutenant Mukherji ব'লে নাম ব'লতে কর্নেল ব্রেট্ তাকে চিনতে পারলেন আর ব'ললেন যে ভারতবর্ষের ল্যান্সডাউন শহরে যখন ঐ রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ান বা পণ্টন ছিল তখন তিনি তাকে জানতেন। এইভাবে কর্নেল ব্রেটের সঙ্গে, একটু দূরের হ'লেও, আমার একটা যোগসূত্র বেরিয়ে' গেল। এতে আমরা দুজনেই খুশি হলুম। কর্নেল ব্রেট্ সৌজন্যের অবতার। আমরা খানিকক্ষণ শিষ্টালাপে ও আলোচনায় কাটিয়ে' কর্নেল ব্রেটের কাছ থেকে ইফেতে আমার যে কার্য্যক্রম ঠিক হয়েছে তার সংবাদ পেলুম। আমার সুবিধে-মতো যা যা আমি দেখতে চাই সেই অনুসারে এই কার্য্যক্রম বদলে' নেওয়া গেল। বেলা একটার সময়ে সেই সময়ের মতো ওনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চেলারামদের গাড়ি ক'রে কর্নেল ব্রেটের বাংলায় এলুম। ঠিক ছিল যে ওঁর ওখানে আমার জিনিসপত্র রেখে, হাতমুখ ধুয়ে, মধ্যাহ্নভোজন সেরে, সাড়ে তিনটের দিকে ওনির প্রাসাদে আবার ফিরে আস্‌বো, আর তখন তিনি প্রাচীন য়োরুবা ব্রঞ্জমূর্তি, যা তাঁর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হ'য়ে আছে, সেগুলি দেখাবেন। তার পরে বিকেলবেলায় কর্নেল ব্রেটের সঙ্গে ইফে শহরের প্রান্তে অবস্থিত একটি বন বা উপবনের মধ্যে একটি য়োরুবা দেবতাদের আস্তানা— মন্দির ঠিক বলা চলে না— দেখতে যাবো। আমার সঙ্গে যে দুটি সরকারি ফোটোগ্রাফার আর রিপোর্টার ইবাদান থেকে এসেছিল, তারাও সঙ্গে থাকবে।

কর্নেল ব্রেটের গৃহে তাঁর গৃহিণীর সঙ্গে দেখা হ'ল। কর্নেল ব্রেট্ নিজেই আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর বয়স ৪৫, তিনি অল্প কিছুদিন হ'ল বিবাহ করেছেন। তিনি আইরিশ-জাতীয় মানুষ, রোমান-কাথলিক, গলায় সরু সোনার হারে লটকানো সোনার ক্রুশচিহ্ন প'রে থাকেন। বেশ সাদাসিধে মানুষটি, আর অতি ভদ্র সুজন। আমি ভারতীয় অতিথি, আমার সঙ্গে যে সহজ সহৃদয়তা দেখিয়ে' তাঁর আতিথ্য পালন ক'রলেন তা আমাকে বিশেষ খুশি ক'রেছিল। মিসেস ব্রেট্ও একটি সরল প্রকৃতির মহিলা, আর বিশেষ আতিথ্যপরায়ণ। এঁদের বাড়ির মধ্যেই একটি অংশে আমার জন্যে ঘর নির্দিষ্ট ছিল, আমি মুখহাত ধুয়ে তৈরী হ'য়ে নিলুম। মিসেস ব্রেটের সঙ্গে একটু আলাপ করা গেল। এঁদের বাড়ি একটি টিলার উপরে। বাড়ির পিছন দিকের বারান্দা থেকে আশপাশের দেশের একটি চমৎকার দৃশ্য পাওয়া যায়।

৩

পশ্চিম-আফ্রিকার ব্রঞ্জমূর্তি
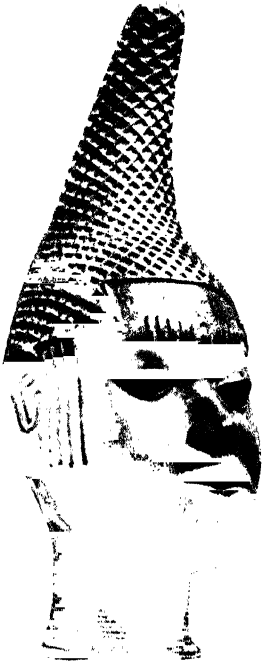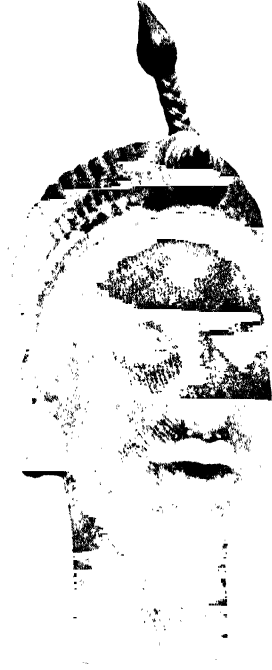
১ রাজকন্যা : মাথায় পলার মুকুট, গলায় পলার কণ্ঠী । বেনিন নগর । খ্রী ১৫০০র পূর্বে

২ প্রাচীন ধরনের দেবতা : সাগর-দেবতা ওলোকুন ? । ইফে । আনুমানিক খ্রী ১০০০

ইফে । কর্নেল বেট, ওনি, লেখক

ইফের ওনি স্যর আদেমোজি আদেরেমি এবং লেখক
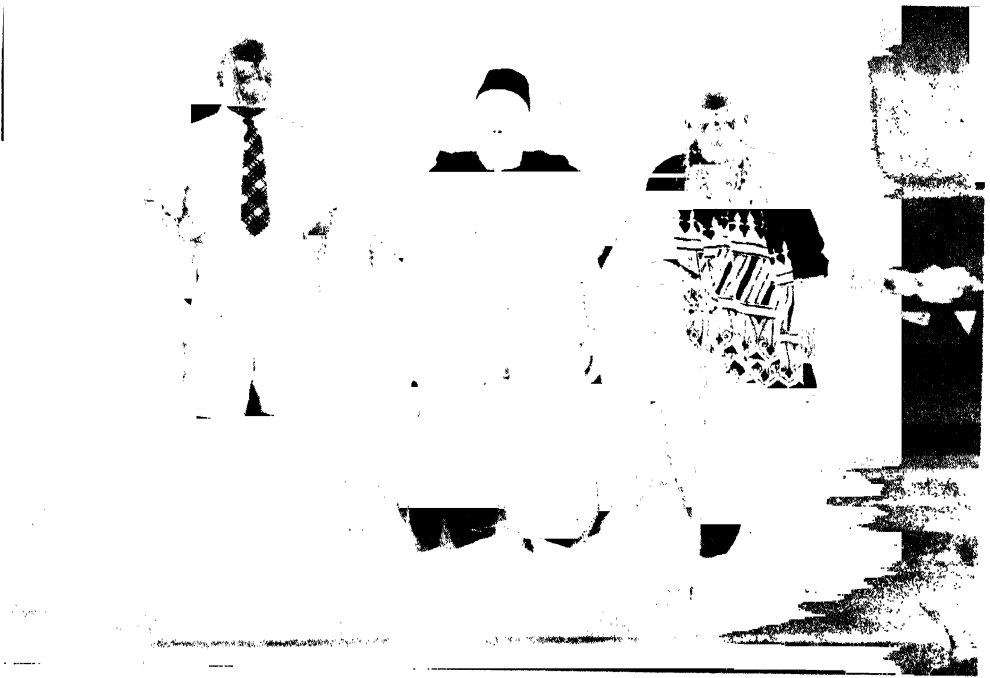
পৌনে-তিনটের মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে আমি কাপড় বদলে' নিলুম— ধুতি, সাদা রেশমের শেরওয়ানি আর চপ্পল, আর মাথায় রেশমের গোল টুপি প'রে, আধুনিক ভারতীয় ভদ্রলোক সাজলুম। ওনির প্রাসাদে তিনটের পরেই উপস্থিত হ'লুম। সঙ্গের আফ্রিকান যুবক দুজন Bernard Akenabor বার্নার্ড আকেনাবোর আর Mac Pepple মাক পেপ্‌ল্ যাদের কথা আগে বলেছি, তারাও সঙ্গে এল, ছবি নিতে। এরা, ওনির সঙ্গে আমার, আর ওনি, কর্নেল ব্রেট্ আর আমার একসঙ্গে, কতকগুলি ছবি নিলে। তার পরে ওনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়মে আমাদের নিয়ে গেলেন। মিউজিয়মটি বড় নয়, কেননা সেখানে কেবল মাটির নীচে থেকে পাওয়া য়োরুবা শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ মাত্র আছে, অন্য কোনো জিনিস নয়। বোধ হয়, ১৯৪৫-এর দিকে তাঁর পুরাতন রাজপ্রাসাদ কতকটা ভেঙে আধুনিক ভাবে আবার তৈরী করবার উদ্দেশ্যে ভিত কাটাতে আরম্ভ করেন। এঁদের পুরাতন প্রাসাদ মানে, খোদাই-করা কাঠের খুঁটি-যুক্ত বড়ো-বড়ো চালাঘর। মাটির দেয়াল দিয়ে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ আলাদা ক'রে রাখা হয়। রাজারা বহুপত্নীক ছিলেন, প্রত্যেক রাণীর জন্য আলাদা পাতায়-ছাওয়া গোল কুঁড়ে-ঘর থাকৃত। রাজার দরবারের জন্য বড়ো হল-ঘর থাকৃত— এই চালাঘরের আকারে। পরে য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে এসব বদলে', হল-ঘর আর অন্য থাকবার ঘর তৈরী করার রেওয়াজ এসে গিয়েছে। ওনির প্রাসাদে দু-একটি এইরকম চালাঘর ছাড়া প্রাচীন আর কিছুই নেই। ভিত খোঁড়ার সময়ে মাটির বেশ নীচে গুটি দশ-বারো ব্রঞ্জের প্রমাণ আকারের মুণ্ড পাওয়া যায়। যে পদ্ধতিতে প্রাচীন গ্রীসে, ভারতবর্ষে, চীনে, মধ্যযুগের ইতালীতে আর অন্যান্য দেশে ব্রঞ্জ আর অন্য ধাতুর মূর্তি ঢালা হ'ত— সেই cire perdue অর্থাৎ মোম-গালানো পদ্ধতিতে এইসব নৃমুণ্ড ঢালা হয়েছিল। এগুলি সম্ভবতঃ প্রাচীন য়োরুবা দেশের রাজারাণী বা দেবদেবীর মূর্তি। মূর্তিগুলি আগে মোমে তৈরী ক'রে নিয়ে তার উপরে মাটির প্রলেপ দিয়ে একটা পুরু আবরণ ক'রে মোমের মূর্তিটিকে ঢেকে ফেলা হ'ত। তার পরে এই আবরণের মাথায় একটি ফুটো ক'রে, সেই ফুটোর মধ্যে দিয়ে উপর থেকে ফুটন্ত গলা ধাতু ঢেলে দেওয়া হ'ত। ধাতুর তাপে ভিতরের মোমের মূর্তি গ'লে বেরিয়ে যায় এবং ধাতু মোমের স্থান নিয়ে নেয়, আর এইভাবে ধাতুর মূর্তি ঢালা হয়। পরে উপরের মাটির তৈরি মুচি বা ঢাকনা ভেঙে ফেলে ধাতুর মূর্তি বার করা হয়, আর তার পরে তাকে ঘষে' মেজে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া হয়। ইফেতে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি বেশির ভাগই পুরুষের। গোঁফ-দাড়ির জায়গায় কতকগুলি করে ছেঁদা আছে, তাতে বুঝতে পারা যায় যে এই ছেঁদাগুলির ভিতর দিয়ে নকল দাড়িগোঁফ— মানুষের মাথার চুলই হ'ক বা কালো সুতোই হ'ক— লাগিয়ে মূর্তিগুলিকে একটু বেশি ক'রে বাস্তবানুসারী করা হ'ত। এই মূর্তিগুলি, আফ্রিকার প্রত্ন বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের মতে, এখন থেকে এক হাজার বছরের উপর হ'ল তৈরী হয়েছিল। এ ধরণের মূর্তি ওনির প্রাসাদ খোঁড়বার পূর্বে মাত্র ২।১টি আবিষ্কৃত হয়েছিল— বিখ্যাত জার্মান আফ্রিকা-তত্ত্ববিদ্ Leo Frobenius লেও ফ্রোবেনিউস্ তার ছবি আর বর্ণনা প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন। ইফে ছাড়া এ ধরণের ব্রঞ্জের কাজ ইতিপূর্বে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে নাইজিরিয়ার Benin বেনিন নগরে। বেনিনে এখনও এই প্রাচীন পদ্ধতির ব্রঞ্জ-ঢালাই শিল্প প্রচলিত আছে, ২।৪ ঘর শিল্পী এখনও সেখানে মূর্তি ঢালাই করে। বেনিন শহর ১৮৯৭ সালে ইংরেজরা দখল করে। বেনিনের আফ্রিকানরা তাদের রাজ্যের আর সভ্যতার পতনের যুগে ভীষণভাবে নরবলি দিত, এবং নানা বিষয়ে তাদের ধর্ম-অনুষ্ঠান চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতার আকর হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এরা কতকগুলি ইংরেজ প্রজাকে হত্যা করার জন্য ইংরেজ সরকার লেগস্ থেকে এক

শাস্তিমূলক অভিযান পাঠায়, তারা বেনিন শহর দখল করে, অপরাধীদের শাস্তি দেয় আর অম্লানবদনে শহর লুঠ করে। লুঠের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় জিনিস ছিল, বেনিনের অদ্ভুত ব্রঞ্জ আর হাতির দাঁতের শিল্পসম্ভার। বড়ো-বড়ো আস্ত হাতির দাঁতের গায়ে নানা মূর্তি আর অন্য অলংকরণ খোঁদা হ'ত। মানুষের মাথার প্রতিকৃতির ব্রঞ্জের বৈঠকের মতন ক'রে, তার উপরে এইসব খোদাই-করা লম্বা হাতির দাঁত বসানো হ'ত, আর এইভাবে এই হাতির দাঁত বাড়ির দরজার দুইপাশে আর বাইরে অন্যত্র সাজিয়ে' রাখা হ'ত। ব্রঞ্জের ছোটো-বড়ো বহু মূর্তি আর মানুষের মুণ্ড— মেয়ে আর পুরুষ উভয়ের— আর ব্রঞ্জের ফলকে ঢালা জীবনের নানা দৃশ্য— এগুলি বেশির ভাগ বেনিনের রাজা রাণী, সেপাই-সান্ত্রী, রাজার অনুচর প্রভৃতিদের নিয়ে, আর তা ছাড়া এখন থেকে চারশো সাড়ে-চারশো বছর পূর্বেকার যুগের পোশাক-পরা পোর্তুগীস সৈন্য আর অন্য মানুষের মূর্তি নিয়ে। দু-একটি পশুপক্ষীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যেমন মুরগি আর চিতাবাঘ, সেগুলিও ব্রঞ্জের ভাস্কর্য্য হিসেবে অপূর্ব। শিকারী পাখি শিকার ক'রছে, রাজা বা সেপাইরা ঘোড়ায় চেপে যাত্রা ক'রছে, দরবারের বালক ভৃত্যের কাঁধে হাত দিয়ে দণ্ডায়মান রাজা, এইসব নিয়েই ফলক বেশি। তা ছাড়া ঘোড়ায় চেপে সানুচর রাজা, নৃত্যের ভঙ্গিতে বেনিনের কুমারী, বংশীবাদনরত তরুণ প্রভৃতি অন্য ছোটো ব্রঞ্জে-ঢালা মূর্তি বা মূর্তি-সমূহও অনেক পাওয়া গিয়েছে। এই ব্রঞ্জে-ঢালা শিল্পসম্ভার যখন য়ুরোপে এল' তখন তা নৃতত্ত্ববিদ্ আর অল্পসংখ্যক কলারসিকদের আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু জনসমাজে তার তেমন প্রসার হয়নি। আফ্রিকা তখনও অবহেলিত ছিল এবং তখনও আফ্রিকার শিল্প আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে য়ুরোপে কোনো চেতনা জাগে নি। লুঠের মাল ব'লে এইসব ব্রঞ্জের অপূর্ব শিল্পদ্রব্য ইংরেজ সেনানীদের হাত ঘুরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে জমা হয়, আর এর অনেকগুলি জিনিস, বার্লিনের নৃতত্ত্ববিষয়ের সংগ্রহশালার পরিচালকের চেষ্টায় সেখানেও কিছু কিছু গিয়ে পৌছয় আর যত্নের সঙ্গে রক্ষিত হয়। এখন এই শিল্পের কদর নৃতত্ত্ববিদ্ আর শিল্পরসিক ছাড়া সাধারণ শিল্পচেতনা-যুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিও ক'রতে শিখেছেন— এইসব ব্রঞ্জ আর হাতির দাঁতের শিল্পের চর্চা আরম্ভ হয়েছে, এর সম্বন্ধে বড়ো-বড়ো বই লেখা হয়েছে আর হ'চ্ছে। বেনিনের প্রাচীন ব্রঞ্জ মূর্তি বা ফলক, এখন বহু মূল্য দিয়ে সংগ্রহ করবার বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন পদ্ধতিতে বেনিনের দু-চার ঘর শিল্পী যেসব মূর্তি এখন তৈরী ক'রছে, তারও চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত হ'চ্ছে যে, এইসব মূর্তি এখন থেকে চার-শো পাঁচ-শো বছর পূর্বে বেনিনে তৈরী হয়েছিল, আর সেই সময় থেকে বা তার আগে থেকে এইরূপ ব্রঞ্জে-ঢালা মূর্তি বানাবার রেওয়াজ আজ পর্য্যন্ত বেনিনে চলে এসেছে। এইসব মূর্তি-রচনাপদ্ধতি এমনিই স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট, এমনিই পুরোপুরি আফ্রিকান শিল্পকলার অঙ্গীভূত যে, একে বিশুদ্ধ আফ্রিকান শিল্পই ব'লতে হয়— য়ুরোপীয় শিল্পের কোনো প্রভাব এতে নেই—যদিও ১৪৭০-৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে যুদ্ধের সাজ পরা পোর্তুগীস সেপাইয়ের ছবিও এইসব মূর্তি ও ফলকে পাওয়া গিয়েছে। এই পুরোনো পোর্তুগীস পোশাক দেকে এইসব ব্রঞ্জ ফলক আর মূর্তির একটা সময় অনুমান করা যায়। মূর্তিগুলি যে পদ্ধতিতে তৈরী সেটি একেবারে পুরোপুরি realistic বা বাস্তবানুকারী নয়— এগুলি একটু বিশেষ রকম stylised অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট প্রাকৃতাতিগ পদ্ধতির অনুযায়ী। কিন্তু তা হ'লেও, দু-একটি মূর্তির রচনা অনবদ্য। আমি যখন প্রথম ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্র-হিসাবে লণ্ডনে যাই, তখন আমার পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা— ব্রিটিশ মিউজিয়মে আফ্রিকার নৃতত্ত্ববিষয়ক সংগ্রহের মধ্যে বেনিন থেকে আনীত এইসব ব্রঞ্জের ফলক আর মূর্তি আর হাতির দাঁতের কাজের মধ্যে

একটি ব্রঞ্জে-ঢালা কন্যা-মূর্তির দর্শন-লাভ। মূর্তিটি কণ্ঠ পর্যন্ত, গলায় প্রচুরপরিমাণ মালা পরা, মাথায় একটি মুকুট— এই মালা আর মুকুট সবই প্রবাল বা পলাকাঠির দানায় তৈরী হ'ত। মুখটির মধ্যে কানদুটি stylised অর্থাৎ বাস্তবানুকারী নয়। মুখের গড়নের মধ্যে ছাঁচে-ঢালা মুখের একটা কৃত্রিম ছাঁদ দেখা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে একটা অপূর্ব কমনীয়তা, একটা আত্মসমাহিত তন্ময়তা আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা কারুণ্য বা বিষাদের ভাব দেখা যায়, যেটি আমার কাছে অপূর্ব লেগেছিল। এই মূর্তির অন্তর্নিহিত ভাব আমাকে আফ্রিকায় সংস্কৃতিকে জানবার ও বোঝবার জন্য আগ্রহশীল ক'রে তুলেছিল। এই মূর্তির আর একটি নকল বার্লিন মিউজিয়মের য়োরুবা-সংগ্রহের মধ্যে আছে। বহুদিন পরে আমি ১৯৩৮ সালে এই মূর্তির একটি প্লাস্টারে নকল ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে ক'লকাতায় আনি, পরে ১৯৫৪ সালে সেটিকে ক'লকাতায় ব্রঞ্জে ঢালিয়ে' নিই ; এখন এটিকে আমার শিল্পসংগ্রহে সযত্নে রেখে দিয়েছি।

বেনিন্ শহর হ'চ্ছে Edo এদো জাতির আফ্রিকানদের দেশ। এরা য়োরুবাদেরই জ্ঞাতি। য়োরুবাদের মধ্যে কিন্তু কাঠের আর হাতির দাঁতের লক্ষণীয় মূর্তি পাওয়া গেলেও, ব্রঞ্জের তেমন কিছু এ-তাবৎ মেলে নি। লেও ফ্রোবেনিউস্-এর আবিষ্কৃত মূর্তিটি একটি সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটি য়োরুবাদের দ্বারা পূজিত হ'ত— সাগরদেবীর মূর্তি হিসাবে। কিন্তু এই মূর্তিটির অন্তর্নিহিত ভাব ছিল পুরোপুরি realistic, অর্থাৎ বাস্তবানুকারী। বেনিনের মূর্তিশিল্পের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য হ'চ্ছিল না। তার পরে, হঠাৎ বছর বারো-তেরো পূর্বে ইফে শহরে ওনির রাজপ্রাসাদের মাটির নীচে থেকে এই য়োরুবা জাতির মধ্যে এই ব্রঞ্জ মুণ্ডগুলি আবিষ্কৃত হ'ল। এগুলি ইংলাণ্ডে আর য়ুরোপের অন্যত্র প্রদর্শিত হ'ল, এবং তাতে নৃতত্ত্ববিদ্ আর শিল্পবিদ্দের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। এই মূর্তিগুলি বাস্তবানুকারিতায় যে-কোনো দেশের বাস্তবানুকারী মূর্তিশিল্পের সমকক্ষ— কি প্রাচীন গ্রীসের, কি ভারতের, কি চীনের, কি রেনেসাঁস যুগের য়ুরোপের। এই মূর্তিগুলিতে আফ্রিকান জাতীয়তার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যেন নিখুঁত ফোটোগ্রাফের মতন ধ'রে দেওয়া আছে। একটুখানি idealism বা ভাবুকতা যে নেই তা ব'ল্‌বো না, আর তার দ্বারা বাস্তবানুকারিতাকে আরও মহনীয়, আরও গভীর-প্রকৃতিক ক'রে তুলেছে। দু-চারটি মূর্তি দেখলে প্রাচীন গ্রীসের কতকগুলি ব্রঞ্জ মূর্তির কথা মনে করিয়ে দেয়— যেমন দেল্‌ফি নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত বিখ্যাত রথচালক বা সারথির মূর্তি। এগুলি আলোচনা ক'রে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই বাস্তবানুকারী মূর্তিগুলি বেনিনের stylistic মূর্তির পূর্বেকার যুগের— প্রায় ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ বা তার পূর্বে এগুলি তৈরী হয় ; আর এগুলির অন্তর্নিহিত বস্তুনিষ্ঠতা পরে ধীরে ধীরে বেনিনের অলংকরণ-নিষ্ঠতা আর ভাবুকতায় পরিবর্তিত হয়েছে, - আর সেটা ঘ'টেছে আফ্রিকান ধর্মের অনুপ্রেরণায়।

ইফের ওনি এই মূর্তিগুলির মূল্য বোঝেন এবং সেইজন্য তিনি খরচ ক'রে মূর্তিগুলি রক্ষা করবার জন্যে সংগ্রহশালা করেছেন। মূর্তিগুলি এখন সমগ্র পশ্চিম আফ্রিকার অধিবাসীদের কাছে জাতীয় সম্পদ্ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নাইজিরিয়ার একটি সুন্দর ডাক-টিকিটে এই ইফের একটি ব্রঞ্জ মূর্তি চিত্রিত হয়েছে— বিদেশী দেখেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়, নাইজিরিয়ার অধিবাসীদের তো কথাই নেই। ওনি নিজে আমাকে নিয়ে মিউজিয়ম দেখাতে লাগলেন, সঙ্গে কর্নেল ব্রেট্ও ছিলেন। এই মূর্তিগুলি চাক্ষুষ ক'রে বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রলুম। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ জাতির মানুষ, যারা শ্বেতকায় জাতির দ্বারা অসভ্য বর্বর আর বন্য ব'লে উপেক্ষিত, তারা হাজার বৎসর পূর্বে কোন্ সভ্যতার অনুপ্রেরণায় এই সমস্ত অদ্ভুত সুন্দর

মূর্তি গড়েছিল তার কোনো হদিস এখন আর পাওয়া যায় না। কেবল এই ব্রঞ্জের মূর্তি নয়—এদের হাতির দাঁতের আর কাঠের কাজ আর মাটির মূর্তি প্রভৃতি যা প্রাচীন কাল থেকে চ'লে এসেছে, তাতে একটা লক্ষণীয় স্বতন্ত্র শিল্পধারা দেখতে পাই, যে শিল্পধারা একেবারে এদের নিজস্ব। এদের অনেক মূর্তির মুখে গায়ে পশ্চিম-আফ্রিকার অতি সাধারণ cicatrice উল্কির দাগ দেখা যায়—এই উল্কিতে দেহের কোনো কোনো অংশে রেখার আকারে চামড়া তুলে নেওয়া হয়, ও পরে নোতুন চামড়া গজানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখে দাগ পড়ে, এবং সেইরূপ দাগই এদের tribal বা কৌলিক একটা চিহ্ন বা পরিচয় ব'লে বিবেচিত হত। এইসব শিল্পদ্রব্য দেখে আর অন্য প্রমাণ থেকে, পশ্চিম-আফ্রিকায় অন্তত দুই হাজার বছর ধ'রে একটা আফ্রিকান কৃষ্ণকায় জাতির স্বকীয় সভ্যতা যে গ'ড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। সুখের বিষয়, আফ্রিকার শিক্ষিত লোকেরা এ বিষয়ে এখন একটু সচেতন হ'চ্ছে, আর তাতে ক'রে তাদের আত্মমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে, একটা সগর্ব দেশাত্মবোধও জেগে উঠছে—যার ফলে এদের মধ্যে স্বাধীনতা-লাভের প্রয়াস সর্বত্র দেখা যাচ্ছে; আর গোল্ডকোস্ট বা Ghana গানা রাষ্ট্রে, আর আংশিকভাবে নাইজিরিয়াতে সে প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

ব্রঞ্জের নমুনাগুলি এখন সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এক নূতন শিল্পসম্পদ্ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই পশ্চিম-আফ্রিকার ব্রঞ্জ মূর্তির পরিচয় পাওয়া যাবে Leon Underwood-এর লেখা একখানি অতি চমৎকার বই থেকে—Bronzes of West Africa; এই বইখানিতে এইসব মূর্তি ও ফলকের অনেকগুলি ছবি আছে আর সুন্দর বর্ণনা আছে। বইখানি লণ্ডনের Alec Tiranti কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য মাত্র ছয় শিলিং। ঐ লেখকের অনুরূপ আর দুখানি বইও দ্রষ্টব্য—Figures in Wood of West Africa এবং Masks of West Africa। ইফে মিউজিয়মে, আগে কখনও যা দেখি নি এমন কতকগুলি মৃৎশিল্পের, terra-cotta বা পোড়ামাটির মূর্তির ভগ্নাংশ দেখলুম। কতকগুলি অতি সুন্দর মাটির মুখ আর মাটির দেহাংশ— মানুষের পা— এগুলি প্রমাণ-আকারের মাটির মূর্তির ভগ্নাংশ, ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গিয়েছে।

বেলা সাড়ে-তিনটের সময়ে মিউজিয়ম দেখে আমরা য়োরুবাদের জাতীয় ধর্মের এক দেবতার স্থান দেখতে গেলুম। কর্নেল ব্রেট্ সঙ্গে চ'ললেন, আর দোভাষী হিসাবে চ'লল কর্নেল ব্রেটের একজন আর্দালি—য়োরুবা জাতির পাহারাওলা, ইংরেজী বেশ ব'লতে পারে। ওনি সৌজন্য ক'রে তাঁর প্রাসাদের একজন অনুচরকে এই সমস্ত দেবতার স্থান দেখাবার জন্যে আমাদের সঙ্গে পাঠালেন। ইংরেজিতে এইসব দেবতার আস্তানাকে Juju-House বলে। এই Juju আমাদের ছেলেদের ভয়-দেখানো 'জুজু' নয়। আমাদের 'জুজু' শব্দ যদি ইংরেজী থেকে এসে থাকে, তা হ'লে এটি মূলে আফ্রিকা মহাদেশের। পশ্চিম-আফ্রিকায় কতকগুলি জাতির মধ্যে তাদের দ্বারা অর্চিত দেবতার কাঠের মূর্তি অথবা মাদুলি তাবিজ প্রভৃতি, যেসব জিনিসের একটা দৈব বা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে ব'লে লোকে বিশ্বাস করে, সেগুলিকে Gru-Gru গ্রুগ্রু বলে। মূলে এটি পশ্চিম-আফ্রিকার কোন্ ভাষার কথা তা এখন ধরা যায় না। এই গ্রুগ্রু শব্দই সম্ভবতঃ Gyu-gyu গ্যুগ্যু রূপের মধ্য দিয়ে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি জাতির কাছে Juju রূপ নিয়েছে; এবং বিদেশীদের দেখাদেখি আফ্রিকানরাও অনেকে Juju-House বলে। চীনদেশে যেমন বৌদ্ধ বা তাও-ধর্মের বা কন্‌ফুশীয় মন্দিরকে ওদেশে প্রচলিত ইংরেজীতে Joss House বলে—এই Joss শব্দ ঈশ্বর-বাচক পোর্তুগীস Deos শব্দের উচ্চারণ-বিকারে হ'য়েছে। সাধারণতঃ এইসব Juju-

House বা দেবতার আস্তানা, পথের ধারে গাছপালার মধ্যে একটু খোলা জায়গায় একটা পাতায়-ঢাকা কুঁড়ে মাত্র। হয়তো সেটা একটা চারদিক্-খোলা চালাঘর; আবার হয়তো তিনদিকে মাটির বা পাতার দেয়াল, সামনের দিক্‌টা খোলা। ভিতরে এক বা একাধিক দেবতার কাঠের মূর্তি বা অন্য কোনো প্রতীক থাকে—যেমন, ছোটো মাটির ঢিবি। কখনও-কখনও বা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা জঙ্গল-মত স্থান, তার ভিতরে মাঝে-মাঝে একটু ক'রে খোলা জায়গা, আর সেই জায়গায় এদের এই ধরণের Juju-House বা ঠাকুর-ঘর। আগে যখন এই ধর্ম বেশ প্রাণবন্ত ছিল, জনসাধারণ এই ধর্ম আস্থা আর নিষ্ঠার সঙ্গে মান্‌ত, তখন এসব জায়গায় লোক-সমাগম খুবই হ'ত, আর এইসব Sacred Grove বা পবিত্র উপবনকে দেবতার স্থান ব'লে সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখ্‌ত। ইফে শহরের উপকণ্ঠে এইরূপ একটি উপবন আছে। এদেশের প্রাচীন ধর্মের এখন ভাঙন-দশা। 'ভাঙা দেউলের দেবতা'-র অবস্থা দেখে মনে একটু দুঃখও হ'ল। এই ধর্ম এখন মরে' যাচ্ছে, আর এই ধর্মের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে একটা অবহেলার ভাব— অন্ততঃ বাইরে-বাইরে; ভিতরে কিন্তু এদের মনে একটা সুপ্ত বিশ্বাস এখনও খুবই আছে, এক আঁচড়েই বা একটু ঘা খেলেই সেই বিশ্বাস মাথা তুলে ওঠে। এই ধর্ম মানা এখন আর fashionable বা শিক্ষিত লোকের উপযুক্ত নয়— নিরক্ষর চাষী লোকেরই উপযুক্ত, এইরকম একটা মনোভাব এসে যাওয়ার ফলে, বাইরে-বাইরে এই অনাস্থা, এই অনাদর। সাধারণ লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে দেবতাদের সম্বন্ধে বা তাঁদের পুরোহিতদের সম্বন্ধে, পূজা-অর্চনার সম্বন্ধে বিশেষ খবর পাওয়া যায় না। দেবতারা কিভাবে মানুষের জীবনের আশা-আশঙ্কা, ভয়-ভালোবাসা, পার্থিব উন্নতি-অবনতি আর আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত, সে বিষয়ে লোকের মধ্যে কেমন যেন আগ্রহ নেই। নিশ্চয়ই একদিনের যাত্রী আমার মতন লোকের কাছে, এত সহজে এসব বিষয়ে দিশা পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার; আর খুব সম্ভব, এরা পথ-চলতি বিদেশীর নিষ্ফল কৌতূহলে আকর্ষণ অনুভব করে না। ওনির প্রাসাদের যে লোকটি আমাদের সঙ্গে এল' সে ইংরেজি জানে না; কর্নেল ব্রেটের আর্দালির মারফত তাকে প্রশ্ন ক'রে যা অল্প-সল্প কিছু খবর পাওয়া গেল। আর্দালিটি ছিল একটি বেশ বুদ্ধিমান্ যুবক— সে-ও যথাজ্ঞান কিছু-কিছু খবর দিলে। এরা দুজনেই আমাকে জানালে যে, দেবতার উপবনের Juju Houseগুলি বেশির ভাগ সময়ে অনাদৃত হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌লেও, চুপে-সাড়ে অনেকেই এসে দেবতাদের পূজা ক'রে যায়— কাম্য ফল পাবার আশায়। আবার বছরে কতকগুলি বড়ো-বড়ো উৎসবও হয়; তাতে বহু লোকের সমাবেশ হয়, পুরোহিতেরা তখন প্রকট হন, তাদেরও তখন কিছু আয় হয়। এদেশে পূজায় উপকরণ হচ্ছে Kola nut—একরকম গুপারি-জাতীয় ফল—বোতলে ক'রে মদ বা তাড়ি, আর বলির জন্যে মুরগি বা অন্য পাখি— আর কুকুর। এদেশে tsetse fly ব'লে একরকম মশার উৎপাতে গোরু ভেড়া ছাগল বাঁচতে পারে না— মুসলমানদের দেখাদেখি পূজায় কখনও ভেড়া গোরু জবাই ক'রলেও সেটা সাধারণ নয়। আগুন জেলে হোম করার মতন অনুষ্ঠান অজ্ঞাত, আবার হিন্দু বৌদ্ধ পূজায় যেমন ফুল দেওয়া হয়, তাও অজ্ঞাত। প্রার্থনা আর মন্ত্র পড়া হয়, গানও হয়, নাচও হয়, আর দেবতার মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতও ক'রে থাকে।

আমরা রাস্তার ধারে মোটর থেকে নেমে ডানহাতি একটা পথ দিয়ে এই উপবনের মধ্যে প্রবেশ ক'রলুম। ঢুকেই কিছুদূরে একটি শিবলিঙ্গের মতো স্তম্ভের আকারে একটি খাড়া পাথর—সেখানে একটু

ঘাসে-ভরা পরিষ্কার-করা জমি। এইটেই প্রথম নজরে প'ড়ল। শুনলুম, এটি হচ্ছে প্রাচীনকালের একজন ওনি বা স্থানীয় রাজার স্মৃতিচিহ্ন। তার পরে আমরা জঙ্গলের মধ্যে আরও এগিয়ে' এখানকার প্রধান Juju Houseএর দিকে অগ্রসর হ'লুম। শুনলুম যে, সাতদিন আগে একটা বড়ো উৎসব হ'য়ে গিয়েছে, তাতে যথারীতি অনেক লোক এসেছিল। উৎসবের জন্য জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এই আস্তানায় পৌঁছবার যে সরু পথ আছে, সেই পথের উপরে চার জায়গায় তেল-শুপারি গাছের বাল্‌দো বা শাখা দিয়ে পর পর চারটে তোরণের মতো করা হয়েছিল, তা রয়েছে। মন্দিরে দিয়ে দেখলুম, একটি জরাজীর্ণ পোকা-খাওয়া গাছের সামনে শিবলিঙ্গাকার তিনটি পাথরের সরু সরু থাম; এগুলির অর্থ কেউ ব'লতে পারলে না। তার পরে একটু দূর গিয়ে একটি কলাপাতায় ছাওয়া চালার নীচে হাঁটু পর্য্যন্ত উঁচু একটি পাথরের মূর্তি দেখলুম। মূর্তিটি খুবই পুরাতন, আর অনেক জায়গায় খ'য়ে গিয়েছে। শুনমুম, এটি হচ্ছে Edena এদেনা অর্থাৎ দেবতাদের দূতের মূর্তি, ইনিও একজন দেবতা। পরে আর একটি দেবতার মূর্তি দেখলুম; এটি হচ্ছে Olofefunra ওলোফেফুন্‌রা; ইনি হচ্ছেন দেবদূত Rere রেরে'র এক ভৃত্য, এঁর মূর্তিটিও পাথরের, এটি বেশ ভালো অবস্থায় আছে, মুখখানা বেশ ভালোই লাগ্‌ল। অন্য দেবতাদের মধ্যে দেখা গেল, শিবলিঙ্গাকৃতি Ogun ওগুন্ দেবতার প্রতীক—ইনি হচ্ছেন লোহা আর অস্ত্রশস্ত্রের দেবতা। শেষ দেবস্থান হচ্ছে, একটি কলাপাতায় ঢাকা কুঁড়েঘর, সেখানে একটি মাটির ঢিবি, আর তার পাশেই পাথরের তৈরী তিনটি অতি মোটা হাতের কাজ কুমিরের মূর্তি। এ মাটির ঢিপি হচ্ছে প্রাচীনকালের এক বীর পুরুষ, যিনি দেবতা হ'য়ে গিয়েছেন, তাঁর প্রতীক—তাঁর নাম হচ্ছে Esuobasin এসুওবাসিন্। এই উপবনে মন্দির ব'ললে আমরা যা বুঝি সে ধরণের কিছু নয়— আমাদের ভারতবর্ষে আদিবাসীদের মধ্যে এইরকম নানা দেবতার আস্তানা আছে, সবই পাতায়-ঢাকা কুঁড়ের ব্যাপার। শহরে অবশ্য দু-এক জায়গায় কাঠের বা মাটির থাম-ওয়ালা বড়ো-বড়ো আটচালার আকারের মন্দির দেখা যায়, কিন্তু উপবনের দেবতার স্থান এই ধরণেরই হ'য়ে থাকে। কর্নেল ব্রেটের আরদালি আমাদের সঙ্গের লোকটির সঙ্গে কথা ক'য়ে পূজার উদ্দেশ্য ও রীতি প্রভৃতি আমাদের ইংরেজিতে বুঝিয়ে' দেবার চেষ্টা ক'রলে, কিন্তু তার সব কথা ধরা গেল না।

এখানে এক অদ্ভুত অবস্থা দেখলুম। দেশের লোকে প্রায়ই, বিশেষতঃ যারা একটু শিক্ষিত ব'লে পরিচিত হ'তে চায়, নিজেদের খ্রীষ্টান ব'লে অভিহিত করে, আর কোন্ সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান, রোমান কাথলিক কি মেথডিস্ট কি চার্চ-অভ-ইংলাণ্ডের, সেটা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করে। একটা করে খ্রীষ্টান নামও নেয়, ভক্তিভরে গির্জাতেও যায়; আবার আবশ্যক-মতন এইসব মন্দিরে আর দেবতার আস্তানায় পুরোহিতদের দিয়ে দেবতার পুজোও করায়, দেবতার উদ্দেশ্যে মদ, Kola nut মুরগি প্রভৃতির ভোগ দেয়, সাষ্টাঙ্গে প্রণামও করে। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, দেবতাদের পুরোহিতরাও কেউ-কেউ অন্য সময়ে নিজেদের খ্রীষ্টান ব'লে পরিচয় দেয়, খ্রীষ্টান বা য়ুরোপীয় নামও নিয়ে থাকে— এটা পরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমি জানতে পারি। কর্নেল ব্রেটের কাছে শুনলুম, ওনি-ও এক দিকে খ্রীষ্টান, আর এক দিকে য়োরুবা ধর্মের সংরক্ষক—Defender of the (Yoruba) Faith; খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী এই য়োরুবা রাজা কতকগুলি বিশেষ ধার্মিক অধিকার ও সম্মান পেয়ে থাকেন, তেমনি এই ধর্ম পালনের জন্য তাঁর বিশেষ কতকগুলি কর্তব্যও আছে। ধর্মগুরু ওনি হিসাবে তাঁর কর্তব্য হ'চ্ছে যে, তিনি প্রায় ৪০টি বিভিন্ন মন্দিরে বৎসরে কয়েকবার ক'রে নিজে গিয়ে দেবতাদের অর্চনা

ক'রবেন। কিন্তু তিনি এখন আর নিজে যান না, তবে পূজার জন্যে নির্দিষ্ট নৈবেদ্য আর বলি পাঠিয়ে' দেন, এবং পুরোহিতরা তাঁর প্রতিভূ হয়ে যথারীতি দেবার্চনা সম্পন্ন ক'রে থাকেন। এই বন্দোবস্ত এখন বেশ চলেছে। আমি পরে ওনিকে য়োরুবা ধর্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলুম— তাঁর নিজের ধর্মমত নিয়ে অবশ্য আলোচনা করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হয় ব'লে করি নি। এর পরের দিন ওনির অধীনস্থ একজন পুরোহিতের বাড়িতে গিয়ে একটি অনুষ্ঠান দেখি। পুরোহিতের নামটি হচ্ছে, James Awosope জেম্‌স্ আরোসোপে। এই নাম থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এই ধর্ম কি কিম্ভূতকিমাকার গতি নিচ্ছে। আমার প্রশ্নে, ওনি উত্তর দেন যে, এখন যে দিকে হাওয়া বইছে তাতে মনে হয়, য়োরুবা ধর্ম আর নিজ বিশুদ্ধি রেখে টিঁকতে পারবে না, খ্রীষ্টান ধর্মের অনেক জিনিস এর মধ্যে ঢুকে যাবে। কিন্তু য়োরুবা ধর্মের অন্তর্নিহিত যে কতকগুলি সত্য দর্শন আছে, জাতির পক্ষে হিতকর অনেক বিষয় আছে, সেগুলি মরবে' না, জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে-ফিরে সেগুলি আবার এসে য়োরুবা জীবনে আর ধর্মানুভূতিতে নিজের যথাযোগ্য স্থান ক'রে নেবে। এ বিষয়ে বহু পূর্বে Nigeria নামে ইংরেজী পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটির কথা আমায় ব'ললেন, কিন্তু সে প্রবন্ধটি আমি সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারি নি।

এইভাবে দেবতার আস্তানা দেখা হ'ল। তখন কর্নেল ব্রেট্‌ ব'ললেন, তিনি আমার সঙ্গে প্রথম এই Juju Houseএ এলেন, এর আগে কখনও আসেন নি। তার পরে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন Odudua ওদুদুয়া দেবীর এক মন্দিরে। য়োরুবা ধর্মমতে আমাদের শিব আর উমার মতো সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের পিতা আর মাতার স্থানীয় দুই দেবতা আছেন— Obatalla ওবাতাল্লা এবং Odudua ; ইনি আমাদের উমার মতো। এই মন্দির অর্থে, একটু উঁচু জায়গায় স্থাপিত একটি কুঁড়েঘর। এখানে দেবীর একটি অতি পুরাতন পাথরের মূর্তি রক্ষিত আছে। পাশেই পুরোহিতের বাড়ি। আমাদের কিন্তু মন্দির-ঘরের ভিতরে ঢুকতে দিলে না। এখানেও সবই ভগ্নদশায় প'ড়ে। পুরোহিত ছিলেন না, কতকগুলি স্ত্রীলোককে সেখানে দেখলুম, আর পুরোহিতের এক ছেলে ছিল, আমরা জিজ্ঞেস করায় সেই ছেলেটি আমাদের জানিয়ে দিলে যে সে নিজে খ্রীষ্টান— অর্থাৎ, সে সভ্য মানুষ, জঙ্গলী নয়।

এর পরে কর্নেল ব্রেট্‌ আমাদের নিয়ে গেলেন ইফে শহরের একটি দ্রষ্টব্য স্থানে— সেটি হ'চ্ছে, আমেরিকায় Saturday Adventist সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত একটি হাঁসপাতাল। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অত্যন্ত গোঁড়া প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টান, আর এরা বাইবেলের প্রত্যেক কথাটির আক্ষরিক অর্থে আস্থা রাখে, সমগ্র বাইবেলকে একেবারে ঈশ্বর-বাক্য ব'লে বিশ্বাস করে। এদের মতে, রবিবার খ্রীষ্টানদের পক্ষে বিশ্রামের দিন হওয়া অশাস্ত্রীয়— পরমপিতা পরমেশ্বর ছয় দিন ধ'রে পৃথিবী সৃষ্টি ক'রে শ্রান্ত হ'য়ে যে সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেদিনটি ছিল শনিবার, রবিবার নয়। এই গভীর তত্ত্বকথাটি হ'চ্ছে এঁদের ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, য়িহুদিরা এই শনিবারই বিশ্রাম আর পূজার দিন ব'লে পালন করে। এঁরাও রবিবার যথারীতি কাজ ক'রে যান, আর শনিবারটি বিশ্রামের দিন ব'লে কোনো কাজকর্ম করেন না, কেবল উপাসনাদি করেন। Dr. S. A. Nagel ডক্টর এস্‌. এ. নাগেল ব'লে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক এই হাঁসপাতাল চালাচ্ছেন। ইনি নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মমত অভ্রান্ত ব'লে বিশ্বাস পোষণ করেন। এঁর আস্থা দেখে দুঃখও হয়, হাসিও পায়— ছোটো-খাটো শিশুচিত মতগুলিকে ইনি কি রকম নিবিড়ভাবে পরম সত্য ব'লে আঁকড়ে ধ'রে আছেন। সেকেলে ধরণের বিশ্বাসী ব্যক্তি,

আবার বাইবেলকে অভ্রান্ত বই ব'লে মনে করেন, তার বাইরে আর সত্য নেই; তিনি আমাকে জানিয়ে' দিলেন যে, এক সময়ে তিনি এই সম্প্রদায়ের মতের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, কিন্তু এটা তাঁর পৈতৃক সম্প্রদায়, তাঁর বাবার উপদেশে আবার তিনি এই সম্প্রদায়ের মতের উপরে আস্থা ফিরে পেয়েছেন, এবং এইভাবে পুনরায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরে তিনি ঈশ্বরের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ভদ্রলোকটি কর্মীও বটেন। তিনি, আর একটি আমেরিকান ডাক্তার, আর দুটি সিস্টার বা উচ্চশিক্ষিত নার্স, এঁরা মিলে ১২০ জন রোগীর অবস্থানের উপযোগী এই হাঁসপাতাল চালাচ্ছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত দেখালেন— কর্নেল ব্রেট্ তাঁর বাড়িতে ফিরে গেলেন। হাঁসপাতালে সব শ্রেণীর রোগী আছে, প্রসূতি-বিভাগও আছে— একেবারে দূর পল্লী থেকে আন্‌কোরা জঙ্‌লি মানুষও চিকিৎসার জন্য এসেছে। এই হাঁসপাতালে আফ্রিকান মেয়ে-নার্স আছে, এবং অনেকে এখানে শিক্ষা পাচ্ছে। ডাক্তার নাগেল আমাকে এঁদের হাঁসপাতালের অনেকগুলি ছবিওয়ালা পোস্ট-কার্ড দিলেন, এঁদের ধর্মমতের কতকগুলি বই দিলেন, আর পরে এঁদের ধর্মবিচার নিয়ে অন্য বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠাবেন ব'ললেন। পরে পাঠিয়েও ছিলেন, ক'লকাতায় আমার ঠিকানায়; আর প্রতিদানে আমি ওঁকে ডাক্তার রাধাকৃষ্ণনের ২।১ খানি বই আর স্বামী বিবেকানন্দের ২।১ খানি বই পাঠাই। কিন্তু সেসব বই যে তিনি বুঝে উঠতে পারবেন সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে' গিয়েছে।

এইভাবে বিকেল এবং সন্ধ্যেটা কাটিয়ে' কর্নেল ব্রেটের বাঙ্‌লায় ফিরে এলুম। ইবাদান থেকে যে দুটি ছোকরা আমার সঙ্গে এসেছিল, আকেনাবোর আর পেপ্‌ল্‌, তারা আমার কাছ থেকে বিদায় নিলে, আজই রাত্রে তারা ইবাদান ফিরে যাবে। আকেনাবোর আমার কাছ থেকে একটা লম্বা interview অর্থাৎ এই দেশে এসে কি কি দেখলুম আর সব কেমন লাগ্‌ল, এ বিষয়ে আমার মতামত লিখে নিলে। পরে নাকি এ থেকে কিছু-কিছু অংশ সরকারি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ক'রবে। এরা যে-সব ছবি নিয়েছে তাও সরকারের তরফ থেকে আমাকে পাঠানো হবে, একথা আমায় জানালে। এই ছোকরা দুজন বেশ কর্মক্ষম আর বিশেষ ভদ্র, এদের সঙ্গে পরিচয়ে বেশ খুশিই হয়েছিলুম।

সন্ধ্যা সাতটায় কর্নেল ব্রেট্ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ইফে শহরের কতকগুলি উচ্চ পদবীর ভদ্র সজ্জনকে আহ্বান করেন। এঁদের জন্য নানাবিধ পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। এরূপ সম্মেলনকে আমেরিকায় আর ইংলাণ্ডে cocktail party বলে— আমাদের দেশেও এই ইংরেজি শব্দ চ'লে যাচ্ছে। পশ্চিম-আফ্রিকায় একে বলে sherry party। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন বৃদ্ধ সরদার বা জমিদার, একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ, আর একজন পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এঁর নাম ছিল Mr. A. C. Willoughby উইলোবি— ইনি সস্ত্রীক এসেছিলেন। এঁরা সকলেই বিশুদ্ধ আফ্রিকান। আমি ভারতবর্ষ থেকে এসেছি দেখে আমার সম্বন্ধে এঁদের বেশ একটু আত্মীয়তার ভাব প্রকাশ পেলে। তবে এঁরা নিজেদের জাতি আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো খোঁজখবর রাখেন না, আর একটু যেন উদাসীন— এঁরা হচ্ছেন বিগত যুগের আফ্রিকান, যাঁরা ইংরেজদের প্রসাদের বাইরে আফ্রিকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অথবা সাংস্কৃতিক জাগরণের কথা মনে ক'রতেই পারেন না। শ্রীযুক্ত উইলোবি আমার পূর্ব-পরিচিত Leon Underwood-এর লেখা পশ্চিম-আফ্রিকার ব্রঞ্জ-মূর্তির সম্বন্ধে বই আমাকে দেখবার জন্য পাঠিয়ে' দিলেন— এই বইয়ের সম্বন্ধে তিনি নিজে কিছুই জানতেন না আর তাঁর কোনো বিশেষ আগ্রহও ছিল না, যদিও বইখানা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

রাত্রে নৈশ ভোজনের সময় কর্নেল ব্রেট্ আর একটি ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেন— ইনি হচ্ছেন একজন স্কট রোমান কাথলিক পাদরি, এঁর নাম Father Kane ফাদার কেন, ইনি কতকটা জেস্থইট-সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত। এখানে ধর্মপ্রচার উপলক্ষ্যে আছেন। লোকটিকে আমার খুবই ভালো লাগ্‌ল— বেশ সাদাসিধে, হৃদ্যতা আছে, রসজ্ঞান আছে। এঁর সঙ্গে নানা গল্প আলাপ আলোচনা হ'ল— ব্রেট্-দম্পতিও যথারীতি যোগ দিলেন।

রাত্রি সাড়ে ন'টার পরে বিশ্রাম ক'রতে এলুম— সারা দিনের পরিশ্রমে আর অপূর্ব-পরিচিত নূতন জগতের অভিজ্ঞতা-গ্রহণে শরীর আর মন বেশ একটু ক্লান্ত ॥

জগদীশ গুপ্ত ১৮৮৬ - ১৯৫৭

শেষ দাহের শিখায় একটি বিস্মৃতপ্রায় নাম সাহিত্যের জগতে ক্ষণিকের জন্যে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

কিছু কালের মধ্যেই তা হয়তো আবার তমসাবিলীন হয়ে যাবে।

সে নাম জগদীশ গুপ্তের।

জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনকালেই খ্যাতির প্রশস্ত রাজপথ থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে প্রায় অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। গুণগ্রাহী সন্ধানী রসিকের দূরবীক্ষণে ছাড়া সর্বসাধারণের স্থূল দৃষ্টির তিনি প্রায় অগোচর ছিলেন বললেই হয়। ছিলেন, তাঁর নিজের স্বভাবে কতকটা, আর কতকটা সাহিত্য-লোকের দুর্জ্ঞেয় নিয়তিতে।

সাহিত্যের এই নিয়তির রহস্য সত্যিই বোঝা কঠিন। সুবিচার অন্ততঃ যে তার ধর্ম নয় তার দৃষ্টান্ত অজস্র। সোনা ফেলে আঁচলে গেরো সে অহরহই আমাদের দেওয়ায়।

জগদীশ গুপ্তের বেলায় এই নিয়তির একটি নির্মম ঔদাস্যের উদাহরণ আমরা দেখলাম।

অন্তিম বহ্নিদীপ্ত তাঁর নাম আবার যদি অন্ধকারে মুছে যায়, সত্যি কথা বলতে গেলে তাতে দুঃখের এমন কিছু নেই। সব নামই তাই যায়, কিছু আগে বা পরে। দু-একটি যা থাকে তা শুধু আক্ষরিক পরিচয়ে নয়, থাকে, চিরন্তন জীবনপ্রবাহের সঙ্গে এমন-একটি বেগ হয়ে মিশে, যার নাম অবান্তর। আক্ষরিক নাম যাদের মুছে যায়, তারাও সেই প্রবাহে নিজেদের স্বল্পাধিক দানে অমর।

জগদীশ গুপ্তের মত লেখকের ভাবী বিস্মৃতি-সম্ভাবনায় দুঃখ তাই নেই। জীবনকালেই সে বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকা যেমন করে তাঁকে আচ্ছাদিত করেছিল, বিস্ময় শুধু তাইতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা সাহিত্যে যে একটা স্বাভাবিক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল তার প্রবর্তনায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের ঠিক পুরোবর্তী না হলেও জগদীশ গুপ্ত নগণ্য ছিলেন না।

দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে যেসব বিপর্যয় আজ প্রত্যক্ষ সাম্প্রতিক ইতিহাস, বিংশ শতাব্দীর সেই তৃতীয় দশকে তারই নাতিস্পষ্ট সূচনা তখন দেখা দিয়েছে। ভাঙন যে ধরেছে নানা দিকের চিড়-খাওয়া চিত্তপ্রসাদে তারই আভাস। এ যুগে যাঁরা লিখতে শুরু করেছিলেন, অসামান্য কিছু তাঁরা হয়তো তখন না করলেও তাঁদের ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্ত আত্মানুসন্ধানের অস্থিরতার মধ্যে সততার অভাব ছিল না। কি যে খুঁজছেন সব সময়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও নির্বিচারে মেনে নেওয়ার নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্নতা তাঁরা অকাতরে বর্জন করেছেন। ভালোমন্দ সত্যমিথ্যা কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতির প্রশ্ন যাচিয়ে নেবার যে দুঃসাহস তাঁরা দেখিয়েছেন অপরিণত মনের মাত্রাহীনতায় তা ধৃষ্টতার সীমায় কখনো হয়তো পৌঁছলেও তাঁদের আন্তরিকতায় কলঙ্কপাত করেনি।

বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও অন্তরের তারুণ্যে জগদীশ গুপ্ত এই দলের দলী ছিলেন। তাঁর কলমে যে স্বাভাবিক শক্তি ছিল তাতে তখনকার নাম-কাটাদের দলে না ভিড়ে সমবয়সীদের সনাতনী আসরে তিনি সহজেই সুনাম কিনতে পারতেন। কিন্তু সে সুনাম তাঁকে লুব্ধ করে নি। তার বদলে শিয়রে যার ব্যর্থতার অভিশাপ সেই বিপন্ন বিশৃঙ্খল যুগের অর্থ তিনি বুঝতে চেয়েছেন।

অত্যন্ত সাম্প্রতিক হলেও সে-যুগের মোটামুটি চেহারাটা হয়তো একবার স্পষ্ট ক'রে তোলবার চেষ্টা করা যেতে পারে। যে মধ্যবিত্ত, ইংরেজিশিক্ষিত, মূলত শহুরে সমাজ তখনকার সংস্কৃতির ধারক তার পায়ের তলার মাটি তখনই বেশ টলতে শুরু করেছে। জমিদারী প্রথা লোপ পায় নি, কিন্তু তার শুষ্কপ্রায় মধু ঝাঁঝালো হয়ে এসেছে, পরাধীনতার গ্লানি তো আছেই তার সঙ্গে নিরুপায় নিষ্ফলতার হতাশায় অধিকাংশ জীবনের দিগন্ত পর্যন্ত আচ্ছন্ন। ইতিহাসের মানে 'অর্থমনর্থম্'-এর মধ্যে নিহিত বলে ধরার রেওয়াজ শুরু না হলেও অসাম্য নিয়ে একটা ধোঁয়াটে বিক্ষোভ দেবতাদের ও নিয়তিকে ছেড়ে অন্য লক্ষ্য সন্ধান করছে। সামাজিক রীতি ও নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য আর নেই, কিন্তু পুনর্বিচার তীক্ষ্ণ হলেও পরিবর্তনের ধারা তখনও ক্ষীণ বলা যায়। মেয়েদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রায় স্বীকৃত কিন্তু তার প্রকাশ অস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বাদশীর বদলে ষোড়শী বা বড়জোর অষ্টাদশীরাই নায়িকা। তাঁরা পুরুষের সঙ্গে জীবিকার্জনের প্রতিযোগিতায় এমনভাবে তখনো নামেন নি যে ট্রামে-বাসে তাঁদের জন্য নির্দিষ্টের বেশি জায়গা ছাড়তে বিরক্তির গুঞ্জন ওঠে। ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবনে সমস্যার কাঁটা তখনও অনেক, কিন্তু বিদেশী শাসনের ক্ষতটাই প্রধান হয়ে আর-সব জ্বালা কিছুটা ভুলিয়েও রেখেছে।

সবসুদ্ধ জড়িয়ে, চিন্তায় ভাবনায়, আশায় আকাঙ্ক্ষায়, আদর্শে উদ্দেশ্যে এমন-একটা অস্থির ঘোলাটে বিশৃঙ্খলা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ও পরে যার আকস্মিক প্রকাশ সেইসব সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও অর্থ নৈতিক বিস্ফোরণের বারুদ কোথায় যে গোপনে সঞ্চিত হচ্ছিল কেউই ঠিকমত বুঝতে পারেন নি। বুঝতে না পারলেও বারুদের অস্পষ্ট ঘ্রাণ যাঁদের সচকিত সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল, শুধু আমাদের দেশে নয় সর্বদেশের সাহিত্যেই তাঁরা তাঁদের ক্ষুব্ধ চাঞ্চল্যের ছাপ রেখে গেছেন।

এই ক্ষুব্ধ অস্থিরতাতেই জগদীশ গুপ্ত 'লঘুগুরু'র নতুন মানদণ্ড খুঁজেছেন, রোমন্থন, রতিবিরতি, দুলালের দোলা, অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদি নানা রচনায় জীবনের মূল্য ও মর্যাদা গাঢ় বেদনাময় সংশয়ের কষ্টিপাথরে নতুন করে যাচাই করবার চেষ্টা করেছেন।

এই বেদনাময় সংশয়ই, জগদীশ গুপ্ত শুধু নয়, সেকালের অনেক লেখকেরই রচনার মূল সুর। মামুলি অনেক ধারণায় তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছেন কিন্তু নতুন কোনো ধ্রুবভিত্তিও খুঁজে পান নি। জ্বলন্ত তাঁদের জীবন-জিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত তাই অনেক ক্ষেত্রেই তিক্ত নৈরাশ্যে ভস্ম-ধূসর। তবু মিথ্যা মোহের আবরণে দুর্বল আত্মপ্রতারণা যথাসম্ভব পরিহার করবার চেষ্টা যে তাঁদের ছিল, লঘুগুরুর মত যে-কোনো একটি কাহিনী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

লঘুগুরু পতিতাদের জীবন নিয়ে লেখা গল্প। পতিতাদের নিয়ে অনেক গল্প আমাদের ও অন্য দেশের সাহিত্যে লেখা হয়েছে। নির্বোধ সমাজের অন্যায় ঘৃণার প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক লেখকের কলম এমন বিপরীত দিকে ঝুঁকেছে যে ভাবালুতার কুয়াশায় বাস্তবতা সেখানেও সমান বিকৃত। জগদীশ গুপ্তের লঘুগুরু এই দুই সীমান্তের কোনো দিকেই সত্যভ্রষ্ট হয় নি। পতিতা সেখানে দেবীও হয় নি, পিশাচীও নয়। সমাজের যে অসুস্থ গ্লানি থেকে তার সৃষ্টি, সেই অস্বাভাবিকতার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা লঘুগুরুতে তাই এত মর্মান্তিকভাবে করুণ।

লঘুগুরু অসাধু সিদ্ধার্থ ইত্যাদির মত রচনা থাকা সত্ত্বেও জগদীশ গুপ্ত তাঁর জীবনকালেই যে বিস্মৃত হয়ে এসেছিলেন তার কারণ খুঁজে বার করা সত্যিই কঠিন। তবে তাঁর কাহিনীর সওদাগরিতে মোহের

অঞ্জনের অভাব হয়তো তার একটি হেতু হতে পারে। তাঁর কলম হয়তো সর্বত্র সমান সূক্ষ্ম নয়, উদ্‌ভ্রান্ত যুগের প্রেরণায় তা হয়তো নিরর্থক গোলকধাঁধায় কখনো ঘুরে মরেছে, ভুয়ো ভব্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তা হয়তো সৌষ্ঠব-সংযমের সীমা কোথাও অতিক্রম করে গেছে, তবু পাঠকের মন ভোলাতে জীবনের উপর মিথ্যে রং চড়িয়েছে এ অপবাদ তার নামে বোধ হয় দেওয়া যাবে না।

একাত্তর বৎসর বয়সে জগদীশ গুপ্তের মৃত্যু হয়েছে। সারাজীবন সাহিত্যের নিভৃত সাধনাই তিনি করে এসেছেন। এই নির্লজ্জ আত্মপ্রচারের যুগে সাধনার এমন নিষ্কাম নিষ্ঠাও বিরল। বর্তমানের নগদ মূল্য যথাযোগ্যভাবে তিনি পান নি; ভাবীকাল তার ক্ষতিপূরণ করবে অনুশোচনায়, এমন আশ্বাস দেবার সাহসও আমাদের নেই, তবু জগদীশ গুপ্তের মত লেখক ব্যর্থ হতে পারেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। সময়ের স্রোতে সব কিছুই হারায়, তবু জীবনকে নির্ভীক নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখবার ও বোঝবার চেষ্টায় অসাধু সিদ্ধার্থের মত বই লেখবার জন্যে সারাজীবন রোগ শোক অভাব দারিদ্র্যের সঙ্গে অম্লানবদনে যিনি যুঝে এসেছেন, প্রত্যক্ষভাবে না হোক, তাঁর সাহিত্যিক সাধুতা পরোক্ষভাবে ভাবী কালের অনুপ্রাণনা হয়ে থাকবেই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ১৮৭৭ - ১৯৫৭

গুটিকতক পাওনাদারের কাছে আজীবন ঋণী হয়ে থাকাকে পরম গৌরবের বিষয় বলে মনে করি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার তাঁদের মধ্যে প্রথম।

যাঁরা মনে করেন ছোটদের দিনগুলি বুঝি শুধু খাওয়াদাওয়া হাসিখেলা দিয়েই ভরা থাকে, ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলো বুঝি তাদের সবই বাস্তবজগতের, শিশুমনস্তত্ত্বের আদ্যক্ষরও তাঁদের চেনা হয় নি। আমার মনে আছে সে সময়ে মাত্র দশটি দিক্‌, তিনটি প্রসার, আর চব্বিশটি ঘণ্টা দিয়ে কুলানো যেত না। হৃদয়ের মধ্যে অষ্টপ্রহর যে অনুভূতিগুলো আকুলি-বিকুলি করতে থাকত, ভাষায় যাদের ব্যক্ত করা যেত না, কাজে যাদের প্রকাশ করা যেত না, বক্তা ছিল যাদের মুখ্যু, হাত ছিল আনাড়ি, শক্তি ছিল দুর্বল, গুরুজনরা যাদের প্রতিকূল, পরিবেশ যাদের বাধা, অথচ যাদের অবিরাম কলরোলে কান ঝালা-পালা হয়ে উঠত, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সেইসব আকুল অনুভূতিগুলোকে মহাসাগরে মুক্তি দিয়েছিলেন। সে মহাসাগরের বর্ণনা দেওয়া যায় না, সুনীল তার জলরাশি; উত্তাল তার ঢেউ; উদ্দাম তার ঝোড়ো হাওয়া; বক্ষে তার ডুবে-যাওয়া জাহাজের ধনরাশি, আর মুক্তোভরা ঝিনুক আর আধখানা মাছের মতো দেখতে সুন্দরী দুঃখিনী মেয়ে; মাঝে মাঝে দুর্গম দ্বীপ, যেখানে পৌঁছতে পারলে সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

কে বলেছে শিশুমনে জ্বালা নেই? ছোটবেলাকার সে মাত্রাহীন যুক্তিহীন অসহ্য ব্যথাগুলোর কথা যার মনে নেই, তাকে আর কি বোঝাব? সে যন্ত্রণার তীব্র অবর্ণনীয় আনন্দের কথাই বা কি করে বলব? কথা বন্ধ হয়ে যেত; গলার পিছনে, ডাক্তার-বদ্যির নাগালের বাইরের গোপন একটি কোষ বেদনায় টন্‌টন্‌ করে উঠত। সুখদুঃখ মিলে একাকার হয়ে যেত, দুইয়েতে যে কোনো তফাত নেই

জগদীশ গুপ্ত

শ্রীপরিমল গোস্বামী গৃহীত চিত্র

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

সুনির্মল বসু

সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠত। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের নামও তখন শুনি নি, কিন্তু নাম দিয়ে কি-ই বা এসে যেত? আধারের কি কোনো দাম ছিল তখন? পঞ্চরসের ধারা আকণ্ঠ পান করেছিলাম, ষড়ৈশ্বর্য অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছিলাম। অধর থেকে আজও তার স্বাদ যায় নি, জীবনের ধারে ধারে আজও সোনালি পাড়টুকু লেগে আছে। এ ঋণ কি শোধ করবার মতো?

কাগজে পড়লাম দক্ষিণারঞ্জনের আশি বছর বয়স হয়েছিল, দুটি মেয়ে রেখে গেছেন, কুড়ি পঁচিশ খানি বই রেখে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ডাকঘরে" ঠাকুরদা সেজে অভিনয় করেছিলেন, গত বছর পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন।

এই দিয়েই কি দক্ষিণারঞ্জনের হিসাব কষা হয়ে গেল?

দানকে যদি সীমার মধ্যে বেঁধে ফেলা যায় তা হলে সে হল ছোট দান। দক্ষিণারঞ্জন যা দিয়েছেন সে হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হবার মতো জিনিস। মানবচিত্তের চিরন্তন সুখদুঃখের উপর সে গড়া, কাহিনীর মধ্যে রাক্ষস খোক্কস দৈত্য দানা যতই-না অবাধে বিচরণ করে বেড়াক। অসম্ভব ঘটনাবলীর জালে জড়িয়েও দৈনন্দিন হৃদয়াবেগগুলো বিন্দুমাত্র জটিল হয়ে ওঠে নি, বরং আয়নার ছবির মতো চোখের সামে পরিস্ফুট হয়েছে। ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই কখনো আমাদের জীবনে ঘটে উঠবে না, কিন্তু যদি হত, কোনো এক ইন্দ্রজালের ছোঁয়া লেগে তাই যদি হত, তবে আমরাও ঠিক ঐরকমই করতাম। এইখানেই গল্পের অপরূপত্ব। অসম্ভব হলেও কোনোটাই অস্বাভাবিক নয়।

আর সে কি রোমাঞ্চকর অসম্ভব! তার বদলে সব সম্ভাবনা, সব সাফল্য অকুণ্ঠিতচিত্তে বিলিয়ে দেওয়া যায়। মৃগয়া করতে গিয়ে, ঘন বনে পথ হারিয়ে সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত দেহে, হতাশ মনে চোখে পড়ে গাছতলায় ব'সে কে একজন রূপসী মেয়ে আকুলনয়নে কাঁদছে। ঘোড়ার উপর তুলে নিয়ে রাজা তাকে ঘরে এনে বিয়ে করে ফেললেন। তার পর রোজ রাতে হাতীশালা থেকে হাতী যায়, ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া। এই পর্যন্ত এসে, মধুর রসের পালা ফুরিয়ে বীভৎসের অবতারণা হয়। হৃদয় তোলপাড় করে দেয়। পরিশেষে গরিব গুণী ছেলে রাক্ষসীরানীকে ধরিয়ে দিয়ে, রাজার মেয়েকে বিয়ে করে, পরমসুখে দিনপাত করে। গল্প এখানে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার সুরটি বুকের মধ্যে গুমরোতে থাকে, তার পর রাজার কি হল, বুক ভেঙে গেল না? মানবজীবনের চিরন্তন বিফলতার বেদনায় চিত্ত আকুল হয়ে ওঠে।

গল্পগুলি পুরোনো, ছাঁদটি কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের, ইন্দ্রজালটি তাঁর। নিজে কোথাও রঙ্গমঞ্চে নেমে আসেন না, রূপকথার মোহ-যবনিকা কোথাও ছিঁড়ে যায় না। কিন্তু অসত্যকে বাহন করে যে নিগূঢ় সত্যগুলি মনকে নিরন্তর নাড়া দিতে থাকে, সেগুলিই হোল দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের চিরন্তন সামগ্রী।

আঙ্গিকেরও লালিত্য আছে, গদ্য যেখানেই পঙ্গু হয়ে আসে, দু লাইন ছড়া দিয়ে দক্ষিণারঞ্জন তাকে উদ্ধার করে দেন। আর ছবি? সে সব ছবি কে এঁকেছে জানি না, কিন্তু এমন শিল্পী আর তো দেখি না, রাক্ষসদের যে অমন রাক্ষুসে রূপ দিতে পারে। 'জিভ লক্‌লকের' মূর্তিখানি চিরদিন আমাদের চিত্তে অঙ্কিত হয়ে থাকবে।

সেই দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার চলে গেছেন এ কথাই বা কেমন করে বলা যায়। বাংলা দেশে যতদিন ছেলেমেয়ে আছে দক্ষিণারঞ্জনও ততদিন আছেন।

লীলা মজুমদার

সুনির্মল বসু ১৯০২ - ১৯৫৭

আকাশে তো কত তারা থাকে, কিন্তু ঐ অজস্র আলোর বিন্দুসমষ্টির মধ্যে থেকে যে তারাটি বেশি উজ্জ্বল আলো ছড়ায় তার উপরেই আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আকাশের-দিকে তাকিয়েই প্রথমে খুঁজতে ইচ্ছে হয় সেই তারাটি।

কিশোরদের আকাশের সেই অতিপ্রিয় তারাটি নিবে গেছে। এতে আকাশ হয়তো নিবে যায় নি একেবারে, কিন্তু আকাশের মোহ এতে একটু কমেছে স্বীকার করতেই হবে।

সুদীর্ঘ কাল, প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর, সুনির্মল বসু তাঁর ছন্দের দোলা দিয়ে বাংলা দেশের কিশোরদের সঙ্গে খেলা করেছেন। কিশোররা তাই তাঁকে তাদেরই একজন সহচর ও সঙ্গী বলে জেনে এসেছে। ছোটরা কি চায়, তাদের মনের পরিধির মাপ কত, তাদের কল্পনার পরিমাণ কতখানি— এসব জানা না থাকলে ছোটদের বন্ধু হওয়া মুশকিল।

সুনির্মল বসু এসব জানতেন, তাই ছোটদের বন্ধু হতে তাঁর কোনো অসুবিধে হয় নি; কেবল বন্ধুই না, তিনি তাদের মনের মালিকই ছিলেন বলা যায়। এইজন্যে তাদের চাহিদার জোগান দিতে তিনি পেরেছেন অনায়াসেই।

পূর্ববাংলার ঢাকা জেলায় তাঁর দেশ। তিনি জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পিতার কর্মস্থলে— গিরিডিতে। এখানেই তাঁর বাল্যকাল কাটে। কাঁচা মাটিতেই পুতুল গড়া সম্ভব, বাল্যের সেই কাঁচা মনের উপর যে ছাপ পড়ে সুনির্মল বসুর রচনায় তার চিহ্ন প্রায় সর্বত্র ছড়ানো। গিরিডির সেই পাহাড়তলী, পাহাড়ি নদীর সেই জলকল্লোল, উস্রিপ্রপাতের সেই জলোচ্ছ্বাস, মহুয়ার বন, মাদলের ধ্বনি, সাঁওতাল নরনারীর প্রাণস্পর্শী নৃত্যছন্দ— কিশোর সুনির্মলের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তার সাক্ষাৎ-প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর অজস্র রচনায়।

ক্রমে তাঁর বয়স বেড়েছে, একের পর এক তিনি নানা বিষয়ে তাঁর লেখনী চালনা করেছেন। কখনো গল্প, কখনো কাহিনী, কখনো উপন্যাস, কখনো ভ্রমণবৃত্তান্ত— এইভাবে প্রায় দুই শ বইয়ের গ্রন্থকার তিনি হয়েছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় রয়ে গেছে তাঁর ছড়ায় এবং কবিতায়। কেননা, শারীরিক বয়স তাঁর বেড়েছে বটে, কিন্তু তাঁর মনের বয়স বাড়তে তিনি দেন নি, সেই মনটিকে রেখেছিলেন কিশোর করেই। এবং সেই কিশোর মনের অকৃত্রিম আনন্দ তিনি নানা ছন্দের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে বিতরণ করেছেন কিশোরদের মধ্যে। কিশোরদের আকাশে এইজন্যেই তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বল তারা। আলোর কাঁপন দিয়ে প্রিয় তারাটি যেমন আমাদের মনকে খেলা দেয়, সুনির্মল বসু অবিকল সেইভাবে ছন্দের কম্পন দিয়ে খেলা দিয়েছেন কিশোরদের।

সুনির্মল বসু নানা রকম ছন্দের কারিকুরি দেখিয়ে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় তো দিয়েছেনই, কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। তিনি কিশোরদের কান তৈরি করে দিয়েছেন বলা যায়। তাঁর কবিতার বা ছড়ার সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠপরিচয় আছে, তারাই অন্য-কারো কবিতায় একটু ছন্দের ভুল হলেই চমকে তাকায়। ত্রুটিটা কোথায়, অতটা বলতে না পারলেও ত্রুটি যে আছে তা ধরতে কোনো কষ্ট তাদের হয় না। ছন্দের

নৈপুণ্য তিনি অর্জন করেছিলেন সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা থেকে এবং ছন্দের বৈচিত্র্য সুকুমার রায়ের কাছ থেকে।

কেবল ছন্দের দোল দিয়ে খেলা দেওয়া নয়, সেই খেলার সঙ্গে ছোটদের শিক্ষা দেওয়াও ছিল সুনির্মল বসুর ধর্ম। সেইজন্যে তাঁকে কিশোরদের সহচরই শুধু নয়, তাঁকে আমরা কিশোরদের শিক্ষক বলেও স্বীকার করে নেব।

মানুষকে শ্রদ্ধা করতে না জানলে কারো শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না। কেউ কেউ মানুষকে অশ্রদ্ধা করে ও অস্বীকার করে নিজে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। সে ব্যর্থ পথের পথিক সুনির্মল বসু ছিলেন না। তিনি মনুষ্যত্বের ও মহত্ত্বের উপর গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁর মনের এই শ্রদ্ধাশীলতা তাঁর রচনার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই প্রতিধ্বনির প্রতিদানও তিনি পেয়েছেন, তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা পেয়েছেন সকলের। তাঁর তিরোধানে তাই কেবল একটি তারা-খসার আক্ষেপই শুধু নয়, একজন বন্ধুবিয়োগের বেদনাও অনুভব করেছে সকলে।

তিনি আজ নেই বটে, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর তিনি যেন রেখে গেছেন আমাদের মধ্যে। আজও তাই আমরা যেন স্পষ্ট শুনতে পাই তাঁর গলা—

যাস কোথা তুই গোবর্ধন,
একটা মজার খবর শোন্—
বৃহস্পতির বারবেলায়
ডোবার জলে চার ফেলায়
উঠল কুমির বঁড়শিতে,
দেখল পাড়াপড়শিতে।
সাবধানেতে কালকে তায়
পাঠিয়ে দিলাম কলকাতায়।

তার পর কুমিরের কি হল, সে কথা জানার ইচ্ছে আমাদেরও নেই, গোবর্ধনেরও নেই। যে খবরটুকু পাওয়া গেল বার বার ঐ খবরটা আবৃত্তি করতে পারলেই হল। তার মধ্যেই মজাটা আছে জমা।

মাদল আর বাঁশি নিয়ে চলেছে দুই সাঁওতাল্ বন্ধু একটা মস্ত জঙ্গলের এলাকা পেরিয়ে। তাদের চলার গতি এবং তাদের মাদলের ধ্বনি ও বাঁশির সুর বেজে উঠেছে মাত্র কয়েকটি ছত্রের মধ্যেই—

মংলা-ভায়া জলদি চল
জংলা দেশের ঠিক কী বল

চলছে তারা দুলকি চালে। দুই সাঙাতে বাজাতে বাজাতে চলেছে—

মাদল— দিপির দিপাং দিপির দিপাং দিপির দিপাং তাং
বাঁশি— তুতুর তুয়া তুতুর তুয়া তুতুর তুয়া তু।

এই ধ্বনি সাঁওতালপল্লীর প্রান্তরেই মিলিয়ে যায় নি, এ ধ্বনি ছড়িয়ে আছে সারা বাংলা দেশের কিশোর-মনের প্রাঙ্গণে-প্রাঙ্গণে।

সুশীল রায়

দেবজন্ম ও এসকিলস্

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

গ্রীক পুরাণে একটা বিচিত্র ঘটনা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে— দেবতাদের সিংহাসনচ্যুতি ও প্রাধান্যপরম্পরা। শেষবার যিনি দেবরাজ হলেন, তিনি স্বনামবিখ্যাত জিউস্ বা জুপিতর। কিন্তু তিনি সিংহাসন অধিকার করেছিলেন তাঁর পিতা ক্রনস্‌কে বিতাড়িত করে; এই ক্রনস্‌ও আবার রাজপদে উঠেছিলেন তাঁর পিতা ইউরেনস্‌কে বিচ্যুত করে। এ যেন রাজত্বের জন্য উত্তরাধিকারীদের বংশানুক্রমিক দ্বন্দ্ব (war of succession)— মানব ইতিহাসে এ ব্যাপারটি একান্ত পরিচিত, প্রাচ্যে হোক আর পাশ্চাত্যে হোক।

অনেকে বলবেন— পুরাতত্ত্ববিদেরা বলে থাকেন— এর মধ্যে আশ্চর্যের বা রহস্যের কিছু নাই। ভগবানকে, দেবতাকে মানুষ গড়েছে নিজের আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে— স্বর্গ পৃথিবীরই প্রতিচ্ছবি। সুতরাং স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে যা ঘটে তা মানবীয় ইতিবৃত্তেরই আলেখ্য বা অনুবৃত্তি। মানুষের কল্পনা মানুষের স্বভাবকে ত ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কথাটি কি তবে এই শুধু?

কারণ, আর-একটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। একটু অভিনিবেশ করে দেখলে, ধরা যায় না কি শুধু পারম্পর্য নয়, কিন্তু পরিণামে একটা ক্রমোন্নতি? ঐতিহ্যে স্পষ্টই বলা হয়েছে 'টাইটান' (দানব বা অসুর)-দের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ। আদিদেবতাদের অন্য নামই ছিল বৈদিক ভাষায় অসুর অর্থাৎ শক্তিমান। কিন্তু গ্রীকেরা যে সব শক্তিমানদের কথা বলেছেন তাঁরা পৌরাণিক অর্থে অসুর— তারা হল 'কাম এষঃ ক্রোধ এষঃ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ', এই বৃত্তির প্রতিমূর্তি। এদের স্বভাবে চরিত্রে যে রূঢ়তা যে ক্রূরতা তা স্পষ্ট। ক্রনস্ এবং তাঁর ভ্রাতৃকুল হলেন এইসব টাইটান। একদিকে তাঁরা স্বর্গের (ইউরেনস্) সন্তান, তাঁদের মা হলেন কিন্তু পৃথিবী ('গেয়া' বা 'গে')— মাটির, জড়ের চেতনায় বা অবচেতনায় তাঁরা ঢালাই হয়েছেন বলেই তাঁরা হলেন একটা অধঃপতনের প্রতীক। দ্রষ্টব্য, তাঁরা সংখ্যায় বারো, ছয়টি পুত্র, ছয়টি কন্যা— সৃষ্টির ছয়টি স্তরের বা লোকের সত্তা ও শক্তি অর্থাৎ সত্তা ও শক্তির অপচ্ছায়া? স্বর্গ হতে যে তাঁদের বিদায় হয়েছিল, ইউরেনস্ যে তাদের নির্বাসিত করে দিয়েছিলেন রসাতলের গর্ভে, তার হেতু তাদের অদেবী প্রকৃতি।

আদিদেবতার তিরোভাব, অসুরের দানবের আবির্ভাব, অমৃতত্বের পরিবর্তে মৃত্যু-বিষের জারণ সৃষ্টির মূলে একটা গূঢ় ইতিহাস—ইউরেনস্-এর পরিবর্তে ক্রনস্। কিন্তু অন্ধকারের গর্ভে জ্বলল আলো— তার প্রথম শিখা নিয়ে দাঁড়াল জিউস অলিম্পস্-পাহাড়ের চূড়ায়। জিউসের ভ্রাতৃকুল যে দেবগোষ্ঠী গঠন করেছে তা জ্যোতির্ময় হাস্যময়; তাদের পূর্ববর্তীদের তামসী প্রকৃতি কাটিয়ে তারা পেয়েছে এনেছে একটা জ্ঞানের সৌন্দর্যের সুষমশক্তির প্রভাব, যা হ'ল গ্রীক বা হেলেনিক শিক্ষাদীক্ষার দান।

২

দেবতার নবজন্ম— এই রহস্যটি গ্রীক নাট্যকার এসকিলস্ তাঁর নাটকের ভিতর দিয়ে কথঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করেছেন। এসকিলীয় নাট্যাবলির মূল সূত্র যদি বলি জিউস্-রহস্য অর্থাৎ দেবরাজ জিউস্

হলেন তাঁর নাট্যজগতে প্রধান ব্যক্তি বা নায়ক— তাঁরই প্রভাব বা ছায়া ছেয়ে আছে এসকিলীয় রঙ্গাঙ্গনে (যেমন বলা হয়ে থাকে, অশরীরী সীজর ছেয়ে আছে সেক্সপীয়রের সীজর নাটক), তবে তা অত্যুক্তি হবে না। কথাটি এখন একটু বিশদ করে বলা প্রয়োজন।

গ্রীক চেতনার একটা মূল বৈশিষ্ট্য হল নিয়তির, একটা অকাট্য নিয়তির বোধ— আমরা যেমন বলে থাকি 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। সৃষ্টির একটা ধারা আছে, গতি আছে, নিয়ম আছে (nomoi); সেই নিয়মই হল নিয়তি (Moirae)। অর্থাৎ মানুষকে জীবকে সেই নিয়ম পালন করতে হয়, সেই ধর্ম অনুসরণ করতে হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে; এ হল দিব্যবিধি, মানুষের গড়া তা নয়, চিরকাল তা ছিল, আছে, থাকবে— এই তো সনাতন ধর্ম। একে যে পালন করে সে পুণ্যবান, স্বর্গে তার স্থান; যে পালন করে না সে ব্যভিচারী পাপী। পাপের ফল জীবনে দুঃখকষ্ট নির্যাতন, পরিণামে নরক-ভোগ। এরই নাম কর্মফল (anangke, ATE)। কর্মফলের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না— কর্মের কুম্ভীপাকে পুরোপুরি ঘুরতেই হবে। গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিস তাঁর ইডিপস্-কাহিনীতে নিষ্করুণ কর্মগতির আলেখ্য দিয়েছেন, ট্রাজেডির চরম কারুণ্য দেখিয়েছেন।

কর্মবন্ধ, কঠোর নিয়তি একদিকে নিষ্করুণ নির্মম— পৃথিবীর তুচ্ছ আকুতি তাকে স্পর্শ করে না— আধুনিক এক কবির কথায়— Beyond the little voice that prays; আকস্মিক করুণা তার বিধানকে ভেঙে দিতে, টলাতে পারে না, হিউগো বলেছেন। কারণ অন্য দিকে, তাই তো হল নিরপেক্ষতা, সমদৃষ্টি, ঔচিত্য, যথান্যায় (DIKE, Justice)। এখানে এই ন্যায়ের তন্ত্রে, আমরা পূর্বতন মনোভাব থেকে একটা ভিন্ন উচ্চতর চেতনায় যেন উঠে গিয়েছি। অসুর বা টাইটানদের— জিউসের পিতৃপুরুষদের — ছিল স্বৈরেচ্ছার স্বেচ্ছাচার অর্থাৎ অনিয়মের জগৎ। বলেছি যে প্রকৃতির পরিচয় 'কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং'— কিংবা 'অহঙ্কারং বলং দর্পং'— তাই হল এই রাজতন্ত্রের বা শাসনের প্রতিষ্ঠা। এই অরাজক স্বৈরাচারের (TURANNIS, tyranny) পরিবর্তে এখন এল নিয়তির বা কর্মের দৃঢ়বন্ধন— শুধু মানুষ কেন দেবতাদের (অসুরদের) পর্যন্ত মানতে হয়, ভোগ করতে হয় কর্মফল। কারণ তাই হল যথাবিধান, তাই ন্যায্যতা। আর জিউসই এই বিধানের ধর্তা, তিনিই ন্যায়াধীশ।

এর পরে, এবং উপরেও কথা আছে অবশ্য। কর্মবন্ধের নিয়তির ন্যায্যতার বাইরে, তার উর্ধ্বে হল যে তত্ত্ব ও সত্য তার নাম ভগবৎকৃপা বা করুণা। তার সঙ্গে মানুষী চেতনার পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে। কর্মচক্রকে কেটে দিতে পারে এমন রহস্যময়ী শক্তি আছে, তাকে আবাহন করা যেতে পারে, কর্মজালের মধ্যে তাকে নামিয়ে আনা যেতে পারে এবং তার আশ্রয়ে জীব মুক্ত হয়ে উদ্ধার হয়ে যেতে অর্থাৎ উন্নীত হতে পারে উর্ধ্বতর বৃহত্তর স্বাচ্ছন্দ্যের লোকে। এই যে কারুণ্যশক্তি বা ভগবৎপ্রসাদ এক হিসাবে তা আবার অহেতুক— হেতু হয়তো আছে, কিন্তু সে তার নিজের মধ্যে, তার নিজের অসীম শাশ্বত গতির ছন্দে। তবে জীব সে অনির্বচনীয়ের পথ সুগম করতে পারে তার দিক থেকে প্রণিপাত, প্রপত্তি, শরণাগতির সহায়ে।

প্রথম পর্বে হল তবে পাপকর্মের ফল দণ্ডভোগ। ব্যভিচার বা নিয়মভঙ্গের পরিণাম শাস্তি অব্যর্থভাবে (গ্রীকরা এই প্রবৃত্তি বা দুষ্প্রবৃত্তির স্বরূপ দেখাতে গিয়ে তার নাম দিয়েছে হুব্রিস্, Hubris)। প্রমেথেউস পাহাড়ের উপরে গাঁথা পড়লেন, এনসেলাডেস্ এটনা-আগ্নেয়গিরির তলে চাপা পড়লেন। কিন্তু প্রশান্ত মনে,

বিদ্রোহ ঘোষণা না করে যদি দণ্ড গ্রহণ করা যায়, যদি তাকে স্বীকার করা যায়, সহ্য করা যায়— ন্যায়ের ধারা ব'লে, যেমন রাজা ইডিপস করেছিলেন— তবে তার স্বরূপ বদলে যায়, তার নাম হয় প্রায়শ্চিত্ত এবং তা সংশোধনের বা পরিশুদ্ধির পর্যায়ে উঠে দাঁড়ায়। কঠোর কর্মবন্ধনের ফলে— এমন কি যাকে বলে 'উৎকট কর্ম', যার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই এবং যার ফল আশু এবং অবশ্যম্ভাবী, তার নির্বন্ধেও, শাস্তিভোগকে যদি প্রায়শ্চিত্তে পরিণত করা যায়, তবে পূর্বতর কর্মধারার প্রতিষেধ, এমন কি বিলোপ পর্যন্ত করা যায়— নরক হয়ে ওঠে Purgatory, অর্থাৎ পৌঁছে যাই স্বর্গের দুয়ারে। তখন যদি ভগবৎকরুণা এসে দেখা দেয় (যেমন বেয়াত্রিস্ এসেছিলেন দান্তের কাছে) তবে পুরাতন কর্ম, নরক সত্যই অবলুপ্ত হয়ে যায়, দেখা দেয় নন্দনের পরিশুদ্ধি ও আনন্দ। গ্রীক পুরাণে কর্মফলের প্রেতমূর্তি, পাপের শাস্তিদূত হল বিকটদর্শনা Erinyes— তারা অপকর্মের প্রতিক্রিয়া— এ হল justice without mercy; কিন্তু অপকর্ম প্রায়শ্চিত্তে বা চেতনা-পরিবর্তনে বা ভগবৎকরুণায় রূপান্তরিত হয় যদি সুকর্মে তবে তারাই হয়ে ওঠে সুদর্শনা Eumenides.

৩

এসকিলসের বৈশিষ্ট্য এই যে জিউসকে তিনি কেবল দণ্ডবিধাতা নয়, ন্যায়াধীশরূপে অধিষ্ঠিত করেছেন— এবং যথাসম্ভব ন্যায়ের সঙ্গে করুণারও স্থান করে দিয়েছেন। আমি যে দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলেছি সেই চেতনা তাঁর আবহাওয়া— তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে উঠে যান নি, তবে সেদিকের একটা দরজা বা জানালা খোলা এরকম অনুভব করি। খৃস্টীয় করুণা তাঁর মধ্যে আমরা আশা করি না, সোক্রাতেস বা প্লেটোর স্নিগ্ধ সৌভ্রাত্র কিছু পাই বই কি।

আমি বলেছি আদিযুগের দেবতা (বা অসুর, টাইটান) ছিল শক্তি বা বলের প্রেতমূর্তি, অবিমিশ্র কেবল বল— ঘোরকর্মা তারা, অবাধ 'অয়মহং ভোঃ' এই তাদের মন্ত্র। তামস প্রাণপ্রবেগের মধ্যে এসে দেখা দিল একটু আলো, একটু জ্ঞান, একটু প্রীতি— জিউস এলেন সেই চেতনার প্রতিভূ হয়ে, তাঁর অলিম্পীয় সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে।

এসকিলসের জিউস তাই শুধু বজ্রধারী দণ্ডবিধাতা নন— তিনি আবার পরিত্রাতা, সহৃদয় অতিথি-বৎসল। তাঁর সান্ত্বনাদায়ী স্পর্শের যাদু এসকিলস্ বলছেন কি অপরূপ :

'যে হাতের শক্তি দুঃখের অতীত, যে স্পর্শ তুরীয়ের নিঃশ্বাস হতে, তাই দিয়ে তিনি মুছে দিলেন আর্ত মেয়েটির সব যন্ত্রণা।'[১]

এই কোরাসটিতেই জিউসের স্বরূপ সম্বন্ধে কবি যা বলেছেন তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে কি নতুন একটা জিনিস 'এসকিলস্' এনে দিয়েছে তাঁর জিউসের পরিকল্পনায়— তা হল মিস্টিকদের, ভারতীয় ঋষি বা অধ্যাত্মসাধকদেরই মূল তথ্য : এসকিলসের এই বিখ্যাত কোরাস্ বলছে :

'কোন দেবতাকে আবাহন করব আমি' (গ্রীক Tin' an Theōn···Kekloiman স্মরণ করিয়ে

১ By the painless strength of His hand, by the touch of His Breath Supernal, the pangs of her sickness ceased. . . . . 'The Suppliants', মেহদি ইমাম-কৃত অনুবাদ

দেয় বৈদিক 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম')— 'জিউস্ জনয়িতা— আপন হস্তে এই বিশ্বকানন রোপণ করেছেন যিনি— মানবজাতির নেতা— পুরানী প্রজ্ঞা— মহান শিল্পী— বিশ্ব শিল্প-স্বর্গের জিউস :
তাঁর উপরে আর কারো আসন নাই— নীচেকার কারো হস্তের দণ্ড তাঁর উপরে অধিকার রাখে না।
তাঁর বাক্যই কর্ম, অবিলম্বে সম্পাদন করে চলে তাঁর মানসে যা রয়েছে।'

এসকিলস বাস্তবিকই দিয়েছেন বৈদান্তিক ভগবানের চিত্র। পরে বলছি আরো। জিউসের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন— তৎকালে প্রচলিত ধারণা ছিল তাঁর সম্বন্ধে যে, তিনি শুধু কবি অর্থাৎ কাব্য-রচয়িতা নন, তিনি ছিলেন আবার প্রজ্ঞাবান দ্রষ্টা। এখানে কবি দেখিয়েছেন যে, জিউস আর আসুরিক দেবরাজ মাত্র নন— তাঁর বিধান তাঁর কেবল অহংকৃত-খেয়াল-প্রসূত নয়। প্রথমতঃ তিনি বিধানমাত্র নন, কেবল অকাট্য নিয়তি তিনি নন— পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে যে ভগবান কাঁদেন তা তিনি নন। বিধানমুক্ত, বিধানের উপরে তিনি স্বরাট্; আমাদের দেশে যেমন বলা হয় ব্রহ্ম হলেন নিত্যমুক্ত চৈতন্য। এই স্বাতন্ত্র্য কেবল জিউসেরই আছে— কারণ তাঁর আছে সেই জ্ঞান, সেই চেতনা, পুরাণী প্রজ্ঞা (palaiphrōn)— আর কারো নাই। আর কারো থাকলে তা হয়ে পড়ে আসুর-স্বৈরাচার। জিউসের স্বৈরেচ্ছা ব্যক্তিগত অনিয়ন্ত্রিত যদৃচ্ছা নয়, পদাকাঙ্ক্ষা ক্ষমতাস্পৃহা নয়— যেমন তাঁর পূর্বগামী পিতৃপুরুষদের ছিল; এর প্রতিষ্ঠা বা প্রকৃতি হল EUNOIA (ইংরাজীতে বলে good will, kindness— কিন্তু ঠিক হল সংস্কৃতে যাকে বলা হয় সৌমনস্য) এবং Dike (ন্যায় বা justice -এর চেয়ে কিছু বেশি)। জিউসের একটা দিক বিধান বটে, কিন্তু তা একান্ত যন্ত্রবৎ নির্মম বিধান নয় জড়নিয়তির মতো। তাই বলা হয় তাঁর রাজত্ব নৈরাজ্য (অরাজকতা) যেমন নয়, তেমনি আবার স্বৈররাজ্যও (despotism) নয়— তা হল ধর্মরাজ্য (eunomia)। তিনি বিধানের উপরে, মুক্ত তিনি, এক তিনিই[২]। এমন কি জন্মেও তিনি মুক্ত, কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি, তিনি স্বয়ম্ভু; আপনার জনক আপনি তিনি, নিজেকে সৃষ্টি করলেন— তার অর্থ জগৎও সৃষ্টি হয়ে গেল সেই সঙ্গে। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই মুক্ত নন কেবল, তিনি আবার মুক্তিদাতা— তাঁর পথে তাঁর চেতনার ধারায় চলে যারা তারাও মুক্ত হয়ে যায়— তিনি সকলের সকল বন্ধন খুলে দেন[৩]।

জিউসের মধ্যে তাঁর শক্তি ও তাঁর জ্ঞান কি রকমে একীভূত একাত্ম তা লক্ষ্য করবার বিষয়। প্রথমে জ্ঞানের মধ্যে কর্তব্য উদ্ভাসিত হয়, তার পর তিনি তাকে কৃতকর্মে পরিণত করেন, তা ঠিক নয়— তাঁর জ্ঞানের স্বভাবই কর্মে পরিণত হওয়া তৎক্ষণাৎ, জ্ঞান কর্মশক্তিই, আমরা যাকে বলি চিৎশক্তি প্রায় সেই বস্তু। তিনি স্বরাট এবং সম্রাট।

Zeus এর শত নাম। একদিকে তিনি যেমন বজ্রধারী শত্রু-নিসূদন বা সর্বকর্তা সর্বসাধয়িতা (Zeus panteleis, pankrateis), অন্যদিকে তিনি পরিত্রাতা, সন্তাপহর্তা, আনন্দদাতা, তিনি খুলে দেন আমাদের দিব্যচক্ষু। একটা অরাজকতার শাসনের পরে তিনি এনে দিয়েছেন সুনিয়মের শাসন, ক্রূরতার বিধানের পরিবর্তে এনে দিলেন একটা সৌমনস্য, মাত্রাধিক্যের উৎকটতার পরিবর্তে ধরে দিলেন মিতাচার, সামঞ্জস্যের আদর্শ। মানুষের উপকার করেছে বলে প্রমেথিউসকে যে জিউস নির্মম শাস্তি দিতে চেয়েছেন

---

২ Since none but Zeus is free—'Prometheus Bound' (Murray).
৩ The liberating ways that are God's—'The Suppliants'.

তা নয়, তার মূল কারণ এ কাজ সে করেছে বিদ্রোহের অঙ্গ হিসাবে, আসুরিক মনোভাবে প্রবুদ্ধ হয়ে। এখানে তাই জিউসের রুদ্রমূর্তি। কিন্তু তাঁর দক্ষিণামূর্তি তিনি দেখিয়েছেন যখন প্রমেথিউস নতি স্বীকার করেছে— দুঃখের বিষয় এসকিলসের সে নাটকখানি আমাদের কাছে পৌঁছয় নি (Prometheus Unbound)।

আমরা Zeus-এর যে চিত্র দিলাম সে হল তাঁর অলক্ষ্য অধ্যাত্মমূর্তি, যাকে বলা হয়েছে স্বর্গীয় জিউস (Ourios Zeus)। কারণ কবি নিজেই বলেছেন জিউসের দুই মূর্তি— তার একটি হল সাধারণ লৌকিক বা মানুষী মূর্তি— যেটা গল্পে কাহিনীতে লোক সমাজে প্রচলিত। ফলতঃ সব দেবতারই আছে এই দুই রূপ। বাহ্যরূপকে মানুষ গড়েছে যতখানি সম্ভব মানুষভাবে, পার্থিব করে— কিন্তু আন্তর রূপ হল দেবতার দিব্য স্বরূপ। মনে হয় এসকিলস কথঞ্চিৎ তার সন্ধান পেয়েছিলেন।

৪

দেবতার ক্রমপরিণামের কথা উল্লেখ করেছি গোড়ায়। গ্রীসীয় দেবরাজের বংশপরম্পরা তারই ইতিহাস কিছু দেয় বলেছি। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, হেলেনিক শিক্ষা দীক্ষা মানবচেতনার যে পরম পরিণতি প্রকাশ করে ধরেছে, তার অধিষ্ঠাতৃদেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন এই অলিম্পীয় অধিরাজ জিউস। কিন্তু মানবচেতনার শেষ চরম পরিণামে আমরা তো এখনো পৌঁছাই নি। জিউস্‌ই যে শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ অধিরাজ নন গ্রীক ইতিবৃত্ত, স্বয়ং এসকিলসই এ তথ্য এনে দিয়েছেন। জিউস একটা পরম্পরায় এসেছেন যেমন, তেমনি চলেও যাবেন আর একজন বৃহত্তর বা মহত্তর দেবরাজের স্থান করে দিয়ে। ভাবী মানব-চেতনার প্রতীক হয়ে উঠবেন আর এক ইন্দ্র। এ সম্বন্ধে ইংরেজ কবি শেলীর কি স্বপ্ন তা আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি।

প্রাচীনতমেরাও নবীনতমের মতোই একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। আজকার উষা অতীতের উষা-পরম্পরায় শেষ উষা, কিন্তু আজকার উষাই আবার ভবিষ্যপরম্পরায় প্রথম।

অশোকলিপি। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন। ছয় টাকা
EDICTS OF ASOKA। শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন। পনেরো টাকা
ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ২১ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

বহু সাধকের বহু প্রয়াসের পর ১৮৩৭ সালে জেম্‌স্‌ প্রিন্‌সেপ্‌ অশোকলিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। তার পর থেকে উইলসন, বার্নুফ, লাসেন, কার্ন, কানিংহাম, সেনার-প্রমুখ বহু পাশ্চাত্ত্য মনস্বী নূতন নূতন লিপি আবিষ্কার, লিপিসমূহের পাঠনির্ণয়, তার আসল অর্থনিরূপণ ও অশোকের প্রকৃত ইতিহাস-উদ্ধার কার্যে ব্রতী হন। কিন্তু অশোকতত্ত্ব আলোচনার প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোনো ভারতীয় এই কার্যে উল্লেখযোগ্যরূপে যোগ দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। অতঃপর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর *History of Civilisation in Ancient India* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৮৯) চোদ্দটি শৈলানুশাসন ও সাতটি স্তম্ভানুশাসনের অনুবাদ সহ অশোকের ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা করেন। বাংলা ভাষায় অশোকবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ হিসাবে কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোক-চরিত' (১৮৯২) বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এই বইখানি অশোকচরিতবিষয়ক প্রথম ইংরেজি গ্রন্থ ভিন্‌সেণ্ট্‌ স্মিথ-কৃত *Asoka, The Buddhist Emperor of India* (১৯০১, তৃতীয় সং ১৯২০) পুস্তকেরও পূর্ববর্তী। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের (১৯০১) একটি অধ্যায়ে অশোকের ইতিহাস আলোচনা করেন। এই সময় থেকেই অশোকচরিত্রের মহত্ত্বের প্রতি বাঙালি পাঠকসমাজের উৎসুক দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হতে থাকে। সে ঔৎসুক্য ও শ্রদ্ধা প্রবলতর হয় ১৯১০ সালে কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোকচরিত' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ও ১৯১১ সালে চারুচন্দ্র বসুর 'অশোক বা প্রিয়দর্শী' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর থেকে। অতঃপর স্মরণীয় চারুচন্দ্র বসু ও ললিতমোহন কর-প্রণীত 'অশোক-অনুশাসন' গ্রন্থখানি (১৯১৫)। এটি বস্তুতঃ পূর্বোক্ত 'অশোক বা প্রিয়দর্শী' বইএরই পূরক গ্রন্থ। ভারতীয় ভাষায় অশোকানুশাসনের প্রথম প্রকাশ ঘটে এই গ্রন্থেই। এই হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এই বইটির একটি স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই পুস্তকে বাংলা অক্ষরে অশোকানুশাসনের মূলপাঠের পরে যথাক্রমে সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ, বিবিধ টীকা, ভৌগোলিক বিবরণ প্রভৃতি আছে, আর আছে একটি মূল্যবান্‌ 'উপক্রমণিকা'। তা ছাড়া ব্রাহ্মী বর্ণমালা ও চারটি অনুশাসনের চিত্রলিপিও আছে এই পুস্তকটিতে। এইসব বিশিষ্টতার ফলে দীর্ঘকালের ব্যবধানের পরে আজও এটির ব্যবহার্যতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অতঃপর উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রনাথ সেন-প্রণীত 'অশোক' (১৯৪০, দ্বিতীয় সং ১৯৪৮) এবং বর্তমান লেখকের 'ধর্মবিজয়ী অশোক' (১৯৪৭), এই পুস্তক-দুটি।

বাংলাভাষায় অশোকবিষয়ক সর্বশেষ গ্রন্থ ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন-প্রণীত 'অশোকলিপি' (১৯৫৩)। শুধু সর্বশেষ নয়, সর্বশ্রেষ্ঠও বটে। বস্তুতঃ বাংলাভাষায় অশোকতত্ত্বের আলোচনা খুব কমই হয়েছে এবং অশোকের অনুশাসনাবলী সম্বন্ধে বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র দুখানি, পূর্বোক্ত 'অশোক-অনুশাসন' এবং আলোচ্যমান 'অশোকলিপি'। এই দুই গ্রন্থের মধ্যে কালের ব্যবধান যেমন বৃহৎ, তাদের আলোচনার

মানের ব্যবধানও তেমনি বৃহৎ। তার কারণ ওই কালের মধ্যে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত, দেশে বিদেশে অশোকরহস্য অনেকাংশে আলোকিত এবং বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদের আরম্ভ থেকে অশোকবিষয়ক গবেষণার নূতন পর্যায় শুরু হয়েছে বলা যায়। তার কারণ ওই সময়ে A. C. Woolner -প্রণীত *Asoka Text and Glossary* (১৯২৪) এবং E. Hultzsch -প্রণীত *Inscriptions of Asoka* (১৯২৫) -নামক দুখানি অতি মূল্যবান্ ও প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশের ফলে অশোকগবেষণা নূতন প্রেরণা লাভ করে। তার পরেও নূতন অশোকানুশাসনের আবিষ্কার ঘটেছে এবং নূতন আলোচনা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থের মধ্যে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার-প্রণীত *Asoka* (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৫, দ্বিতীয় সং ১৯২৮), রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়-কৃত *Asoka* (১৯২৮), বেণীমাধব বড়ুয়া-প্রণীত *Inscriptions of Asoka* (১৯৪৩) ও *Asoka and His Inscriptions* (১৯৪৬) এবং জি. শ্রীনিবাস মূর্তি ও এ. এন. কৃষ্ণ আয়াঙ্গার-প্রণীত *The Edicts of Asoka* (১৯৫০, দ্বিতীয় সং ১৯৫১), এই পাঁচখানি ইংরেজি বই এবং W. Schumacher -প্রণীত একখানি জর্মান বই (১৯৪৮) ও J. Bloch-প্রণীত একখানি ফরাসি বই (১৯৫০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমূল্যবাবু তাঁর 'অশোকলিপি' গ্রন্থে এই সমস্ত নূতন তথ্য ও আলোচনার সদ্‌ব্যবহার করেছেন অতি নিপুণভাবে।

শুধু তাই নয়, অমূল্যবাবু তাঁর এই গ্রন্থে যথেষ্ট স্বকীয়তা ও নূতন দৃষ্টিক্ষমতার পরিচয়ও দিয়েছেন। মাত্র ১৬৮ পৃষ্ঠার এই স্বল্পায়তন পুস্তকের মধ্যে তিনি অশোকতত্ত্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েরই পরিচয় দিয়েছেন অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়। তা ছাড়া তিনি এ বিষয়ের সমস্ত তর্কবিতর্ক অতি সযত্নে পরিহার করেছেন। তাই নূতন শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের পক্ষে অশোকতত্ত্বের সামগ্রিক জ্ঞান লাভ অতি সহজসাধ্য হয়েছে। জটিল বিষয়কে সর্বসাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য করবার ক্ষমতা অতি দুর্লভ। অমূল্যবাবুর কাছে এই দুর্লভ ক্ষমতা অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর বুদ্ধকথা, রাজগৃহ ও নালন্দা, জৈনধর্ম প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থেই সেই অসাধারণ শক্তির পরিচয় আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, তাঁর 'বুদ্ধকথা' গ্রন্থে গবেষণাজাত গভীর জ্ঞান এবং সরল অথচ সরস রচনাশক্তির বিরল সমন্বয় ঘটেছে। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় বুদ্ধবিষয়ে আজ পর্যন্ত যত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে (সেগুলির সংখ্যাও কম নয়), বুদ্ধকথা সে সবেরই শীর্ষস্থানীয়, একথা বললে আশা করি অত্যুক্তি হবে না। তাই বলছিলাম অমূল্যবাবুর লেখনীপ্রসূত 'অশোকলিপি' গ্রন্থে গভীর জ্ঞান ও প্রাঞ্জলতার সমাবেশ অপ্রত্যাশিত নয়।

'অশোকলিপি' গ্রন্থখানির তিনটি বিভাগ। 'সিংহাবলোকন'-নামক প্রথম অংশের (পৃ ৫-৫৩) সামান্য পরিধির মধ্যে অশোকানুশাসনের প্রাপ্তিস্থান, শ্রেণীবিভাগ, লিপি, ভাষা, পাঠান্তর ও প্রকাশের কালক্রম, রাজা অশোকের চরিত্র এবং ধর্ম ও রাজনীতি, আর দেশের তৎকালীন ধর্ম, শাসনব্যবস্থা, শিল্পকলা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়েরই সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ বিবরণ আছে। ইংরেজি বা বাংলা অন্য কোনো গ্রন্থেই এমন সুসজ্জিত ও সুন্দরভাবে অশোকের লিপিমালা, তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব এবং তৎকালীন ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া যায় না। এই হিসাবে এই গ্রন্থের উপযোগিতা অন্য সব গ্রন্থকেই ছাড়িয়ে গেছে, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। অতঃপর গ্রন্থের দ্বিতীয় বিভাগে (পৃ ৫৪-১৪৭) অশোকের সাতাশটি অনুশাসন ও পাঁচটি লেখ মোট বত্রিশটি লিপিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে যথাক্রমে এগুলির

সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সটীক বাংলা অনুবাদ আছে। প্রত্যেক পর্যায়ের পরিচয়-অংশগুলি ইতিহাসজিজ্ঞাসুর পক্ষে খুবই সহায়ক; অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ, বস্তুতঃ এই অনুবাদের ভাষার মধ্যেই মূল অশোকবাণীর স্বাদ পাওয়া যায়, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়; আর টীকাগুলিও অনুশাসনের ভাষা ও অর্থবোধের খুবই উপযোগী। অতঃপর তৃতীয় বিভাগে (পৃ ১৪৮-৬৭) অশোকের মূল প্রাকৃত লিপিগুলি সংগৃহীত হয়েছে। অশোকলিপির মূলপাঠ নির্ণয় সহজসাধ্য নয়; বহু বিভিন্ন পাঠ মিলিয়ে অশোকতত্ত্ববিৎরা অশোকলিপির যে আদর্শপাঠ নির্ণয় করেছেন এই বিভাগে সেই পাঠই সংকলিত হয়েছে; এবং এই পাঠ কিভাবে নির্ণীত হয়েছে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে যাঁরা বাংলা অনুবাদ পড়ে মূল দেখতে উৎসুক হবেন তাঁদের খুবই সহায়তা হবে অথচ বিভিন্ন পাঠের জটিলতায় জড়িয়ে তাঁদের বুদ্ধিভেদ ঘটবে না; পক্ষান্তরে যাঁরা অশোকলিপির বিভিন্ন পাঠের সঙ্গেই পরিচিত হতে চাইবেন তাঁরাও গ্রন্থকারের নির্দেশ অনুসরণ করে অনায়াসেই কৌতূহল তৃপ্ত করতে পারবেন। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি আগাগোড়াই সুপরিকল্পিত ও সুলিখিত।

কিছুকাল পূর্বে (১৯৫৬ জুলাই) অমূল্যবাবুর এই বইখানির একটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংস্করণে বাংলা গ্রন্থখানির তুলনায় নানাবিধ উন্নতি-বিধান করা হয়েছে। তার মধ্যে অশোকের লিপি ও শিল্পকলার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্রের সমাবেশ এবং বাংলা গ্রন্থটি প্রকাশের পরে তিনটি বিভিন্ন স্থানে (গুজর্‌রা, রজুল-মণ্ডগিরি ও ভুইগাম) আবিষ্কৃত অনুশাসনের পরিচয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া আরও দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই। প্রথমতঃ, বাংলা গ্রন্থে অনুশাসনগুলিকে কালানুক্রমে না সাজিয়ে পূর্বানুসৃত রীতিতেই সাজানো হয়েছে; কিন্তু ইংরেজি সংস্করণে কালক্রম রক্ষা করেই সাজানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অনুশাসনের গোড়াতেই ওটির প্রকাশকাল তথা বিষয়বস্তুর উল্লেখ আছে, তাতে পাঠকের পক্ষে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা সহজতর হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, অশোকবাণীর মূলপাঠ গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট না হয়ে ইংরেজি অনুবাদের ঠিক সমুখে উলটো পৃষ্ঠায় স্থাপিত হয়েছে আর তার নীচে সংস্কৃত অনুবাদও দেওয়া হয়েছে, ফলে অশোকবাণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধনের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। তা ছাড়া, অশোকবাণীর ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে গ্রন্থকারের টীকাভাষ্যও পরিমার্জিত এবং স্বীয় অভিমতও সুচিন্তিততর হয়েছে। আশা করি দেশের ইদানীন্তন অশোকসচেতনতার ফলে অচিরেই 'অশোকলিপি' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হবে এবং তখন এটিতেও ইংরেজি সংস্করণের পদ্ধতি অনুসৃত হবে। অবশেষে একথাও বলা প্রয়োজন যে, বিখ্যাত মনস্বী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যবান্ ভূমিকাটিও অশোকানুশাসনের নানা দিকে নূতন আলোকপাত করেছে ও গ্রন্থের মূল্যবত্তা বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি উভয় সংস্করণেই একটি অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছি। গ্রন্থের শেষে একটি বিশেষ বিভাগে একটি সংক্ষিপ্ত পরিভাষাপরিচয় (glossary) ও একটি সাদৃশ্যপরিচয় (concordance) এবং সর্বশেষে একটি নির্দেশিকা (index) থাকলে বইটির উপযোগিতা ও ব্যবহার্যতা অনেকখানি বেড়ে যেত বলে মনে করি। আশা করি পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময় গ্রন্থকার এই কথা বিবেচনা করে দেখবেন।

অশোক যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা ছিল প্রবল ধর্মসংঘর্ষের যুগ। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, আজীবিক প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের কলহকোলাহলে তখনকার সাহিত্য মুখরিত। অথচ বুদ্ধদেব ও তাঁর ধর্মাদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও অশোক সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমদর্শিতা ও রাজকীয় নিরপেক্ষতার

নীতিতে অটল ছিলেন। তার একটি প্রমাণ এই। আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতি বৌদ্ধদের গভীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের কথা সুবিদিত। তথাপি রাজা অশোক অজস্র অর্থ ব্যয় করে খলতিক (আধুনিক 'বরাবর') পর্বতে আজীবিক সন্ন্যাসীদের জন্য দুটি গুহাবাস নির্মাণ করিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি।[১] বৌদ্ধ-আজীবিক কলহের চেয়ে বৌদ্ধব্রাহ্মণ্য কলহ ছিল তীব্রতর। কিন্তু অশোক পুনঃপুনঃ ব্রাহ্মণ-শ্রমণের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এবং প্রজাদেরও অনুরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। তথাপি ইতিহাসের পরিহাসে অশোক কালক্রমে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ উভয়ের দৃষ্টিতেই ঐকান্তিক বৌদ্ধ বলেই গণ্য হয়েছেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যজগতে অশোকমহিমা একেবারেই বিস্মৃত এবং বৌদ্ধজগতে অত্যন্ত শোচনীয় রূপে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত হয়েছে।

সৌভাগ্যবশতঃ অশোক তাঁর রাজত্বের ইতিহাস ভারতবর্ষের সর্বত্র পর্বতপৃষ্ঠে, স্তম্ভগাত্রে বা শিলাফলকে দুরপনেয় রূপে উৎকীর্ণ করিয়ে গেছেন অতি সচেতনভাবে। তিনি তাঁর রাজত্বের সপ্তবিংশ বর্ষে যে শেষ লিপিটি খোদাই করিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট করেই বলেছেন—

'আমার মনে হয়, আমি যে ধর্মঘোষণা শোনাই, যে ধর্মানুশাসন প্রকাশ করি তাতে লোক অভ্যুন্নত হবে, তাদের ধর্মবৃদ্ধি হবে।...এইরূপে লোকের দয়া দান সত্য শৌচ মার্দব ও সাধুতা বর্ধিত হবে।...যেখানে শিলাস্তম্ভ বা শিলাফলক আছে সেখানে এই ধর্মলিপি উৎকীর্ণ হবে যাতে এটি চিরস্থিতিক হয়।'

অশোকের এই উক্তিটিকে লক্ষ্য করে মনস্বী ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থে অশোকপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করেছেন এই অভিমত দিয়ে—

The Edict *has* endured unto remote ages ; and within the two thousand years which have succeeded, mankind has discovered no nobler religion than to promote in this earth "mercy and charity, truth and purity, kindness and goodness." —*Civilisation in Ancient India*, Book IV, ch. VII

অশোকের 'চিরস্থিতিক' লিপিমালার পাঠোদ্ধার ও প্রচারের ফলে আজ ওই মহানৃপতির অপূর্ব মহিমা বহুযুগব্যাপী বিস্মৃতির অবসানে বিশ্বমানবের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের মধ্যে পুনরভ্যুদিত হতে পেরেছে। তাতে ভারতবর্ষের মহিমা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের মনুষ্যত্বও তেমনি পুনরুদ্‌বুদ্ধ হবার সুযোগ লাভ করেছে। তাই বুদ্ধদেবের প্রতি কবি যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন, প্রিয়দর্শী অশোকের প্রতিও আমরা সেই ভাষা প্রয়োগ করতে পারি।—

আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

অমূল্যবাবুর 'অশোকলিপি' গ্রন্থ ও তার ইংরেজি সংস্করণ আমাদের মোহ-আবরণ মোচন করতে প্রভূত পরিমাণেই সহায়তা করবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, 'ভারতবিদ্যাবিহার' অমূল্যবাবুর বুদ্ধকথা, জৈনধর্ম, রাজগৃহ ও নালন্দা,

---

১ দ্রষ্টব্য : 'অশোকলিপি' পৃ ১১২ এবং ভিনসেন্ট স্মিত-কৃত *Asoka* (১৯২০, তৃতীয় সং) পৃ ১৩৪-৩৫।

অশোকলিপি প্রভৃতি সংস্কৃতিগ্রন্থ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশ করে সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। বিশেষ কৃতজ্ঞতার বিষয় এই যে, এই প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উপেক্ষা পোষণ করে না। বর্ধমান মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ ও প্রিয়দর্শী অশোক সকলেই প্রাকৃতভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের মহৎ দৃষ্টান্তের অনুবর্তন করে 'ভারতবিদ্যাবিহার' যে আধুনিক প্রাকৃত ভাষার প্রতি সমাদর প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না, এটা বিশেষ আনন্দ ও আশার বিষয়।

প্রবোধচন্দ্র সেন

শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়। শ্রীমতী সাধনা কর। সুপ্রকাশন, ৩ সার্কাস রেঞ্জ, কলিকাতা ১৯। মূল্য আট আনা।

শিক্ষাসমস্যার কয়েকটি দিক। শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য বারো আনা।

শিক্ষার ভিত্তি। বনফুল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কেম্পানি, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭। মূল্য আড়াই টাকা।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা। শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ ও শ্রীমতী শান্তি দত্ত। নলেজ হোম ৫৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট টাকা।

শ্রীমতী সাধনা করের রচিত ছোট্ট কয়েক পৃষ্ঠার বইটিতে তত্ত্বকথা নেই, তথ্যেরও অভিমান নেই ; সহজ সরল ভাষা, অনেকদিনের পুরানো শান্তিনিকেতনের কতকগুলি টুকরো টুকরো ছবির সমাবেশ এতে আছে। হয়তো 'ছবি' বললে ভুল বলা হয়, যাঁরা শান্তিনিকেতনে নূতন এসেছেন বা নূতন পরিচয়ের অতিরিক্ত কিছু এখনও পান নি তাঁদের কাছে এই ছোট বইটিতে লেখা ঘটনাবলীর কোনোটিই ছবি হয়ে ফুটে উঠবে না। কিন্তু যাঁরা শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদিযুগের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের মনে এই পুস্তিকার সামান্য সামান্য ঘটনার উল্লেখ অবলম্বন করে বেদনামধুর ছবির সৃষ্টি হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যাঁদের ঔৎসুক্য আছে তাঁদের পক্ষেও পুস্তিকাটি কম মূল্যবান নয়। একাধিক প্রবন্ধে গল্পে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাদর্শনের যতটুকু সাধারণভাবে প্রকাশ করে গেছেন তার পরিপূরক হিসাবে এ পুস্তিকার ব্যবহার হতে পারে। তাঁর চেষ্টার দিকটি তখনকার ছাত্রদের লেখা নানা নামের পত্রিকার মধ্যে নানা ভাবে ফুটে উঠেছিল ; চিন্তার রূপগ্রহণ চলেছিল কত ছোটখাট খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে তার আভাস রয়ে গেছে তখনকার আশ্রমবালকদের সাহিত্যসৃষ্টিতে। সেইগুলি অনুধাবন করলে অনেক মূল্যবান্ তত্ত্ব লাভ হতে পারে।

আজকাল পঠন-পাঠন বিষয়ে নানা জনের নানা পদ্ধতির কথা শুনতে পাওয়া যায়, সেইসব কোলাহলের মধ্যে একটি অতি সত্য অথচ অতি সোজা উপদেশ চাপা পড়ে যায়। ছাত্রদের কাছে পড়ালেখার তাগাদা দেওয়াটা শিক্ষকদের একটি বিশেষ দায়িত্ব হলেও তার চেয়ে অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে অন্য দিকে। ছাত্রদের বড় করে তুলতে হলে তাদের কাছে বড় করে দাবি করতে হয়, তাদের প্রাণের দ্বারে বারে বারে বড় হবার আহ্বান জানাতে হয়। এই আহ্বান যেন কখনো ছোট সংকীর্ণ না হয়, কখনো যেন ক্ষীণ হয়ে

না পড়ে। কিন্তু এ দাবি জানাবার কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। এটা নিতান্তই শিক্ষকের, গুরুর প্রাণের দাবি। গুরুর প্রাণের এই আহ্বান ছাত্রের প্রাণে জাগায় প্রবল আশার আলোড়ন। কেমন করে কোথায় যেন গুরুর প্রাণের স্পর্শ ঘটে যায় ছাত্রদের প্রাণে-মনে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যেন একটা আত্মিক যোগ ঘটে। এই যোগ সম্ভব হতে দেখা যায় বড়-র ভূমিকায়, ছোট দাবির দুর্বল টান সুকুমার প্রাণে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। তাই দেখি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট মনের দুর্বার শক্তিতে ছাত্রদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন, বড় হবার দাবি করছেন— তাদের ভালোতে তাঁর কত আনন্দ, তাদের দুর্বলতায় তাঁর প্রাণে দুঃখ কত সহজভাবেই গভীর হয়ে ওঠে। ছাত্রদের একটি পত্রিকায় আছে, 'আচার্যদেব বলিয়াছেন, "সমস্ত পৃথিবীর চোখ আমাদের এই আশ্রমের উপর পড়িয়াছে। যেটি সবচেয়ে বড় জিনিস সেটি আমাদের লাভ করিতে হইবে। এই আশ্রমে এমন একটি জিনিস আছে যাহা দ্বারা বিশ্বের মঙ্গল করা যায়। তোমাদের এখন জিনিসটি কাজে লাগাইতে হইবে। সেইটি লাভ করিতে হইবে।"' বিশ্বের মঙ্গলসাধনের আহ্বান, এইই রবীন্দ্রনাথের আহ্বান, রবীন্দ্রনাথের আশা। সকল পঠন-পাঠন নিয়ম-কানুন ভেদ করে এই ডাক, ক্ষুদ্র প্রাণের এতটুকু শক্তির নিকট বিশ্বের ডাক, বিশ্বের আশা। এমনি করেই বড়র আহ্বানে ক্ষুদ্র বড় হয়ে ওঠে। তত্ত্বের মতো দু-এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের বিদ্যালয়ে তাঁরই আচরিত ধর্ম এবং তাঁর তত্ত্ব যে একই সে কথা অপ্রকাশিতই তো রয়েছে।

আর-একটি পত্রিকায় গুরুদেব প্রাণের দুঃখ প্রকাশ করেছেন— "আমি শুনিতে পাই যে তোমরা ঝগড়া করিয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বল না, তোমাদের এই শিশুহৃদয়ের মতি, কত অসরলতা, কত অন্যায়— সমস্ত আছে যখন সে সব শুনি তখন আমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে।" একাধিক শোক যে-মনকে আঘাত করেও বিচলিত করতে পারে নি শিশুদের ত্রুটি শিশুদের অন্যায় সেই মনকে আহত করেছে। এ যে তাঁরই সাধনার ব্যর্থতা, শিশুদের মধ্যেই যে তাঁরই প্রাণ বিকাশশীল। মনোবিজ্ঞানে এর যে নামই থাক্— Identification, Suggestion— এর কার্যকারিতা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

শান্তিনিকেতনে এই মহান্ একাত্মতার আবহাওয়া বর্তমান ছিল। অধ্যাপকরা তাঁদের চিন্তা জ্ঞান অনেক সময়েই ছাত্রদের পত্রিকায় প্রকাশ করতেন, কৃপা করে নয়, স্বাভাবিক সংগত বলেই। ছাত্ররা তাদের শিশুসুলভ অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে-পত্রিকায়, শিক্ষকরাও তাঁদের জ্ঞানচর্চা করবেন সেই পত্রিকাতে, এইটাই গুরুশিষ্যের সম্মিলিত সাধনার পরিবেশে স্বাভাবিক ছিল। বিলাতে ভ্রমণ করার সময় অধ্যাপকের নব নব অভিজ্ঞতা এই ক্ষুদ্র আশ্রমটির শিশুদের কাছে পৌঁছত, প্রকাশিত হত তাদের কোনো-না-কোনো পত্রিকায়।

'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়' অনেকটা বাতায়নের মতো, যতটুকু তার আয়তন তার শতগুণ প্রকাশ করে দেয়। হয়তো এর মূলে আছে পুরাতন দিনের অশ্রুস্নাত স্মৃতি, অল্পের স্পর্শেই যা বড় হয়ে ওঠে, ছবি হয়ে ওঠে। তবু এ কথা ঠিক, স্মৃতিপীড়িত মন যাঁদের নয় তাঁরাও এর ভিতর রবীন্দ্রনাথ জাত-শিক্ষকের কথা যা বলেছেন, শৈশবের পরিবেশের যে spiritএর ইঙ্গিত আজীবন দিয়ে এসেছেন তার আভাস পাবেন।

তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ তিনটি মোটামুটি এক বৎসরের ভিতরই লেখা এবং বোধ হয় সেইজন্য এদের মধ্যে চিন্তার একটা ঐক্য রয়েছে দেখা যাচ্ছে। প্রবন্ধগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও একসঙ্গে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করায় কোনো অসংগতি ঘটে নি।

শিক্ষা সম্বন্ধে আজকাল অনেকেই ভাবছেন। যাঁরা শিক্ষাব্রতী শিক্ষাবিদ্ তাঁরা তো চিন্তা করছেনই, 'শিক্ষা' পেয়ে বা শিক্ষার খরচ বহন করে হাঁপিয়ে উঠেছেন যাঁরা তাঁদেরও ভাবনা দেখা দিয়েছে। জনসাধারণ বলতে যে বিরাট জনসংখ্যা আমাদের মনে আসে তার তুলনায় অবশ্য চিন্তিতের সংখ্যা অল্প। তবু এ কথা এখন স্বীকার করতে হবে যে, শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে অনেকেরই ভাবনা সন্দেহ নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে এবং প্রতি বৎসরেই এই শিক্ষা-নৈরাশ্য বেড়ে চলেছে। বিমলবাবু চিন্তাশীল, তাঁর চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই গভীর। গভীর আলোচনায় সাধারণ ব্যক্তির নিতান্ত কাছের সমস্যা অনেক সময়েই স্থান পায় না, দৈনন্দিন অতিবাস্তব প্রশ্নের উর্ধ্বে ভেসে চলে চিন্তাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের ভাব ও ভাষা। বর্তমান পুস্তিকায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে, সাধারণ ব্যক্তির শিক্ষাপীড়িত মনের প্রশ্ন ও ধারণা প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই কয়টি প্রবন্ধে। সুদূরপ্রসারী কোনো পরিকল্পনার বা আশু ফললাভের পথ নির্দেশের চেষ্টা প্রবন্ধ-তিনটিতে প্রাধান্য পায় নি বটে, কিন্তু চারি দিকে বহু প্রকার মতামতের গোলমালে যে-চিন্তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে তাকে গুছিয়ে সাজিয়ে সহজ ভাষায় সহজভাবে সাধারণের কাছে উপস্থিত করার কৃতিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতের চিন্তাজগতে দুটো ভাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক পক্ষের গতি অতীতের দিকে, ভারতের প্রাচীন মানস-ঐশ্বর্যকে চরম জ্ঞান করে তাকেই যথাসাধ্য বর্তমানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই এর আদর্শ। অপর পক্ষের ধারণা পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে সকল প্রগতিরই চাবিকাঠি গচ্ছিত আছে। এই দুটি বিপরীতমুখী চিন্তার মধ্যে ঐক্যসাধনের কোনো স্পষ্ট আশা লেখক দেখতে পান নি। শিক্ষার ব্যবস্থায় (বা অব্যবস্থায়) এরই দ্বৈরথ দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হচ্ছে বলে লেখকের মনে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বকে সাময়িক বলেই ভরসা দিয়েছিলেন; তিনি বিশ্বাস করতেন, অন্ততঃ ভারতের সাধনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মূলতঃ মিলবে, তিনি তাঁর সাধনার আসনও পেতেছিলেন ভারতের এক কোণে এবং তাঁকে তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে দেখে সিলভ্যাঁ লেভি বলেছিলেন—এখানে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রকৃত মিলন ঘটেছে। শোনা যায় যে, সর্বভারতে এখন রবীন্দ্রনাথের সাধনার অদৃশ্য প্রভাব অনুভূত হচ্ছে, নিতান্ত প্রাচ্য ও নিতান্ত পাশ্চাত্য বলে কোনো শিক্ষাকে ভারতবর্ষ সত্য বলে স্বীকার করতে চায় না। লেখক এতখানি এখনো বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন, তাঁর চোখে কোনো সমন্বিত সমাজ-রূপের লক্ষণ এখনো ধরা পড়ে নি। এইটাই তাঁর আক্ষেপ যে, সমাজের রূপ ও প্রয়োজন উপলব্ধি করবার পূর্বেই শিক্ষার রূপান্তরের চেষ্টা চলেছে দেশে, কখনো প্রাচ্যের প্রভাবে কখনো পাশ্চাত্যের অনুকরণে। এরই ফলে 'কেজো' শিক্ষার হৈচৈটা হচ্ছে বেশি, শিক্ষার আসল ব্যাপারটা যাচ্ছে তলিয়ে। কেজো শিক্ষা না পারছে বেকারের সংখ্যা কমাতে, না পারছে দেশে 'মানুষে'র সংখ্যা বাড়াতে। যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পেয়েছেন তাঁদেরও হচ্ছে 'কেজো' শিক্ষা, সাহিত্যের রস অদৃশ্য হচ্ছে মনোভূমি থেকে। লেখকের এই আক্ষেপে ভাষা পেয়েছে বহুজনের অনুভূতি।

শিক্ষার মান অনেকটা নেমে গেছে আমাদের দেশে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর এ ধারণা হয়েছে। যাঁরা শিক্ষাদানের কাজে কয়েক বৎসর যাবৎ নিযুক্ত আছেন তাঁদেরও অধিকাংশ, সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশিত অভিযোগ না পড়েও, লেখকের ধারণাটিকে সত্য বলেই মনে করবেন। শিক্ষামানের অবনতি কতখানি ঘটেছে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে লণ্ডনের পাঠ্যক্রমের তুলনা দিয়ে। পাঠ্যক্রম সব সময়ে মানের নির্দেশক না হলেও বা লণ্ডনের তুলনায় আমেরিকার কয়েক স্থানের শিক্ষামান কোনো কোনো পর্যায়ে নিচু হলেও কোনো সান্ত্বনার অধিকার সত্যই আমাদের দেশের নেই।

অবনতি ঘটেছে কেন ? ঘটছে কেন ?— লেখক বিশেষজ্ঞের মতো গুরুগম্ভীরভাবে কিছু বলেন নি। তবে তাঁর মতটি যদি শিক্ষাবিদের, বিশেষতঃ সরকারের, দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তাহলে উপকার হবে। সংখ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে মানকে অবনত করা হচ্ছে এ কথাটাতে নূতনত্ব নেই বলে সকলেই উপেক্ষা করে অবস্থাকে আরো মন্দের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের মনে হয়, অবনতির গভীরতর কারণটি লেখকের আলোচনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে, ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে বলা হয় নি। শিক্ষাকে যেখানে সর্বদাই সর্বস্তরেই প্রয়োজনের অনুবর্তী হতে হয় সেখানে সৃষ্টিধর্মের অবকাশ থাকে না, সেখানে জ্ঞান হয়ে পড়ে কতকগুলি তথ্যের ও তত্ত্বের বোঝা, শিল্প নেমে আসে মিস্ত্রিগিরিতে। এর ইঙ্গিত লেখকের প্রবন্ধেই আছে, অন্য সব 'এহ বাহ্য'। ম্যানেজিং কমিটি, রাজনীতি প্রভৃতির প্রভাব কিভাবে কতখানি শিক্ষার মানকে অবনত করে তুলছে তারও খুঁটিনাটির উল্লেখ রয়েছে বইটিতে। প্রবন্ধে যা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এবং যা প্রকাশ করে বলা হয়েছে, একত্র অনেকখানি চিন্তার পরিচয় বহন করছে এই ক্ষুদ্রায়তন বইটি।

লেখক বলছেন, 'আমি শিক্ষাবিদ্ নই, শিক্ষণ-শাস্ত্রের তত্ত্ব আমার জানা নেই· ·।' তত্ত্বজ্ঞানী হলে প্রত্যেক কথাটি হয়তো আরো সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতেন, 'শিক্ষা' কথাটির একটিমাত্র অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে বইটি নিশ্ছিদ্র করে তুলতেন, ত্রুটিমোচনের পথনির্দেশে ভারী ভারী যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন। তাতে বইটির ভার বাড়ত, হয়তো মানও বাড়ত, কিন্তু যাদের জন্য লেখা বলে মনে হচ্ছে তাদের মনের কথা বলা হত না, তাদের চিন্তাকে সাহায্য করা হত না।

বনফুল রচিত এক শো বাষট্টি পৃষ্ঠার এই বইখানি শিক্ষার ভিত্তি, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, কাব্যপ্রসঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ, বুদ্ধদেবের জীবনে নারী— এই কয়টি প্রবন্ধ নিয়ে সম্পূর্ণ। 'শিক্ষার ভিত্তি' প্রবন্ধটিই বড় এবং প্রথমে আছে, বইটির নামকরণ হয়েছে প্রথম প্রবন্ধ অনুসারে, বহু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে প্রথম এবং সবচেয়ে বড় এই প্রবন্ধে। বিষয়গুলি অনেকটা ঘুরে ঘুরে পাঠকের মনকে মূলবক্তব্যের কাছে এনে দিয়েছে, কখনো দূর থেকেই ছেড়ে দিয়েছে মূলকে অনুসন্ধান করে নিতে। 'শিক্ষার ভিত্তি'তে আছেন মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, জহরলাল নেহেরু; আছে বুনিয়াদি শিক্ষা, বিশ্বভারতীর 'পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণ', আর্য-অনার্য, জাতিভেদ, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য, যন্ত্র-সভ্যতা, genes, ব্যক্তিত্ব— আরো অনেক বিষয় ভাগ উপভাগ ঐ প্রবন্ধটিকে বিচিত্র ও সারবান্ সাহিত্য করে তুলেছে। সুসাহিত্যিক বনফুল নদীর মতো বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবন্ধকে বিস্তৃত করেছেন, সহজ সরস এই বিস্তার।

'শিক্ষার ভিত্তি'তে তাঁর মূল বক্তব্য বোধ হয় 'আমরাও যদি আমাদের ভবিষ্যৎ দেশবাসীদের চরিত্রবান কর্মনিষ্ঠ করিতে চাই তাহা হইলে ধর্মকেই শিক্ষার ভিত্তি করিতে হইবে।' 'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই সকল ধর্মের চরম লক্ষ্য', 'কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে সত্যধর্মের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে এখনও জাগে নাই।' 'আমি অবশ্য ইহা দাবি করিতেছি না যে আমাদের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম করিয়া দিন· ·এ ব্যবস্থা করিলে যে রাতারাতি আমরা সকলে ধার্মিক হইয়া উঠিব এ অসম্ভব কল্পনা আমার নাই। কিন্তু এ ক্ষোভ আমার আছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রে ভারতের কোনো ছাপ নাই', 'বর্তমান যুগে রাষ্ট্র আমাদের ধর্মশিক্ষা দিতে অপারগ, নানা কারণে সে সামর্থ্য তাহার নাই।' তবে 'গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপানার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

প্রবন্ধটির নানা অংশে যে-সব মতামত প্রকাশ করা হয়েছে তার অনেকগুলিই অনেক ব্যক্তিকে চিন্তিত করে তুলতে পারে। বিশ্বভারতী এখন যে 'পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণ মাত্র' এ কথা বিশ্বভারতীর কোনো কর্মীই জানেন না, হলপ করে বলতে পারি। বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যাখ্যাটিও বিশেষজ্ঞদের কাছে নূতন ঠেকতে পারে। 'ভিক্ষা'র দ্বারা যে ছাত্ররা নিরহংকার হতেন এবং তাঁদের সমাজবোধ বাড়ত লেখকের এ মতটাও শিক্ষাবিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে নিশ্চয়ই। এ ছাড়াও অনেক কথা আছে যা চলতি ধারণা ও বিশেষজ্ঞদের মতামত থেকে আলাদা।

'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা' আমাদের আলোচ্য শেষ গ্রন্থ।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে গেলে মনোবিজ্ঞানের কিছু ধারণা থাকা দরকার, কিছু কিছু সূত্র হৃদয়ংগম করা ভালো। বর্তমান যুগে শিক্ষাজগতে এই বিশ্বাসটি দৃঢ় হয়ে গেছে। ভারতবর্ষও এই বিশ্বাসে এখন বিশ্বাসী। দেশের বহু স্থানে তাই ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। এখনো নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এইসব ট্রেনিং কলেজে শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থিনীরা যেসব বই পড়েন তা প্রায় সবগুলিই ইংরেজিতে লেখা, যাঁদের ইংরেজিতে প্রকাশক্ষমতা দুর্বল অথচ বিষয়টা বুঝে নেবার মতো ধীশক্তি আছে, তাঁদের জন্যই এই ধরনের বই দরকার। কোনো বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করে তার সংকীর্ণ পাঠক-পরিধির বাহিরে বহুতর জনের মধ্যে বহু জনের জন্যে উপস্থিত করা এই বইটির কাজ নয়। বইটির লক্ষ্য পরীক্ষার্থী পাঠক-পাঠিকা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না। ট্রেনিং কলেজের বাঙালী পাঠক-পাঠিকারা যাতে ইংরেজি বই পড়ে বাংলায় উত্তর দিতে অসুবিধা না ভোগ করে প্রধানতঃ তারই জন্য বাংলা ভাষায় লেখা এই বইখানি। মাঝে মাঝে ইংরেজি বই থেকে উদ্ধৃতি দিলে নম্বর বেশি পাওয়া যায় নিশ্চয়ই। এই বইখানিতে ছাত্রছাত্রীরা তাও পাবেন যথেষ্ট। গ্রন্থের 'কৃতজ্ঞতা প্রকাশ'এ লেখা রয়েছে 'পরীক্ষার খাতায়ও কোনো ইংরাজি বই হইতে কোনো লেখা উদ্ধৃত করিলে তাহা মূল ভাষায়ই হওয়া আবশ্যক তাহার বাংলা অনুবাদ না দিলে ক্ষতি নাই।' এ ছাড়া এই বইটিতে প্রচুর ইংরেজি শব্দ থাকা আর-একটি কারণ গ্রন্থকারদ্বয় দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে, প্রশ্নপত্র এখনও ইংরেজিতেই হ'য়ে থাকে, কাজেই ইংরেজি শব্দগুলির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় অপরিহার্য।

পরীক্ষার সুবিধার জন্য বইটি লেখা হয়ে থাকলেও যেমন-তেমন করে অতি সংক্ষেপে বা গোঁজামিল দিয়ে পাঠ্য বিষয়কে উপস্থিত করা হয় নি। মনোবিজ্ঞানের বহু দিক এবং একাধিক মতামত আলোচনা করা হয়েছে, পাঠক-পাঠিকারা একটু খোলা মন নিয়ে পড়লে ব্যাপকতার একটি আভাস পাবেন এবং কয়েকটি বিষয়ে অল্পাধিক নির্ভুল ধারণাও পাবেন। এর চেয়ে বেশি এই ধরনের বইয়ে থাকা সম্ভবও নয়। ভাষা সত্যই সোজা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরসতা বজায় আছে।

লেখক-লেখিকার কাছে একটু নিবেদন আছে। দু-একটা জায়গায় আরো একটু বিশদ করে লিখলে ভালো হবে বলে মনে হয়েছে। হয়তো কিছু পৃষ্ঠা-সংখ্যা বাড়তে পারে। তবে, সরসতার জন্য এবং সাহিত্যাভাসের অন্য মাঝে মাঝে যেসব কবিতা, কথোপকথন, ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন সেগুলি না দিলেও চলবে। বইটির instinctএর পরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে আর-একটু লিখলে কেমন হয়? modes, forms -এর পরিবর্তন এবং এদের সামগ্রিক গুণগত পরিবর্তন (যেমন sublimation) যে পৃথক্ ব্যাপার সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা থাকলে বোধ হয় উপকার হবে। sex ও intelligence -এর একটা প্রশ্ন থাকতে পারে। আর, intelligenceএর প্রকাশের উপর unconsciousএর প্রভাব যে অনেক সময়ে অত্যন্ত স্পষ্ট, এ বিষয়ে আরো লেখা দরকার। বুদ্ধির মাপ নিয়ে যে মনোবিশ্লেষণে একটু কটাক্ষপাত করা আছে বলে মনে হয় সেটার আভাস দেওয়া যেতে পারে কি? শহর ও পল্লীর বালকবালিকাদের মধ্যে বুদ্ধিগত প্রভেদ সম্বন্ধে ভারতীয় অনুসন্ধানের ভিত্তি যেটুকু আছে (তা নির্ভরযোগ্য তো?) সেটুকু দিলে ভালো হয়। 'জোর' করে ভুলতে চেষ্টা করার কুফল প্রসঙ্গে যতটুকু বলা হয়েছে তাতে যথেষ্ট হবে না। জোর করে ভুলতে চেষ্টা করার অর্থটা অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার কাছে কেবল conscious চেষ্টা বলেই মনে হবে; অথচ consciousএর স্তরে চেষ্টাটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ দৃষ্টিহানি পক্ষাঘাত প্রভৃতি না ঘটার কথা। এদিকে পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দিলে ভালো হয়। অনুকরণ-অধ্যায়ে Piagetএর গবেষণার একটু দেওয়া যেতে পারে। (Piagetএর কথা বলা হয়েছে অন্য প্রসঙ্গে)।

বইটি সত্যই ভালো হয়েছে বলেই নানারূপ প্রস্তাব করতে সাহস হল। গ্রন্থকারদ্বয় কেবল যে পড়াশোনা করেছেন তা নয়, তাঁরা গ্রন্থখানিকে তথ্যবহুল ও প্রামাণিক করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এবং পরিশ্রম তাঁদের সার্থক হয়েছে। অনেক দিকে অনেক গ্রন্থের সন্ধান এতে পাওয়া যাবে; যাঁরা একটু বেশি পড়তে চান তাঁদের সুবিধা হবে যে, এক জায়গাতেই অনেক পথনির্দেশ আছে। ছাত্রছাত্রীরা এ বই ব্যবহার করলে লাভবান হবেন।

সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীত-পরিক্রমা। নারায়ণ চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড। তিন টাকা চার আনা।

'সঙ্গীত পরিক্রমা' বইটি সাতাশটি ছোট ছোট প্রবন্ধের সমষ্টি। সংগীতের ইতিহাস ও মার্গসংগীতের পরিচয় থেকে শুরু করে লেখক শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছেন বাংলার লোকসংগীতের আলোচনায়। তারও উপর পাঠকদের তিনি উপহার দিয়েছেন তিনটি অতিরিক্ত প্রবন্ধ: 'ভারতীয় সঙ্গীতে প্রগতিলক্ষণ', 'যৌথসঙ্গীত' ও 'সঙ্গীত ও রুচি (উপসংহার)'। আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, কেশরবাঈ ও হীরাবাঈ—এই চারটি নাম বাদে নারায়ণবাবুর নির্বাচিত সংগীতনায়ক সকলেই বাঙালী। সুতরাং বইটির নাম 'বঙ্গসংগীত-পরিক্রমা' দিলেও বেমানান হত না।

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে বইটিতে চারটি প্রবন্ধ আছে, একটি শেষের দিকে আর তিনটি মাঝামাঝি। এই সমাবেশ তাৎপর্যহীন নয়। কেননা লেখকের মতে (যদিও তাঁর ভাষায় নয়) সাংগীতিক উৎকর্ষের দুই মেরু, মার্গসংগীত ও লোকসংগীত, এরই মাঝামাঝি একটি অনির্দিষ্ট জায়গায় রবীন্দ্রনাথের স্থান। একথা না বললে অন্যায় হবে যে, রবীন্দ্রসংগীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লেখক যথেষ্ট অবহিত। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: "বাংলা গানের সামগ্রিক পরিধির ভিতর সুরের সব চেয়ে সুকুমার, সব চেয়ে সুচিক্কণ রূপ তুলে ধরেছে যে গান তার নাম—রবীন্দ্রসঙ্গীত।" ঠিক এই কথার পরেই কিন্তু তিনি অভিযোগ করেছেন যে, গায়কের স্বাধীনতা রবীন্দ্রসংগীতে খণ্ডিত। রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে নারায়ণবাবুর চারটি প্রবন্ধের ধুয়াই হল এই কথা যে, রবীন্দ্রসংগীতে গায়কের হাত-পা বাঁধা। "রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য" প্রবন্ধে "রবীন্দ্রসঙ্গীত ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী আন্দোলন" মুক্তকণ্ঠে এই কথা ঘোষণা করবার পর তিনি আক্ষেপ করছেন যে, "এই আন্দোলনের প্রায় সবটুকু কৃতিত্ব যিনি এই আন্দোলন প্রবর্তন করে গেছেন তাঁর; আন্দোলনকে যাঁরা ধারণ করে আছেন তাঁদের জন্যে কৃতিত্বের ছিটে-ফোঁটা পড়ে রইল না।" এর পর বলেছেন তিনি আরও সাংঘাতিক কথা: "ভারতীয় সঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা একটা মস্ত বড় জিনিস; সেই স্বাধীনতাকে আঘাত করা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণকে আঘাত করারই সমতুল।" এই মতের সমর্থনে তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, "…ভারতীয় সঙ্গীতে সুরের প্রাধান্য। রচনা এখানে একটা উপলক্ষ্যমাত্র, সুরকে কণ্ঠে বা যন্ত্রে ফুটিয়ে তোলাটাই হল আসল।" কথাটা দাঁড়াল এই, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের প্রাণকেই আঘাত করেছেন, যদিও "রবীন্দ্রসঙ্গীত" প্রবন্ধের একেবারে গোড়াতেই লেখক বলেছেন যে, "রবীন্দ্র প্রতিভায় যা কিছু সুন্দর মহৎ বরণীয় ও স্মরণীয় তা সবই বিধৃত হয়েছে তাঁর গানে। ··শিল্পসৃষ্টিতে বিভিন্ন উপাদানের এমন সুসমঞ্জস সমন্বয় বড় একটা চোখে পড়ে না।" একেই বলে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

যাই হোক, সংগীত পরিবেশনে শিল্পীর স্বাধীনতা কতটা আছে বা নেই, এই প্রশ্নটি একটু আলোচনা করা যেতে পারে। ইউরোপীয় সংগীতে এ প্রশ্ন ওঠে না, কেননা সেখানে রচয়িতার ও পরিবেশকের পার্থক্য স্বীকৃত, তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র নির্দিষ্ট। কিন্তু ভারতীয় মার্গসংগীতে শিল্পী বলতে কি বোঝায় না একাধারে রচয়িতা ও পরিবেশক? সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা কথার কোনো মানেই হয় না, কেননা রচনা ও পরিবেশন মার্গসংগীতে প্রায় একই প্রক্রিয়া। ব্যক্তিভেদে ও ঘরানাভেদে রাগরাগিণীর শুধু বাইরের রঙ নয়, তাদের ভিতরের রসও যে বদলে যায় সে তো জানা কথা। এই যে ঘরানা থেকে ঘরানায়

ছড়িয়ে পড়া ও এই ভাবে বিচিত্র রাগ-রাগিণীর উদ্‌ভব, এই হল ভারতীয় সংগীতের স্বাধীনতার মূল কথা। রবীন্দ্রসংগীতকেও বলা যেতে পারে বিশেষ একটি ঘরানা। স্বাধীনতার দোহাই পেড়ে এই বিশেষ ঘরানাকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে রবীন্দ্রসংগীতে লেখক যে 'সুসমঞ্জস সমন্বয়'-এর সন্ধান পেয়েছেন, তার কি পরিণতি ঘটবে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে। রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের উপর স্বাধীনতার প্রয়োগের ফলে যে রূপের ও রসের সৃষ্টি হয়েছে তা যদি কারো কানে অতি উপাদেয় লাগে তাতে আপত্তির অধিকার হয়তো আমাদের নেই। কিন্তু এ কথা বলবার অধিকার নিশ্চয় আমাদের আছে যে ঐ জাতীয় গানের রস আর রবীন্দ্রনাথ যে জাতীয় গান সৃষ্টি করে গেছেন তার রস একেবারে ভিন্ন গোত্রের।

শিল্পীর স্বাধীনতার অবশ্য রকমফের আছে। দিলীপীয় স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য সুরবিস্তার ও তানসংযোগ। কেননা, তাঁর বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন শুধু কাঠামো, শিল্পীর অর্থাৎ গায়কের কর্তব্য এই কাঠামোকে ভরাট করে রবীন্দ্রসংগীতের নিহিতার্থ ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু সূত্রকার আর দিলীপকুমার বা সমগোত্রীয় শিল্পীরা ভাষ্যকার, আর ভাষ্যই শিল্পের প্রাণ। কিন্তু স্বাধীনতার আর-এক জাতীয় প্রয়োগও আমরা দেখেছি— কোথাও বা সামান্য একটু মোচড়, কোথাও বা এক-আধ পরদা এদিক-ওদিক, অনিচ্ছায় নয়, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত। রবীন্দ্রসংগীতের একাধিক প্রখ্যাত পরিবেশকের কণ্ঠে এই জাতীয় মারাত্মক অন্তর-টিপুনির পরিচয় আমরা পেয়েছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আজ রবীন্দ্রসংগীতের দ্বৈত সংকট, বাহির থেকে ও ভিতর থেকে। এই হল শিল্পীর স্বাধীনতার পরিণাম। এই অবস্থায় নারায়ণবাবু যাঁদের বলেছেন রবীন্দ্রসংগীতের "ন্যাসরক্ষক" এবং যাঁরা তাঁর মতে "শিল্পীর স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কায় মূর্ছা যাবার দাখিল", তাঁরা যদি সজাগ না হন তা হলে রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ আছে।

আমি প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে ঘরানা কথাটা যোগ করেছি। এটি শুধু কথার কথা। প্রকৃত-পক্ষে রবীন্দ্রসংগীত এমন ঐকান্তিকভাবে ব্যক্তিগত সৃষ্টি যে, এই প্রসঙ্গে 'ঘরানা' কথা ব্যবহার বোধ হয় অচল। ঠিক এই কারণেই স্বাধীনতা কথাটাও এখানে ওঠে না, অর্থাৎ গ্রন্থকারের অর্থে। বিস্ময়ের ও আক্ষেপের কথা এই যে, নারায়ণবাবুর মতন গুণগ্রাহী সাংগীতিক, যিনি শুধু রবীন্দ্রসংগীতের অপূর্ব ঐশ্বর্য নয়, কী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় এই ঐশ্বর্যের উদ্‌ভব হল এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি রবীন্দ্রনাথের সাংগীতিক সৃষ্টির টিকে থাকার অধিকার হরণ করতে চান শিল্পীর স্বাধীনতার নামে। বিস্ময়ের কথা আরো এই জন্যে যে, নারায়ণবাবুর বইর পাতায় পাতায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি শুধু সাংগীতিক নন, তিনি সাহিত্যিকও, কাব্যে ও সংগীতে তাঁর অনুরাগ প্রায় সমান, আর তিনি মানেন যে সাংগীতিক জগতে মার্গ-সংগীত ও লোকসংগীত প্রায় তুল্যমূল্য। সংগীতে ও সংস্কৃতিতে যাঁর অনুশীলন ও অনুরাগ এত ব্যাপক, এই সহজ কথা কি তিনি বোঝেন না যে, মার্গসংগীতের বেলায় যা খাটে লোকসংগীতের বেলায় তা খাটে না, আর রবীন্দ্রসংগীত এই দুই স্তরের মাঝামাঝি বিশেষ স্তরের সৃষ্টি, যে সৃষ্টিকে তাঁরই ভাষায় বলা চলে "বিদগ্ধ" সংগীত, যদিও তিনি এই কথাটির প্রকৃত সংজ্ঞা বা সীমা নির্ধারণ করেন নি। Sophisticated আর বিদগ্ধ কি এক জিনিস? উনি বলছেন, "যাকে আমরা sophisticated বা বিদগ্ধ সঙ্গীত বলি, বাংলা দেশে তা কোনো কালেই শিকড় গেড়ে বসতে পারে নি; বাঙালী মনের সহজ ঝোঁক লোকসঙ্গীতের প্রতি।" দুটি দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে, একটি কীর্তন, আর-একটি নিধুবাবুর টপ্পা। এই দুটিকে গ্রন্থকার কোন্ পর্যায়ে ফেলবেন? এ কথা বলার বোধ হয় প্রয়োজন নেই বাঙালীর সাংগীতিক মনের কতখানি জায়গা জুড়ে আছে টপ্পা ও কীর্তন।

বিদগ্ধ সংগীতের যে ধারা বাংলা দেশে বরাবরই প্রবল ছিল রবীন্দ্রনাথ তাকে করেছেন প্রবলতর, অর্থাৎ টপ্পা ও কীর্তনের ঐতিহ্যকে তিনি নিয়ে গেছেন আর-এক ধাপ এগিয়ে। তাঁর সাংগীতিক সৃষ্টিতে তিনি যেমন আত্মসাৎ করেছেন মার্গসংগীত তেমনি আকর্ষণ করেছেন লোকসংগীত। ফলে যে শিল্পসৃষ্টির উদ্‌ভব, তাই এ যুগের যথার্থ বিদগ্ধ সংগীত। রবীন্দ্রসংগীত বা রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্যই যে এই বৈদগ্ধ্য, এ কথা ভালো করে বুঝলে নারায়ণবাবু লিখতেন না: "রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার কি এক দুর্নিরীক্ষ্য কারণে সমাজের উচ্চ মহলে আবদ্ধ।" কথাটা পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি সত্য হত যদি 'উচ্চ' বলতে গ্রন্থকার বুঝতেন শুধু শিক্ষিত বা বিদগ্ধ, ধনী নয়। দুঃখের কথা তিনি 'উচ্চ' কথাটি ব্যবহার করেছেন দ্বিতীয় অর্থে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় কি কোনো তফাত করা যায়? আমার অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে তাঁর গানের সমাদর অনেক ব্যাপক। নারায়ণবাবু এই প্রসঙ্গে জনসাধারণ কথাটি ব্যবহার করেছেন বলেই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তাঁর কল্পিত জনসাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রচার তিনি কতটা লক্ষ্য করেছেন? আর কবিতার বেলাতেও কি তিনি মনে করেন যে, "একটি কায়েমী স্বার্থের চক্র"ই এই প্রচারের প্রতিকূলতা করছে? জনগণের শিক্ষার অভাব এইজন্যে দায়ী নয়? সন্দেহ হয় যে, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থকার যথেষ্ট প্রবীণ নন।

আরও একটি প্রমাণ দিচ্ছি। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত "সংগীত ও সংস্কৃতি" গ্রন্থ উদ্ধার ক'রে তিনি বলছেন যে, বৈদিক যুগে মার্গসংগীতের পাশে পাশে লোকসংগীতেরও অনুশীলন হত, অতএব লোকসংগীত মার্গসংগীতের অনুগ বা অধীন নয়, পক্ষান্তরে সহগ ও সমমর্যাদাসম্পন্ন।" স্বামীজীর বই আমি পড়িনি। কিন্তু এই তথ্যটি কি সর্বস্বীকৃত নয় যে, লোকসংগীতের উদ্‌ভব সভ্যতার প্রায় আদি পর্যায়ে ও মার্গসংগীতের জন্ম বহুদিন পরে এই লোকসংগীত থেকেই? সংগীতের প্রাথমিক যুগের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, মুসলমান আমলেও কী ভাবে লোকসংগীত থেকে মার্গসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে তার পরিচয় আছে শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী রচিত "হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা" (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) বইতে। রবীন্দ্রনাথ এই ঐতিহ্যেরই বাহক। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে একটু সচেতন হওয়া বিশেষ দরকার।

এই সব মৌলিক কথা বাদ দিয়েও দেখা যায় যে, রবীন্দ্রসংগীত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখক এমন অনেক কথা বলেছেন যা মেনে নেওয়া কঠিন। দু-চারটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১. রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গানগুলো সুরধর্মী এবং মধ্য ও শেষ বয়সের গান মূলত কাব্যধর্মী— এই শ্রেণীবিভাগ কি নিতান্ত যান্ত্রিক নয়? কোনো এক অনবহিত মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ যদি এই জাতীয় শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করেও থাকেন, আমাদের পক্ষে তাই কি চিরকালের আদর্শ হয়ে থাকবে?

২. রবীন্দ্রনাথ কীর্তনের প্রতি তেমন আকৃষ্ট হন নি ও কীর্তনাঙ্গ সুরের গানে অ-ভক্তিমূলক কথা বসাবার 'ক্ষীণতম চেষ্টা'ও নাকি এখন পর্যন্ত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যে কীর্তনের কী রকম ভক্ত ছিলেন তা তাঁর সংগীতবিষয়ক রচনায় ও আলোচনায় বা ভাষণে বারবার প্রকাশ পেয়েছে। বিশুদ্ধ কীর্তনের ও কীর্তনভাঙা সুরে তিনি বহু গান রচনা করেছিলেন। এই গানগুলির কথা অনেক ক্ষেত্রেই ভক্তিমূলক নয়। তিনটি উদাহরণ দিচ্ছি: 'তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে' (এই গানটি কী ভাবে রচিত হয়েছিল "জীবনস্মৃতি"তে তার বিশদ বর্ণনা আছে), 'তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে' ও "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পের

বিখ্যাত গান—'এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো'। তৃতীয় গানটি প্রধানত ভৈরবী সুরে রচিত, কিন্তু কীর্তনের ঢঙে। এই জাতীয় আরও দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু "ক্ষীণতম প্রচেষ্টা"র পক্ষে বোধ হয় এই তিনটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরে রচিত গানগুলির গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে যে কীর্তনের সুর সেকথাও সুবিদিত।

৩. ভাঙা গান, যেমন রবীন্দ্রনাথের একাধিক ব্রহ্মসংগীত, সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত: "এ-জাতীয় গানে বাণীসমৃদ্ধি অবধারিত নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত…কথা ও সুরের সুসমঞ্জস মিলনে গানের যে পরিপূর্ণতা তা এই জাতীয় গানে কদাচ লভ্য।" ভাঙা গান প্রসঙ্গে শুধু একাধিক ব্রহ্মসংগীতের কথা কেন যে নারায়ণবাবুর মনে এল জানি না। বহু অ-ব্রহ্মসংগীতও রবীন্দ্রনাথ হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গান ভেঙে রচনা করেছেন। আর তাঁর ব্রহ্মসংগীতের বেশির ভাগই সম্পূর্ণ নিজের দেওয়া সুরে রচিত, যদিও সে-সুর অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিক সৃষ্টি নয়। এ সব গানের বাণী ব্যাহত কি না তা শুধু মতের নয়, রুচির কথা। ভাঙা গানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, পাঠকেরা বিচার করুন এগুলির বাণী "ব্যাহত" কি না: 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ', 'আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে', 'আজি কমল মুকুলদল খুলিল', 'খেলার সাথী, এবার বিদায়দ্বার খোলো'। এই চারটি হিন্দী-ভাঙা গানের প্রথম ও দ্বিতীয়টি ব্রহ্মসংগীত; চতুর্থটিকে প্রেমের গান বলা যেতে পারে। কিন্তু শ্রোতার মন এই গানগুলি শুনলে আচ্ছন্ন হয় কথা ও সুরের অপূর্ব সম্মোহনে। এই রকম দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানে অজস্র পাওয়া যায়। এত বেশি যে, এক-একসময় মনে হয় ভাঙা গানগুলিই তাঁর সাংগীতিক কীর্তির চরম নমুনা।

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। নারায়ণবাবুর লেখা পড়ে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, তাঁর পক্ষপাত কবির প্রথম-জীবনের গান সম্বন্ধে। আজকালকার গাইয়েদের সম্পর্কে তিনি অভিযোগ করেছেন, এঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম-বয়সের গান সযত্নে পরিহার করে থাকেন। অথচ কবির রচিত "উল্লেখযোগ্য" ভৈরবীর যে-ছয়টি নমুনা তিনি দিয়েছেন প্রত্যেকটি তাঁর উত্তরজীবনের ও এর মধ্যে পাঁচটি তাঁর একেবারে শেষ-বয়সের রচনা।

বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ এ-বইটিতে আছে চারটি, যদিও রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়িয়ে আছে পাতায় পাতায়। অবশ্য তা স্বাভাবিক এবং তাতে প্রমাণ হয় যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার সচেতন। অথচ তাঁর আপেক্ষিক মূল্যবিচারে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রায় তুল্যমূল্য। কেননা তিনি লিখেছেন, "একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত সম্বন্ধে বলা যায় তাঁদের সুর ও বাণী দুইই ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং তাঁদের গান একটি সুসমঞ্জস ঐক্যের মধ্যে এসে পরিণতি লাভ করেছে।" ("কাজী নজরুল ইসলাম—গীতকার ও সুরকার")।

তিনি আরও বলেছেন যে, নজরুল 'মার্চ'-সংগীতের প্রথম সার্থক স্রষ্টা। প্রমাণ, তাঁর 'উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল' ও 'টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চল সমরে'। লেখক কি কখনো 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' কিংবা 'চল্ রে চল্ সবে ভারতসন্তান' প্রভৃতি গান শোনেন নি?

গ্রন্থকার আক্ষেপ করেছেন যে বাংলায় "যে সমস্ত কোরাস গান তৈরি হয়েছে সেগুলির··সুরের দিক দরিদ্র···জাতীয়তার অনুপ্রেরণা থেকে তাদের জন্ম, তাই কথা তাদের ভিতর স্বভাবতই প্রধান মর্যাদা লাভ করেছে।" ঐ "একসূত্রে বাঁধিয়াছি" গানটির প্রেরণা যে জাতীয়তাবোধ তা অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু এটির সুর কি উপেক্ষণীয়? অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার দৃষ্টান্ত দিতে হচ্ছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি

প্রণমি চরণে তব", সত্যেন্দ্রনাথের "জয় দেব জয় দেব, জয় মঙ্গলদাতা", রবীন্দ্রনাথের "পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে", "মোরা সত্যের পরে মন" প্রভৃতি ব্রহ্মসংগীতগুলির জন্ম কি জাতীয়তার অনুপ্রেরণা থেকে? আর এই গানগুলির সুরের দিক কি দরিদ্র? মায়ার খেলার অপূর্ব কোরাসগুলির কথাও কি উল্লেখযোগ্য নয়?

মূল্যবিচারের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থকারের আরো দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে: "সুরকার হিমাংশু দত্ত" ও "গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য"। এঁরা দুজনেই ছিলেন গ্রন্থকারের অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু, অতএব তাঁদের সম্বন্ধে প্রকাশ্যে উচ্ছ্বাস না করাই বোধ হয় তাঁর পক্ষে শোভন হত। হিমাংশু দত্ত অবশ্য সুরকার হিসাবে আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করতে পারেন। কিন্তু শুধু সুর রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত না হয়ে, কথার বরাত দিতেন বন্ধু অজয় ভট্টাচার্যের উপর। এই ভাবে তৈরি হত যে গান, শচীন্দ্র দেববর্মনের মতো শিল্পীর মুখে শুনতে না পেলে সেগুলির কোনো প্রতিষ্ঠা হত কি না সন্দেহ। অথচ এই ধরনের জোড়াতালি-দেওয়া গান সম্বন্ধে নারায়ণবাবু তাঁর নজরুল ইসলাম বিষয়ক প্রবন্ধে নিজেই মন্তব্য করেছেন যে, "যাঁরা নিজেরা গান লেখেন কিন্তু অপরকে দিয়ে তাতে সুরযোজনা করিয়ে নেন তাঁদের গানে কখনও সত্যিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। আবার এর উল্টো পিঠে, যাঁদের সুর দেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু নিজেরা গান রচনা করতে জানেন না,...তাঁরাও সুর যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন কিনা সন্দেহ...।" এই ভাবে এক ঘায়ে "সুরকার" ও "গীতিকার" বন্ধুদ্বয়কে ঘায়েল করার পর তাঁদের সম্বন্ধে ঐ জাতীয় উক্তির সংগতি সম্বন্ধে স্বভাবতই একটু সন্দেহ হয়।

এ কথা মানতে হবে যে, নারায়ণবাবুর দৃষ্টি কূপমণ্ডুকের নয়। তাই তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, মার্গসংগীতের ভবিষ্যৎ প্রসারের পথ রুদ্ধ। "কাজেই ভারতীয় সঙ্গীতের মোড় নতুন দিকে ফেরাতে হবে, ফেরার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আর সমষ্টিসঙ্গীতই হল সেই প্রত্যাশিত দিক।" ভাববার মতন কথা। কিন্তু যিনি এই ভাবনার বরাত দিলেন আমাদের উপর এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক থাকলে এ কথার উল্লেখ তিনি নিশ্চয়ই করতেন যে রবীন্দ্রনাথ বাদেও একাধিক ব্রহ্মসংগীত-রচয়িতা অনেক উল্লেখযোগ্য কোরাস গানের সৃষ্টি করেছেন। আর সমসাময়িক গান-রচয়িতাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের নামও তিনি একেবারে বাদ দিতেন না।

"সঙ্গীত পরিক্রমা"য় সংগীত সম্বন্ধে লেখকের গভীর দরদের পরিচয় পাওয়া যায় নিঃসন্দেহ, কিন্তু বইটির বিভিন্ন নিবন্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রের একান্ত অভাব। ইতিপূর্বে দৃষ্টান্ত দিয়েছি, আরো দু-একটি দেওয়া যেতে পারে। বইটির প্রথম প্রবন্ধে ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিক উপক্রমণিকায় লেখক বলেছেন: "মোগল যুগে ধ্রুপদের জায়গা জুড়ে বসলো খ্যাল।" মোগল আমলে গোয়ালিয়রে যে ধ্রুপদের জন্ম এ কথা কি তিনি জানেন না? এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে বিখ্যাত আগ্রা ঘরানায় ওস্তাদ ফৈয়জ খাঁর পূর্বাচার্য আকবর শা'র অনুগত সুজন খাঁ প্রায় সাত শ ধ্রুপদাঙ্গ গান রচনা করেছিলেন ও এই জাতীয় দরবারী ধ্রুপদের থেকেই পরে উদ্ভব হয় খেয়ালের। কিন্তু গ্রন্থকার এই পরিণতির যে কারণ নির্দেশ করেছেন তাতে ফুটেছে তাঁর মৌলিকতা। "মোগল বাদশারা সঙ্গীতকে জাগতিক সুখভোগের অন্যতম উপকরণ মনে করতেন। সুখলাভের সোপানরূপে ছিল তার ব্যবহার। কাজেই সঙ্গীতের প্রাচীন মহিমা ও আধ্যাত্মিক গৌরব আর টিকল না, ধ্যানের আসন থেকে সঙ্গীতকে নেমে আসতে হল আলোকমালাসজ্জিত আতর-সুবাসিত আসরে।" এই বর্ণনার বর্ণসমারোহ ভেদ করে লেখকের বক্তব্য অবশ্য দাঁড়ায় এই যে, একদা

ধ্রুপদ-ধামার-মন্দ্রিত অধ্যাত্মসাধনার কঠিন মার্গে ছিল ভারতীয় মার্গসংগীতের কঠোর বিহার, তার পর মুসলমান যুগে বইল আতর ও গোলাপজলের অবারিত প্রবাহ, আর তাতে শৈবালদলের মতো ভেসে এল খেয়াল ও ঠুংরি। কিন্তু ক্ষিতিমোহনবাবুর ঐ ছোট্ট বইটি থেকে জানা যায় যে, বিদগ্ধ ও লোকসংগীতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে হয়েছিল বাদশাহী দরবারে খেয়াল ঠুংরির জন্ম। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই, শিল্প-ইতিহাসে দেখা যায় ঐ একই ধারা: শিল্পসৃষ্টিতে সরলতা ও কঠোরতার পর আবির্ভাব হয় বৈচিত্র্যের ও অলংকরণের। ক্লাসিকাল-এর পর রোমান্টিক।

আরো একটা কথা স্মরণ করা যেতে পারে। শিল্প-ইতিহাসের প্রাথমিক ও সব চেয়ে গৌরবময় যুগের শিল্পসৃষ্টি ও শিল্প উপভোগ হয় সার্বজনীন, তাই বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিতে শিল্পীর হাতের ছাপ থাকলেও তার নামের সীলমোহর থাকে না। অজন্তার ছবিতে বা মহাবল্লিপুরমের ভাস্কর্যে কয়জন শিল্পীর নামের সন্ধান পাওয়া যায়? সুতরাং এই আক্ষেপ একেবারেই অহেতুক যে, "এদেশের সুরকাররা কদাপি তাঁদের পরিপূর্ণ মর্যাদা পান নি। সুরের ভিতর নিজের নাম ও ব্যক্তিত্বকে নিঃশেষে লুপ্ত করে দেওয়াই ছিল তাঁদের রীতি।" এর পর নারায়ণবাবু বলেছেন, "বর্তমানে এই নীতির পরিবর্তন আবশ্যক। সর্বাগ্রে সুরকারের মর্যাদা স্বীকৃত হওয়া উচিত, তারপর গায়ক ও বাদক।" এই পরিবর্তন যাতে সহজসাধ্য হয় এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার বিশেষ এক সুরকারের নামও করেছেন। "তিমিরবরণকে দিয়েই এই পরিবর্তনের সূচনা হোক।" আমার ধারণা এই যে, এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দাবি বোধ হয় তিমিরবরণের চেয়ে নিতান্ত কম নয়, অতএব আমাদের কর্তব্য রবীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর বিশিষ্ট স্বাক্ষর যাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়, এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা।

হিরণকুমার সান্যাল

ব্যাকরণ-প্রসঙ্গ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি

শব্দদ্বৈত ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ

পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীর শেষ অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বাদশটী সূত্র দ্বারা শব্দদ্বৈত স্বীকার করিয়াছেন এবং সেগুলিকে সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজি দীক্ষিত তদ্ধিত প্রকরণের শেষাংশে "অথ দ্বিরুক্ত প্রক্রিয়া" নাম দিয়া স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত দ্বাদশটী সূত্রের মধ্যে মাত্র তিনটী সূত্র— নিত্য বীপ্সয়োঃ; পা ৮।১।৪, প্রকারে গুণবচনস্য; পা ৮।১।১২ ও যথাস্বে যথাযথম্; পা ৮।১।১৪"—বাংলায় প্রযোজ্য।

পাশ্চাত্ত্য ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় শব্দদ্বৈত অর্থাৎ Reduplications সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। Otto Jespersen তাঁহার Language গ্রন্থের ৫ম অধ্যায়ে ৫ম প্রকরণে ইহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য মত সমালোচনার পর এইমাত্র বলিয়াছেন যে—It is simpler and more natural to refer these reduplications to the pleasure always felt in repeating the same muscular action until one is tired (1947 e., p., 109) উক্ত উদ্ধৃতির সারাংশ পাণিনি সূত্র—অকৃচ্ছ্রে প্রিয়সুখয়োরন্যতরস্যাম্; পা ৮।১।১৩—সহিত অভিন্ন হইলেও ব্যাকরণের সাধারণ আলোচনায় যে শব্দদ্বৈতের কোনও মূল্য আছে তাহা এখনও পাশ্চাত্ত্য ভাষাতত্ত্ববিদগণের নজরে পড়ে নাই।

বাংলায় বহুবচন অর্থপ্রকাশ করিবার জন্য গুণবাচক অর্থাৎ বিশেষণের দ্বিত্ব করিবার নিয়ম আছে। "লাল লাল কাপড়" বলিলে ঐ বর্ণের কাপড়ের বহুত্ব জ্ঞান আইসে। অতএব এখানে "প্রকারে গুণবচনস্য" সূত্রের প্রয়োগ পাওয়া যায়। লঘুশব্দেন্দুশেখর টীকামতে—"প্রকার" শব্দ "সাদৃশ্যবাচী"। সেইজন্য বিশেষণ দ্বারা প্রকাশিত গুণের অল্পসল্প তারতম্য ঘটিলেও বহুবচন অর্থ অটুট থাকে। উক্ত ৮।১।১২ সূত্রটী পূর্ববর্তী "কর্মধারয়বদুত্তরেষু; পা ৮।১।১১" সূত্রের অনুবৃত্তি হেতু সমানাধিকরণবলে বাংলায়ও ঐ শ্রেণীর শব্দদ্বৈতে কর্মধারয় (পা ২।১।৪৯) নিয়মে উত্তরপদার্থের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া পরবর্তী বিশেষ্য পদ পুনরায় বহুবচন বিভক্তি গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগে দেখিতে পাই যে—"ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি, ভাইবোন করি গলাগলি, অঙ্গনেতে নাচিতেছে ঐ"—অথবা "গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর ছোট ছোট গ্রামগুলি"।

যথাস্বে যথাযথম্; পা ৮।১।১৪ সূত্র নিয়মে গঠিত "যথাযথ" পদ বিশেষণ হইলেও ইহার মধ্যে বহুবচন অর্থ নাই। পদটী "যথা" শব্দের ন্যায় বিশেষণ; যদিও "যথা" শব্দকে অব্যয়ীভাব সমাস প্রয়োগে অব্যয়রূপেও গণ্য করিতে হয়। "পর" এই বিশেষণ বা সর্বনামসিদ্ধ "পরস্পর" পদে বহুবচন অর্থ আছে বটে কিন্তু ঐ পদসিদ্ধ "পরম্পরা" পদ বিশেষ্য এবং একবচন মাত্র। মূল "পর" শব্দ সংস্কৃত সুপ্ প্রাপ্তিতে লিঙ্গভেদ পাইলেও উক্ত "পরস্পর" শব্দ Russian ব্যতিহারিক সর্বনামের ন্যায় পুং স্ত্রী লিঙ্গে একই রূপ পায়।

সাদৃশ্য অর্থ থাকার জন্যই বাংলার অন্য প্রকারের শব্দদ্বৈতের আম্রেড়িতাংশে অর্থাৎ দ্বিতীয়াংশে অক্ষরের পরিবর্তন করিয়া বহুবচন অর্থ ঘটানো হইয়া থাকে। "জলটল বা কাপড়চোপড়" বলিলে সাদৃশ্য অর্থের প্রাধান্য আনিয়া বহুবচন সূচিত হয়। পাণিনি দ্বিরুক্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে এরূপ অক্ষরের (syllable) পরিবর্তন

কুত্রাপি স্বীকৃত না হইলেও ৮।১।৪ সূত্রের বীপ্সা হইতে এরূপ ঘটে স্বীকৃত হইতে পারে; কারণ "প্রৌঢ় মনোরমা" টীকায় ভট্টোজি দীক্ষিত বলিয়াছেন— ব্যাপ্তুমিচ্ছা বীপ্সা, ব্যাপ্তি প্রতি পিপাদয়িষেতি যাবৎ। সা চ প্রয়োক্তৃধর্মঃ। বস্তুত ব্যাপ্তির সমস্ত অংশের সহিত সর্বলোকসিদ্ধি (law of the uniformity of nature) বা প্রকৃতির একরূপতার সম্বন্ধ না থাকায় এই সকল শব্দদ্বৈত পুনরায় বহুবচন বিভক্তি পাইতে পারে; যথা— কাপড়চোপড়গুলি গুছাইয়া রাখ ইত্যাদি। এইপ্রকার শব্দদ্বৈতকে বাংলা ব্যাকরণ মতে ধ্বন্যর্থক পদ বলা উচিত। কারণ আম্রেড়িতাংশ শুধু যে ধ্বনি সূচনা করে তাহা নহে, বচন অর্থও সূচনা করে।

শব্দদ্বৈত দ্বারা বাংলায় বচন অর্থ প্রকাশ করা ছাড়া দু-একটী অন্য দৃষ্টান্তও মিলে। "সঙ্গে" এই সম্বন্ধনীয় পদ দ্বিত্বরূপ গ্রহণ করিয়া যখন "ইবার" প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবিশেষ্যের (Gerund) অর্থাৎ ইসম-এ-মসদাক (যথা—খাইবার সঙ্গে সঙ্গে) এর সহিত যুক্ত হয় তখন ঐ দ্বিত্বপদ আর সম্বন্ধনীয় থাকে না; তৎপরিবর্তে কালার্থসূচক সংযোজক অব্যয় বিশেষণ (Relative adverb)এ পরিণত হয় এবং এরূপ পদ, যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করে।

সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ ধ্বন্যাত্মক (Onomatopoeia) শব্দ সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই। বাংলায় এরূপ শব্দের বাহুল্য ত আছেই, ইহাদেরও আবার নিয়মতান্ত্রিক দ্বিরুক্তি হইতে দেখা যায়। কচ্, কট্, খট্ খপ্ ধুপ্ প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ শব্দদ্বৈতে পরিণত হইলে প্রথমাংশের শেষে আ-কার যুক্ত হয়; যথা— কচাকচ, কটাকট, ধুপাধুপ (প্রয়োগ যথা— তাক ধুপাধুপ বাদ্যি বাজে; ডালিম গাছে পরভু নাচে— গ্রাম্য ছড়া) ইত্যাদি। এসব স্থলে গুণ বা বচন কোনও অর্থ না থাকিলেও নিত্য অর্থাৎ আভীক্ষ্ণ্য বা পৌনঃপুন্য (নিত্যম্ = আভীক্ষ্ণ্যম্ ব্যাখ্যানাৎ। তচ্চ পৌনঃপুন্যম্— লঘুশব্দেন্দুশেখর) অর্থ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত "দাগ্" প্রভৃতি ধাতুর দ্বিত্ব এবং আ-কার স্থলে ও-কার করিয়া এক রকম শব্দদ্বৈত পাওয়া যায়; যথা— দাগদোগ, বাছবোছ, ধারধোর ইত্যাদি। তদ্ব্যতীত উভয় অক্ষরে আ-কার যুক্ত ধাতু বা শব্দের দ্বিত্বে আম্রেড়িতাংশের প্রথম আ-কার স্থলে উ-কার এবং শেষে আ-কার স্থলে ই-কার করিয়াও অন্য একপ্রকারের শব্দদ্বৈত মিলে; যথা— ঢাকাঢুকি, ভাজাভুজি, কাঁটাকুঁটি, ধাক্কাধুক্কি, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যেও পৌনঃপুন্য অর্থাৎ নিত্যঅর্থপ্রধান।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ কর্তৃক স্বীকৃত না হইলেও প্রাচীন মীমাংসকগণ বিশেষতঃ ভট্ট কুমারিল তাঁহার গুণপদার্থের চব্বিশ বিভাগের মধ্যে ইহাকে অন্যতমরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কুমারিলের গুণবিভাগ ন্যায় ও বৈশেষিকের মত হইলেও শেষোক্ত দার্শনিকগণ কেবলমাত্র শব্দ স্বীকার করিয়াছেন। কুমারিল ও পরে প্রভাকর ঐ শব্দস্থলে ধ্বন্যাত্মক শব্দ স্বীকার এবং স্ফোটবাদের অস্বীকার করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণও ধ্বন্যাত্মক শব্দের মূলীভূত ধ্বনি স্বীকার করিয়াছেন। ভট্টনায়ক, আনন্দবর্ধন এবং কুন্তক প্রত্যেকের কাব্যালোচনায় যে লাবণ্যের উল্লেখ আছে তাহাতে ধ্বনির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আনন্দবর্ধনের ন্যায় কুন্তকও ধ্বনিকে তাঁহার আলোচিত বক্রতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কুন্তকের উপচার বক্রতা আনন্দবর্ধনের লক্ষণামূল ধ্বনির অনুরূপ। ইহাঁদের মতে ধ্বনি প্রধান নয় বটে, ধ্বনি গৌণ বা ভাক্ত এবং বক্রোক্তি প্রধান হইলেও ধ্বনি তাহার অঙ্গীভূত।

ধ্বনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের মূল উপাদান বলিয়াই অধিকাংশ স্থলে প্রাণী বা নৈসর্গিক ব্যাপারের শব্দ বা ধ্বনি

বিশেষকে অনুসরণ করিয়াই এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের উৎপত্তি। এই জন্যই Otto Jespersen তাঁহার *Language* গ্রন্থে ইহাদিগকে Echo-words নামেও অভিহিত করিয়াছেন (chap. xvi Section 7)। ইহাদিগের সীমা নির্দেশ করিতে গিয়া ফ্রেডারিক ডায়াজের (Diez) যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই যে—One can easily go too far in supposing onomatopoeia, as a rule it is more advisable to build on existing words. ফ্রেডারিক ডায়াজের এই মত উভয় মতাবলম্বী মীমাংসকগণের সিদ্ধান্তের সমপর্যায়ভুক্ত এবং সেইজন্যই "পিপীলিকা" শব্দের ব্যুৎপত্তিমূলে যে যঙ্লুগন্ত "পীল" ধাতু রহিয়াছে তাহাও ধ্বন্যাত্মক। বাঙ্গালিকবি ইহা লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন—

পিপীলিকা পিপীলিকা দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাবে যাও ভাই বলি,
শীতের সঞ্চয় চাই, খাদ্য খুজিতেছি তাই
ছয় পায় পীল পীল চলি।

সংস্কৃত আরও দুই-এক ধাতুর এইরূপ ধ্বন্যাত্মক অর্থ বাহির করা যায় এবং সেই অর্থ দিয়া ব্যুৎপন্ন শব্দেরও ব্যাখ্যা করা যায়।

উপরে দেখানো গিয়াছে যে ধ্বন্যাত্মক শব্দও শব্দদ্বৈতে পরিণত হইতে পারে। বাস্তবিক শব্দ একবার গড়িয়া উঠিলে তাহা যে অন্যরূপেও শব্দ গঠিত করিতে পারে তাহা Otto Jespersen-ও স্বীকার করিয়াছেন। Onomatopoeia-র আলোচনা প্রসঙ্গে Language গ্রন্থের ৮ম অধ্যায় ৪র্থ প্রকরণে বলিয়াছেন—When once formed, such words may be transferred to other things where the sound plays no longer any role. Jespersen-এর এই মত ভর্তৃহরির শব্দের নিত্যতাবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র (বাক্যপদীয় ব্রহ্মকাণ্ড নামক প্রথম কাণ্ডের প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের ঐ প্রকরণের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে যে ভাষা যত বেশি শিশুর কাকলির সমপর্যায়ে রহিয়াছে সে ভাষায় তত বেশি ধ্বন্যাত্মক শব্দ রহিয়াছে। বাংলা ভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের বাহুল্যহেতু এই সত্য কিন্তু প্রমাণিত হয় না বরং রবীন্দ্রনাথের মতে ইহাদের অনির্বচনীয়তা বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে (শব্দতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

Otto Jespersen পুনরায় বলিয়াছেন— But as our speech organs are not capable of giving a perfect imitation of all unarticulated sounds, the choice of speech sounds is to a certain extent accidental and different nations have chosen different combinations more or less conventionalized for the same sounds. (*Language* chap. XX, sec. 3)। জেস্পার্সনের এই মতও ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় শ্লোকের ভাবার্থ মাত্র।

অব্যয়

অর্বাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ সুপ্রচলিত কারিকা দ্বারা অব্যয়সংজ্ঞা নির্দেশ করিলেও বৃদ্ধবৈয়াকরণ পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদের— ১. স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্; ২. তদ্ধিতশ্চা-

সর্ববিভক্তিঃ ; ৩. কৃন্মেজন্ত ; ৪. ক্ত্বাতোসুন্‌কসুনঃ , ৫. অব্যয়ীভাবশ্চ (৩৭-৪১) এই পাঁচটী সূত্র দ্বারাই অব্যয়লক্ষণ বিধান করিয়াছেন। "সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসুচবিভক্তিষু। বচনেষু চ সর্বেষু যন্নব্যতিতদব্যয়ম্"—প্রচলিত কারিকার দ্বারা আমরা যে সংজ্ঞা পাই তাহা উল্লিখিত দ্বিতীয় সূত্র (পাণিনি—১।১।৩৮) হইতে পাওয়া যায় এবং অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম অর্থাৎ ১।১।৩৭ সূত্র দ্বারা আমরা যাহা পাই তাহা একপ্রকার গণবিভাগ মাত্র। বাংলায় সংস্কৃতের অনুকরণে যে অব্যয়-সংজ্ঞা তাহার স্বরূপ আলোচনার জন্য এই শব্দগণ পরীক্ষা করা উচিত। এ সম্বন্ধে পাণিনীয় গণপাঠ, সিদ্ধান্তকৌমুদীর গণপাঠ হইতে কিছু স্বতন্ত্র বলিয়া মূল পাণিনীয় গণপাঠ ধরিয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

উক্তগণধৃত "ক্ষমা, সাক্ষাৎ, উষা ও উপধা" পদ বাংলায় বিশেষ্যরূপেই ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদের বিভক্তিযুক্ত রূপ সুপ্রচলিত ; যথা—"ক্ষমার সমান গুণ নাহিক ভূতলে।" "তাহার সহিত সাক্ষাতের এখন প্রয়োজন নাই। "নিভিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি।" উপধায় হ্রস্বস্বর থাকিলে কৃৎপ্রত্যয় পরে তাহার গুণ হয়।" কোনো কোনো বাংলা বৈয়াকরণ "সাক্ষাৎ" প্রভৃতি পদের অব্যয়ত্ব রক্ষার জন্য ইহাকে "সাক্ষাৎকার" রূপে বিশেষ্যে প্রয়োগ নির্দেশ দেন ; কিন্তু ইহাও যে অসঙ্গত তাহা "সাক্ষাৎ প্রভৃতীনিচ ; পা ১।৪।৭৪" সূত্রদ্বারা বুঝা যায় ; কেননা ঐ সূত্র অনুসারে "সাক্ষাৎকার" পদও গতি অর্থাৎ অব্যয় থাকে, বিশেষ্য পদ হয় না।

উক্তগণধৃত "নানা, পৃথক, সুষ্ঠু, মিথ্যা, সত্য" পদ বাংলায় বিশেষণরূপে ব্যবহার পায়। ইহাদের প্রথমটী ছাড়া অন্যান্য পদগুলি গুণবাচক বিশেষণ এবং প্রথমটী সংখ্যাবাচক বিশেষণ। বাংলায় যদিও বিশেষণ পদ বিশেষ্যের বচন ও বিভক্তি প্রাপ্ত হয় না তথাপি ইহারা অন্যান্য বিশেষণের মত আরোপ্য (attributive) ও বিধেয় (predicative) ব্যবহার পায় এবং প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য পদ (যথা—পার্থক্য, সৌষ্ঠব, মিথ্যুক, সত্যতা) সৃষ্টি করে। এতদ্ব্যতীত "ঈষৎ, পরম" দুইটী বিশেষণের বিশেষণ দেখিতে পাই। ইহারাও আরোপ্য ও বিধেয় ব্যবহার পায়। কাযেই সংস্কৃত মতে ইহারা অব্যয়গণভুক্ত হইলেও বাংলায় ইহারা অব্যয় নহে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে 'ক্রিয়ার বিশেষণ' দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত হয়। বাংলায় ইহাদের কোনও বিভক্তি প্রাপ্তি নাই। এই অব্যয় গণভুক্ত "সদা, বৃথা, ক্বচিৎ, অবশ্য, নিত্য, সহসা" পদগুলি সংস্কৃত ভাষাতে ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াও দ্বিতীয়া বিভক্তি পায় না ; এবং বাংলায়ও ইহাদের ঐরূপ ব্যবহার আছে। ইহাদের মধ্যে "অবশ্য" পদ হইতে "আবশ্যিক" বিশেষণ এবং "নিত্য" পদ হইতে "নিত্যতা" বিশেষ্য উদ্ভূত হইতে দেখা যায়। অবশিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে "বিনা, যাবৎ" প্রভৃতি শব্দগুলিকে মহাত্মা রাজা রামমোহনের নির্দেশ অনুসারে "সম্বন্ধনীয় পদ" আর "বা, এবং, বরং সুতরাং" প্রভৃতি পদগুলিকে ঐ নির্দেশে সমুচ্চয়ার্থপদ বলা যায়।

প্রথম সূত্রের গণ আলোচনা ছাড়িয়া এইবার দ্বিতীয় সূত্রটী ধরা যাক। পূর্বেই বলিয়াছি যে এই সূত্রটীর অর্থই বর্তমানে অব্যয়লক্ষণ বিচারের কারিকার মূল ভিত্তি ; এবং এই জন্যই অর্বাচীন ব্যাকরণে যে সুদীর্ঘ অব্যয়-তালিকা মিলে তাহা এই সূত্র স্বীকারের ফল। ইহাদের প্রায় সমস্ত না হইলেও অধিকাংশই ক্রিয়ার বিশেষণ শ্রেণীভুক্ত, অতএব বিস্তৃত আলোচনা ছাড়িয়া অষ্টাধ্যায়ীর একটী তদ্ধিত সূত্র ধরিয়া একটী মাত্র বিশিষ্ট পদের আলোচনা করিব।

এখানে এই সূত্র সংশ্লিষ্ট "অবিভক্ত্যারিতরেতরাঽঽশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ" কাত্যায়ন বার্ত্তিকটীর আলোচনা করা কর্তব্য। ইহার ভাষ্যে পতঞ্জলি বলিয়াছেন— সত্য বিভক্তিতে সংজ্ঞয়া ভবিতব্যং সংজ্ঞয়া চাঽবিভক্তিত্বং-ভাব্যতে, তদেতদিতরেতরাশ্রয়ং ভবতি। ইতরেতরাশ্রয়াণি চ কার্যাণি ন প্রকল্পন্তে।" ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন পদের সহিত পার্থক্য রক্ষা করিয়া একপ্রকারের পদ সংসর্গে যখন পূর্বপদও বিভক্তিযুক্ত থাকে এবং অন্যপদ সংযুক্ত হয় তখন উভয় পদের ইতরেতর আশ্রয় হয়। একমাত্র "মমতা পদ" থাকিলেও ভাষ্যকার এই বার্ত্তিক আলোচনায় কোনোও দৃষ্টান্ত দেন নাই এবং এই পদটির তা প্রত্যয় তদ্ধিত কিন্তু কোনোও পদ নহে বলিয়া কোনোও আশ্রয় সম্বন্ধে যুক্ত নহে। কিন্তু বাংলায় "কাহাকেও" এবং "কাহারও" পদদ্বারা "কাহা" সর্বনামের বিভক্ত্যন্ত রূপের সহিত ও—সর্বনামের ইতরেতরাশ্রয় পাইতেছি। সংস্কৃতে এরূপ পদের অপ্রসিদ্ধি থাকিলেও বাংলায় পূর্বোল্লিখিত "ইহা" পদের ন্যায় উক্ত পদ দুইটীর সর্বনাম প্রয়োগ আছে। তবে উভয়ের অভেদ অর্থাৎ উভয় অংশে সর্বনাম-সংসর্গহেতু পদ দুইটীতে সংস্কৃত মতে অভেদসংসর্গ বা ইংরাজী মতে Agglutination স্বীকার করাই সুসঙ্গত। লক্ষ্য করিবার এই যে উক্তরূপ সংসর্গ-ফলেও পদদ্বয়ে বিভক্তির অর্থ অবিকৃত থাকে এবং পদদ্বয়ের পূর্বপদ, প্রশ্নসূচক (Interrogative) অর্থ ও পরপদ, নির্দেশক (Demonstrative) অর্থ হারাইয়া সম্মিলিতরূপে অনির্দিষ্ট (Indefinite) অর্থ প্রকাশ করে। কেহই অব্যয় হয় না।

পা; ৫।৩।১-২৬ সূত্র ছাব্বিশটীকে বিভক্তিসংজ্ঞক তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়, কারণ এই সূত্র কয়টী নির্ধারিত প্রত্যয় পাইলে শব্দ আর কোনও বিভক্তি গ্রহণ করে না; অর্থাৎ (যথা—ক্রমশঃ, সর্বদা ইত্যাদি) তাহারা অব্যয় পদ। এই আহ্নিক অন্তর্গত ১১শ সূত্র "ইদমোহঃ" সূত্রমতে "ইদম্" শব্দ হইতে "ইহ" পদ সিদ্ধ হয়। সংস্কৃতে হউক আর বাংলায় হউক পদটী বিশেষণরূপেই ব্যবহার পায়; যথা— ইহকাল, ইহলোক, ইহধাম, ইহজীবন ইত্যাদি। কেবল সংস্কৃতে "অত্র" অর্থে "ইহ" শব্দের প্রয়োগ আছে; যথা:— ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, এবং এই অর্থে ইহা ক্রিয়ার বিশেষণ। বাংলায় বিশেষণরূপে প্রয়োগের অর্থ ধরিলে আমরা ইহাকে নির্দেশক বিশেষণ (Demonstrative Adjective) বলিতে পারি। পদটী কিন্তু আ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া "ইহা" রূপে বাংলায় নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun) হইয়া যায় এবং সকলপ্রকার বিভক্তি যোগে রূপপ্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়া "স্বয়ং" এই অব্যয় পদটীও বাংলায় প্রত্যাবৃত্ত সর্বনাম (Reciprocal Pronoun) ব্যবহার পায় এবং "সম্যচ" শব্দ সু বিভক্তি যোগে "সম্যক্" রূপে অব্যয় বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব আমরা অব্যয় হইতে বাংলা সর্বনামও গঠিত হইতে দেখিতেছি; কাযেই কারিকার অর্থ টিকিতেছে না।

তৃতীয়সূত্রনির্দিষ্ট কোনও পদের লৌকিক সংস্কৃতে প্রয়োগ নাই, সেজন্য কোনও তৎসমপদ বাংলায় পাওয়া যায় না। বাংলার নিজস্ব শব্দ হিসাবে "নিকটে, সঙ্গে, ক্রমে, পরিবর্তে, পানে" প্রভৃতি পদ গণ্য হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সবগুলিকে আমরা বাংলা কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গরূপে ব্যবহার করি।

এইবার চতুর্থসূত্রনির্দিষ্ট "তোসুন" ও "কসুন" প্রত্যয় বাদ দিয়া "ক্ত্বা" প্রত্যয়ান্ত পদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য হইতেছে। এই সঙ্গে 'তুমুন' সম্বন্ধেও বলা হইবে। বাংলায় যদিও এই দুই প্রত্যয়ান্ত তৎসম শব্দ নাই তথাপি 'ইয়া' 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে এই শ্রেণীর গণ্য করা হয়। 'ক্ত্বা' ও 'তুমুন'

উভয় প্রত্যয়ে 'সমানকর্তৃকেষু' বিধান থাকিলেও 'রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এবং "প্রজাসু বৃত্তিং যমযুক্ত বেদিতুম্ (কিরাত)" স্থলে পৃথক কর্তৃকেও প্রয়োগ স্বীকার করা হইয়াছে। কাষেই বাংলায় আমরা যখন 'ইয়া' 'ইতে' প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার ভিন্নকর্তৃকত্ব (যথা—খেটে খেটে খেটে, জন্ম গেল কেটে বা কাঁদলে মুক্তো ঝরে, হাসলে মাণিক পড়ে) পাই তখন তাহা অস্বীকারে কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু অসমাপিকার এই লক্ষণ ছাড়া যেটী বিশেষ দ্রষ্টব্য সেটী এই যে সংস্কৃতে 'ক্ত্বা' ও 'তুমুন' প্রত্যয় ধাতুর অবয়ব নহে, কৃৎ-প্রত্যয় মাত্র। বাংলায় "ইয়া', 'ইতে', ও 'ইলে" ইহারা ধাত্ববয়ব অর্থাৎ ইয়া—ধাত্ববয়ব ক্রিয়ার তিনটী কাল গঠনে, ইতে—ধাত্ববয়ব বর্তমান ও অতীত গঠনে এবং ইলে—ধাত্ববয়ব অতীত কাল গঠনে ব্যবহৃত হয়। ধাত্ববয়ব ছাড়া স্বরসংগতি প্রাপ্ত 'ইয়া'-প্রত্যয়ান্ত পদের বিশেষ্যরূপেও প্রয়োগ আছে; যথা—নাচিয়ে, গাইয়ে, বলিয়ে, কইয়ে। কাষেই বাংলায় এই তিন প্রত্যয়ান্ত পদকে অব্যয় বলা চলে না।

পঞ্চমসূত্রনির্দিষ্ট অব্যয়ীভাব সমাস-নিষ্পন্ন যে সকল শব্দ বাংলায় চলে তাহাদের বিবেচনা করার সঙ্গে বাংলার নিজস্ব অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন শব্দেরও বিবেচনা করা যাইতেছে। বাংলায় প্রচলিত তৎসম শব্দগুলির মধ্যে "প্রতিদিন, প্রত্যহ, অনুদিন, সমভূমি, সম্প্রতি, আজীবন, আমরণ" ও "সমীপ, সমক্ষ, অভিমুখ, সম্মুখ" এবং বাংলার নিজস্ব "আচমকা, বেমালুম, বেসুরা" শব্দ ছাড়া অন্য সমস্তই বিশেষ্য বা বিশেষণ। উল্লিখিত শব্দের "সমীপ, সমক্ষ, অভিমুখ ও সম্মুখ" পদ এ-প্রত্যয়ান্ত হইয়া পূর্বোল্লিখিত সম্বন্ধনীয় পদ হয় এবং অবশিষ্ট সমস্তই ক্রিয়ার বিশেষণ। "পরোক্ষ" পদ বিশেষণ এবং বাংলায় অন্যান্য বিশেষণ (যথা—ধীর, আচম্বিত, চরম, অবাধ, সহজ, অচির, চকিত, প্রকাশ্য ইত্যাদি) এ-প্রত্যয় যোগে যেমন ক্রিয়াবিশেষণ হয়, এই পদটীও সেইরূপ পদান্তর পায়। অতএব বাংলায় অব্যয়ীভাবসমাসনিষ্পন্ন পদের অব্যয়ত্ব কোথায় তাহা চিন্তনীয়।

অব্যয়ীভাব সমাস আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাদি নিপাত অর্থাৎ উপসর্গগুলির কথাও আসিয়া পড়ে। আমরা প্রথমে অষ্টাধ্যায়ীর যে সূত্র আলোচনা করিয়াছি তাহাতেও এই নিপাতের কথার উল্লেখ ছিল। অব্যয়ীভাব সমাসে এই উপসর্গগুলিই (এবং 'যথা' শব্দ) পূর্বপদরূপে থাকে এবং বিভক্তি, বীপ্সা প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। "দিনকেদিন" পদে বিভক্তি যুক্ত পদের অর্থ প্রধান বলিয়া ইহা সমার্থক "প্রতিদিন" পদের ন্যায় অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন পদ। এই "প্রতিদিন" পদের অনুকরণে আমরা "প্রতিদিবস" পদ গঠন করিতে পারি না, কেননা 'প্রতিদিন' পদে যে syncretism বা coalescence আসিয়া গিয়াছে তাহা "প্রতিদিবস" পদে সম্ভব নহে এবং সেজন্য শেষোক্ত পদটীর পূর্বে নিপাত থাকা সত্ত্বেও ইহাতে পরপদের অর্থই প্রধান আছে; আর সেই জন্যই বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সুষ্ঠু প্রয়োগে (যথা—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খণ্ডগিরির শিখরদেশ হইতে প্রতিদিন চাহিয়া দেখিতেন এক একখানি করিয়া পাষাণের পর পাষাণ উঠিয়া তাঁহাদের প্রতিদিবসকে নিষ্ফল করিতেছে— "উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র") 'প্রতিদিন' শব্দের ক্রিয়াবিশেষণ রূপ প্রয়োগের পাশে পাশে পদটী বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ পাইতেছে অর্থাৎ এখানে "প্রতি" পদ আর অব্যয় নহে; 'দিবস' শব্দের বিশেষণ (Distributive adjective বা বিভাগকারী বিশেষণ) মাত্র।

অতএব "প্রতি" এই প্রাদি নিপাতটীর পূর্বাবস্থানে বিশেষণ অর্থাৎ সত্বার্থ (ভাবপ্রধানমাখ্যাতম্ সত্বপ্রধানানি নামানি; যাস্ক-নিরুক্ত—১।১০) ও অসত্বার্থ ভেদে দুইপ্রকার প্রয়োগ পাইতেছি। পতঞ্জলি

"প্রাদয় উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে ; পা ১।৪।৫৮-৫৯" সূত্রের মহাভাষ্যে বলিতেছেন— "প্রাদয়োঽসত্ত্ববচনা নিপাত সংজ্ঞাভবন্তি"। কিন্তু এই অসত্ত্বার্থে নিপাত সংজ্ঞায়ও দুই প্রকার ভেদ পাণিনি পরম্পরায় স্বীকৃত ; একটী হইতেছে ষত্ব ও ণত্ব নিষেধে গতি সংজ্ঞক অবস্থা (যেমন :— 'প্রনষ্ট বিসেচক' প্রভৃতি পদে) এবং অন্যটী ষত্ব-ণত্ব স্বীকৃত অবস্থা। এই অবস্থার কি নাম হইবে। পাণিনি বলেন— উপসর্গ ক্রিয়াযোগে (১।৪।৫৯) কিন্তু বাংলা ক্রিয়ায় উপসর্গের ব্যবহার নাই। অতএব উপসর্গ এই সংজ্ঞা বাংলায় অসঙ্গত। আবার কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞাও এই পূর্বাবস্থানে অচল ; কারণ বাংলায় এরূপ স্থলে ইহাদের পরাবস্থান প্রচলিত। এই "প্রতি" শব্দটীরই "পিছু" এই সম্বন্ধনীয় অর্থে যে প্রয়োগ হয় তাহা "লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসুপ্রতি-পর্যনবঃ (পা ; ১।৪।৯০)" সূত্রানুযায়ী ভাগার্থক হেতু কর্মপ্রবচনীয় হইলেও পরাবস্থানকেই স্বীকার করায় ; কেননা, প্রতি টাকায় = টাকায় = টাকাপিছু = টাকাপ্রতি (যথা—টাকাপ্রতি অষ্টগণ্ডা সের প্রতি ধর)। "বীর শক্রর প্রতি ধাবিত হইলেন" বাক্যে যে কর্মপ্রচনীয় প্রয়োগ পাইতেছি তাহা "প্রতিঃ প্রতিনিধি প্রতিদানয়োঃ [পাঃ— ১।৪।৯২]" সূত্রানুসারে হইলেও বাংলায় পরাবস্থানেই সম্ভব। "অতিরতিক্রমণে চ ; পা ১।৪।৯৫" সূত্রানুসারে "অতি" শব্দের যে প্রয়োগের কথা উল্লেখ আছে বাংলায় তাহা পাই বটে ; এরূপস্থলে "অতি" শব্দ বিশেষণের বিশেষণ মাত্র এবং পূর্বাবস্থানই প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহাও সত্ত্বার্থক হেতু নিপাত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

অব্যয়ের সত্ত্বার্থ ও অসত্ত্বার্থ বিবেচনার আবশ্যকতা অন্যদিক দিয়াও বাংলায় অনুভূত হয়। "চাদয়োঽসত্ত্বে ; পা ১।৪।৫৭" সূত্রগণধৃত "চ" পদের স্বতন্ত্র ব্যবহার নাই। পদটী "তথা, তত্র" প্রভৃতি নির্দেশক সর্বনাম এবং "বর" বিশেষণের প্রথমার একবচন রূপের উত্তর প্রযুক্ত হইয়া (যথা—তথাচ, তত্রাচ, বরঞ্চ) সমুচ্চয়ার্থ (অব্যয়) পদ সৃষ্টি করে। অনুরূপ ঐ গণের "তু" পদটীও "পর" ও "কি" সর্বনামের সমরূপের সহিত যুক্ত হইয়া (পরন্তু, কিন্তু) সমশ্রেণীর পদ গঠন করে। ঐ গণভুক্ত "বা" পদটীর ব্যবহার বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে থাকিলেও "অথ" অব্যয়ের সহিত এবং "কি" সর্বনামের রূপের সহিত যুক্ত হইয়া সমশ্রেণীর পদ (যথা— অথবা, অথচ, কিংবা) সৃষ্টি করে। অন্যশ্রেণীর পদের সহিত যুক্ত হইলেও উক্ত গণভুক্ত এই তিনটী পদ নিজ সত্ত্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া (সমুচ্চয়ার্থ) একই শ্রেণীর পদ সৃষ্টি করে এবং এই গণভুক্ত "নচেৎ" পদের ন্যায় বাক্য সংযোজনের কায করিবার শক্তি প্রাপ্ত হয়। এই গণভুক্ত "দিক" পদটী অন্য (অন্তর্ভাবার্থক) শ্রেণী ভুক্ত হইলেও নিজস্ব সত্তায় প্রতিষ্ঠিত।

অতএব অসত্ত্বার্থক প্রাদিগুলির বাংলা ব্যাকরণ মর্যাদা কি ? ইহা বিবেচনা করিতে গেলে প্রথমে "স্বরাদি নিপাতমব্যয়ম্" যে সূত্রটী লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম আমাদিগকে সেখানে ফিরিয়া আসিতে হয় ; কেননা এই গণধৃত কয়েকটী শব্দের আলোচনা বাকি রাখিয়া গিয়াছি। এই গণে ধৃত "স্বর, নভ, স্ব, ইতঃ, ততঃ, কুতঃ, উপরি, প্রাক, সনা, পুরা, কু, বহিস, নমস, পয়স, তিরস, আবিস, দোঃ, উচ্চৈস্, শনৈস, চিরম্, অতস, পুনর, প্রাদুঃ, অধস্, প্রাতর্, সায়ম্, প্রায়স্, অন্তঃ, পুরস্, অলম্, যথা, ভূস্, ও ভূবস্" শব্দগুলি কৃৎ প্রভৃতি প্রকরণে পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব অসত্ত্বার্থক প্রাদিগুলি এই গুলির সমপর্যায়ভুক্ত। পাণিনি সূত্রমতে প্রথমোক্তগুলি অব্যয়। কাযেই বাংলায় যদি অব্যয় বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা এই পূর্বপদ ও প্রাদি সমষ্টির একত্র নাম এবং ইহা ছাড়া অন্যত্র এই সংজ্ঞার প্রয়োগ অসংগত।

স্বরলিপি

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

II {গা -ঋপা পঋা ধপঋা -পা -া -া -া গপা -া -া -া -ঋপা -ধধা -পঋা -গঋা
কী ০ ০ ধ্ব ০ নি ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা -া -া -া} গঋা গঋা ঋা -সা -ন্‌া -া ন্‌া ঋা ঋগা -া -া -াপ
জে ০ ০ ০ গ ০ হ ০ ন ০ ০ ০ চে ত না ০ ০ ০ ০

গা -ঋা -া -া সা -া -া -া গঋপা -ধধা পা -া ধধা -পপা -ঋা -গঋা
মা ০ ০ ০ ঝে ০ ০ ০ কী ০ ০ ০ ০ আ ০ ন ০ ০ ০ ০ ন্‌

গা -ঋা -া -া গঋা -ঋগা গা -ঋা ঋগা -ঋা -া -া সা -া -া -া
দে ০ ০ ০ উ ০ ০ চ্‌ ছ ০ সি ০ ০ ০ ০ ল ০ ০ ০

সা ঋসা -ন্‌া -াঋ গা ঋা পা -না -া -া ধপা -ঋা -গঋা -গা -া -া
ম ম ০ ০ ০ ত মু বী ০ ০ ০ ণা ০ ০ ০ ০ ০

গঋা গঋা ঋা -সা -ন্‌া -া ন্‌া ঋা ঋগা -া -া -াপ গা -ঋা -া -া
গ ০ হ ০ ন ০ ০ ০ চে ত না ০ ০ ০ ০ মা ০ ০ ০

সা -া -া -া গা গা ঋধা নর্সা র্সা নর্সা -া -া -া -া র্সাঋ র্সঋা
ঝে ০ ০ ০ ম ন প্রা ০ ণ হ রা ০ ০ ০ ০ সু ধা ০

-া -ার্স র্সাঋ নর্সা -া -া -া -া গা গা ঋপধা -নর্সা র্সা র্সা নর্সা -া
০ ০ ঝ রা ০ ০ ০ ০ ম ন প্রা ০ ০ ০ ণ হ রা ০

-া -া র্সাঋ র্সঋা -া -ার্স র্সাঋ নর্সা -া -া -া -া না র্সা না -া
০ ০ সু ধা ০ ০ ০ ঝ রা ০ ০ ০ ০ প র শে ০

-া -ার্স র্গঋা ঋা র্সা -া -া -া না নার্স -ধনা -ধনর্সা নধা পঋা -পা -া
০ ০ ভা ০ ব না ০ ০ ০ উ দা ০ ০ ০ ০ সী ০ না ০ ০

-া পা -া -ধা ধা -র্সা না -ধা পক্ষা -ধপা -ক্ষা -গক্ষা গা -া -া -া
০ কী ০ ০ ধ্ব ০ নি ০ বা০ ০০ ঃ ০ জে ০ ০ ০

গক্ষা গঋা ঋা -সা -ন্া -া ন্া ঋা গা -া -া -াপ গা -ঋা -া -া
গ০ হ০ ন ০ ০ ০ চে ত না ০ ০ ০ মা ০ ০ ০

সা -া -া -া গা গা ক্ষধা নর্সা র্সা নর্সা -া -া -া -া র্সাঋ র্সঋা
ঝে ০ ০ ০ ম ন প্রা০ ণ হ রা ০ ০ ০ ০ সু ধা০

-া -ার্স র্সাঋ নর্সা -া -া -া -া না -র্সা -র্গা -ঋা -র্গা -ঋা -র্সা -না
০ ০ ঝ রা ০ ০ ০ ০ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

-র্সা -ধনা -র্সর্সনা -ধপক্ষা -গা -া -া -া গা গা ক্ষধা নর্সা র্সা নর্সা -া -া
০ ০০ ০০০ ০০০ ০ ০ ০ ০ ম ন প্রা০ ণ হ রা ০ ০

-া -া র্সাঋ র্সঋা -া -ার্স র্সাঋ নর্সা -া -া -া -া না র্সা না -া
০ ০ সু ধা০ ০ ০ ঝ রা ০ ০ ০ ০ প র শে ০

-া -ার্স র্সর্গঋা ঋা সা -া -া -া না নার্স -ধনা -ধনর্সা নধা পক্ষা -পা -া
০ ০ ভা০ ব না ০ ০ ০ উ দা ০০ ০০ সী০ না ০ ০

-া পা -া -ধা ধা -র্সা না -ধা পক্ষা -ধপা -ক্ষা -গক্ষা গা -া -া -া
০ কী ০ ০ ধ্ব ০ নি ০ বা০ ০০ ০ ০ জে ০ ০ ০

গক্ষা গঋা ঋা -সা -ন্া -া ন্া ঋা গা -া -া -াপ গা -ঋা -া -া
গ০ হ০ ন ০ ০ ০ চে ত না ০ ০ ০ মা ০ ০ ০

সা -া -া -া গা -ক্ষপা পক্ষা ধপক্ষা -পা -া -া -া গপা -াক্ষ ধপক্ষা -পা
ঝে ০ ০ ০ কী ০০ ধ্ব০ নি০ ০ ০ ০ ০ বা০ ০ জে০ ০

-া -া -া -া ক্ষধপা -ক্ষধপা -ক্ষপক্ষা -গক্ষগা -ঋগক্ষা -ধপক্ষা -গক্ষগা -ঋসা
০ ০ ০ ০ আ০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০

-গন্ধপা -ধনর্ঋা -র্সনধা -পননা । -ধপক্ষ্মা -গন্ধগা -া -া । গা -পা পক্ষ্মা ধপক্ষ্মা । -পা -া -া -া ।
০০০ ০০০ ০০০ ০০০ । ০০০ ০০০ ০ ০ । কী ০ ধ্ব ০ নি ০ । ০ ০ ০ ০

নর্ঋা -না -া -া । -ধপা -ক্ষ্মা -পা -না । -নধা -পা -ক্ষ্মা -গক্ষ্মা । গা -া -া -া
বা ০ ০ ০ ০ । ০০ ০ ০ ০ । ০০ ০ ০ ০ । জে ০ ০ ০

গক্ষ্মা গঋা ঋা -সা । -ন্া -া ন্া ঋা । গা -া -া -াপ । গা -ঋা -া -া
গ ০ হ ০ ন ০ । ০ ০ চে ত । না ০ ০ ০ । মা ০ ০ ০

সা -া -া -া । গন্ধপা -ধধা পা -া । ধধা -পপা -ক্ষ্মা -গক্ষ্মা । গা -ঋা -া -া
ঝে ০ ০ ০ । কী ০ ০ ০ ০ আ ০ । ন ০ ০০ ০ ন্ । দে ০ ০ ০

গক্ষ্মা -ক্ষ্মগা গা -ঋা । ঋগা -ঋা -া -া । সা -া -া -া । সা ঋসা -ন্া -াঋ
উ ০ ০ চ্ ছ ০ । সি ০ ০ ০ । ল ০ ০ ০ । ম ম ০ ০ ০

গা ক্ষ্মা পা -না । -া -া ধপা -ক্ষ্মা । -গক্ষ্মা -গা -া -া । গক্ষ্মা গঋা ঋা -সা
ত নু বী ০ । ০ ০ ণা ০ । ০ ০ ০ ০ । গ ০ হ ০ ন ০

-ন্া -া ন্া ঋা । গা -া -া -াপ । গা -ঋা -া -া । সা -া -া -া II II
০ ০ চে ত । না ০ ০ ০ । মা ০ ০ ০ । ঝে ০ ০ ০

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত বীণাবাদিনী চিত্রের ব্লক ভারত-সরকারের প্রকাশন-বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

পশ্চিম-আফ্রিকার ব্রঞ্জমূর্তি। মূর্তিগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। চিত্রগুলি Leon Underwood লিখিত *Bronzes of West Africa* (Alec Tiranti) গ্রন্থ হইতে প্রকাশকের অনুমতি অনুসারে গৃহীত।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের চিত্র শ্রীবিমল ঘোষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।